একক 1 ❑ জনবসতি ও জনবসতি ভূগোল

গঠন ঃ

1.1 উদ্দেশ্য

1.2 প্রস্তাবনা

1.3 জনবসতির ভৌগোলিক তাৎপর্য্য

1.4 জনবসতি ভূগোলের পরিধি ও বিষয়বস্তু

1.5 জনবসতি ভূগোলের বিকাশ

1.6 জনবসতির সংজ্ঞা

1.7 জনবসতির শ্রেণীবিভাগ

1.7.1 ক্রিয়াকলাপ ও সামাজিক প্রেক্ষাপটের ভিত্তিতে শ্রেণীবিভাগ

1.7.2 স্থায়ীত্বের ভিত্তিতে শ্রেণীবিভাগ

1.7.3 আয়তনের ভিত্তিতে শ্রেণীবিভাগ

1.7.4. অন্যান্য শ্রেণীবিভাগ

1.8 ইতিহাস, সংস্কৃতি ও জনবসতি

1.8.1 ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমিকা

1.8.2 পুরাতাত্ত্বিক আবিষ্কার ও জনবসতি

1.8.3. বিভিন্ন ঐতিহাসিক যুগে জনবসতির বিকাশ

1.9 সারসংক্ষেপ

1.10. প্রশ্নাবলী

1.1 উদ্দেশ্য

জনবসতি ও জনবসতি ভূগোল সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান লাভই এককটির উদ্দেশ্য। এককটিতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচিত হবেঃ

- জনবসতির সংজ্ঞা ও তার শ্রেণীবিভাগ ;
- জনবসতির ভৌগোলিক তাৎপর্য ;

- জনবসতি ভূগোলের পরিধি ও বিষয়বস্তু ;
- ভারত ও অন্যান্য দেশে জনবসতি ভূগোলের বিকাশ ও অগ্রগতি ;
- জনবসতি ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক তাৎপর্য।

1.2 প্রস্তাবনা

বাসস্থান বা বসতি মানুষের প্রাথমিক তিনটি চাহিদার অন্যতম। অতিপ্রাচীনকাল থেকেই প্রকৃতির খামখেয়ালীপনার হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য মানুষ গাছ, গুহা, গর্ত প্রভৃতি জায়গায় আশ্রয় নিয়েছে। কাল ক্রমে সভ্যতা যত এগিয়ে চলেছে মানুষ বিভিন্ন প্রাকৃতিক উপাদানের সাহায্যে নিজের আশ্রয়স্থল নির্মাণ করেছে। এই আশ্রয়স্থল বা বসতি নির্মাণ হল প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে মানুষের নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়ার এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ।

বর্তমানে মানুষের বাসস্থান ও বহুবাসস্থানের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা যে বসতি আমরা দেখতে পাই, তা হাজার হাজার বছরের মানবসভ্যতার বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বর্তমান অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। প্রাগৈতিহাসিক যুগে মানুষ যখন ফলমূল সংগ্রহ ও বন্যপ্রাণী শিকার জীবন ধারণ করত তখন তাদের আশ্রয়স্থল ছিল গুহা, গাছ, গর্ত প্রভৃতি। স্বাভাবিক কারণেই এই সময় মানুষের আশ্রয়স্থলগুলি স্থায়ী ছিল না, কারণ জীবনধারণের প্রয়োজনে মানুষ তখন এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ঘুরে বেড়াত। এর পরবর্তী অবস্থায় যখন মানুষ পশুপালন করতে শিখল, তখনও মানুষ চারণভূমির সন্ধানে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ঘুরে বেড়াত। সুতরাং সেই সময়ও মানুষের বসতি স্থায়ী ছিল না, যদিও সেই বসতির স্থিতিকরণ কিছুটা দীর্ঘ হয়েছিল। পরবর্তীকালে প্রযুক্তিতে উন্নতির সাথে সাথে মানুষ কৃষিকার্য করতে শিখল এবং মানুষের একস্থানে স্থায়ীভাবে বাস করার প্রয়োজন হল। আনুমানিক দশ থেকে পনেরো হাজার বছর আগে কৃষিকার্যের আবিষ্কারে ফলে মানুষ নিজেদের খাদ্য উৎপাদন এবং বস্ত্র, গৃহনির্মাণ প্রভৃতির কাঁচামাল উৎপাদন করতে সক্ষম হয়েছিল। স্থায়ী বসতি নির্মাণের পথে এটাই ছিল মানুষের প্রথম দৃঢ় পদক্ষেপ। এরপর প্রযুক্তির যত উন্নতি ঘটেছে, মানুষের বসতির রূপও ক্রমশঃ বদলেছে। গ্রাম থেকে শহর, শহর থেকে নগর এবং অবশেষে মহানগরীর সৃষ্টি হয়ে মানুষের বসতি বর্তমান অবস্থায় পৌঁছেছে।

1.3 জনবসতি ঃ ভৌগোলিক তাৎপর্য

বসতি স্থাপনের মধ্য দিয়ে মানুষ তার চারপাশের প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয়। ভূগোল শিক্ষার একটি মূল বিষয় হল "মানুষ-পরিবেশ সম্পর্ক" বিষয়ে আলোচনা। বসতি এই আলোচনার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাকৃতিক পরিবেশের যেমন বিভিন্নতা

দেখা যায়। তেমনই বিভিন্ন প্রকৃতিক পরিবেশে বসতির আকার, আকৃতি উপাদান প্রভৃতিও ভিন্নতর হয়ে থাকে। সুতরাং কোন ভৌগোলিক পরিবেশে গড়ে ওঠা বসতি সেখানকার "মানুষ পরিবেশে সম্পর্ক" সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট ধারণা দেয়।

প্রাকৃতিক পরিবেশ সৃষ্টিতে মানুষের কোন হাত নেই। তবে মানুষের সংস্কৃতি এই প্রাকৃতিক পরিবেশের পরিবর্তন ঘটাচ্ছে। সভ্যতার প্রথম স্তর থেকে মানুষের চিন্তা, শ্রম ও প্রযুক্তির সাক্ষর প্রাকৃতিক পরিবেশের ওপর পড়েছে। এর ফলে সৃষ্টি হচ্ছে সাংস্কৃতিক ভূদৃশ্য।

পানীয় জলের সহজলভ্যতা, সূর্যালোকের সময় প্রভৃতিও জনবসতি প্রভাবিত করে। পৃথিবীর বেশীর ভাগ জনবসতিই নদী উপত্যকাগুলিতে গড়ে উঠেছে। যেমন-জার্মানীর রাইন উপত্যকা, উত্তর আমেরিকার সেন্ট লরেন্স, চীনের হোয়াংহো ও ভারতের গঙ্গা নদীকে কেন্দ্র করে ঘন বসতি গড়ে উঠেছে। তেমনি আবার মরুভূমিতে কেবলমাত্র মরুদ্যানগুলিকে কেন্দ্র করে বিচ্ছিন্ন বসতি গড়ে উঠতে দেখা যায়। অনেক সময় পার্বত্য উপত্যকায় প্রস্রবণ ও ঝরণাকে কেন্দ্র করেও বসতি গড়ে ওঠে। আবার পার্বত্য অঞ্চলে যে জায়গায় দীর্ঘ সময় ধরে সূর্যের আলো পাওয়া যায়। সেইদিকে বসতিগুলি গড়ে উঠতে দেখা যায়। তাই উত্তর গোলার্ধের পার্বত্য অঞ্চলে দক্ষিণমুখী ঢালে অধিকাংশ বসতি গড়ে ওঠে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে উত্তরমুখী ঢাল জনবসতি স্থাপনের জন্য বিশেষ উপযোগী।

অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণেও বসতির প্রকারভেদ দেখা যায়। ভিদাল দ্য লা ব্লাশ (Vidal de la Blache) এর মতে, যেখানে কৃষিজমি সহজলভ্য, সেখানে সংঘবদ্ধ বসতি ওঠে। একারণে উত্তর ভারতে সংঘবদ্ধ বসতি দেখা যায়, অন্যদিকে পার্বত্য ভূ-প্রকৃতির জন্য নেপাল ও ভূটান কৃষিজমি বিচ্ছিন্নভাবে পাওয়া যায় বলে যেখানে ছোট ছোট গ্রাম ও অস্থায়ী বসতি দেখা যায়। নদী উপত্যকাগুলিতে জনবসতির বিন্যাস প্রধানতঃ গুচ্ছাকৃতির, আবার মরুভূমি বা পার্বত্য অঞ্চলে জনবসতিগুলি বিক্ষিপ্ত।

1.4 জনবসতি ভূগোলের পরিধি ও বিষয়বস্তু

জনবসতি ভূগোল মানবীয় ভূগোলের এক নবীন শাখা হলেও, তা মানবীয় ভূগোলে এক বিশেষ স্থান অধিকার করে নিয়েছে। মানবীয় ভূগোলের বিভিন্ন শাখা মানুষের অর্থনৈতিক ও মানবিক কাজকর্ম বিভিন্নভাবে মানুষের তৈরি এই সাংস্কৃতিক ভূ-দৃশ্যে একটি অন্যতম (Content) হল জনবসতি। জনবসতির মধ্যে দিয়েই তাই মানুষ-প্রকৃতি সম্পর্কে সবচেয়ে সুন্দর প্রকাশ ঘটে। মানুষ তার ঘরবাড়ি নির্মাণের উপকরণ প্রকৃতি থেকে সংগ্রহ করে। তার সাথে যোগ করে নিজের শ্রম ও সংস্কৃতি। সাংস্কৃতিক পর্যায় অনুযায়ী মানুষের চাহিদা বদলানোর সাথে সাথে ঘরবাড়ি নির্মাণের কাঁচামাল ও প্রযুক্তির কৌশল বদলায়। ফলে সমাজে পাতার কুটীর, মাটির কুঁড়ে, ইট কাঠের বাড়ি থেকে শুরু করে আকাশ ছোঁয়া বহুতল বাড়ি এমনকি

অতি আধুনিক উপকরণ নির্মিত অট্টালিকাও দেখা যায়। এই ধরণের অনেক বাসগৃহ একত্রে মিলে তৈরি হয় একটি জনবসতি।

জ্যাঁ ব্রুনেস (Jean Brunhes) এর মতে বসতি স্থাপনের মধ্য দিয়ে পরিবেশের সঙ্গে মানুষের প্রথম পরিচয় ঘটে। এই পরিবেশ প্রাকৃতিক হতে পারে, আবার সাংস্কৃতিকও হতে পারে। বসতি গড়ে ওঠার পেছনে প্রাকৃতিক পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের প্রভাব অপরিসীম। ভূপ্রকৃতি, জলবায়ু, মাটি ইত্যাদির ওপর বসতির অবস্থান, আকার, উপাদান প্রভৃতি বহুলাংশে নির্ভর করে। এটা লক্ষ্য করা গেছে যে 1800 মিটারের বেশী উচ্চতায় পৃথিবীতে বসতি বিস্তার খুব কম হয়েছে। এর মধ্যেও আবার সমুদ্রতল থেকে 500 মিটার উচ্চতার মধ্যেই পৃথিবীর 50 শতাংশ লোক বাস করে। আবার দেখা গেছে যে, পৃথিবীর জনসংখ্যার 90 শতাংশেরও বেশী বাস উত্তরগোলার্ধে। আবার অক্ষাংশ অনুসারেও জনবসতির প্রভেদ দেখা যায়। এই উত্তর গোলার্ধেই নিরক্ষরেখা থেকে 20° অক্ষাংশের মধ্যে মোট জনসংখ্যার 10 শতাংশ বাস করে, 50 শতাংশ বাস করে 20° থেকে 40° উত্তর অক্ষাংশের মধ্যে। 40° থেকে উত্তর অক্ষাংশের মধ্যে 30 শতাংশ লোকের বাস এবং এর উত্তরে 1 শতাংশেরও কম লোক বাস করে।

অবস্থা ও প্রতিষ্ঠানিক গঠন সম্পর্কে জানা যায়, তাই নয়, শহরের বন্টন, শহরের মধ্যে বিভিন্ন অঞ্চল এবং শহরের প্রভাব অঞ্চল সম্পর্কেও অবগত হওয়া যায়। তাই পৌর বসতি দুভাবে আলোচনা করা যায়ঃ (i) সামগ্রিকভাবে শহরের আলোচনা, যেখানে সমগ্র শহরের ভূমিভাগ, প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের সঙ্গে তার সম্পর্ক, শহরের সমস্যা প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করা হয়। শহরের প্রভাব অঞ্চল পৌর বসতি ভূগোলের অন্যতম আলোচ্য বিষয়বস্তু এবং (ii) একটি শহরের বিভিন্ন অঞ্চলের আলোচনা। এই ধারায় শহরকে বিভিন্ন ব্যবহারিক ও সামাজিক অঞ্চলে ভাগ করে, তাদের সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় ও মানচিত্র অঙ্কন করা হয়।

গ্রামীণ বসতি ভূগোলের বিষয়বস্তু কিছুটা আলাদা। অধ্যাপক স্টোন (Stone, 1965) গ্রামীণ বসতি ভূগোলের চরিত্র বিশ্লেষণে দুটি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর মতে বাসগৃহ ও মানুষ-প্রকৃতি সম্পর্ক জনবসতি ভূগোলের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু। বাসগৃহ আলোচনায় বাসগৃহের অবস্থান ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা, অর্থাৎ কি কি সুযোগ সুবিধার ওপর ভিত্তি করে কোন অঞ্চলে বাসগৃহ নির্মিত হয়েছে তার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। অধ্যাপক জর্ডন (Jordan, 1966) এর মতে গ্রামীণ জনবসতি ভূগোলের পরিধি অনে ব্যাপক। তার মতে ভূগোলের এই শাখা সাংস্কৃতিক ভূ-দৃশ্যের রূপ বর্ণনা করে। জর্ডনের বক্তব্য অনুসারে বলা যায় যে, সাংস্কৃতিক ভূ-দৃশ্যের তিনটি বিষয় গ্রামীণ জনবসতি ভূগোলে আলোচনা করা হয়ঃ(i) বসতির নকশা ও খামার বাড়ির বন্টন, (ii) কৃষিজমির নকশা ও (iii) বাসগৃহ ও খামার বাড়ির প্রকারভেদ, বাসগৃহ নির্মাণের উপকরণ ও গ্রামীণ স্থাপত্য বিশ্লেষণ করে। জনবসতি ভূগোল মানবীয় ভূগোলের সামাজিক

বিষয়গুলির একটি অংশ নিয়ে আলোচনা করে। প্রাকৃতিক পরিবেশ সৃষ্টিতে মানুষের হাত না থাকলেও, গ্রাম, শহর, নগর প্রভৃতি সৃষ্টির মাধ্যমে মানুষ পরিবেশের পরিবর্তন ঘটায়। এর ফলে মানুষ-পরিবেশ সম্পর্কেরও পরিবর্তন ঘটে। জনবসতি ভূগোল এই গ্রাম, শহর প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করে এবং বসতি স্থাপনের মাধ্যমে মানুষ-পরিবেশ সম্পর্কের যেমন পরিবর্তন ঘটে, তাও জনবসতি ভূগোলের বিষয়বস্তু।

জনবসতি ভূগোলের ইতিহাসের প্রাক্কালেই গ্রামীণ ও পৌর বসতির মধ্যে বিভাগ হয়েছে। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর আগে পর্যন্ত জনবসতি ভূগোল প্রধানতঃ পৌরবসতি নিয়েই আলোচনা করেছে কারণ পৌর বসতিকে আধুনিক সভ্যতার একটি চিহ্ন হিসাবে ধরা হয়। কিন্তু পৃথিবীর দুই তৃতীয়াংশ জনগণ এবং ৭৪ শতাংশ জনবসতি গ্রামে অবস্থান করছে। তাই ঐতিহাসিক, সমাজতত্ত্ববিদ্ ও ভৌগোলিকগণ বিভিন্ন গ্রামীণ জনবসতি ও তাদের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন। জনবসতির একটি পূর্ণাঙ্গ আলোচনার বিভিন্ন প্রকার জনবসতির অবস্থান, আকার, গৃহ নির্মাণের উপকরণ, কর্মধারা, বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করে। এর মধ্যে অবস্থান, পারিপার্শ্বিক অবস্থা, ও গৃহ নির্মাণের উপকরণের আলোচনায় যেমন প্রাকৃতিক পরিবেশ ও তার সঙ্গে সংস্কৃতির সম্পর্ক আলোচনার প্রয়োজন হয়, তেমনি জনবসতির বাহ্যিক গঠন আলোচনার ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক পটভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর থেকে জনবসতির পর্যায়ক্রমে পরিবর্তন বোঝা যায়। জনবসতির আঞ্চলিক পার্থক্যও এই পরিবর্তন বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু। স্থান নাম বিশ্লেষণ থেকেও এ সম্পর্কে কিছু তথ্য পাওয়া যায়।

জনবসতি ভূগোলের একটি প্রধান বিষয় হল কর্মধারা বিশ্লেষণ। এর থেকে যে শুধু গ্রামীণ বসতির আর্থ-সামাজিক বিষয়ার্থে গ্রামীণ বসতি ভূগোল মানুষের বসতি স্থাপনের পদ্ধতি ও তার বিকাশ নিয়ে আলোচনা করে। ব্রেক (Brack J. O. M.) এবং ওয়েব (Webb. J. W.) (1968) এ জিওগ্রাফি অফ ম্যানকাইণ্ড (A Geography of Mankind) গ্রন্থে গ্রামীণ জনবসতির বিষয়বস্তু হিসাবে সাংস্কৃতিক ভূ-দৃশ্যে বসতি নির্মাণের পদ্ধতি, আয়তন, আকার, কর্মধারা প্রভৃতিকে চিহ্নিত করেছেন। আর, এল. সিং (R. L. Singh 1975) এর মতে, গ্রামীণ জনবসতি ভূগোলের মূল বিষয় হল সাংস্কৃতিক ভূদৃশ্যের পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে বসতির উৎপত্তি, আয়তন, আকার ও কর্মধারা বিশ্লেষণ। বেকার (Baker) গ্রামীণ জনবসতি ভূগোলকে ভূবিজ্ঞানের সঙ্গে তুলনা করেছেন। তাঁর মতে, ভূবিজ্ঞানে যেমন, গঠন, প্রক্রিয়া ও পর্যায় (Structure, Process and Stage) এর আলোচনা করা হয়, তেমনি গ্রামীণ জনবসতি ভূগোলের আলোচ্য বিষয় হল বসতির আকার, কর্মধারা ও উৎপত্তি।

1971 সালে বারাণসীতে ভৌগোলিকদের আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্রে জনবসতি ভূগোল এবং বিশেষভাবে গ্রামীণ জনবসতি ভূগোলের একটি পূর্ণাঙ্গ বিষয়বস্তু প্রস্তাবিত হয়, যার বিবরণ পরের পাতায় দেওয়া হল ঃ

1. গ্রামীণ জনবসতি ভূগোলের দৃষ্টিকোণ ঃ

(ক) ভূগোলের অন্যান্য শাখার সঙ্গে গ্রামীণ জনবসতি ভূগোলের সম্পর্ক,

(খ) সমীক্ষার মাধ্যমে জনবসতি সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ,

(গ) নথীভুক্ত পরিসংখ্যান, মানচিত্র এবং অন্যান্য ঐতিহাসিক তথ্য,

(ঘ) তথ্য বিশ্লেষণ ও মানচিত্র অঙ্কন, তত্ত্ব, দৃষ্টান্ত প্রভৃতির বিকাশ এবং

(ঙ) জনবসতি সম্পর্কিত অন্যান্য তথ্যসমূহ যেমন স্থান নাম।

2. ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রামীণ জনবসতির বিচারঃ

(ক) ঐতিহাসিক সাংস্কৃতিক অঞ্চল (বিভিন্ন সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী এবং তাদের আধিকৃত অঞ্চলের মানচিত্র অঙ্কন)

(খ) ভূমিভাগের প্রণালী, জমির মালিকানা প্রদান, জলের অধিকার প্রভৃতির সঙ্গে জনবসতি বিকাশের সম্পর্ক।

(গ) নতুন জনবসতি অঞ্চল ও তার সমস্যা।

(ঘ) নবীন প্রস্তরযুগ, তাম্র এবং লৌহ যুগে অথবা প্রাচীন, মধ্য এবং আধুনিক যুগে জনবসতি গড়ে ওঠার পর্যায়ক্রম।

3. গ্রামীণ জনবসতির আঞ্চলিক প্রকারভেদ—

(ক) বিভিন্ন প্রকার প্রকৃতির, জাতিগত এবং সামাজিক অবস্থার সাথে জনবসতির প্রকারভেদ ও নকশার সম্পর্ক।

(খ) কৃষিকাজ, জল ও মৃত্তিকা পরিচালনা এবং জমির অধিকার ভোগের সাথে জনবসতির সম্পর্ক, ভূমি ব্যবহারের প্রগাঢ়তা আঞ্চলিকীকরণ, শ্রমিক এবং যোগান ও উৎপাদনের খরচ প্রভৃতি উৎপাদিত দ্রব্যের বাজারে বিক্রয় এবং অন্যান্য স্থানীকরণ তত্ত্ব।

4. গ্রামীণ জনবসতির কায়িক গঠন।

5. গ্রামীণ জনবসতির কর্মধারার প্রকারভেদ—

(ক) গ্রামীণ জনবসতির কর্মধারা বিশ্লেষণ—পদ্ধতিগত ব্যবস্যা, বিকাশ প্রভৃতি।

(খ) পরিষেবামূলক গ্রাম ও বাণিজ্যিক কেন্দ্রের কর্মধারা বিশ্লেষণ, এই সব কেন্দ্রের ক্রমোচ্চ শ্রেণীবিভাগ (hierarchy) এবং কেন্দ্রীয় স্থান তত্ত্বের (Central Place Theory) সাথে এর সম্পর্ক।

(গ) ঋতুভিত্তিক গ্রামীণ প্রব্রজন, বিভিন্ন গ্রামীণ গোষ্ঠীর প্রকারভেদ প্রভৃতি।

6. গ্রামীণ বসতবাড়ির প্রকারভেদ—

(ক) গ্রামীণ বসতবাড়ি ও অন্যান্য কর্মভিত্তিক গৃহের আয়তন, ক্রিয়াকলাপ, স্থাপত্যশৈলী, গৃহনির্মাণের উপকরণ প্রভৃতির বিশ্লেষণ।

(খ) গ্রামীণ বসতবাড়ির আঞ্চলিকীকরণ।

(গ) গ্রামীণ বসতবাড়ির পরিকল্পনা।

7. গ্রামীণবিদ্যা।

8. গ্রামীণ জনবসতি ও জনবসতি নকশার পরিকল্পনা ও যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা।

(ক) ভূমি ব্যবহারের স্থানভিত্তিক দক্ষতা, উৎপাদিত দ্রব্যের বাজারীকরণ, জীবনযাত্রা প্রভৃতির সাথে সম্পর্ক রেখে গ্রামীণ জনবসতির পরিকল্পনা।

(খ) বর্তমান অর্থনৈতিক উন্নতি, সামাজিক উন্নতি ও আধুনিকীকরণের চাহিদার সঙ্গে সম্পর্ক রেখে পরিকল্পনা।

(গ) গ্রামীণ পরিবর্তনের প্রতিনিধি হিসাবে পরিবেবামূলক গ্রাম এবং গ্রামীণ পরিষেবা কেন্দ্রের পরিকল্পনা।

(ঘ) গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন প্রকার সুবন্দোবস্তের পরিকল্পনা।

5. জনবসতি ভূগোলের বিকাশ ঃ

মানবীয় ভূগোলের এক নবীন শাখা হল জনবসতি ভূগোল। তবে প্রাচীনকাল থেকে বিভিন্ন শাস্ত্রকার, দার্শনিক ও ঐতিহাসিকদের লেখায় তৎকালীন জনবসতিগুলির বৈশিষ্ট্য ও গুণাগুণের উল্লেখ পাওয়া যায়। আপনারা এই বিভাগে জনবসতি ও জনবসতি ভূগোল সম্বন্ধে বিভিন্ন স্থানে ও বিভিন্ন সময়ে যে সকল আলোচনা ও গবেষণা হয়েছে, সে সম্পর্কে জানতে পারবেন।

● জনবসতি বিদ্যার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

প্রাচীন হিন্দু ও বৌদ্ধ শাস্ত্রে জনবসতির উল্লেখ পাওয়া যায়। পুরাণ ও জাতকে তৎকালীন বাসগৃহের ধরণ, "বাস্তুপদ বিন্যাস" অর্থাৎ বাসগৃহের নকশা, গ্রামীণ বসতি ও নগর পরিকল্পনা এবং স্থাপত্যশৈলীর বিবরণ পাওয়া যায়। ইউরোপে প্রাচীন ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিকদের রচনায় সর্বপ্রথম জনবসতি বিদ্যার বিকাশলাভ ঘটে। ঐতিহাসিক হেরাডোটাস (Herodotus)-এর লেখায় প্রাচীন বসতি ও তার সামাজিক রীতিনীতির উল্লেখ পাওয়া যায়। রোমান পণ্ডিত স্ট্রাবো (Strabo) তাঁর জিওগ্রাফিয়া (Geographia) গ্রন্থে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের শহর ও নগরের কথা বলেছেন। তাঁর ও অন্যান্য রোমান পণ্ডিত দার্শনিকদের লেখায় তৎকালীন সুসংগঠিত নগর পরিকল্পনার উল্লেখ পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে স্পেনীয় ও পর্তুগীজ

অভিযাত্রীগণ রোমান নগর পরিকল্পনার ধারা নতুন পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ফস্টার (Foster)-এর "সাউথ সী আইল্যাণ্ড" (South Sea Island) গ্রন্থে বসতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগ থেকে জনবসতি ভূগোলের বিশ্লেষণধর্মী গবেষণা শুরু হয়। এক্ষেত্রে জার্মান ভৌগোলিকদের অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রকৃতপক্ষে কার্ল রিটার (Carl Ritter) এর মনুষ্য ভূমির পারস্পরিক সম্পর্কের বিশ্লেষণ জনবসতি ভূগোলের ভিত রচনা করেছিল। এছাড়া অন্যান্য জার্মান ভৌগোলিকগণও তাদের রচনায় বাসগৃহের নমুনা এবং শহরাঞ্চল সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নগর ও তার প্রাকৃতিক পরিবেশের সম্পর্ক আলোচনার মধ্যে দিয়েই জনবসতি ভূগোল মানবীয় ভূগোলের একটি নির্দিষ্ট শাখা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। তার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে বিশেষতঃ পৌরবসতির মধ্য দিয়ে ভূগোলের এই নবীন শাখার প্রকৃত উন্নতি ঘটেছে।

● **জনবসতির আকার ও কার্যকলাপ ও বিশ্লেষণ**

মোসার (Moser) জার্মানীর বিভিন্ন খামার পরিদর্শন করে তার "হিস্ট্রি অফ ওসনাব্রুক" (History of Osnabruck) বইতে এই খামারগুলির গঠন ও কার্যকলাপ লিপিবদ্ধ করেন। পরবর্তীকালে জনবসতির আকার ও কার্যকলাপ জনবসতি ভূগোলের একটি উল্লেখযোগ্য গবেষণার বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়ায়। 1990 সালে ডালমান (Dahlmann) এবং হ্যানসেন (Hanssen) উত্তর ইউরোপের বিচ্ছিন্ন ও গোষ্ঠীবদ্ধ খামার বসতিগুলির ওপর অনুরূপ আলোচনা করেন।

● **স্থান নাম বিশ্লেষণ**

ঐতিহাসিক ডব্লিউ আরনল্ড (W. Arnold) সর্বপ্রথম দেখান যে প্রতিটি জনবসতির নামেরই বিশেষ কোন তাৎপর্য আছে। পরবর্তীকালে অনেক ভৌগোলিক এই পদ্ধতিটি ব্যবহার করেন। এই পদ্ধতির সাহায্যে আরনল্ড জার্মানীর পাঁচটি প্রধান জনবসতির—আলেমানেন (Alemaknen), ফ্রাঙ্কেন (Franken), থুরিঞ্জার (Thuringer), স্যাক্সেন (Sachsen) এবং বাইয়ান (Baiern) এর পঞ্চাশটি উপজাতিকে সনাক্ত করেন। আধুনিক যুগের ভৌগোলিকগণ একধরণের ঐতিহাসিক জনবসতি কৌশল গড়ে তোলেন এবং এর সাহায্যে জনবসতির নাম পরিবর্তন ব্যাখ্যা করেন। মিশেল (Mitchell) লক্ষ্য করেছেন যে স্থান নামের মানচিত্র অঙ্কন ও বিশ্লেষণের সাহায্যে বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে এমনকি একই অঞ্চলের মধ্যেও বিভিন্ন জনবসতির তারিখ ও পর্যায়ক্রম গড়ে তোলা যায়। পাশ্চাত্য জনবসতির তারিখ ও পর্যায়ক্রম গড়ে তোলা যায়। পাশ্চাত্য জগতের ভৌগোলিকগণ জনবসতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে স্থান নাম বিশ্লেষণ করেছেন এবং এর গুরুত্ব আবিষ্কার করেছেন। ইভান (Ivan) স্থান নামকে দুভাগে ভাগ করেছেন। প্রথমতঃ প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্কিত স্থান নাম এবং দ্বিতীয়তঃ সাংস্কৃতিক বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত স্থান নাম। দুই ধরণের স্থান নামেরই

বেশ কিছু উদাহরণ দেওয়া যায়। যেমন সুইডেনের লিমা-ইন-ডালার (Lima in Dalara) নামটি থেকে বোঝা যায় যে এটি চুনাপাথর (limestone) গঠিত অঞ্চলে অবস্থিত। আমাদের কলিকাতা শহরের নামটিও "কলিচুন" কথাটি থেকে এসেছে। 'কলি' শব্দের অর্থ হল চুন মিশ্রিত সামুদ্রিক প্রাণীর খোলস এবং 'কাতা' মানে চুনকে জল দিয়ে ফোটানোর জন্য তৈরী করা। মধ্যভারতের অনেক জনবসতির নামের পরে গড় দারা (উপত্যকা), ঘাটি (সংকীর্ণ উপত্যকা), ঘাটা (ভৃগুতট), মাল (উচ্চভূমি), খোহ (গুহা) এবং নামের আগে টিলা (উঁচু ঢিবি), খাই (ডোবা) প্রভৃতি বিভিন্ন ভূ-প্রকৃতিক বৈশিষ্ট্যকে বোঝায়।

অনেক জনবসতির নামের সঙ্গে জলেরও সম্পর্ক আছে। বিন্ধ্যপর্বতের মধ্য ও পশ্চিমভাগে এবং সাতপুরা পর্বতের কয়েকটি জনবসতির নাম পাতালপানী, জামাঝিরি, ভুনপানী, গৌকুণ্ড প্রভৃতি স্থানীয় জলাভাবের সঙ্গে জড়িত। রাজস্থানের কিছু জনবসতির নামের শেষে তাল, সির এবং সার শব্দগুলি জলের সঙ্গে সম্পর্কিত।

অনেক জনবসতির নামের সঙ্গে স্থানীয় গাছপালা, পশুপাখী প্রভৃতি জড়িয়ে রয়েছে। বিন্ধ্যপর্বতের নদী উপত্যকায় এরকম অনেক গ্রাম আছে। আমখেরা, আমরোহি, আমলিয়া (আম), কমলপুর (কমল বা পদ্ম), চম্পাখেড়ি (চাঁপাফুল), জিরাপুর (জিরে), কেশরগঞ্জ (জাফরান), করেলা (করোলা), ইমলিয়া (ইমলি বা তেঁতুল), পিপালিয়া, পিপারি, পিপরিস (পিপুল) প্রভৃতি গ্রামগুলির নাম থেকে স্থানীয় গাছপালার পরিচয় পাওয়া যায়। মালওয়া অঞ্চলে খরপাকার, খড়িপাকার (পাকুড়), শোমলখেড়ি (শিমুল), মহুয়াখেড়ি, গেহুখড়ি (গম), ধাতুরিয়া (ধুতরা) প্রভৃতি গ্রামের নাম থেকেও আমরা স্থানীয় গাছপালা সম্পর্কে জানতে পারি। তেমনি কিছু জনবসতির নাম স্থানীয় পশুপাখী থেকে এসেছে। যেমন কাক থেকে কাকপুরা, টিয়া থেকে সুয়াখেরা, সিংহ থেকে শেরপুর, কচ্ছপ থেকে কাছুওয়া প্রভৃতি।

স্থানীয় সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যও অনেক জনবসতির নামকে প্রভাবিত করে। অনেক গ্রামের নাম সেখানকার সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতের নাম অনুসারে হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ ধোবিখেড়া (ধোপা), মালিখেড়ি (মালি), সুনারি (স্বর্ণকার), নাউকুণ্ড (নাপিত) প্রভৃতি গ্রামের কথা বলা যায়। অনেক জনবসতির গ্রামের ওপর ধর্মীয় প্রভাব লক্ষনীয়। তিব্বতের রাজধানী লাসা কথাটির অর্থ হল আধ্যাত্মিক জগৎ। মুম্বাই নামটি মুম্বাইদেবী এবং কানপুর নামটি কানহা (কৃষ্ণ) থেকে এসেছে। অমৃতসর নামটির অর্থ হল অমৃতের সরোবর, রসুলপুর, মহম্মদপুর, সান্তিয়াগো প্রভৃতি জনপদগুলির নাম ইসলাম ও খৃষ্টধর্মীয় প্রভাব লক্ষ্যণীয়। আবার জনপদগুলির নাম অথবা নামের প্রথম বা শেষ শব্দটি সেখানকার ঐতিহাসিক পটভূমিকার সাথে জড়িত। উত্তরভারতে মুঘলসরাই, এলাহাবাদ, মোরাদাবাদ, গোপিগঞ্জ প্রভৃতি জনপদগুলি মুঘলযুগের অস্থায়ী সৈন্যশিবির ছিল। মধ্যপ্রদেশের উত্তর পশ্চিমাংশে যে সব স্থানের নামের শেষে ওয়াড়ি বা ওয়াড়া আছে, তাদের উৎপত্তি মারাঠাদের দ্বারা হয়েছিল। বাডেন পাওয়েল (Baden Powell) এর লেখা থেকে জানতে

পারি যে বাগৌরা, ধানৌরা প্রভৃতি যেসব জনপদের নামের শেষে 'উরা' কথাটি যুক্ত, সেইসব স্থানে তামিল, তেলেগু ও কানাড়াভাষী জনসংখ্যা বেশী। কোশাম্বি (Kosambi) দেখিয়েছেন যে, হিন্দী "আউলী" (জনবসতি) শব্দের মারাঠী প্রতিশব্দ ভালি (Vali) ধরিভালি প্রভৃতি।

এই ধরণের আরও অনেক কারণে অনেক জনবসতির নাম হয়েছে, যার গবেষণা জনবসতি ভূগোলে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে।

● **পদ্ধতিগত ব্যাখ্যা ঃ**

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ ও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে মানবীয় ভূগোলের গবেষণায় জনবসতির আকার ও কায়িক গঠন বিশ্লেষণ একটি প্রধান বিষয় ছিল। এই সকল ভৌগোলিক অনুসন্ধানের সাথে সাথে জনবসতি ভূগোলের বিভিন্ন গবেষণা পদ্ধতির ক্রমশঃ উন্নতি ঘটে। মানবীয় ভূগোলের কেন্দ্রবিন্দুতে মানুষের গুরুত্ব সম্পর্কে উপলব্ধির এই সময়েই বিকাশ ঘটে। এই ধারণার পথিকৃৎ ছিলেন কার্ল রিটার। ভিদাল দা লা ব্লাশ বিক্ষিপ্ত ও গোষ্ঠীবদ্ধ জনবসতির ওপর অবস্থান ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাব বিশ্লেষণ করেছেন। মিটজেন (Meitzen) এই সময় স্থান নাম বিশ্লেষণ পদ্ধতির সাহায্যে স্থায়ী গ্রামীণ জনবসতির বিবর্তনের ধারা ব্যাখ্যা করেন। তিনি প্রণালীবদ্ধ পদ্ধতিতে জনবসতির শ্রেণীবিভাগ করেন। জনবসতির পরিভাষাগত অনেক অবদান আছে। রিচতোফেন (Ritchtofen) জনবসতির সঙ্গে সংযুক্ত জমির ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন জলবায়ু ও মৃত্তিকার সাথে জনবসতির সম্পর্কও তিনি ব্যাখ্যা করেন। সোয়ার্টজ (Schwartz) তাঁর বইতে বসতবাড়ি ও অর্থনৈতিক অঞ্চলের সম্পর্কের ওপর জোর দেন। পরবর্তীকালে স্টৈন তাঁর গ্রামীণ জনবসতি ভূগোলের সংজ্ঞাতে এই ধারণাটিকে অনুসরণ করেন।

● **শ্রেণীবিভাগ আলোচনা**

শ্রেণীবিভাজন জনবসতির একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই এ বিষয়ে প্রচেষ্টা শুরু হয়। জার্মান, ফরাসী ও ব্রিটিশ ভৌগোলিকগণ এ বিষয়ে প্রচুর গবেষণা করেন। তবে জনবসতির শ্রেণী বিভাজনে আমেরিকা, রাশিয়া এমনকি এশিয়া ও আফ্রিকার ভৌগোলিকদের অবদানও কম নয়। 1920 সালে আরাসু (Aurousseau) মানবগোষ্ঠী ও জনবসতির আয়তন, ধরণ ও আকারের একটি সুন্দর বিবরণ দেন। আলম্যান (Ahlman) জনবসতির প্রকারভেদ নিয়ে আলোচনা করেন। লেফিভার (Lefiver) কৃষিভিত্তিক ভূদৃশ্যে বসতবাড়ীর ওপর আলোকপাত করেন। তাঁর মতে জনবসতি অনুশীলনের উদ্দেশ্য হল বিভিন্ন প্রকার জনবসতির সংজ্ঞা দেওয়া, তাদের শ্রেণীবিভাগ করা ও আঞ্চলিক বন্টন বিশ্লেষণ করা। 1939 সালে ডিকিনসন (Dickinson) জার্মানীর গ্রামীন জনবসতির প্রকারভেদ করেন। অ্যামেরিকান জিওগ্রাফি, ইনভেন্টরি এ্যাণ্ড প্রসপেক্ট (American Geography, Inventory and Prospect) বইতে কন (Kohn) জনবসতি ভূগোলের ব্যবহারিক বিষয়গুলি ব্যাখ্যা করেন। যা পরবর্তীকালে অনেক ভৌগোলিককে

অনুপ্রাণিত করে। 1954 সালে স্পেনসার (Spencer) এবং থমাস (Thomas) সাংস্কৃতিক বিষয়ের ভিত্তিতে জনবসতির শ্রেণীবিভাগ করেন। এরিস জোন্‌স্ (Emrys Jones) তাঁর "হিউম্যান জিওগ্রাফি" (Human Geography) গ্রন্থে উদাহরণ সহযোগে নতুন ও প্রাচীন পৃথিবীর জনবসতির অবস্থান, নকশা ও বণ্টন ব্যাখ্যা করেন। মিশেল (Mitchel) "হিস্টোরিক্যাল জিওগ্রাফি" (Historical Geography) গ্রন্থে জনবসতির অঙ্গ-সংস্থান ব্যাখ্যা করেন। চিসোল্‌ম্ (Chisolm) গ্রামীণ জনবসতি ও ভূমিব্যবহারের মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষণ করেন। 1969 সালে জে. সি. হাডসন (J. C. Hudson) গ্রামীণ জনবসতি ভূগোলের তত্ত্ব বিষয়ে আলোচনা করেন। এর ঠিক পরের বছর অর্থাৎ 1970 সালে এফ. ডি. হাডসন (F. D. Hudson) "এ জিওগ্রাফি অফ সেট্‌ল্‌মেন্ট (A Geography of Settlement) নামে একটি পৃথক গ্রন্থ রচনা করেন।

হাসিংগার (Hassinger) ও অস্ট্রিয়ার অন্যান্য কয়েকজন ভৌগোলিকের জনবসতি সম্পর্কে ধারণার সঙ্গে জার্মান ভৌগোলিকদের ধারণার মিল খুঁজে পাওয়া যায়। স্ক্যানিডনেভিয়ায় ভৌগোলিকগণ জনবসতিকে ভৌগোলিক সত্ত্বা হিসাবে বিশ্লেষণ করেছেন। গ্রানো (Grano) ফিনল্যাণ্ডের জনবসতি অঞ্চলের উদাহরণ সহযোগে আকার ও অবস্থান ব্যাখ্যা করেন। তিনি জনবসতিকে হ্যামলেট, গ্রাম ও নগরে ভাগ করেন। চেকোশ্লোভাকিয়াতে গ্রামীণ জনবসতির ব্যবহারিক মূল্যের ওপর জোর দেওয়া হয়। সেদেশের ভৌগোলিকগণ গ্রামের বসতবাড়ি, খামার ও চারপাশের জমি নিয়ে আলোচনা করেছেন।

5.1 ভারতে জনবসতি ভূগোলের অগ্রগতি

বিখ্যাত কবি কালিদাসের রচনায় প্রাচীন ভারতের বিভিন্ন জনবসতির বিবরণ পাওয়া যায়। 1940 সাল পর্যন্ত ভারতে জনবসতি ভূগোল সেভাবে বিকাশলাভ করেনি, যদিও এর আগে বছরের কেন্দ্র কার কিছু গ্রন্থ রচিত হয়। আর্থার গেডেস্ (Arthur Geddes) এর চার খণ্ডে রচিত "এ হিউমান জিওগ্রাফি অফ বেঙ্গল" (A Human Geography of Bengal) ই হল ভারতে জনবসতি ভূগোলের প্রথম বিস্তারিত গবেষণা। অবশ্য এর আগে 1899 সালে লণ্ডন থেকে প্রকাশিত হয় বাডেন পাওয়েলের লেখা "ভারতের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীগুলির উৎপত্তি ও বিকাশ" নামে একটি গ্রন্থ। 1940 সালে প্রকাশিত রাইকমল মুখার্জীর "ম্যান অ্যাণ্ড হিজ হ্যাবটেশান-এ স্টাডি অফ সোসাল ইকোলোজি (Man and His Habitation—A Study of Social Ecology) ভারতের জনবসতি ভূগোলের ভিত্তি স্বরূপ। তাঁর অপর একটি রচনা "ওয়েস অফ ডোয়েলিং ইন দ্য কমিউনিটিস্ অফ ইণ্ডিয়া" (Ways of Dwelling in the Communities of India) ভারতে জনবসতি ভূগোলের সমাজতাত্ত্বিক আলোচনার পথ খুলে দেয়।

● **গ্রামীণ জনবসতি**

ভারতে গ্রামীণ জনবসতি ভূগোলের বিকাশ প্রধানতঃ ঘটে প্রখ্যাত ভৌগোলিক আর এল. সিং-এর রচনায়। তাঁর দুটি গবেষণাপত্র "ইভালিউশন অফ্ সেটলমেণ্ট্‌স্ ইন মিডল গঙ্গা ভ্যালী" (Evolution of

Settlements in Middle Ganga Valley, 1955) এবং "টিপিক্যাল রুরাল ডোয়েলিংস ইন দ্যা ইনল্যাণ্ড অফ বেনারস, ইণ্ডিয়া" (Typical Rural Dewllings in the Inland of Benaras, India, 1957) এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য। এ. এন. ভট্টাচার্য্যির অপ্রকাশিত গবেষণাপত্র "রুরাল হ্যাবিটেশনাস ইন দ্যা আপার গঙ্গা প্লেন এ্যাণ্ড শোন ভ্যালী" (Rural Habitations in the Upper Ganga Plain and Shone Valley) জনবসতির তুলনামূলক আলোচনার এক নতুন দিগন্ত খুলে দেয়. সি. ডি. দেশপান্ডে (C. D. Deshpandey)-র "মারকেট ভিলেজেস এ্যাণ্ড পিরিওডিক টাউনস্ অফ বম্বে" গ্রামীণ জনবসতি বিষয়ক আরেকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। এ. টি. এ. লিয়ারমাউথ্ (A. T. A. Learmonth) এর রচনা থেকে আমরা দক্ষিণ ভারতের গ্রামীণ জনবসতি সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারি। কে. এম. সুব্রামণ্যাম (K. M. Subrahamanyam) দক্ষিণ ভারতের চার প্রকার বসতির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করেন। 1950 খৃষ্টাব্দে এস. সিনহা (S. Sinha) "ভাবারিয়ার ইন ছোটনাগপুর" (Bhabharia in Chottanagpur) রচনায় ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চলে গ্রামীণ জনবসতি সম্পর্কে আলোচনা করেন। 1956 সালে এম. এস. বিশ্বনাথ (M. S. Viswanath) তাঞ্জাভুরের জনবসতির বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করেন, অপর দিকে ঐ একই সময় অধ্যাপক এ. বি. মুখার্জী (A. B. Mukherjee) মোরাদাবাদ ও বিজনৌর জেলার জনবসতির ওপর গবেষণা করেন। 1954 সালে এম. আনাস (M. Anas) এবং 1962 সালে এল. আর সিং (L. R. Singh) হিমালয়ের তরাই অঞ্চলের জনবসতির বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করেন। ভারতের গ্রামীণ জনবসতি ভূগোলের আরও কয়েকটি রচনা হল—সি. নিরুমালা (C. Nirumala)-র ভিট্টালানি অঞ্চলের, আর রামচন্দ্রন (R. Ramchandran) এর মহম্মদপুরম, এ. ভি. থিরু (A. V. Thiru)-র নেলোম্বুর, এ. বি. (A. B. Bose)-এর রাজস্থানের ছিরাই এবং ভি. এ. জানকী (V. A. Janki) ও এম. এইচ. আজওয়ানি (M. H. Ajwani)-র রসুলাবাদের ওপর সমীক্ষা। ভি. এ. জানকী কেরালার জনবসতির বন্টন এবং বিকাশের ওপরেও গবেষণা করেছেন।

প্রয়াত ভূগোলবিদ্ এস. পি. চ্যাটার্জী (S. P. Chatterjee) 1963 এবং 1968 সালে তাঁর ফিফটি ইয়ার্স অফ্ ফাইনস ইন জিওগ্রাফি (Fifty years of Science in Geography) গ্রন্থে ভারতের গ্রামীণ জনবসতির ওপর গবেষণার একটি ভাল বিবৃতি দেন। জি. এস. ঘোষাল (G. S. Gosal) এবং এ. বি. মুখার্জী (A. B. Mukherjee) 1969 থেকে 1975, এই সাত বছরে ভারতের গ্রামীণ জনবসতি ভূগোলের বিকাশ সম্পর্কে আলোচনা করেন। এর পর থেকে ভূগোলের এই শাখায় গবেষণার অনেক উন্নতি ঘটে। সত্তর দশকের শেষ ভাগ থেকে ভারতে গ্রামীণ জনবসতির ওপর যে সকল গবেষণা হয়, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হল—আর রামচন্দ্রন (R. Ramchandran) এর "আইডেণ্টিফিকেশন অফ গ্রোথ সেণ্টারস্ এ্যাণ্ড গ্রোথ পয়েণ্টস্ ইন সাউথ-ইষ্ট রিসোর্স রিজিয়ন (Identification of Growth Centres and Growth points in South East Resource Region, 1976), আর. এল. সিং (R. L. Singh) এবং আর. পি. বি.

সিং (R. P. B. Singh)-এর "স্প্যাসিয়াল অ্যাণ্ড স্টাকচারাল অ্যানালিসিস অফ্ রুরাল মার্কেট নেটওয়ার্ক অ্যাণ্ড ইট্স্ রিলেশন টু সোসাইটি ইন অ্যান ইণ্ডিয়ান এনভায়রনমেণ্ট" (Spatial and Structural Analysis of Rural Market Network and Its Relation to Society in an Indian Environment, 1977), মিনতি সিং (Minati Singh)-এর "লোয়ার গঙ্গা ঘাঘরা দোয়াব ঃ এ স্টাডি ইন রুরাল সেটল্মেণ্ট" (Lower Ganga Ghaghara Drab : A Study in Rural Settlement, 1979), আর সি. তেওয়ারি (R. C. Tewari) এবং এন. উদ্দীন (N. Uddin)-এর "রুরাল সেটল্মেণ্ট সিস্টেম অফ প্রতাপগড় ডিস্ট্রি ঃ এ স্টাডি ইন স্প্যাসিয়াল প্যাটার্ন (Rural Settlement System of Pratapgarh District : A study in Spatial Pattern, 1982) প্রভৃতি। গ্রামীন জনবসতির আকার, ধরণ ও বিন্যাস নিয়ে যতটা গবেষণা হয়েছে, সে তুলনায় ক্রিয়ামূলক বৈশিষ্ট্য নিয়ে সেরকম গবেষণা ভারতে হয় নি।

● পৌর ভূগোল

ভারতের নাগরিক ভূগোলের ইতিহাস শুরু হয় উনবিংশ শতাব্দীতে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে কয়েকজন সিভিল ইঞ্জিনিয়ার, প্রশাসক, স্থপতি, নগর পরিকল্পক, ও অন্যান্যরা দেশের বড় বড় শহরের সামাজিক, অর্থনৈতিক, স্বাস্থ্য, প্রশাসনিক ও অন্যান্য সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করেন। ভৌগোলিকরা প্রধানতঃ ব্যষ্টিগত সমীক্ষা (micro level studies) কেই তাঁদের গবেষণার মূল ধারা হিসাবে চিহ্নিত করেন। এই ধারা অনুসারে তাঁরা বিশেষ বিশেষ শহর নির্বাচন করে, সেখানকার ঐতিহাসিক বিবর্তন, ভূমি ব্যবহার, সুবন্দোবস্ত, পরিবর্তনশীল জনসংখ্যা ও সামাজিক পরিবেশ সম্পর্কে আলোচনা করেন। এ বিষয়ে প্রথম দিকের কয়েকজন গবেষক হলেন অ্যানস্টেড (Anstea, 1928), ন্যাটেসান (Natesan, 1931), রাও (Rao, 1937), পেরেইরা (Pereira, 1938), সুব্রমন্যাম (Subramanyam, 1938), কুরিয়ান (Kuriyan, 1941) প্রমুখ। 1955 সালে আর. এল. সিং-এর "বেনারস এ স্টাডি ইন আরবান জিওগ্রাফি" (Benaras : A study in Urban Geography) প্রকাশিত হয়। এটিই ভারতের নাগরিক ভূগোল বিষয়ে প্রথম পূর্ণাঙ্গ রচনা। এই একই পথে 1958 সালে অধ্যাপক এ. বি. চ্যাটার্জী (A. B. Chatterjee)-র হাওড়া এবং 1960 সালে এন. আর. কর (N. R. Kar) এবং কলকাতার ওপর রচনা প্রকাশিত হয়। এর পর থেকে অন্যান্য শহরের ওপর গবেষণা বৃদ্ধি পায়। পঞ্চাশের দশকে আটটি শহরের ওপর সমীক্ষা চালানো হয়। 1962 সালে ব্রুশ (Brush) এ বিষয়ে আলোচনা করেন, যাতে তিনি শহরগুলির অবস্থান ও কায়িক গঠনের সঙ্গে তাদের কর্মধারার সম্পর্ক বিশ্লেষণ করেন।

ঘোষাল (Gosal, 1972), গোপাল কৃষাণ (Gopal Krishan, 1979) এবং মনজুর আলম (Manzoor Alam, 1984) ভারতে পৌর ভূগোলের গবেষণার ওপর পৃথকভাবে সমীক্ষা চালান। অধ্যাপক গোপাল কৃষাণের মতে ভারতের পৌর ভূগোল গবেষণাকে প্রধানতঃ দুটি ভাগে ভাগ করা যায়—(ক) পৃথক শহরের

সমীক্ষা (খ) প্রভাব এলাকার সমীক্ষা (গ) পরিষেবা কেন্দ্রের সমীক্ষা (ঘ) নগরায়ণের সমীক্ষা (ঙ) শহরের শ্রেণীবিভাগ ও অর্থনৈতিক ভিত্তি সমীক্ষা এবং (চ) ফলিত পৌর ভূগোল। মনজুর আলম অবশ্য দুটি ধারাকে নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করেন...

(ক) নগরায়ণের বিন্যাস ও গতিধারা—এই ধরণের গবেষণা ভারতীয় আঞ্চলিক ও স্থানীয়, সব স্তরেই হয়েছে। ভারতের নগর জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও বড় শহরের ক্রমবর্ধমান প্রাধান্য এই গবেষণাগুলিতে স্থান পেয়েছে।

(খ) শহরের আকার ও বিবর্তন।

(গ) নগর অঞ্চল ও আয়তন বিন্যাস।

(ঘ) নগর পরিকল্পনা।

(ঙ) নগরের জনবিজ্ঞান।

(চ) নগরের অর্থনীতি, রাজনীতি ও প্রশাসন

বিভিন্ন ভূগোলবিদ্ ও আঞ্চলিক পরিকল্পক নগর এবং তার প্রভাব অঞ্চলের মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষণ করেন। প্রভাব অঞ্চল বলতে কোন কোন বিশেষ হিন্টারল্যাণ্ড (Hinterland) শব্দটি ব্যবহার করেন। [যেমন—এলিফেসেন (Ellefesen, 1962), অ্যালন (Alan, 1965) এবং দত্ত (Dutt, 1971)]। আবার কোন কোন উমল্যান্ড (Umland) শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। এ বিষয়ে সিং (Singh, 1957) এর বেনারস, এ. কে. দত্ত (A. K. Dutt, 1963)-র জামসেদপুর এবং কৃষাণ ও আগরওয়াল (Krishan and Agarwal, 1970) এর চণ্ডীগড়ের প্রভাব অঞ্চল বিষয়ক রচনায় উল্লেখযোগ্য।

ভারতে জনবসতি ভূগোলের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর গবেষণার করা হয়েছে। গ্রামীণ বসতির ওপর প্রধানতঃ ভূগোলবিদ্‌রা গবেষণা করলেও পৌর বসতির ক্ষেত্রে অন্যান্য শাখার বিশেষজ্ঞদের অবদান কিছু কম নয়।

1.6 জনবসতির সংজ্ঞা

অক্সফোর্ড (Oxford) অভিধানে বসতি বা settlement শব্দটি অর্থ দেওয়া আছে এইভাবে—"Newly settled tract of country" অর্থাৎ কোন দেশের নতুন বসত এলাকা। ভৌগোলিকদের রচনায় বসতি শব্দটি আরও ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। স্মিথ (Smith)-এর "ডিকস্‌নারি অফ জিওগ্রাফি" (Dictionary of Geography) তে বসতি শব্দটির অর্থ হল স্থায়ী ভাবে বসবাস করার জন্য তৈরী আবাসস্থল। এই আবাসস্থলের আয়তন ছোট, বড় নানাপ্রকারের হতে পারে। ছোট গ্রাম, বড় গ্রামীণ জনপদ, শহর, নগর,

মহানগর প্রভৃতি জনবসতির বিভিন্ন রূপ। স্টোন (Stone) বসতি বলতে একস্থানে এক বা একাধিক মানুষের বসবাস করাকে বুঝিয়েছেন (Settlement is defined as a place where one person and more dwell)। ব্রুনেস (Brunhes) এর মতে বসতি হল গৃহ ও রাজপথ। মানুষের এই দুটি মৌলিক চাহিদার সমন্বয় ঘটিত রূপ। (Settlement is the topographic expression of the grouping and arrangement of two fundamental elements-houses and highways)। ডিকেন (Dicken) এবং পিটস (Pitts) বসতি বলতে ক্ষুদ্রগ্রাম বা হ্যামলেট, গ্রাম, শহর এবং নগর মানুষ এবং বাসগৃহের সমষ্টিকে বুঝিয়েছেন (Settlement refers to the groupings of people, and houses into hamlets, village, towns and cities)।

বসতির আভিধানিক ও ভৌগোলিক অর্থ উপরের আলোচনা থেকে আপনারা বুঝতে পারছেন। মানুষের তিনটি মৌলিক চাহিদার মধ্যে আশ্রয় অন্যতম। শুধুমাত্র দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া বা বন্যপ্রাণীর হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করাই নয়। বিশ্রামের জন্যও চাই আশ্রয় স্থল। বসতি এই আশ্রয়স্থলের একটি পরিপূর্ণ সমষ্টিগত রূপ। মানুষ পরিবেশ, সামর্থ্য ও চাহিদা অনুসারে বসতি নির্মাণ করে। পার্বত্য অঞ্চলে পাথর ও কাঠ সহজলভ্য বলে এখানে এগুলিই বসতি নির্মাণের উপকরণ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলে ঋতুনিয়ন্ত্রিত পশুপালকদের দুর্বলগণের বসতি নির্মাণ করতে দেখা যায় উচ্চ উপত্যকায় অস্থায়ী বসতি এবং নিম্ন উপত্যকায় স্থায়ী বসতি। ভূমিকম্প প্রবণ পার্বত্য অঞ্চলে মানুষ হালকা উপাদান দিয়ে বাড়ি তৈরী করে সামর্থ্য ও চাহিদা অনুসারে মানুষ কুঁড়েঘর থেকে অট্টালিকা প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের বাসগৃহ নির্মাণ করে।

1.7 জনবসতির শ্রেণীবিভাগ

পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ধরণের জনবসতি দেখা যায় এবং জনবসতির বিভিন্নভাবে শ্রেণীবিভাগও করা যায়। নিম্নলিখিত শ্রেণীবিভাগ বিভিন্ন ভিত্তি অনুসারে করা হয়েছে।

1.7.1 ক্রিয়াকলাপ ও সামাজিক প্রেক্ষাপটের ভিত্তিতে শ্রেণীবিভাগ

কোন জনবসতির বেশীরভাগ মানুষ কোন্ পেশায় নিযুক্ত ও বসতিটির সামাজিক প্রেক্ষাপট কেমন, তার ভিত্তিতে জনবসতিকে দুটি মৌলিক ভাগে ভাগ করা যায়—গ্রামীণ বসতি (rural settlement) এবং পৌর বসতি (urban settlement)।

● **গ্রামীণ বসতি**

অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ, ভূমি ব্যবহার, গৃহনির্মাণ, মানুষের জীবনযাত্রা প্রভৃতি বিভিন্ন দিক থেকে গ্রামীণ বসতি পৌর বসতির থেকে আলাদা এবং এই পার্থক্য খুব সহজেই বোঝা যায়। গ্রামীণ বসতি প্রধানতঃ

কৃষি নির্ভরশীল। গ্রামের অধিকাংশ মানুষ চাষবাসের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে। কিছু কিছু গ্রামীণ বসতিতে অবশ্য অন্যান্য প্রাথমিক জীবিকা দেখা যায়। উপকূল অঞ্চলের গ্রামগুলিতে মৎস্য শিকার প্রধান জীবিকা উদাহরণ স্বরূপ মেদিনীপুর জেলার শঙ্করপুরের নাম করা যায়। নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের সরলবর্গীয় বৃক্ষের অরণ্যাঞ্চলে অনেক কাঠশিল্পের ভিত্তিক গ্রাম গড়ে উঠেছে।

অধিকাংশ গ্রাম যেহেতু কৃষি নির্ভরশীল, তাই গ্রামীণ বসতির ভূমি ব্যবহারে কৃষিভূমি প্রাধান্য বিস্তার করে। বসতবাড়ী গ্রামের একটি বা দুটি অঞ্চলে কেন্দ্রভূত হতে দেখা যায়। এছাড়া গ্রামে বেশ কিছু জলাশয় থাকে। গ্রামে দোকান পাট খুব কম থাকে। দু-একটি দোকানে শহর থেকে বিভিন্ন অকৃষিগত সামগ্রী এনে বিক্রয় করা হয়। গ্রামীণ বসতিতে পথ ঘাটের প্রাধান্য কম থাকে। পথের মধ্যে পাকারাস্তা খুবই কম। বেশীর ভাগ রাস্তাই কাঁচা, কিছু কিছু রাস্তায় গরুর গাড়ী চলে, আবার কিছু কিছু রাস্তা শুধু পায়ে হাঁটার উপযোগী।

গ্রামে যেহেতু নদীর কোন অভাব নেই, তাই গ্রামবাসীরা খোলামেলা ভাবে গৃহ নির্মাণ করে। এ কারণে গ্রামীণ বসতি বিক্ষিপ্ত বা গোষ্ঠীবদ্ধ যে কোন ধরণের হতে পারে। পরিবেশ ও উপকরণের সহজলভ্যতা অনুসারে গ্রামে ইঁট, কাঠ, পাথর ও মাটির বাড়ি দেখা যায়। কৃষিপ্রধান গ্রামে গোয়ালঘর, গোলাঘর, উঠোন প্রভৃতি দেখা যায়। গ্রামীণ বসতির আর একটি বৈশিষ্ট্য হল বিভিন্ন জাতের মানুষের বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাস, বিশেষ করে অস্পৃশ্য জাতির মানুষেরা আলাদা একটি অঞ্চলে বাস করে। সামাজিক পটপরিবর্তনের সাথে সাথে অবশ্য গ্রামের এখন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। বর্তমানে গ্রামে অকৃষিগত ক্রিয়াকলাপ অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। রাস্তা ঘাটের সংখ্যা অনেক বেড়ে গিয়েছে, জাতপাতের বিচার অনেক কমে গিয়েছে।

● **পৌর বসতি**

অর্থনৈতিক কাজকর্ম, সামাজিক প্রেক্ষাপট প্রভৃতি বিভিন্ন দিক থেকে পৌর বসতি গ্রামীণ বসতি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। গ্রামে যেখান বেশীর ভাগ মানুষ চাষবাসের ওপর নির্ভরশীল হয়, শহরে সেখানে বেশীর ভাগ মানুষ অন্যান্য অর্থাৎ অকৃষিগত কাজকর্মে লিপ্ত থাকে। যে কোন পৌর বসতিতে বসবাসকারী মানুষের একটা বড় অংশ চাকরী করে। শিল্প পৌর বসতির একটি প্রধান জীবিকা। শিল্পাঞ্চলগুলিতে কলকারখানায় অনেক লোক কাজ করে। হুগলী শিল্পাঞ্চলের বিভিন্ন শহর যেমন চাকদা, পানিহাটি, টিটাগড়, নৈহাটী প্রভৃতিতে প্রচুর পাটকল, কাগজকল প্রভৃতি আছে। ব্যবসা বাণিজ্য শহরের আর একটি উল্লেখযোগ্য জীবিকা। ছোট থেকে বড় বিভিন্ন ব্যবসায়ী বিভিন্ন ধরণের ব্যবসা করে জীবিকা উপার্জন করে। এছাড়া ডাক্তার, উকিল, শিক্ষক প্রভৃতি প্রচুর সংখ্যায় শহরে বাস করেন। কোন পৌর বসতি ছোট থেকে যত বড় হয়, এই ধরণের অকৃষিগত জীবিকার সংখ্যা ততই বাড়তে থাকে। কোন কোন শহর বিশেষ একটি জীবিকার ওপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে। উদাহরণ হিসাবে শান্তি নিকেতনের কথা বলা যায়, যা একটি শিক্ষা কেন্দ্র হিসাবে গড়ে উঠেছে। দার্জিলিং, পুরী প্রভৃতি বিভিন্ন পৌর বসতি পর্যটন কেন্দ্র। কলকাতা, নতুন দিল্লী

প্রভৃতি প্রশাসনিক শহর, জ্যারিকান ধর্মীয় শহর এবং মর্মাগাঁও, পারাদ্বীপ প্রভৃতি বন্দর শহর হিসেবে গড়ে উঠেছে।

জীবিকার পার্থক্য থাকার জন্য পৌর বসতির ভূমি ব্যবহার গ্রামীণ বসতির থেকে আলাদা। শহরের একটি বড় অংশে বসত এলাকা গড়ে উঠতে দেখা যায়। একটি নির্দিষ্ট এলাকা থাকে শিল্প সংক্রান্ত কাজকর্মের জন্য। এছাড়া শহরের বেশ কিছু এলাকায় ব্যবসা বাণিজ্য, প্রশাসনিক প্রভৃতি কাজকর্ম হয়। শহর হল একটি বাজার এলাকা, যেখানে বিভিন্ন ধরণের জিনিষপত্র কেনা বেচা হয়। আয়তনের ওপর নির্ভর করে প্রত্যেকটি শহরেই এক বা একাধিক বাজার গড়ে উঠেছে। শহরে পথ ঘাটের সংখ্যা অনেক বেশী থাকে কারণ পথই হল পণ্য আদান প্রদান ও মানুষের যাতায়াতের মাধ্যম। অন্যদিকে গ্রাম অপেক্ষা শহরে জলাশয়ের সংখ্যা কম থাকে কারণ এখানে পাইপের মাধ্যমে জল সরবরাহ করা হয়। গ্রামে যেমন প্রচুর ফাঁকা জমি থাকে, শহরে তা থাকে না। এখানে কিছু নির্দিষ্ট স্থানে খেলার মাঠ, উদ্যান প্রভৃতি গড়ে ওঠে।

শহরে জমির মূল্য অত্যাধিক হওয়ায় এখানে বাড়িগুলি একটি অপরটির প্রায় গায়ে গড়ে ওঠে। ফলে বেশীরভাগ শহরই সংঘবদ্ধ প্রকৃতির হয়। বড় বড় শহরের কাজের সুবিধা বেশী থাকায় প্রায় প্রতিদিনই গ্রাম থেকে বেশ কিছু কিছু মানুষ শহরে এসে ভিড় জমায়। বেশী দামে জমি কিনে স্বাস্থ্যসম্মত গৃহ নির্মাণ করা এদের পক্ষে সম্ভবপর হয় না। ফলে এখানে ঘিঞ্জি, অস্বাস্থ্যকর বসতি গড়ে ওঠে। এর অবশ্যম্ভাবী ফল হল বস্তির সৃষ্টি। বর্তমানে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে বস্তি হল শহরের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

ঘরবাড়ির কাঠামো, নকশা, উপকরণ প্রভৃতির মাধ্যমেও সহজেই পৌর বসতি চেনা যায়। শহরের প্রায় সব বাড়িই ইটের তৈরী, যদিও পার্বত্য অঞ্চলের শহরগুলিতে কাঠের বাড়ি তৈরি হতে দেখা যায়। এখানে গ্রামের মত গোয়ালঘর, উঠোন প্রভৃতি থাকে না, এখানে এক ছাদের নীচে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে একাধিক স্বয়ং সম্পূর্ণ ফ্ল্যাট বা বাসগৃহ তৈরী হয়। শহর বাসীরা সারাদিন নিজেদের কাজে ব্যস্ত থাকায় পরস্পরের মধ্যে মেলামেশার সুযোগ কম।

1.7.2 স্থায়িত্বের ভিত্তিতে শ্রেণীবিভাগ

স্থায়িত্বের ভিত্তিতে বসতিকে প্রধানতঃ দুভাগে ভাগ করা যায়—অস্থায়ী বসতি (Temporary Settlement) এবং স্থায়ী বসতি (Permanent Settlement)। তবে মুলার এবং উইলি (Muller-Wille) স্থায়িত্বের মাত্রার ভিত্তিতে জনবসতিতে নিম্নলিখিত পাঁচ ভাগে ভাগ করেছেন—

1. ক্ষণস্থায়ী (Ephemeral)	1 থেকে 7 দিনের জন্য স্থায়ী বসতি
2. অস্থায়ী (Temporary)	8 থেকে 30 দিনের জন্য স্থায়ী বসতি
(ক) (Episodic)	8 থেকে 15 দিনের জন্য স্থায়ী বসতি
(খ) পর্যাবৃত্ত (Periodic)	16 থেকে 30 দিনের জন্য স্থায়ী বসতি

3. ঋতুভিত্তিক (Seasonal) কয়েক মাসের স্থায়ী বসতি

4. অর্ধস্থায়ী (Semi-Permanent) কয়েক বছরের জন্য স্থায়ী বসতি

5. স্থায়ী (Permanent) কয়েক বংশ ব্যাপী স্থায়ী বসতি

● **অস্থায়ী বসতি**

সভ্যতার শুরু থেকে স্থায়ীভাবে কৃষিকাজ শুরু হওয়ার আগে পর্যন্ত মানুষ ছিল যাযাবর। খাদ্যের প্রয়োজনে এরা এক স্থানে থেকে অন্য স্থানে ঘুরে বেড়ায়। ফলে এদের ঠিকানাও ছিল অস্থায়ী। যাযাবর গোষ্ঠীর প্রধান জীবিকা ছিল বন্যজন্তু শিকার করা ও গাছের ফলমূল সংগ্রহ করা। কোন স্থানের ফলমূল বা বন্যজন্তু নিঃশেষ হয়ে গেলে তারা খাদ্যের সন্ধানে অন্যত্র চলে যেত। পরবর্তীকালে যাযাবর গোষ্ঠীরা পশুপালন বা স্থানান্তর কৃষির মাধ্যমেও জীবিকা নির্বাহ করত। আধুনিক বিজ্ঞানের যুগেও পৃথিবীর কোন কোন অঞ্চলে যাযাবর মানুষদের আদিম প্রথায় জীবন যাপন করতে দেখা যায়। খাদ্যের সন্ধানে যেহেতু তারা একস্থান থেকে অন্যস্থানে ঘুরে বেড়ায়, তাই তারা গুহা বা অস্থায়ী কুঁড়ে ঘরে বাস করে। স্থানীয় উপকরণের সাহায্যে এরা ঘরবাড়ী নির্মাণ করে। অনেকে আবার তাঁবুর মধ্যে বাস করে। যেমন—আরবের 'বেডুইন', মধ্য এশিয়ার মোঙ্গল, কিরঘিজ প্রভৃতি। ইন্দোচীনের মই (Mai) এবং পশ্চিম আফ্রিকার ফন (Fon) বা স্থানান্তর কৃষিজীবী। অনেক অস্থায়ী বসতি ঋতু বিশেষে গড়ে ওঠে। এস্কিমো এর উদাহরণ। শীতকালে যখন এদের কাজকর্ম বিশেষ থাকে না, তখন এরা সংঘবদ্ধভাবে 'ইগলু'-তে বাস করে, যা পাকাপোক্তভাবে তৈরী। আর গরমকালে শিকারের সন্ধানে এরা ছোট ছোট ভাগে ভাগ হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। অন্যভাবে বলতে গেলে, শীতকালে এদের সামাজিক বন্ধন খুব দৃঢ় থাকে এবং গ্রীষ্মকালে সমস্ত সামাজিক ও ধর্মীয় বন্ধন আলগা হয়ে পড়ে। স্ক্যান্ডিনেভিয়ার ল্যাপদের মধ্যেও ঋতুভিত্তিক অস্থায়ী বসতি দেখা যায়। শীতকালে এরা অরণ্যাঞ্চল থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে বলে তার কাছাকাছি কুঁড়েঘর বানিয়ে থাকে। আবার গরমকালে তারা পশুচারণের জন্যদূরে যায় বলে ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে তাঁবুতে বাস করে।

স্থানান্তর কৃষিজীবীদের মধ্যেও অস্থায়ী বসতি দেখা যায়। এরা কোন নতুন স্থানে গিয়ে সেখানকার জমি পরিষ্কার করে চাষবাস করতে শুরু করে। অনুন্নত প্রথায় চাষ করার ফলে কয়েক বছরের মধ্যেই সেখানকার জমির উর্বরতা নষ্ট হয়ে যায়। তখন তারা অন্য জায়গায় চলে যায়। ভারতের অরুণাচল প্রদেশে কিছু উপজাতি এখনও ঝুম চাষ করে। অন্ধ্রপ্রদেশে, কেরালা প্রভৃতি রাজ্যে কোন কোন উপজাতির মধ্যে এখনও স্থানান্তর কৃষি প্রচলিত আছে। এদের সকলেরই বসতি অস্থায়ী। মালয়েশিয়ার মাইফ্যাম টুপী প্রভৃতিউপজাতিরা স্থানান্তর কৃষিজীবী এবং এরা অস্থায়ী বসতিতে বাস করে। স্থানান্তর কৃষিজীবীদের অস্থায়ী বসতি সংঘবদ্ধ অথচ বিক্ষিপ্ত উভয়ই হতে পারে। ব্রাজিলের আমাজন উপত্যকায় সংঘবদ্ধ বসতি দেখা

যায় আবার মধ্য ও দক্ষিণ চিলিতে স্থানান্তর কৃষিজীবীরা বিক্ষিপ্তভাবে বাস করে। অন্যান্য যাযাবর গোষ্ঠীর থেকে স্থানান্তর কৃষিজীবীদের গৃহ নির্মাণের উপকরণও আলাদা। আরবের বেদুইনরা যেখানে ছাগলের চামড়া দিয়ে তাঁবু বানায়, মধ্য এশিয়ার কাজাক ও কিরঘিজ উপজাতিরা যেখানে উইলো গাছের ছাল ও চামড়া দিয়ে তাদের গৃহ (ইয়ার্ট) বানায়, পূর্ব আফ্রিকার মাসাইরা যেখানে ঘাস দিয়ে অস্থায়ী কুঁড়েঘর বানায়, স্থানান্তর কৃষিজীবীরা সেখানে কাঠ ও ইঁটের বাড়ি তৈরী করে। উদাহরণ হিসাবে আফ্রিকার সাভানা ব অঞ্চলের ক্রাল বসতির কথা বলা যায়। এগুলি কাঠের তৈরী শঙ্কু আকৃতির কুঁড়েঘর যার ওপর মাটির প্রলেপ দেওয়া থাকে এবং ছাদ ঢাকা থাকে ঘাস দিয়ে। কাছাকাছি অনেকগুলি কুঁড়েঘর মিলে একটি বৃত্তাকার বসতি তৈরী করে। বাড়িগুলি সব বেড়া দিয়ে ঘেরা থাকে, সেখানে রাত্রিবেলা পশুদের রাখা হয়।

- **স্থায়ী বসতি**

অস্থায়ী বসতির ঠিক বিপরীত অবস্থা হল স্থায়ী বসতি, তবে অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অস্থায়ী বসতি স্থায়ী বসতিতে পরিণত হয়েছে। কৃষিকাজ আবিষ্কার হওয়ার পরেও যতদিন মানুষ স্থানান্তর কৃষি পদ্ধতি অনুসরণ করেছে, ততদিন যাযাবর জীবন যাপন করেছে। ফলে ততদিন তারা অস্থায়ী বসতি নির্মাণ করেছে। এরপর জনসংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মাথাপিছু কৃষিজমির পরিমাণ কমে গেলে পরিমাণ জমি থেকে মানুষকে বেশী খাদ্য উৎপাদন করতে হয়েছে। এইভাবে নিবিড় কৃষির সূত্রপাত হয়েছে। নিবিড় কৃষির সূত্রপাত হওয়ার পর থেকেই মানুষ স্থায়ী ভাবে বসবাস করতে শুরু করেছে। এইভাবেই গড়ে উঠেছে স্থায়ী বসতি। ভারতবর্ষের অনেক উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে আগে স্থানান্তর কৃষি প্রচলিত ছিল, ফলে সেখানকার বসতিও ছিল অস্থায়ী প্রকৃতির। জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় সেখানে স্থায়ী কৃষি পদ্ধতি গড়ে উঠেছে। ফলে সেই সব অঞ্চলের বসতিও স্থায়ী রূপ নিয়েছে। ইউরোপেও একই ঘটনা ঘটতে দেখা গেছে। প্রাগৈতিহাসিক যুগে ইউরোপের কোন কোন স্থানে স্থানান্তর কৃষি প্রচলিত ছিল। পরবর্তীকালে জনসংখ্যা বাড়লে একই জমি থেকে একাধিকবার ফসল উৎপাদন করতে হয়েছে। ফলে জনগণ স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করেছে।

স্থায়ী বসতি গড়ে ওঠার পেছনে অনেক সময় অন্যান্য কিছু কারণও থাকতে পারে। খনিজ সম্পদের আবিষ্কার এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য। মধ্যপ্রাচ্যের মরুভূমিতে খনিজ তেল, অস্ট্রেলিয়ার মরুভূমিতে সোনা, দক্ষিণ আমেরিকার চিলির মরুভূমিতে নাইট্রেট প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে স্থায়ী বসতি গড়ে উঠেছে। শিল্প স্থাপনের মাধ্যমেও স্থায়ী বসতি গড়ে উঠতে দেখা যায়। উদাহরণ হিসেবে পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপুরের লৌহ-ইস্পাত শিল্প এবং ফরাক্কা ও পুরুলিয়া জেলার সাঁওতালডিহির তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কথা বলা যায়।

1.7.3 আয়তনের ভিত্তিতে শ্রেণীবিভাগ

একটি জনবসতির আয়তন বলতে সেই বসতিটি কতখানি স্থান অধিকার করে আছে এবং তার জন-

সংখ্যা কত তা বোঝায়। পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে কলকাতা, লণ্ডন, নিউইয়র্ক প্রভৃতি মহানগরীর জনবসতি আছে, আবার রাস্তার ধারেও ছোট বসতি দেখা যায়। তাই আয়তনের ভিত্তিতে জনবসতির শ্রেণীবিভাগ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

● সড়ক বসতি (Roadside Settlement)

এটি বসতির ক্ষুদ্রতম আয়তন। বড় বড় রাস্তা বা হাইওয়ের ধারে সাধারণতঃ এই বসতি দেখা যায় বলে একে সড়ক বসতি বলা হয়। এই ধরণের বসতিতে দু চারটের বেশী ঘর থাকে না। প্রধান বসতি থেকে এই বসতি পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন থাকে। হাইওয়ের ওপর দিয়ে যে সমস্ত বাস, লরী যাতায়াত করে, তাদের সাময়িক আস্তানা হিসাবে এই বসতিগুলি কাজ করে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে বাড়ীর একটি অংশে লোকজন এবং অপর অংশটিকে ব্যবসার কাজে লাগানো হয়। অনেক সময় এই বসতিগুলিকে চটি বলা হয়। ভারতের অনেক স্থানেই বসতি গড়ে উঠতে দেখা গেছে। উত্তর ভারতের অনেক বসতি আছে, যারা বর্তমানে আয়তনে বড় হলেও তাদের সৃষ্টি হয়েছিল সড়ক বসতি হিসাবে।

● ক্ষুদ্রগ্রাম (Hamlet)

একটি বড় গ্রামের ক্ষুদ্র সংস্করণকে বলা হয় ক্ষুদ্রগ্রাম। ইংরাজীতে একে বলা হয় হ্যামলেট (Hamlet)। হ্যামলেট বলতে গ্রামের সেই অংশকে বোঝায়, যেখানে একই ধরণের লোকজন বাস করে এবং তারা সকলেই চাষাবাদ, পশুপালন, মাছধরা প্রভৃতি প্রাথমিক বৃত্তির মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে। ভারতবর্ষে এমন অনেক গ্রাম দেখা যায় যার একটি বিশেষ অংশ বিশেষ কোন জাতের লোকজন বাস করে। এই বিশেষ অংশটিকেই বলা হয় ক্ষুদ্রগ্রাম। এই ক্ষুদ্রগ্রাম যেমন চার পাঁচটি বাড়ি থাকতে পারে, তেমনি আবার বেশী সংখ্যক বাড়ীর সমাবেশও দেখা যায়। বসতবাড়ি ছাড়াও এই ক্ষুদ্রগ্রাম অনেক সময় মুদিখানা, পূজোর মণ্ডপ, মসজিদ প্রভৃতি দেখা যায়। আমাদের দেশে অনেক গ্রামীণ বসতিতে গ্রামের একটি অংশ 'টোল', 'টুলী' নামে পরিচিত হয়ে থাকে। এগুলি প্রধান গ্রামের থেকে একটু দূরে অবস্থিত হলেও গ্রামেরই অংশ হিসাবে বিবেচিত হয়। বেশীরভাগ সময়েই গ্রামের এই অংশগুলিতে অস্পৃশ্য শ্রেণীর লোকেরা বাস করে। এই ধরণের বসতিগুলি বেশীরভাগ ক্ষেত্রে বিক্ষিপ্ত প্রকৃতির হয়। বিহার, উত্তরপ্রদেশ প্রভৃতি রাজ্যে অনেক গ্রামের প্রান্তভাগে এই ধরণের ক্ষুদ্রগ্রাম গড়ে উঠতে দেখা গেছে।

● গ্রাম (Village)

ক্ষুদ্রগ্রাম অপেক্ষা বড় বসতিকে বলা হয় গ্রাম একটি গ্রামের মধ্যে বিভিন্ন পেশার বা বিভিন্ন জাতের লোকের বসবাসের জন্য কয়েকটি পাড়া বা ক্ষুদ্রগ্রাম থাকে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের জনগণনায় 150 থেকে 1000 মানুষের আবাসস্থলকে গ্রাম বলা হয়। কিন্তু আমাদের দেশে গ্রামের কোন নির্দিষ্ট জনসংখ্যা নেই। এখানে খুব ছোট গ্রামে (ক্ষুদ্রগ্রাম নয়) যেমন 200-র কম মানুষ বাস করে, তেমনি খুব বড় গ্রামে 10,000-

এর বেশী মানুষ বাস করে। 1991 সালের জনগণনায় ভারতের সর্ববৃহৎ গ্রাম কেরালাতে পাওয়া গেছে। যার লোকসংখ্যা 80,000-এরও বেশী। উন্নত দেশের গ্রাম থেকে আমাদের দেশের গ্রামের অনেক পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। আমাদের দেশের গ্রামগুলিতে ডাক্তারখানা, হাসপাতাল, স্কুল এসবের সুযোগ সুবিধা খুব কম। দোকান, বাজারও ভারতবর্ষের গ্রামে খুব কম থাকে। কিন্তু উন্নত দেশের এসব সুযোগ সুবিধা পাওয়া যায়। এমনকি, গাড়ি মেরামতির কারখানায় গ্রামে দেখা যায়। তবে পৃথিবীর সর্বত্রই গ্রামে জনসংখ্যা ও জনঘনত্ব কম থাকে। গ্রামে বেশীর ভাগ মানুষের জীবিকা থাকে কৃষিকাজ। তবে ক্ষেত্রবিশেষে অন্যান্য প্রাথমিক বৃত্তিও গ্রামের প্রধান জীবিকা হয়। উপকূল অঞ্চলের গ্রামগুলিতে মৎস্যশিকার প্রধান জীবিকা হয়। আবার নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের সরলবর্গীয় অরণ্যাঞ্চলের অনেক গ্রামে কাঠ সংগ্রহ প্রধান জীবিকা। পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং এবং জলপাইগুড়ি জেলায় এরকম অনেক গ্রাম দেখা যায়, যেখানে কাঠ সংগ্রহ প্রধান জীবিকা। সময়ের সাথে সাথে অবশ্য সব গ্রামেই অন্যান্য জীবিকা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এখন প্রায় প্রতি গ্রামে বেশ কিছু দোকান, কুটীর শিল্প প্রভৃতি দেখা যায়। দক্ষিণবঙ্গের বেশ কিছু গ্রাম আছে, যেখানে তাঁতশিল্প প্রধান জীবিকা।

● **শহর (Town)**

আয়তন ও জনসংখ্যার দিক থেকে গ্রাম অপেক্ষা শহর অনেক বড়। শহরের সংজ্ঞা পৃথিবীর সব দেশে একরকম নয়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে কোন বসতির লোকসংখ্যা 2500 হলে, তাকে শহর বলা হয়, আবার ডেনমার্কে কোন বসতির লোকসংখ্যা 250 হলেই, সেটি শহর বলে বিবেচিত হয়। ভারতবর্ষের শহর শুধুমাত্র লোকসংখ্যার বিচারে বিবেচিত হয় না। এখানে কোন শহরের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল স্থানীয় প্রশাসনিক সংস্থা, যেমন কর্পোরেশন, মিউনিসিপ্যালিটি প্রভৃতি। এছাড়া কোন বসতির মোট লোকসংখ্যা যদি কমপক্ষে 5000 হয়, জনঘনত্ব যদি প্রতি বর্গ কিলোমিটারে 400 হয় এবং পুরুষ কর্মীদের 75 শতাংশ যদি অকৃষিগত কাজকর্মে নিযুক্ত থাকে, তবে তাকে শহর বলা হয়। শহর বলতে অকৃষিগত কাজকর্মকেই বোঝায়। এখানকার বেশীরভাগ মানুষই অফিস কাছারিতে কাজ করে। শিল্পকর্মের সঙ্গে অনেকে নিযুক্ত থাকে। আবার অনেকে ব্যবসা বাণিজ্য করে। এছাড়া ডাক্তার উকিল, শিক্ষক প্রভৃতি পেশার লোকজন শহরে বেশী বাস করে। শহরে দোকানের সংখ্যাও অনেক বেশী থাকে। এছাড়া মাধ্যমিক স্কুল, হাসপাতাল, সিনেমা হল প্রভৃতিও শহরের অঙ্গ। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে কৃষিকাজ শহরের একটি গুরুত্বপূর্ণ পেশা হিসাবে বিবেচিত হয়। মধ্যযুগে পশ্চিম ইউরোপীয় শহরে কৃষিকাজ একটি গুরুত্বপূর্ণ জীবিকা ছিল। বর্তমানেও দক্ষিণ ইউরোপের কোন কোন শহরে চাষবাদ হতে দেখা যায়। ভারতবর্ষের পাঞ্জাব, হরিয়ানার কোন কোন শহরে 30 শতাংশেরও বেশী কর্মী কৃষিকার্যে নিযুক্ত।

● নগর (City)

শহরের আয়তন ও জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে, তা নগরে পরিণত হয়। আমাদের দেশে কোন শহরের জনসংখ্যা এক লক্ষ বা তার বেশী হলে তাকে নগর বলা হয়। আয়তন ও জনসংখ্যার দিক থেকে বড় হওয়ার নগর তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। নগরে সুযোগ সুবিধা অনেক বেশী থাকায় প্রতিদিনই আশে পাশের গ্রাম, এমনকি ছোট শহর থেকেও অনেক লোক কাজের সন্ধান ও অন্যান্য প্রয়োজনে নগরে আসে। লিউইস মামফোর্ড (Lewis Mumford) এর ভাষায় নগর হল সংঘবদ্ধ জীবনের সর্বোচ্চ এবং সবচেয়ে জটিল প্রকারের প্রকৃতির রূপ। (The city is infact the physical form of the highest and most complex types of associative life)। আর. ই. ডিকিনসন (R. E. Dickinson) এর মতে ল্যাটিন শব্দ সিভিটাস (civitas) থেকে সিটি (city) এবং সিভিলাইজেশান (civilisation) শব্দ দুটির উৎপত্তি হয়েছে। কোন অঞ্চলের সাংস্কৃতিক জীবনের প্রাণকেন্দ্র হল নগর।

● মহানগর (Metropolis)

অনেক সময় দেখা যায় যে কোন একটি অঞ্চলে কয়েকটি নগরের মধ্যে একটির আয়তন ও জনসংখ্যা অনেক বেশী হয় এবং এই নগরটি সমগ্র অঞ্চলের অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করে। এই নগরটিকে বলা হয় মহানগর বা metropolis, যার অর্থ হল 'মূল নগরী' বা 'mother city'। ভারতবর্ষের causes এর সংজ্ঞা অনুসারে যে সব নগরের জনসংখ্যা দশ লক্ষ বা তার বেশী। তাদের বলা হয় মহানগর। 1991 সালের জনগণনা অনুসারে ভারতে 23টি মহানগর আছে। এইসব মহানগরের কর্মধারা বহুবিধ হয় এবং এখানে অনেক ভাষার এবং দেশী-বিদেশী বিভিন্ন ধরণের মানুষ বাস করে।

1.7.4 অন্যান্য শ্রেণীবিভাগ

ভৌগোলিকগণ অন্যভাবেও জনবসতির শ্রেণীবিভাগ করেছেন। বসতবাড়ীর বিন্যাসের ওপর নির্ভর করে জনবসতিকে বিভিন্ন আকারে ভাগ করা যায়। ডিকিনসন জার্মানীর জনবসতিকে বিভিন্ন ভাগ ভাগ করেন। যা পরবর্তীকালে ক্রিস্টালার (Christaller) নিম্নলিখিতভাবে পরিবর্তন করেন ঃ

1. অনিয়মিত গোষ্ঠীবদ্ধ গ্রাম।
2. বিচ্ছিন্ন খামার—
   - (ক) অনিয়মিত বিক্ষিপ্ত বসতি।
   - (খ) গ্রামের কেন্দ্রের চারপাশে গোষ্ঠীবদ্ধভাবে গড়ে ওঠা বসতি।
   - (গ) পথের ধারে গড়ে ওঠা রৈখিক বসতি।

3. ক্ষুদ্রগ্রাম বা হ্যামলেট—

(ক) জঙ্গল পরিষ্কার করে জমিদার দ্বারা স্থাপিত।

(খ) বড় গ্রামের চারপাশে গড়ে ওঠা গ্রাম।

(গ) কৃষিজমির ক্রমাগত খণ্ডীকরণের ফলে গড়ে ওঠা ক্ষুদ্র গ্রাম।

4. স্থান গ্রাম (Place Village)।

5. অ্যাঙ্গারডরফার (Angerdorfer)।

6. রাস্তার দুধারে গড়ে ওঠা খামার বাড়ী।

7. রৈখিক গ্রাম—

(ক) জলাভূমিতে গড়ে ওঠা গ্রাম।

(খ) জঙ্গলে গড়ে ওঠা গ্রাম।

(গ) ফেনাকোলো নিয়েন (Fehnkolonien)।

(ঘ) জমিদারী বা তালুক জাতীয় গ্রাম।

8. খনি এবং শিল্প ভিত্তিক গ্রাম।

9. শহুরে গ্রাম।

10. শহরতালী জাতীয় বসতি।

11. আধুনিক শিল্পভিত্তিক জাতীয় বসতি।

1.8 ইতিহাস, সংস্কৃতি ও জনবসতি

জীবজগতে মানুষের স্থান সর্বোচ্চে। জৈবিক বিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের সুনিয়ন্ত্রিত সাংস্কৃতিক জীবনের যে বিকাশ হয়েছে তা জীবজগতের অন্য কোনো ক্ষেত্রে দেখতে পাওয়া যায় না। মানুষের এই সংস্কৃতির বিকাশের ফলেই সৃষ্টি হয়েছে মানবসভ্যতার বৈচিত্র্যময় ইতিহাস। এই সাংস্কৃতিক বিকাশের আধারস্বরূপ হল জনবসতি। তাই জনবসতির বিবর্তন ইতিহাসের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এই অধ্যায়ে তাই সংস্কৃতি, ইতিহাস ও জনবসতি, এই তিনটি বিষয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক আলোচনা করা হয়েছে।

1.8.1 জনবসতির ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমিকা

আধুনিক মানুষ অর্থাৎ হোমো-সেপিয়েন্স (Homo Sapiens) এর আবির্ভাবকাল থেকে আজ পর্যন্ত মানুষের সাংস্কৃতিক জীবনযাত্রার প্রভূত পরিবর্তন হয়েছে। তাই জনবসতির যে বৈচিত্র তার উপর মানুষের সাংস্কৃতিক তথা সামাজিক বিবর্তনের (Socio Cultural evolution) সুস্পর্ক ছাপ রয়েছে।

মানুষের সাংস্কৃতিক বিবর্তনের সাথে জনবসতির সম্পর্ক আলোচনা করতে প্রথম মনে রাখতে হবে যে মানবসংস্কৃতির উদ্ভব ও বিবর্তনের চারটি প্রাথমিক ধাপ রয়েছে -

(i) খাদ্যসংগ্রহ ও শিকার সংস্কৃতি (Hunting and food gathering Culture)

(ii) যাযাবর পশুপালক সংস্কৃতি (Nomadic herding Culture)

(iii) কৃষিভিত্তিক সংস্কৃতি (Agricultural Culture) এবং

(iv) নগরভিত্তিক সংস্কৃতি (Urban Culture)

এইসকল সংস্কৃতিক পর্য্যায়ের এক ধাপ থেকে আর এক ধাপে উন্নীত হওয়ার পিছনে বিভিন্ন প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের (technolgical invention) অবদান রয়েছে। এই প্রযুক্তিগত উন্নতি ও সাংস্কৃতিক বিবর্তনের সাথে তাই জনবসতির চরিত্রেরও নিবিড় সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়।

আদিমযুগে যখন মানুষের জীবিকা কেবলমাত্র পশুশিকার ও ফলমূল সংগ্রহের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল তখন মানুষ বাসস্থান হিসাবে পাহাড়-পর্বতের গুহাগুলিকে ব্যবহার করত। এই সময় প্রধানতঃ প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বন্যপশুর আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বসতির প্রয়োজন ছিল। সময় সময় একস্থানের শিকার বা খাদ্যবস্তুর পরিমাণ কমে এলে তারা একস্থান থেকে অন্যস্থানে যেতে বাধ্য হত। তাই আদিমযুগে প্রকৃত অর্থে স্থায়ী জনবসতি গড়ে ওঠেনি।

কালক্রমে মানুষ যখন বিভিন্ন পশুকে পোষ মানাতে শেখে তখন পশুপালনই ক্রমশ মানুষের প্রধান জীবিকা হয়ে ওঠে এবং পশুশিকার ও খাদ্যসংগ্রহের গুরুত্ব ক্রমশঃ হ্রাস পেতে থাকে। কিন্তু এই সময়ও পশুচারণভূমির সন্ধানে মানুষকে একস্থান থেকে অন্যস্থানে ঘুড়ে বেড়াতে হত এবং এই কারণেই মানব সংস্কৃতির এই পর্য্যায়ের স্থায়ী জনবসতি তেমনভাবে গড়ে ওঠেনি। পরবর্তীকালে স্থানান্তর কৃষি থেকে ক্রমশঃ স্থায়ী কৃষিকার্য যখন মানুষের প্রধান জীবিকা হয় তখন স্বাভাবিক কারণেই একস্থানে স্থায়ীভাবে বসবাস করার প্রয়োজন দেখা দেয়। সংস্কৃতির এই পর্য্যায় থেকেই স্থায়ী গ্রামীণ বসতি একটা নির্দিষ্ট রূপ পেতে থাকে। স্থায়ী কৃষিকার্য যেমন সংঘবদ্ধ গ্রামীণ বসতি গড়ে ওঠার একটি প্রধান কারণ। তেমনই এক জায়গায় অনেকে সংঘবদ্ধভাবে বসবাস করার জন্য অন্যান্য সহায়ক জীবিকারও উদ্ভব হয়। এইভাবেই প্রধান জীবিকা কৃষিকার্য্য এবং অন্যান্য সহায়ক জীবিকার উপর নির্ভর করে এক একটি গ্রামীণ জনবসতি গড়ে ওঠে। কালক্রমে কৃষিকার্যের উন্নতির ফলে প্রচুর পরিমাণে কৃষিজাত দ্রব্য উদ্বৃত্ত হতে থাকে এবং জনসংখ্যার একটি অংশ অন্যান্য অকৃষিগত ক্রিয়াকলাপে নিযুক্ত হয়। ক্রমশঃ দূরবর্তী স্থানের সঙ্গে কৃষিজাত ও অন্যান্য পণ্যের বাণিজ্য শুরু হওয়ার সাথে সাথে বিভিন্ন বৈচিত্রপূর্ণ অর্থনৈতিক জীবিকায় অনেকে নিযুক্ত হয়। এইভাবে কিছু জনবসতি প্রধানতঃ বিভিন্ন বৈচিত্রপূর্ণ অকৃষিগত অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের কেন্দ্র হিসাবে গড়ে ওঠে। এইভাবেই নগরবসতি তথা নগর সংস্কৃতির সৃষ্টি হয়। এই নগরবসতিগুলি কেবলমাত্র

ব্যবসাবাণিজ্য বা অন্যান্য অকৃষিগত ক্রিয়াকলাপের কেন্দ্রই নয়, প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসাবেও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এইভাবেই প্রধানতঃ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক পর্যায়ের মধ্য দিয়ে জনবসতির বিবর্তন হয়। নিচের সারণীতে সাংস্কৃতিক বিবর্তনের বিভিন্ন উপাদান সমূহ দেখান হল --

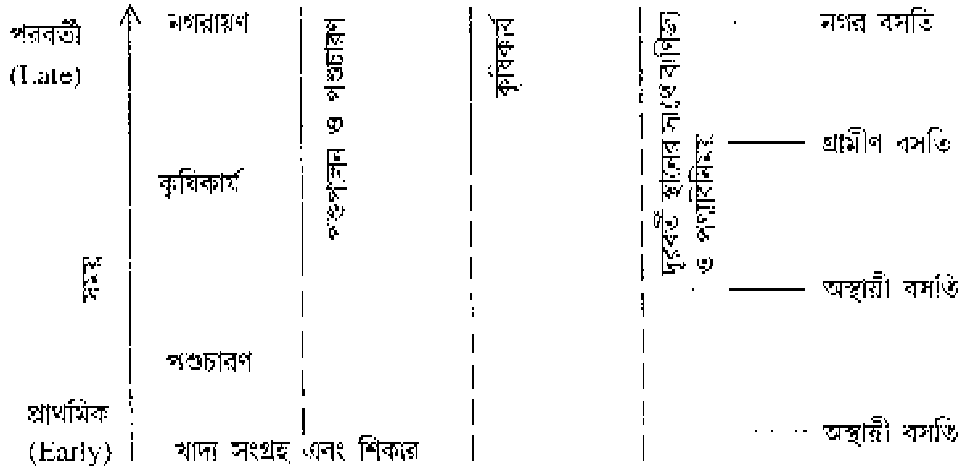

সাংস্কৃতিক বিবর্তনের উপাদান সমূহ

1.8.2 পুরাতাত্ত্বিক আবিষ্কার এবং জনবসতি

পুরাতত্ত্ব অতীতের সাক্ষ্য বহন করে। তাই পুরাতাত্ত্বিক আবিষ্কার থেকে অতীতের জনবসতি সম্পর্কে জানতে পারা যায়। যেমন আমরা জানতে পারি খৃষ্টের জন্মের 3000 বছর আগে মধ্যপ্রাচ্যের মানুষ কৃষিকার্য এবং পশুপালনের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করত। পৃথিবীর চারটি নদী উপত্যকায় যে প্রাচীনকালে নগরসভ্যতা গড়ে উঠেছিল। তাও আমরা পুরাতাত্ত্বিক আবিষ্কার থেকেই জানতে পারি। এই চারটি নগর সভ্যতা হল--

(1) টাইগ্রিস এবং ইউফ্রেটিস উপত্যকায় মেসোপটেমিয়া ;

(2) নীলনদ উপত্যকায় মিশরীয় সভ্যতা ;

(3) পাকিস্তান ও ভারতের সিন্ধু সভ্যতা ; এবং

(4) উত্তর চীনের পীত নদী উপত্যকার সভ্যতা।

সুতরাং দেখা যায় যে সেই সময় পৃথিবীর স্থায়ী জনবসতির অধিকাংশই নদী উপত্যকায় গড়ে উঠেছিল যার প্রধান অঞ্চলগুলি পরের পাতায় সারণীতে লিপিবদ্ধ করা হল—

অঞ্চল	অবস্থান	প্রাচীন নগর সংস্কৃতি	প্রতিনিধি নগর
মধ্যপ্রাচ্য	নীল নদ উপত্যকা	মিশরীয় (খৃষ্টপূর্ব 3000)	মেমফিস, থেবেস
	টাইগ্রীস-ইউফ্রেটিস উপত্যকা	সুমেরিয়ান (খৃষ্টপূর্ব 2700)	উর, উরুক
	সিন্ধু উপত্যকা	সিন্ধু (খৃষ্টপূর্ব 2500)	মহেঞ্জোদারো, হরপ্পা
পূর্ব এশিয়া	হোয়াংহো উপত্যকা	শাং (খৃষ্টপূর্ব 1300)	আনইয়াং
	মেকং উপত্যকা	খেমের (1100 খৃষ্টাব্দ)	আংকর
দক্ষিণ ইউরোপ	এজিয়ান দ্বীপপুঞ্জ	এজিয়ান (খৃস্টপূর্ব 2000)	নসস্,
	এবং উপদ্বীপ		মাইকেল
	ইটালিয় উপদ্বীপ	এট্রাসকান (খৃষ্টপূর্ব 400)	ফেলসিনা, রোম
আমেরিকা	ইউকাটান উপদ্বীপ	মায়া সভ্যতা (500 খৃষ্টাব্দ)	প্যালেনকিউ, টিকাল
	মধ্য মেক্সিকো	অ্যাজটেক (1400 খৃষ্টাব্দ)	টেনোকটিটলান
	পেরু	ইনকা (1500 খৃষ্টাব্দ)	কিউজকো
পশ্চিম আফ্রিকা	নাইজার উপত্যকা	ইউরোবা (1300 খৃষ্টাব্দ)	ইফে

এই শতাব্দীর গোড়ায় পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার 40 শতাংশেরও বেশী দক্ষিণ এশিয়ায় বসবাস করত। এছাড়া চীনের হোয়াংহো নদী উপত্যকাও একটি জনবহুল অঞ্চল ছিল। তৃতীয় জনবহুল অঞ্চলটি ছিল নীল নদ উপত্যকা ও লিবিয়া সহ রোম নগররাষ্ট্র। এই তিনটি বসতি অঞ্চলেরই নিজস্ব সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল। মায়া, ইনকা, ইউরোবা, অ্যাজটেক প্রভৃতি সভ্যতা প্রাচীন পৃথিবীর বিভিন্ন বসতি অঞ্চলগুলিতে বিভিন্ন সাংস্কৃতির সাক্ষ্য বহন করে। এছাড়া পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলেও যে ভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক বিকাশ ঘটেছিল। তাও আমরা পুরাতত্ত্বের আবিষ্কার থেকেই জানতে পারি। উপরের আলোচনা থেকে একথা পরিষ্কার হয় যে। প্রাচীনকালে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে যে সকল জনবসতির বিকাশ হয়। তাদের প্রত্যেকেরই নিজস্ব সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল। ফলে এই জনবসতি অঞ্চলগুলি এক একটি সাংস্কৃতিক অঞ্চলে পরিণত হয়েছিল। পরবর্তীকালে এখানে থেকেই পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলে সংস্কৃতিক বিকাশ ঘটেছিল।

1.8.3 বিভিন্ন ঐতিহাসিক যুগে জনবসতির বিকাশ

কোথায় এবং করে ভূপৃষ্ঠে মানবজাতির আবির্ভব হয়েছিল, তা সঠিকভাবে নির্ধারণ করা যায় না। তবে সাম্প্রতিক অভিমত হল যে কমপক্ষে দশলক্ষ বছর আগে পূর্ব মধ্য আফ্রিকায় বিভিন্ন মানব গোষ্ঠীর বসবাস ছিল। এরপর বিভিন্ন সময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বসতির বিস্তার ঘটেছে। সময়ের সাথে সাথে এবং প্রযুক্তির উন্নতির ফলে এদের প্রত্যেকেরই নিজস্ব সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছে যা একটি অঞ্চলকে অপর

অঞ্চল থেকে পৃথক করেছে। বিভিন্ন ঐতিহাসিক যুগে সংস্কৃতি ও প্রযুক্তির রূপ আলাদা হওয়ার ফলে, জনবসতির বৈশিষ্ট্যও আলাদা।

- **প্রাগৈতিহাসিক যুগ**

পুরাতাত্ত্বিক আবিষ্কার থেকে জানা যায় যে প্রাগৈতিহাসিক যুগে পৃথিবীর নদী উপত্যকাগুলিতে জনবসতির বিস্তার ঘটায় সেগুলি প্রাচীন সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। এই কেন্দ্রগুলি হল মেসোপটেমিয়া, নীল নদ উপত্যকা। সিন্ধু উপত্যকা এবং পীত নদী উপত্যকা। এই চারটি কেন্দ্র ছাড়াও কয়েকটি স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে উন্নত সংস্কৃতির নজির পাওয়া যায়। আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব 4000 সালে ক্রিট দ্বীপে গোষ্ঠীবদ্ধ গ্রাম ছিল, যার অধিবাসীরা কৃষিকার্যের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করত। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের পূর্বদিকের প্রাকৃতিক পরিবেশ ফসল ফলানোর জন্য অনুকূল থাকায় সেখানেও গ্রামীণ বসতি গড়ে উঠেছিল। পরবর্তীকালে বৈদিক সংস্কৃতির বিকাশ ঘটায়। ভারতের বিভিন্ন ধরনের জনবসতি গড়ে উঠেছিল—(ক) সিন্ধু সভ্যতার শেষের দিকে আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব 1500 সালে প্রযুক্তি, সংস্কৃতি, উন্নত ধ্যানধারণা প্রভৃতি পূর্বদিকে বিস্তারলাভ করেছিল, (খ) খৃস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে দক্ষিণ এশিয়াতে লৌহযুগের সংস্কৃতি ছড়িয়ে পড়েছিল এবং দক্ষিণ মানচুরিয়া। কোরীয়া ও জাপানের জনবসতি ও জীবনযাত্রা উত্তর চীনের সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। এই সকল সাংস্কৃতিক কেন্দ্রগুলির সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলিতে অমার্জিত বা অর্ধশিক্ষিত মানুষরা বসবাস করলেও এখানে কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ জনবসতি গড়ে উঠেছিল। পুরাতাত্ত্বিক আবিষ্কার থেকে আরও জানা যায় যে খৃষ্টপূর্ব 4000 সাল থেকে খৃষ্টপূর্ব 500 সাল পর্যন্ত আফ্রিকার বিভিন্ন স্থানে কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ জনবসতি গড়ে ওঠে। এর মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র হল নাইজেরিয়া উপকূল। উচ্চ কঙ্গো উপত্যকা, চাঁদ হ্রদ অঞ্চল এবং আবিসিনিয়ার (বর্তমান ইথিওপিয়া) উচ্চভূমি।

- **নতুন পৃথিবীর প্রাগৈতিহাসিক থেকে ঐতিহাসিক জনবসতি**

নতুন পৃথিবীতে বসতির বিস্তার অন্যভাবে ঘটেছিল। এখানে সাধারণতঃ মন্দির অঞ্চলকে কেন্দ্র করে গোষ্ঠীবদ্ধ জনবসতি গড়ে উঠেছিল। এই ধরনের বসতি অঞ্চলগুলির একটি হল মধ্য দক্ষিণ মেক্সিকো। ইউকাটান ও গুয়াতেমালা এবং দ্বিতীয়টি হল দক্ষিণ আমেরিকার পেরু উপকূল অঞ্চল যেখানে ব ইনকা সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল। অ্যাজটেক এবং মায়া সভ্যতার সঙ্গে ইনকাসভ্যতার খুব ঘনিষ্ট সম্পর্ক ছিল। নতুন পৃথিবীর এই সব বসতি অঞ্চলগুলি যথেষ্ট উন্নত ছিল। নতুন পৃথিবীর এইসব বসতি অঞ্চলগুলি যথেষ্ট উন্নত ছিল কারণ খৃষ্টের জন্মের প্রায় 400 বছর আগেই সেখানে সেচব্যবস্থা, ধাতুবিজ্ঞান এবং শিল্পের বিকাশ ঘটেছিল।

● **পরবর্তী যুগের সাংস্কৃতিক অঞ্চল**

মানবসভ্যতার ইতিহাসের পরবর্তী অধ্যায়ে দেখা যায় যে পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলে সংস্কৃতি ও জনবসতি বিস্তারলাভ করেছিল। একদিকে যেমন পশ্চিম ইউরোপ থেকে দক্ষিণ আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়ার বসতির বিস্তার ঘটেছিল তেমন পূর্ব এশিয়ার প্রভাব পড়েছিল আমেরিকায়। ধীরে ধীরে ইউরোপের বেশীরভাগ অঞ্চলে খৃষ্টধর্মের প্রভাব পড়ে, দাসেরা (Slave) উর্বর সমভূমি ও নদী উপত্যকা অধিকার করে এবং মুসলমান ধর্মাবলম্বীরা ইউরোপেরদক্ষিণ অংশ, আফ্রিকার উত্তর এবং পূর্ব অংশে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়। প্রাকৃতিক পরিবেশের বৈচিত্র থাকলেও এখানকার জীবনযাত্রা সভ্যতা এবং জনবসতির ওপর ধর্মের প্রভাব ছিল অপরিসীম। মধ্যযুগে রোমান সাম্রাজ্য এবং ইউরোপের অন্যান্য অঞ্চলে ইসলাম ধর্ম প্রভাব বিস্তার করায় প্রাচীন কেন্দ্রগুলিতে একমিশ্র সংস্কৃতি উদ্ভব ঘটেছিল। 1500 খৃষ্টাব্দের মধ্যে সামুদ্রিক দ্বীপগুলিতেও বসতির বিস্তার হয়। পরবর্তী 400 বছরে পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল ইউরোপীয় উপনিবেশ স্থাপন। ইউরোপের জনগোষ্ঠী আমেরিকা, আফ্রিকা এবং দক্ষিণ এশিয়ায় উপকূল অঞ্চলে বাণিজ্যকেন্দ্র, বাগিচাকৃষি এবং উপনিবেশের মাধ্যমে বসতি স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিল।

● **ভারতীয় সাংস্কৃতিক অঞ্চল**

পুরাতাত্ত্বিক আবিষ্কার থেকে জানা যায় যে দক্ষিণ ভারতের কিছু অংশ এবং পূর্বতন সিন্ধুপ্রদেশ ছাড়া ভারতের বেশীরভাগ অঞ্চলে প্রাচীন মানবগোষ্ঠীর বসবাস ছিল। প্রস্তরযুগে পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলা, উত্তরপ্রদেশের ঝাঁসী, রাজস্থানের চিতোরগড়, গুজরাটের মেহসানা এবং মহারাষ্ট্রের নাসিক ও আহমদনগর জেলায় ঘন জনবসতি ছিল। পুরাতাত্ত্বিক, পুনা, বৈশালী, পাঞ্জাবের রোপার এবং রাজস্থানের শেরপুরা হরপ্পার সমসাময়িক এবং আরও আগের জনবসতির প্রমাণ পেয়েছেন। একইভাবে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগ উত্তর প্রদেশের বান্দাজেলায় প্রাগৈতিহাসিক যুগের অনেক জনবসতির অবস্থান লক্ষ্য করেছে। এইসব জনবসতি খৃষ্টপূর্ব 2750 সাল থেকে খৃষ্টপূর্ব 500 সাল পর্য্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিল। তবে বৈদিক এবং হরপ্পার সংস্কৃতি শুধুমাত্র ভারতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। ইন্দোনেশিয়া, এমনকি লাতিন আমেরিকাতেও এর প্রভাব পড়েছিল। তাই মেক্সিকোর মায়া সভ্যতার সাথে সিন্ধু সব্যতা ও বৈদিক সভ্যতার খুবই সাদৃশ্য পাওয়া যায়।

ভারতের জনবসতির বিস্তার ও সাংস্কৃতিক বিকাশকে নিম্নলিখিত ঐতিহাসিক যুগে ভাগ করা যায়—

(ক) প্রাগৈতিহাসিক যুগ (300 খৃষ্টপূর্বা থেকে 300 খৃষ্টপূর্বাব্দ)

(খ) প্রাচীন ঐতিহাসিক যুগ (300 খৃষ্টপূর্বাব্দ থেকে 400 খৃষ্টাব্দ)

(গ) মধ্যযুগ (400 খৃষ্টাব্দ থেকে 1200 খৃষ্টাব্দ)

(ঘ) মধ্যযুগের শেষ পর্যায় (1200 খৃষ্টাব্দ থেকে 1857 খৃষ্টাব্দ)

(ঙ) ব্রিটিশ যুগ (1857 খৃষ্টাব্দ থেকে 1947 খৃষ্টাব্দ)

(চ) স্বাধীনতার পরবর্তী যুগ (1947 খৃষ্টাব্দের পরবর্তীকাল)।

1.9 সারসংক্ষেপ

মানবীয় ভূগোলের একটি নবীন শাখা হলেও জনবসতি ভূগোলের গুরুত্ব কিছু কম নয়। জনবসতি ভূগোলের বিষয়বস্তুকে দুটি প্রধান শাখায় ভাগ করা যায়—গ্রামীণ বসতি ও পৌর বসতি। দুটি শাখাতেই বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ভারত ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশে অনেক গবেষণা হয়েছে। এছাড়া স্থান নাম বিশ্লেষণ, পদ্ধতিগত ব্যাখ্যা প্রভৃতি বিষয়েও জনবসতি ভূগোলের গবেষণার যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছে। মানুষের তিনটি মৌলিক চাহিদার মধ্যে আশ্রয় অন্যতম এবং এই আশ্রয়ের একটি সমষ্টিগত রূপ হল বসতি। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে যেমন বিভিন্ন ধরণের প্রাকৃতিক পরিবেশ দেখা যায়, তেমনি বিভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশে জনবসতির আকার, নকশা, উপকরণ প্রভৃতির পার্থক্য দেখা যায়। তাই জনবসতির ভৌগোলিক তাৎপর্য যথেষ্ট। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে জনবসতির ভিন্নতা অনুসারে জনবসতিকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়। এর মধ্যে যেমন গ্রামীণ ও পৌর বসতি আছে তেমনি স্থায়ী ও অস্থায়ী বসতিও আছে। আবার আয়তন অনুসারেও জনবসতিকে ভাগ করা যায়। জনবসতির ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক তাৎপর্যও কিছু কম নয়। বিভিন্ন ঐতিহাসিক যুগে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে, যে সব জনবসতির বিকাশ ঘটেছে, তাদের সংস্কৃতির পার্থক্য থাকায় পরবর্তীকালে এগুলি একটি সাংস্কৃতিক অঞ্চলে পরিণত হয়েছে।

1.10 প্রশ্নাবলী

বিভাগ-ক

(প্রতিটি প্রশ্ন 2 নম্বর)

1. ভারতের পৌর ভূগোলের গবেষণাকে কটি ভাগ করা যায়?
2. সড়ক বসতি কিভাবে গড়ে ওঠে?
3. ক্ষুদ্রগ্রামের বৈশিষ্ট্য কি কি?
4. শহর ও নগরের মধ্যে পার্থক্য কি?
5. স্থায়ী বসতির বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে আলোচনা করুন।
6. মুলার ও ইউর্সির জনবসতির শ্রেণীবিভাগ উল্লেখ করুন।

বিভাগ-খ

(প্রতিটি প্রশ্ন 4 নম্বর)

1. ভারতে পৌর (Urban) ভূগোলের অগ্রগতি আলোচনা করুন।
2. গ্রামীণ বসতি ও পৌর বসতির পার্থক্য নিরূপণ করুন।
3. অস্থায়ী বসতির বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।
4. আয়তন অনুসারে জনবসতির শ্রেণীবিভাগ করুন ও তাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।
5. ডিকিনসনের জনবসতির শ্রেণীবিভাগ, যেটি ক্রিষ্ট্যালির পরিবর্তন করেছেন, সেটি উল্লেখ করুন।
6. বিভিন্ন ঐতিহাসিক যুগে জনবসতির বিকাশের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দিন।
7. পুরাতাত্ত্বিক আবিষ্কার থেকে জনবসতির কথা আমরা কিভাবে জানতে পারি?

বিভাগ-গ

(প্রতিটি প্রশ্ন 10 নম্বর)

1. জনবসতি ভূগোলের বিকাশ আলোচনা করুন।
2. জনবসতির ভৌগোলিক তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করুন।
3. জনবসতির ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করুন।
4. জনবসতি ভূগোলের পরিধি ও বিষয়বস্তু আলোচনা করুন।

একক 2 ❑ বসতি ভূগোলের বিভিন্ন দিক

গঠন ঃ

2.1 প্রস্তাবনা

2.2 বসতি ভূগোল কি?

2.3 পৌর ভূগোল

2.4 গ্রামীণ বসতি ভূগোল ও তার বিভিন্ন দিক

2.5 বসতির ভিত্তি ও উপাদান

2.6 বসতির পরিবর্তন

 2.6.1 স্থিতিকলা অনুসারে

 2.6.2 বাস্তুস্থান অনুসারে

 2.6.3 আকৃতি অনুসারে

 2.6.4 পারিবারিক বিন্যাস অনুসারে

 2.6.5 পেশা অনুসারে

 2.6.6 জনসংখ্যার আকার অনুসারে

2.7 বসতির আকৃতি ও পারিবারিক বিন্যাস

 2.7.1 বিন্যাসের ঘনত্ব

 2.7.2 বসতির বুনট

 2.7.3. বিন্যাসের ধরণ

2.8 প্রশ্নাবলী

2.9. উত্তর

2.1 প্রস্তাবনা

ভূগোলশাস্ত্রে বসতি সংক্রান্ত গঠন ও অনুশীলন বহুদিন ধরেই চলে আসছে। কিন্তু প্রতিনিয়ত নতুন নতুন চিন্তাধারা এর সাথে যোগ হচ্ছে। এজন্য বলা যায় বসতি ভূগোলের চর্চা নতুন, আবার আর এক দিক দিয়ে দেখতে গেলে পুরানোও বটে। বসতি ভূগোলের বিষয়বস্তু মানবীয় ভূগোলের (Human

Geography) অন্তর্ভুক্ত হলেও বসতি ভূগোল একটি স্বতন্ত্র ও পূর্ণাঙ্গ বিষয়। ব্যাপক অর্থে এই ভূগোলের বিষয়বস্তু (Subject matter) সম্পর্কে মতপার্থক্য রয়েছে। আর এই কারণে এসম্পর্কে ভৌগোলিকরা কোনো সর্বজনগ্রাহ্য ব্যাখায় আসতে পারেন নি। বসতি ভূগোল আবার গ্রামীণ ও পৌর এই ভাগে বিভক্ত।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে বসতি ভূগোলের মূল ভিত্তি কি? অধ্যাপক স্টোন (Stone)-র মতে এটি হচ্ছে "A part of the geography of population". অধ্যাপক জর্ডন জনসংখ্যা ভূগোলের অঙ্গ হবে। তবে একটি বাড়ী, একটি খামার, কৃষিখেতের ধরণ ও এগুলোর বিভাজনকারী সীমানা তা হলে কোন বিষয়ের আওতায় আসবে? তাই তিনি বলেছেন যে জনসংখ্যা ভূগোল বা অর্থনৈতিক ভূগোলের মত বসতি ভূগোলও একটি **স্বতন্ত্র** বিষয়। তবে এ প্রসঙ্গে আরো উল্লেখ করতে হয় যে বসতি বলতে পরিবেশের যে সব উপাদান রয়েছে তা প্রধানত গ্রামীণ ভূ-দৃশ্যেই দেখতে পাওয়া যায়।

নীচে আমরা বসতি ভূগোলের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করব ঃ

বসতি হল মানুষের এক সুশৃঙ্খল উপনিবেশ যেখানে মানুষ বসবাস করে, দৈনন্দিন কাজকর্ম করে বা যাতায়াতের জন্য রাস্তা বানায়। পশুপালক বা পশুশিকারীদের আদিম বাসগৃহ, এমনি কি মালয়ের সেমাং দের এক দেওয়াল বিশিষ্ট কুটিরে মানুষের চিন্তাশক্তি ও পরিবেশের ছাপ ধরা পড়ে। ভূগোলের অন্যান্য শাখার মত জনবসতি ভূগোলের কেন্দ্রবিন্দু হল মানুষ ও তার আশ্রয়স্থল এবং পরিবেশের সাথে তার পারস্পরিক সম্পর্ক। সৃষ্টির প্রথম পর্যায়ে বসতির বিভিন্ন উপাদানগুলো থাকে সাধারণ মানের। তাতে পরিবেশের স্পর্শ লেগে থাকে, কিন্তু জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে সাথে বসতির আয়তন, আকার ও বৈচিত্র্য যতই বাড়তে থাকে, মানুষের হাতের স্পর্শ ততই অনুভূত হয়। তবে সবচেয়ে বেশি এই ছোঁয়া লেগে থাকে মহানগরে। মহাগরীর বাহ্যিক রূপটির মতো তার ভূমি ব্যবহারের চিত্রটিও খুব জটিল।

সাধারণভাবে প্রতিটি গৃহও তার অন্যান্য সুযোগ সুবিধাগুলো স্থায়ী হয়। কোন বসতিতে খুব সাধারণ বাড়ি থেকে বহুতল বিশিষ্ট ও কারুকার্যখচিত বাড়ি থাকতে পারে। কয়েকটি বাড়ি মিলে একটি ক্ষুদ্র পল্লী (Hamlet) সৃষ্টি করে। দু'তিনটি ক্ষুদ্র পল্লী মিলিয়ে গ্রাম, গ্রাম থেকে শহর, নগর ও মহানগর—এই ভাবে একটা অনুক্রমিক নিয়মে (hierarchial order) বসতির বিস্তার ঘটে থাকে। Kohn অবশ্য শিকারী বা পশুপালকদের অস্থায়ী ছাউনিকেও বসতি হিসেবে গণ্য করেছেন। তাঁর ভাষায় "It is concerned not only with the buildings grouped around the permanent farm dwellings, but also with the temporary camp of the hunter or herder, or with settlement clusters or agglomerations running the scale from hamlet to village, to town, to city and to metropolis".

সংক্ষেপে গ্রাম ও শহর হল বসতি-ভূগোলের দু'টি মূল উপাদান। কিন্তু গ্রামীণ ও পৌর জনবসতি ভূগোলের আলোচনার ধারা দু'রকম। উভয় বিষয় বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তাঁরা এই দুটি

বিষয়ের ভিন্ন ভিন্ন পাঠক্রম নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং প্রতিটি বিষয়ের নির্দিষ্ট সংজ্ঞা ও সাধারণ নিয়মের কথা বলেছেন। তবে পৌর বসতির ক্ষেত্রে বেশি গবেষণা হয়েছে। ফলে জনবসতি ভূগোলের এই শাখার একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু গ্রামীণ জনবসতি ভূগোলের এই শাখার একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু গ্রামীণ জনবসতি ভূগোলের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত তথ্য পাওয়া যায় নি। ফলে ভূগোলের অন্যান্য উপাদানের (জলবায়ু, উদ্ভিদ, মৃত্তিকা, কৃষি) মত গ্রামীণ জনবসতি ভূগোলের অনেক উপাদানের (যেমন পাথরের বাড়ি, কাঠের বাড়ির বণ্টন) পৃথিবীব্যাপী বণ্টনের যথেষ্ট তথ্য নেই। ফলে সেই সংক্রান্ত নীতি আজও প্রতিষ্ঠিত হয় নি। অর্থনীতিবিদ্, ঐতিহাসিক ও সমাজতত্ত্ববিদ্‌রা তাঁদের নিজ নিজ বিষয়ের দৃষ্টিকোণ থেকে বসতিকে বিচার করেন। ফলে তাঁদের দেওয়া বসতির বিশ্লেষণ হয়ে গেছে একপেশে। কিন্তু ভৌগোলিকেরা বসতিকে গোটা অংশ হিসেবে দেখেন। বসতিকে ভূ-পৃষ্ঠে মনুষ্য-সৃষ্ট আশ্রয় বিবেচনা করে তাঁর এর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য যেমন গৃহ, তার শিল্পয় সুষমা, রাস্তা ইত্যাদি সমুদয় বিষয়গুলো বিশ্লেষণ করেন। এর উদ্দেশ্য হল শুধুমাত্র বসতির আকার, গঠন ইত্যাদি নির্ণয় করাই নয়, ঐতিহাসিক ঘটনা পরম্পরা ও কার্যকরণ সম্পর্কের ওপরও আলোকপাত করা। তাই বলা চলে বসতির আয়তন, আকার, কার্যাবলী ও উৎপত্তি জনবসতি ভূগোলের প্রয়োজনীয় উপাদান। অধিকন্তু বসতির আঞ্চলিক পার্থক্যও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়, কারণ তা মানবগোষ্ঠীর অর্থনীতি ও সামাজিক অবস্থার প্রতিফলন।

মানুষ-সৃষ্ট পরিবেশে পরিবর্তনের ধারাকে বিশ্লেষণ করতে ভৌগোলিকরা সকল প্রকার বসতি ও তাদের বণ্টনের ধাঁচ (Pattern) নিয়ে আলোচনা করেন। একদিকে স্থান ও সময়, অন্যদিকে ঐতিহ্য, কারিগরী জ্ঞান ইত্যাদির সাতে তাল মিলিয়ে বাড়ি, রাস্তা, কৃষিক্ষেত্রের বন্টন ইত্যাদি ব্যাপারগুলো পাল্টায় যেমন পাল্টায় যোগাযোগের মাধ্যম। বলদ টানা গাড়ি থেকে উড়োজাহাজে যাত্রার মধ্য দিয়ে মানুষের এই কারিগরী জ্ঞানের বিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে। মানুষের জীবনযাত্রার মান পাল্টালেও পূর্বেকার রাস্তাঘাট অতীতের সাক্ষ্য হিসেবে রয়ে যায়। পুরনো বসতির পাশে নতুন বসতি প্রতিষ্ঠিত হয় বা পুরনো ধ্বংসাবশেষ বসতির ওপর নতুন করে গ্রাম গড়ে ওঠে। অনেক প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় শহরের পাশে ক্যান্টনমেন্ট, সিভিল লাইনস্ ইত্যাদি তৈরি হয়েছে, যেমন, এলাহাবাদ, গোয়ালিয়র। কোন কোন গ্রামে প্রাচীন বসতির ধ্বংসাবশেষ স্তূপ হিসেবে আজও টিকে আছে। অনেক সময় নতুন বসতির কেন্দ্রস্থলে এই ধরনের ধ্বংসাবশেষ থাকে। অনেক সময় পুরনো গ্রামের নামেই নতুন গ্রামের নামকরণ করা হয়। কোন দেশের ধ্বংসপ্রাপ্ত এই সব বসতির একটা মানচিত্র প্রস্তুত করলে তা থেকে আমরা সেখানকার অতীত বসতির সূত্রের সন্ধান পাই। এছাড়া কোন জাতির পরিযান (Migration) সম্বন্ধে তথ্যও এই ধরনের মানচিত্র থেকে পাওয়া যেতে পারে।

কোন গ্রামীণ বসতিকে চিনে নেওয়া যায় তার বাহ্যিক রূপটি দেখে। যেমন দূর থেকে সারি সারি গাছের সমাবেশ থেকে আমরা বাংলার গ্রামাঞ্চলের অবস্থান সম্পর্কে জানতে পারি। কবির ভাষায় "ছায়া,

সুনিবিড়, শান্তির নীড়, ছোট ছোট গ্রামগুলি।" এছাড়া বেশিরভাগ ভারতীয় গ্রামকে চিনে নেওয়া যায় গ্রামের মধ্যস্থলে মন্দির, জমিদারের প্রাসাদ, গ্রামের উচ্চবর্ণের আবাসস্থল এবং গ্রামের প্রান্তভাগে কৃষিশ্রমিক ও কারিগরের বাসগৃহের অবস্থান থেকে। গ্রামের শেষে সীমায় বাস করেন তথাকথিত নীচু বর্ণের লোকেরা। অনুরূপভাবে, কোন দোহশিল্পাঞ্চলকে (Dairy Industry) চেনা যাবে বড় বড় গোয়ালঘর ও পশুখাদ্যের গুদামঘরের অবস্থান থেকে। তেমনিভাবে কোন শিল্পাঞ্চলকে চেনা যাবে ধোঁয়া বেরুবার চুল্লী ও ধোঁয়াচ্ছন্ন আকাশ দেখে।

অর্থনীতিবিদ্‌দের যেমন কাজ হল কোন প্রান্তিক জমির উপযোগিতা নির্ণয় করা, তেমনি ভৌগোলিকের কাজ হল নতুন বসতির সম্ভাবনাকে জানা, কোন বসতি সংলগ্ন আনকোরা প্রান্তভাগ ("Pioneer fringe") খোঁজ করা। প্রতিকূল পরিবেশে এ ধরনের সম্ভাব্য বসতির অনুসন্ধান সম্বন্ধে Bowman যথার্থই মন্তব্য করেছেন যে "The pioneer fringe is a laboratory of exceptional scientific worth, because there human intelligence is pitted against exterme or unusual environmental conditions"। সরকারী সাহায্যে হোক, আর বেসরকারী প্রচেষ্টায় হোক উষ্ণ ও শীতল পরিবেশে ও ধরনের সম্ভাব্য নতুন বসতি অনুসন্ধানের দিকে মানুষের কর্ম প্রচেষ্টার অন্ত নেই। নতুন বসতির সম্ভাবনা খতিয়ে দেখতে সেখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার কথাও বিবেচনা করা হয়। Bowman তাই বলেছেন, "City Geography is at one end of the scale of settlement, pioneering at the other"।

2.3 পৌর ভূগোল (Urban Geography)

আমরা আগেই দেখেছি যে জনবসতি ভূগোলের পৌর ভূগোল শাখায় যথেষ্ট গবেষণা হয়েছে এবং একটি নির্দিষ্ট তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শহর বা নগরকে ধরাপৃষ্ঠে মনুষ্য সৃষ্ট এক উল্লেখযোগ্য ভূমিরূপ হিসেবে দেখা যেতে পারে। পৌর বসতি যথার্থই হল সমসাময়িক সভ্যতার এক উজ্জ্বল নিদর্শন। পৌর বসতির আলোচনা দু'ভাগে হতে পারে : (A) সামগ্রিকভাবে শহরের আলোচনা, (B) গোটা শহরের পৃথক পৃথক অঞ্চলের আলোচনা। (A) প্রথমটির আলোচনার সময় গোটা শহরের ভূমিভাগ এবং প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক ভয় পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা হতে পারে। আয়তন, কর্মধারা ও বাহ্যিক আকারের দিক দিয়ে বিভিন্ন শহরের মধ্যে পার্থক্য আছে। অইধকাংশ শহরের কিছু কিছুসাধারণ সমস্যা থাকে। সুতরাং অন্যান্য বিষয়গুলোর মধ্যে নিম্নোক্ত আলোচনা বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে : পৌর পদানুক্রম (Urban Hierarchy), স্থানীয় ও আঞ্চলিক পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে শহরগুলোর পরস্পরের মধ্যে ব্যবধান, তাদের সমস্যার প্রকৃতি ও কিভাবেতার সমাধান করা যায় ইত্যাদি। প্রতিটি শহর ও নগর তাদের পার্শ্বস্থ এলাকার

ওপর এলাকার ওপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে, যাকে আমরা 'পৌর প্রভাবের অঞ্চল' (Urban Sphere of influence) বা 'পৌর ক্ষেত্র' বলে থাকি। এটিও পৌর বসতি ভূগোলের অন্যতম আলোচ্য বিষয়। (B) ভৌগোলিক শহরের বিভিন্ন অংশে গড়ে ওঠে কর্মভিত্তিক অঞ্চল যেমন বাণিজিক বা শিল্পাঞ্চল ও সামাজিক অংশকে (Social tracts) যেমন বসতি অংশ, আমোদ-প্রমোদের জন্য ব্যবহৃত জমি ইত্যাদিকে মানচিত্রে চিহ্নিত করবেন। এর ফলে শহরের কর্মধারা আরও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা যাবে।

ভৌগোলিকরা অনেক শহরের পুঙ্খানুপুঙ্খ গবেষণা করেছেন। তাঁদের গবেষণা থেকে এটা দেখা গেছে যে প্রতিটি শহরের একটা নিজস্ব স্বকীয়তা থাকে এবং যে অঞ্চলে এই শহরটি অবস্থিত তার জীবনযাত্রার ওপর নিজস্ব প্রভাব ফেলে। যদিও প্রতিটি শহরের মধ্যে তুলনার একটা আলাদা মূল্য আছে, তবুও একথা ঠিক যে, যে সব শক্তি শহর বা নগরের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে থাকে, তা প্রতিটি ক্ষেত্রে এক নয়। এই সব তুলনামূলক আলোচনা থেকে বিভিন্ন শহরের এলাকা, অবস্থান, কর্মধারা ও সংস্কৃতির ওপর নির্ভর করে শহরগুলোর একটা সাধারণ নিয়মে শ্রেণীবিভাগ (Classification of towns and citites) করা যেতে পারে।

পৌরায়ন (Urbanisation) যত বেশি জনমিতি পরিবর্তনের (demographic change) সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়ে, জনবসতি ভূগোলের বিশ্লেষণও তত জটিল হয়। জনসংখ্যা বাড়ার সাথে সাথে অনেক নগর মহানগরে পরিণত হয়। অনেক সময় পাশাপাশি লাগোয়া অনেকগুলো শহর পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়ে পৌর মহাপুঞ্জের (Conurbation) সৃষ্টি করে। নগর ও পৌর মহাপুঞ্জ আয়তনে ও সংখ্যায় যত বাড়ে এবং শিক্ষা ও অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য যত বাড়ে মানুষ তত ভালো বাসগৃহ এবং কাজ ও অবকাশের জন্য আরও ভাল পরিবেশ আশা করে। সুতরাং সমাজকে মানুষের বসবাসের উপযুক্ত পরিবেশের দিকে দৃষ্টি দিতে হয়। নগর পরিকল্পনাবিদ্‌রা শহরের উন্নয়নের জন্য নানা সুপারিশ করেন। পৌর ভূগোলবিদ্‌দের কাজ হল বাস্তবে তা রূপায়নের চেষ্টা করা।

2.4 গ্রামীণ বসতি ভূগোল ও তার বিভিন্ন দিক—এলাকা, অবস্থান, আয়তন, ধাঁচ ও কর্মধারা (Rural Settlement Geography and its various aspect—area, location, size, pattern and functions)

অধ্যাপক Stone (1955) প্রথম জনবসতি ভূগোলের এই শাখার চরিত্র নির্ধারণের প্রয়াস নেন। তাঁর মতে এই ভূগোল হল "The description and analysis of the distribution of building by which people attach themselves to the land for the purposes of primary production"। Stone-এর এই সংজ্ঞায় দু'টি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তাঁর মতে গ্রামীণ জনবসতি ভূগোলের কেন্দ্রবিন্দু হল

বাসগৃহ, কোথায় তা অবস্থিত, কেন সেখানে অবস্থিত এবং মানুষ ও ভূমির সম্পর্ক এই ভূগোল আলোচনা করবে। Stone-এর এই অভিমত খুব সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে বলে অধ্যাপক Jordan (1966) মনে করেন। তাঁর মতে সাংস্কৃতিক ভূ-দৃশ্যের রূপ বর্ণনা ও অনুশীলনীই ভূগোলের এই শাখার মূল লক্ষ্য। "Geography is the study of the form of the cultural landscape"। বাড়ির বাহ্যিক রূপ, তার নির্মাণ উপকরণ স্থাপত্য শৈলি জনবসতি ভূগোলের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। Jordan-এর মতে গ্রামীণ জনবসতি ভূগোল সাংস্কৃতিক ভূ-দৃশ্যের তিনটি পৃথক বিষয় নিয়ে আলোকপাত করে ঃ—(1) বসতির ধাঁচ (Pattern) ও খামার বাড়ির বন্টন, (2)কৃষি জমির ধাঁচ, (3) বাসগৃহ ও খামারবাড়ির প্রকারভেদ, বাড়ি তৈরির উপকরণ ও গ্রামীণ স্থাপত্য।

বিশদ অর্থে জনবসতি ভূগোলের এই শাখা মনুষের বসতি স্থাপনের পদ্ধতি ও তার বিকাশ নিয়ে আলোচনা করে। Broek ও Webb এর (A Geography of Mankind) ভাষায় The word settlement indicates to the geographer all man made facilities resulting from the process of settling including the establishment of that shelter..."। এই ভূগোলের প্রধান আলোচ্য বিষয় হল সাংস্কৃতিক ভূ-দৃশ্যে বসতির উৎপত্তি, আয়তন, আকার ও কর্মধারার বিশ্লেষণ করা।

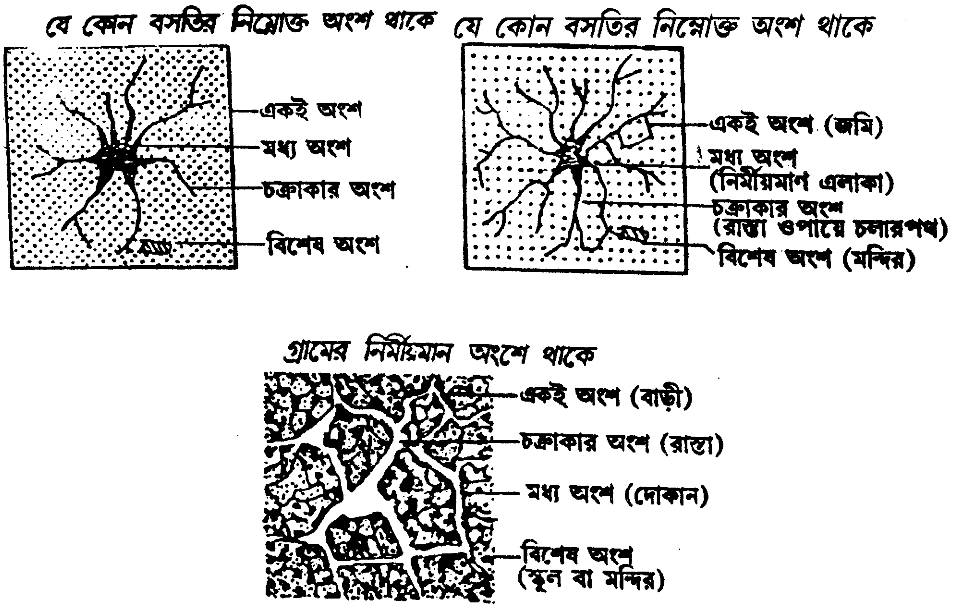

চিত্র 1.0 ঃ জনবসতির বিভিন্ন অংশ

Prof. R. L. Singh-এর মতে গ্রামীণ জনবসতি ভূগোলের মূল বিষয় হল "to analyse the origin size, form and function within the sequence of change in the cultural landscape"। তাঁর মতে

সাংস্কৃতিক ভূ-দৃশ্যের পরিবর্তনেব প্রেক্ষাপটে বসতির উৎপত্তি, আয়তন, আকার ও কর্মধারার বিশ্লেষণ করা এই ভূগোলের উদ্দেশ্য।

Doxiadis-এর মতে তত্ত্বগতভাবে (theoreocally) যে কোন বসতির চারটি অংশ থাকে (চিত্র 1-0) ঃ (a) একই প্রকার অংশ (homegeneous part), (b) মধ্য অংশ (central part), (c) চক্রাকার অংশ (circulatory part) এবং (d) বিশেষ অংশ (special part)। এই সব খণ্ডাংশ সবসময়েই একটা জীবন্ত (living) বসতি বা Existics-এর মধ্যে উপস্থিত থাকে।

তাই বলা চলে গ্রামীণ জনবসতি ভূগোলের মূল কথা হল স্থান ও বসতির অনুক্রম (Sequency)। Baker-এর মতে গ্রামীণ জনবসতি ভূগোলের আকার, কার্য ও উৎপত্তিকে (from, function and genesis) ভূ-বিজ্ঞানের (geomorphology) গঠন, প্রক্রিয়া ও ধারার (Structure, Process and Stage) সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। উপরোক্ত পরিকাঠামোর ভিত্তিতে গ্রামীণ জনবসতি ভূগোলের আলোচনাকে দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে ঃ (a) উৎপত্তিগত আলোচনা ও (b) স্থানিক আলোচনা।

সাধারণভাবে 'বসতির' আলোচনায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি প্রাধান্য পায়

2.5 বসতির ভিত্তি ও উপাদান

মানব বসতিব প্রক্ষেপনে দুটি মৌলিক ভিত্তি আছে ঃ

(এক) আধার (Container) ঃ সমগ্র ভূ-খণ্ডই আধার বা ধারক এবং তা প্রকৃতির সৃষ্টি। ক্ষেত্রবিশেষে মানুষ তা নিজের মতো পরিশীলিত করতে পারে।

(দুই) আধেয় (Content) ঃ এই আধার বা ধারকের সর্বোত্তম ও চূড়ান্ত ভোগী হচ্ছে আধেয়'রা তথা মানুষ। এরা এককভাবে অথবা গোষ্ঠিবদ্ধ হতে পারে, যা এক অর্থে সমাজ।

মানুষ এককভাবে বা গোষ্ঠীবদ্ধভাবে (আধেয়) সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য হলেও স্থিতু হয়। তবে এই স্থিতু অবস্থায় তারা যদি কোনো আচ্ছাদনের আওতায় না আসে, তবে বসতি তৈরি হয় না।

ধারক ও আধেয়কে বিশিষ্ট করে তুলতে পাঁচটি উপাদানের (চিত্র 1.2) ভূমিকা রয়েছে। সেগুলো হলো—

(a) প্রকৃতি (Nature) ঃ মানব গোষ্ঠীর মূল বিচরণ ক্ষেত্র।

(b) মানব (Man) ঃ বিচরণ ক্ষেত্রটি প্রতিনিয়ত বিভিন্ন প্রেক্ষিতরচনা করছে।

(c) সমাজ (Society) ঃ পরস্পরের নির্ভরশীল ও সম্মিলিত কাঠামো।

(d) আচ্ছাদন (Shell) ঃ সমগ্র কর্মকাণ্ড যে অবকাঠামো বা আচ্ছাদনের ভিত্তিতে রচিত হয়।

(e) সংযোগ (Network) ঃ সমাজবদ্ধ মানবগোষ্ঠী যখন আচ্ছাদনে থেকে দূরবর্তী আরেকটি আচ্ছাদিত জনগোষ্ঠী সাথে যোগাযোগ করে।

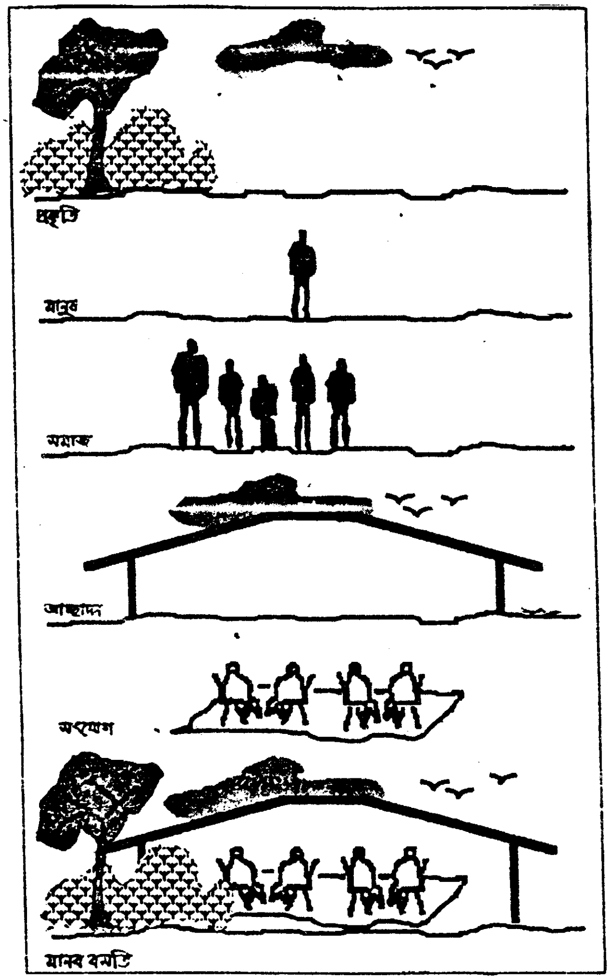

চিত্র 1.2 ঃ আধার ও আধেয়-এর উপাদানসমূহ

(ডাকসিয়াডিস-এর অনুসরণে)

উপরোস্থিত উপাদানগুলোর সমন্বয় কেমন হতে পারে, তা এইভাবে বর্ণনা করা যেতে পারে। অনুকুল প্রকৃতি মানুষকে বিচরণ করতে দিয়েছে। এই বিচরণশীল মানবগোষ্ঠী সময়ভাবাপন্নদের নিয়ে ছোট ছোট দল গড়েছে, ফলে তৈরি হয়েছে সমাজ। এই সমাজের সব কর্মকাণ্ড কোনো এক পর্যায়ে আরো দূরবর্তী দলের সাথে সংযোগ ঘটাবে। এভাবেই মানব বসতি বৃহত্তর জালে জড়িয়ে সমগ্র বিশ্বকে এক জটিল মিথষ্ক্রিয়ার সম্পৃক্ত করছে। একেই সামগ্রিক অর্থে একটি প্রক্রিয়া বলা যেতে পারে। (বাকী, আব্দুল, 1998, গ্রামীণ বসতি)

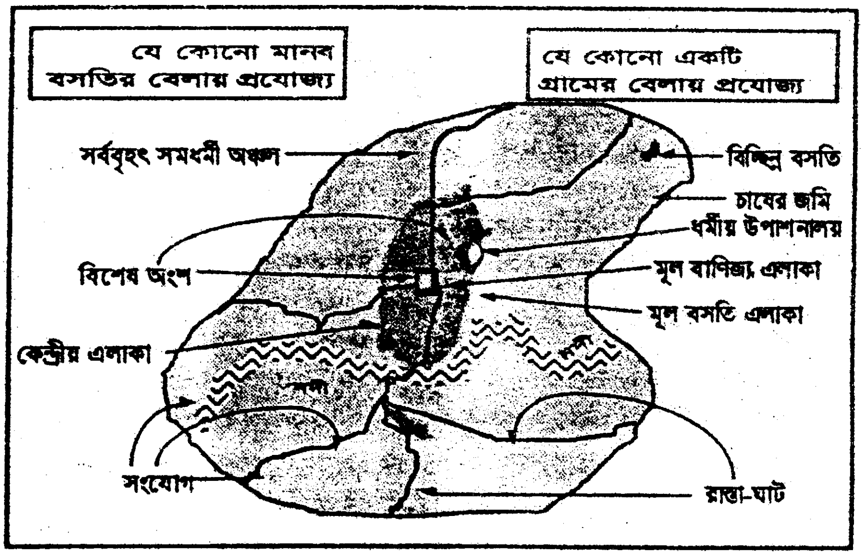

চিত্র 1.3 ঃ বসতির গাঠনিক উপাদান

একটি পূর্ণাঙ্গ বসতির চারটি গাঠনিক উপাদান থাকে (চিত্র 1.3)। সময়ের ব্যবধান একটি বসতিতে পরিবর্তন আসতে পারে। তবে তার মূল বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন হয় না। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় গ্রামীণ প্রেক্ষাপটে কৃষি জমির একচ্ছত্র প্রাধান্য দেখা যায়। কোথাও কোথাও ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসতি গড়ে উঠলেও একটি মূল বসতি এলাকা খুব সহজেই চেনা যায়। মূল বসতি এলাকা আবার ছড়িয়ে-ছিটিয়ে গড়ে ওঠা বসতিগুলোর মধ্যে যোগাযোগের জন্য রাস্তা-ঘাট, নদী পথের সুবিধাকে কাজে লাগায়। এভাবে প্রকারন্তে মানুষ তাদের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা গড়ে তোলে। এই নির্ভরশীলতা মূল বসতিব অভ্যন্তরের বিশেষ এলাকায় বাণিজ্য, ধর্মীয় ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়।

2.6 বসতির বিবর্তন

কোনো বসতির বিবর্তনকে একটি বাড়ির সাথে তুলনা করলে পরিষ্কার হবে। একটি বাড়ি সময়ের সাথে সাথে পুরাতন হতে থাকে এবং এর দুর্বল ও ক্ষয়িষ্ণু অংশ যদি প্রতিনিয়ত বদল হতে থাকে, তবে বাড়িটির পুরাতন আদল থাকে তবে এক সময় গোটা বাড়িটিই কিন্তু পরিবর্তনের মধ্যে গিয়ে নতুন হয়ে থাকে। এই উদাহরণ যে কোনো বসতির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

ডকসিয়াডিস (C. A. Doxiadis) বসতির বিবর্তনকে নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করেছেন।

- **প্রথম ধাপ**

অসংগঠিত বসতি ঃ মানব বিবর্তনের সূচনা পর্ব। সম্ভবত একটি শুরু হয়েছে মানুষের শারীরিক

বিবর্তনকালে থেকে। এ সময় মানুষ খুবই সাময়িকভাবে কিছু দিনের জন্য থেকে আরেক জায়গায় সরে গছে। দারণা করা হয়, এ সময় মানুষ আগুনের ব্যবহার শিখেছে। এর পরই পশু ও কৃষি আয়ত্ব করতে পেরেছে। এ সময় মানুষ প্রকৃতি প্রদত্ত গুহা, গাছে বাস করেছে। মানুষ আরো সংহত হয়ে মাটিতে নেমে এসেছে এবং প্রায় গোলাকৃতি ঘর তৈরি করেছে।

- **দ্বিতীয় ধাপ**

সুসংগঠিত বসতি ঃ এই পর্বটির এই প্রায় 10 হাজার বছর আগের ঘটনা। এ সময় গ্রামের গড়ন সুস্পষ্ট হয়েছে এবং মানুষ কৃষিকে আরো সুসংহত করেছে। তবে এসব ঘটনা খুব সহজে এবং দ্রুত হয়নি। কালের আবর্তনে ভুল ও শুদ্ধি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গড়ে উঠেছে। মানুষ প্রকৃতির খেয়ালকে অনুধাবন করতে পেরেছে। আগের তুলনায় মানুষ আরো কাছাকাঠি ও সংঘবদ্ধভাবে বাস শুরু করে। পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগ বেড়েছে এবং আরো কাছাকাছি থাকার প্রবণতা গড়ে উঠেছে। মানুষ নিজেকে ছোট একটি ঘরে আর সীমাবদ্ধ রাখেনি, তাই এ সময়কার ঘরের আয়তন ও সংখ্যা বেড়েছে। ফলে আকৃতিতে এসেছে ভিন্নতা।

- **তৃতীয় ধাপ**

পৌর বসতির প্রাথমিক পর্ব ঃ এখন থেকে প্রায় 5 থেকে 6 হাজার বছ্র আগের ঘটনা। কিছু কিছু গ্রামের অবস্থান ও অন্যান্য সামাজিক সুবিধাকে প্রতিফলিত করে ছোট ছোট্ নগর জীবনের আঙ্গিক তৈরি করেছে। বৈরী বা শক্তি থেকে বসতির কর্ণধারা দুর্গ গড়ে তোলে। আপদকালীন সময়ে এই দুর্গের বেষ্টনে নিজেকে আবদ্ধ করে শত্রুকে মোকাবেলা করেছে। দুর্গের ভেতরে পৌর বসতি জ্যামিতিক ধারায় প্রাধান্য বিশেষভাবে চোখে পড়ে। সময়ে আবর্তনে বসতি আয়তনে বেড়ে যাবার কারণে একাধিক কেন্দ্র বা গ্রন্থি গড়ে উঠেছে। এ সময় মানুষ বসতির শুধুমাত্র আনুভূমিক বিস্তৃতিতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, বাড়ির উলম্ব বৃদ্ধির কৌশল আয়ত্ব করেছে।

- **চতুর্থ ধাপ**

পৌর বসতির উত্তোরণ পর্ব ঃ সপ্তদশ শতাব্দি থেকে এই বসতির এই রূপ পরিগ্রহ করতে থাকে। এ সময়কার পৌর বসতিগুলো খুবই জমাটবদ্ধ অবস্থায় বেড়ে উঠেছে। কোনো নগরপুঞ্জের ব্যাসার্ধ প্রায় 30 কিঃমিঃ, এ থেকে বোঝা যায় যে, বসতির কতটা জায়গা জুড়ে বিন্যাস্ত হতে পারে। মানুষ প্রকৃতির সকল বাধাকে জয় করে দুর্গম এলাকাতেও বসতি গড়ে তুলেছে। জয়ের এই প্রক্রিয়ায় প্রকৃতি সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ইতিমধ্যে শিল্প বিপ্লব ঘটে গেছে, ফলে মানুষের অগোচরেই দূষণ প্রক্রিয়া চালু হয়ে যায়। মানুষ নিজেই নিজের সৃষ্টিতে বন্দী হতে শুরু করেছে।

● **পঞ্চম ধাপ**

পৌরপুঞ্জ পর্ব ঃ প্রকৃত অর্থে এধরনের বসতির রয়েছে এক সার্বজনীন ও সর্ব-নৃগোষ্ঠীর এক মহা সমাবেশ। কখনো কখনো একাধিক নগর পর-পর অবস্থিত হয়ে এক মহা নগরপুঞ্জের সৃষ্টি করবে। বিভিন্ন পরিকল্পনাবিদদের অনুমান অনুযায়ী পৃথিবীর জনসংখ্যা যে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে, সে তুলনায় নগরীয় জনগোষ্ঠীর বৃদ্ধির হার অনেক বেশি। ফলে আগামী শতাব্দীর মাঝামাঝিতে 200 থেকে 300 কোটি লোক বিশ্বের পৌরপুঞ্জগুলোতে বাস করবে। (বাকী, 1998)

2.6.1. স্থিতিকলা অনুসারে (period)

কোনো বসতিই চূড়ান্ত অর্থে স্থিতিশীল নয়। বসতির ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বিচার করলে দেখা যাবে যে, বসতির স্থিতিশীলতা ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর্থ-সামাজিক উন্নতি বসতির স্থিতিশীলতা আনতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। সুতরাং বলতি শ্রেণীবিভাগে যে কোনো প্রচেষ্টায স্থিতিকলা একটি উল্লেখযোগ্য ভিত্তি হিসেবে প্রয়োগ করা যেতে পারে। স্থায়িত্বের মাপকাঠিতে বসতিকে প্রধানত ক্ষণ-স্থায়ী, অস্থায়ী এবং স্থায়ী—এই তিন শ্রেণীতে বিভাজিত করা হয়। স্থায়ীত্বের ভিত্তিতে শ্রেণীবিভাজিত এই তিন ধরনের বসতির বিস্তারিত আলোচনা পূর্ববর্ত অনুচ্ছেদে বসতির প্রাথমিক রূপায়ন এবং ক্রমবিকাশ শিরোনামে তুলে ধরা হয়েছে। এখান সংক্ষেপে কিছুটা আলোচনা করা হলো। কোনো কোনো বসতি বছরের একটা বিশেষ সময় ধরে ব্যবহৃত হয় এবং অন্য সময় পরিত্যক্ত থাকে। এধরনের বসতিকে অস্থায়ী বসতি বলে। প্রাচীন যুগে ক্ষণ-স্থায়ী বসতির প্রাধান্য ছিলো। এই বসতিতে যারা বাস করে তাদের মধ্যে শিকারি জনগোষ্ঠী অন্যতম। এরা প্রতি বছৰ ঋতু পরিবর্তনের সাথে আবাসস্থল পরিবর্তন করে। আজকের এই দিনেও কিছু কিছু অস্থায়ী বসতি দেখা যায়। যেমন ; মেরু অঞ্চলের এস্কিমোরা এবং মরু অঞ্চলের বেদুঈন যাযাবর সম্প্রদায়।

অন্যদিকে স্থায়ী বসতি সাধারণত বহু দিন যাবত বসবাস থেকে সৃষ্ট। বর্তমানে পৃথিবীর বেশির ভাগ বসতি স্থায়ী। স্থায়ী বসতির অধিবাসীরা নানাবিধ পেশায় নিয়োজিত থাকে।

2.6.2 বাস্তুস্থান অনুসারে (Site)

বাস্তুস্থানের আলোকে বসতিকে শ্রেণী বিভাজিত করা যেতে পারে। অর্থাৎ বসতি ব্যাখায় বাস্তুস্থান একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। বাস্তুস্থান হলো কোনো বসতির পারিপার্শ্বিক প্রাকৃতিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক সুবিধাকে প্রতিফলিত করে বসতি সামগ্রিক বৈশিষ্ট্য বিকাশ লাভ করে থাকে। যেমন, জলাশয়কে ঘিরে বসতি গড়ে উঠেছে। সমুদ্র বা নদীর উপকূলীয় বসতি, হ্রদ ভিত্তিক বসতি ইত্যাদি। পানিকে যাতায়াতের মাধ্যম ও সম্পদের আধার হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ক্ষেত্রবিশেষে উপকূলীয় বসতি একই সঙ্গে কৃষি ও মৎস সম্পদ আহরণে বৈচিত্র্যময় হয়েছে। অন্যদিকে হ্রদ বসতি স্বাস্থ্য নিবাস হিসেবে সুপরিচিত হয়।

একইভাবে পাহাড়ি এলাকার বসতি বিভিন্ন উচ্চতায় অবস্থিত হয়ে বিশিষ্ট রূপ নেয়। পাহাড়ি বসতিতে পশুখামার ও কৃষি উভয়ই দেখা যায়। পাহাড়ের শীর্ষে, মাঝা-মাঝি উচ্চতা এবং পাহাড়ের পাদদেশস্থ বসতি। এধরনের বসতি অরণ্য সম্পদের ব্যবহারকারী বসতি। এই একই ধারায় প্লাবন সমভূমিতে অবস্থিত বসতি। এই বসতি প্রধানত কৃষি ভিত্তিক। সুতরাং বসতির শ্রেণীবিভাজনে বাস্তুস্থান বিশ্লেষণে একটি চমৎকার ভিত্তি হিসেবে নেয়া যেতে পারে (বাকী, 1998)

2.6.3 আকৃতি অনুসারে (Shape)

বিবিধ প্রাকৃতিক ও সামাজিক শক্তির মিথস্ক্রিয়ার পলে বলতি গড়ে ওঠে। এসব শক্তি কখনো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে গড়ে তোলে। এই গড়নের ফলে বসতিসমূহ বিভিন্ন রূপ নিয়ে একটি আকৃতিতে পরিণত হয়। তবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে যে সব বসতি গড়ে ওঠে সেগুলোর বেলায় তেমন কোনো রূপ শনাক্ত করা সম্ভব হয় না। কিন্তু পুঞ্জিভূত বা সন্নিবিষ্ট বসতিসমূহ প্রায়শই বিভিন্ন রূপ ধারণ করে। যখন অনেকগুলো বসতি পরস্পর খুব কাছাকাছি অবস্থিত হয়, তখন তা পুঞ্জিভূত বসতি বলে চিহ্নিত করা হয়। এই পুঞ্জিভূত বসতির সম্মিলিত রূপ নানা ধরনের হয়ে থাকে। যেমন, অণুকেন্দ্রিক বসতি ; যখন বসতিসমূহ কোনো একটি বিশেষসুবিধা বা প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। আরেকটি রূপ হচ্ছে সারিবদ্ধ, যখন বসতিসমূহ পাশাপাশি অবস্থিত হয়ে নিবিড় রেখার রূপ নেয়, তখন একে সারিবদ্ধ বসতি বলে। সাধারণত নদীর ধারে বা রাস্তার পাশে এধরনের সারিবদ্ধ বসতি দেখতে পাওয়া যায়। সারিবদ্ধ বসতি সরল রেখার মতো বা কখনো কখনো অর্ধচন্দ্রাকৃতি হতে পারে। একাধিক রাস্তার সঙ্গমস্থলে যেমন ইংরেজি বর্ণ 'T' আকৃতির বসতি হতে পারে। এ আকৃতি কখনো কখনো 'X' বা 'Y'-এর মতো হতে পারে, এক অর্থে আকৃতির তেমন কোনো ধরাবাধা নিয়ম নেই। এই বইয়ের পরবর্তী অংশে বিভিন্ন আকৃতির বাংলা নামকরণ ও বর্ণনা দেয়া হয়েছে। সাধারণ দৃষ্টিতে বসতির আকৃতির কোনো গুরুত্ব নেই। কিন্তু পরিকল্পনাতে এক যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। কোনো বসতিতে আর্থ-সামাজিক সুবিধাগুলি পরিকল্পিতভাবে বিন্যাসকরণের ক্ষেত্রে বসতির আকৃতি একটি নিয়ামক (factor) হিসেবে কাজ করে। এরূপ ক্ষেত্রে সবচেয়ে আদর্শ আকৃতি হলো গোলাকার, বর্গাকার ইত্যাদি জ্যামিতিক আকৃতিগুলো। সুতরাং পরিকল্পনা মাফিক বসতি সাজাতে গেলে এর আকৃতি জানা দরকার, আর সে জন্যই আকৃতি অনুযায়ী বসতির শ্রেণী বিভাজন জানা দরকার। অর্থাৎ আকৃতি বসতি শ্রেণীবিভাজনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হতে পারে।

2.6.4 পারিসপারিক বিন্যাস অনুসারে (Pattern)

বসতি বিন্যাসের আন্তর্জাতিক ভূগোল ইউনিয়ন দুটি ভাগে ভাগ করেছে ; সংঘবদ্ধ ও বিক্ষিপ্ত। কিন্তু স্থান ভেদে সংঘবদ্ধ বসতিকে আরো তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। একইভাবে বিক্ষিপ্ত বসতিকে স্থান বিশেষে

বিচ্ছিন্ন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। অর্থাৎ একটি পরিসরে বসতির আনুভূমিক বিস্তৃতি ও বিন্যাসকে এই বিভজানের ভিত্তি বলা যেতে পারে।

2.6.5 পেশা অনুসারে (Occupation)

একটি বসতির অধিকাংশ লোকজন কোন ধরনের পেশায় নিয়োজিত, এর ভিত্তিতে বসতিকে বিভাজিত করা যেতে পারে। এমন অনেক গ্রামীণ বসতি আছে যেখান প্রায় সবাই একই রকম পেশায় নিয়োজিত। তেমন বসতিকে সমধর্মী (homogeneous) বসতি বলে। যেমন ঃ বাংলাদেশের কুমার-পল্লি, তাঁতি-পল্লি, জেলে-গ্রাম ইত্যাদি। তবে এধরনের বসতিতে খুব অল্প সংখ্যক হলেও অন্যধরনের পেশায় নিয়োজিত আছে এমন লোকও দেখা যায়। কুমার, তাঁতি বা জেলে গ্রামের লোকদের বিভিন্ন সেবা যেমন দৈনন্দিন চাহিদা মেটানোর জন্য দোকান, প্রশাসনিক দায়িত্বের লোকজন থাকতে পারে। এধরনের কিছু লোক বাদ দিলে ওই বসতিগুলো সম্পূর্ণরূপে কুমার-পল্লি, তাঁতি-পল্লি বা জেলে-গ্রাম। অর্থনৈতিক কাঠামো মতে এধরনের বসতি সমধর্মী শিল্প বসতি। তবে আজকের এই দিনে বসতির এই চরিত্র আর নেই বললেই চলে।

আবার যে সব বসতির লোকজন বিভিন্ন ধরনের পেশায় নিয়োজিত সে রকম বসতিকে বহুধর্মী (heterogeneous) বসতি বলে। এধরনের বসতির উদাহরণের অভাব নেই। নগর বসতির শ্রেণীবিভাজনের ক্ষেত্রে পেশা একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি। এভাবে শিল্প, বন্দর শহর, পর্যটন শহর ইত্যাদি ভাগে শহরে বসতিতে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। আর্থনীতিক পরিকল্পনার ক্ষেত্রে যে কোনো বসতির শ্রেণীবিভাগের ক্ষেত্রে পেশা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হিসেবে প্রয়োগ করা যেতে পারে। কারণ একটা জেলে গ্রামে উন্নয়নের জদন্য কৃষি ওপর জোর দিলে, সেই পরিকল্পনা নিঃসন্দেহে কার্যকর হবে না।

2.6.6 জনসংখ্যার আকার অনুসারে (population)

জনসংখ্যার ভিত্তিতেও গ্রামীণ বসতিকে বিভাজিত করা যেতে পারে। যেমন ; এক পরিবার বিশিষ্ট খামার বাড়ি, যা প্রায় বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিত হয়ে থাকে। এধরনের বসতিতে একটি পরিবারের সকল সদস্য ও অন্যান্যসহ প্রায় 10 জন লোক বাস করে থাকে মাত্র। তেমনি গোটা দেশকে পরিবার সম্বলিত বসতিকে গ্রাম বা পাড়া হিসেবে পরিচিতি। এরূপ বসতিতে সাধারণত 150 জন লোকের বেশি বাস করে না। ছোট-খাট দু'একটি দোকান থাকলেও থাকতে পারে। এই বসতিতে পাড়া অনুভূতি অত্যন্ত প্রগাঢ়।

সারণী 2.1 ঃ জনসংখ্যার ভিত্তিতে বসতির এককসমহ্

বসতি		**জনসংখ্যা**
খামার বাড়ি	—	1–15
পল্লি / পাড়া	—	16–150
ক্ষুদ্রগ্রাম	—	151–500
বড় গ্রাম	—	501–1000
ছোট শহর	—	1001–1500
শহর	—	1501–1,00,000
নগর	—	1,00,001–5,00,000

জনসংখ্যার ভিত্তিতে গ্রাম ও পাড়ার পরই আসে গ্রাম। গ্রাম নির্ধারিত হয় 151 থেকে 1000 জনেরলোকের বসতিকে ঘিরে। তবে 151 থেকে 500 লোকের আবাসস্থলকে ক্ষুদ্রগ্রাম এবং 501 থেকে 1000 লোকের বসতিকে বড় গ্রাম বলে। ক্ষুদ্রগ্রামে পাড়া অপেক্ষা বেশি, কিন্তু বড় গ্রাম অপেক্ষা কম ধরনের সুবিধা থাকে। অনেক সময় বড় গ্রামের জনসংখ্যা এক হাজারেও বেশি হতে দেখা গেছে। যে সব ক্ষেত্রে গ্রামের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য অনেক সমৃদ্ধশালী হয়ে থাকে। গ্রামের চেয়ে বেশি লোক সংখ্যা নিয়ে যে বসতি গড়ে ওঠে তাকে ছোট শহর, শহর বলে। এধরনের বসতিকে আর গ্রামীণ সংস্কৃতিতে ফেলা যায় না। ধারাক্রমে, এরপর আসে নগরী, মহানগরী ইত্যাদি।

জনসংখ্যার ভিত্তিতে বসতির শ্রেণিবিভাজন করা হলেও একটি অঞ্চলেও বসতির সঠিক চরিত্র সম্পর্কে খুব একটা ভালো ধারণা দিতে পারে না। তাছাড়া জনসংখ্যার যে আকার তুলে ধরা হয়েছে তাও পৃথিবীর সব দেশে সমানভাবে অনুসরণ করা হয় না।

2.7 বসতির আকৃতি ও পারিসরিক বিন্যাস

বসতির আঙ্গিক গঠন ঃ

দুটি ভিন্ন গ্রিক শব্দ থেকে মরফোলজি (morphology) শব্দটি উৎপত্তি হয়েছে। মরফস্ (morphos) শব্দের অর্থ হলো অঙ্গ-সংস্থান বা আঙ্গিক এবং লোকস্ (locos) শব্দটি অর্থ হলো জ্ঞান। এই দুটি শব্দের সমন্বয়ে সৃষ্ট মরফোলজি শব্দটি বসতির গঠন বৈশিষ্ট্যকে ইঙ্গিত করে। বসতি ভূগোল মরফোলজি বলতে, সাধারণভাবে বসতির গঠন ও অভ্যন্তরীণ কাঠামোর পঠনকেই বোঝায়। বসতি গড়ে ওঠার পেছনে বিভিন্ন নিয়মাক কাজ করে এবং এগুলোর প্রভাবের মাত্রার ভিন্নতার জন্যই বসতির বৈশিষ্ট্যে ভিন্নতা আসে। বসতির ভৌগোলিক নিয়ামকগুলো অভ্যন্তরীণ বিভিন্নতাকে কাঠামোগত অনুশীলন করাকেই বসতির আঙ্গিক গঠন

বিশ্লেষণ বা Morphology of Settlement বলে। বসতির আঙ্গিক গঠনকে পাঁচটি ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে করা যায় এবং এগুলো পরস্পর সম্পর্কযুক্ত।

(ক) আন্তঃবাড়ি দূরত্ব (spacing)

(খ) বিন্যাসের ঘনত্ব (density)

(গ) বিন্যাসের বনুট (texture)

(ঘ) বিন্যাসের ধরন (pattern)

(ঙ) বিন্যাসের গঠন (form)

আন্তঃবাড়ি দূরত্ব (spacing)

এখানে আন্তঃবাড়ি দূরত্ব বলতে একাধিক ঘর-বাড়ির পারস্পরিক দূরত্বকে বোঝানো হচ্ছে। বসতির গঠন বিন্যাস অনুসারে ঘর-বাড়িগুলো একটি অপরটির থেকে কতো দূরে অবস্থিত তা জানা প্রয়োজন। উল্লেখ্য যে, পারস্পরিক দূরত্ব ওই বসতির সামাজিক ও আর্থনীতিক নির্ভরশীলতাকে ইঙ্গিত দেয়। এই দূরত্ব কতগুলো বৈশিষ্ট্যের ওপর নির্ভর করে। যেমন ঃ বাস্তু-স্থান বৈশিষ্ট্য, জনসংখ্যার ঘনত্ব, বসতির প্রকৃতি, যোগাযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদির ওপর। ভূমির প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের জন্য বাস্তু-স্থানের মধ্যে পারিসরিক দূরত্ব যেমন নিয়ন্ত্রণ করে, তেমন কৃষি ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে। ফলে, তা সরাসরি জনসংখ্যার বিন্যাসের প্রভাব ফেলে। জনসংখ্যার এই তারতম্য যোগাযোগের নিবিড়তাকেও প্রভাবিত করে। সমগ্রভাবে এসব বৈশিষ্ট্য একটি বসতির চরিত্র নির্মাণ করে।

2.7.1 বিন্যাসের ঘনত্ব (density)

একটি বসতির পারিসরিক ব্যাপ্তি ওই বসতির অনেকগুলো বৈশিষ্ট্যকে ইঙ্গিত দিতে পারে। এই ব্যাপ্তিকে আরো বিশেষত্ব দিয়ে জানতে হলে ঘনত্ব গঠন আবশ্যক। ঘনত্ব বলতে সাধারণভাবে বসতির পারিসরিক আয়তনকে ওই বসতির বাড়ির সংখ্যা দিয়ে বিভক্ত করলেই যে ফল পাওয়া যায় তাকে বিন্যাসের ঘনত্ব বলে। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন আছে। একটি বসতির আন্তঃবাড়ি দূরত্ব প্রকৃত দূরত্বকে চিহ্নিত করে। কিন্তু ঘনত্ব এই বসতির আন্তঃবাড়ি দূরত্বের গাণিতিক ব্যাখ্যা তুলে ধরে। বসতি ভূগোলের অনেক বিশ্লেষণে বসতির বিন্যাসের প্রকৃত দূরত্ব ও গাণিতিক দূরত্বের সমন্বয়ে বিশ্লেষণ করা হয়। বসতির ঘনত্ব আবার এই বসতির ঘর-বাড়ির বিন্যাসের ধারা ও বুনটের ওপর অনেকাংশে নির্ভর করে। (বাকী, 1998)

2.7.2 বসতির বুনট (texture)

বসতির বুনট বলতে সাধারণভাবে ঘর-বাড়ির গাঠনিক বিশ্লেষণকে বোঝায়। অন্যভাবে বললে এরকম দাঁড়ায়—একটি বাড়ির এর পার্শ্ববর্তী বাড়ি থেকে কতটা দূরে অবস্থিত এবং একইভাবে ওই বাড়িগুলো একটি অপরটির থেকে কত বড় বা ছোট। এসব কিছুর সমন্বিত গঠনকেই বসতির বুনট বলে। বসতির বুনটের বিভিন্নতার সাধারণত ঘনসন্নিবিষ্ট বসতিতেই দেখা যায়। যে সব অঞ্চলে বসতি বিক্ষিপ্ত বা বিচ্ছিন্ন সেখানে বসতি বুনট প্রসঙ্গ খুব একটা প্রাধান্য পায় না।

2.7.3 বিন্যাসের ধরন (pattern)

ইতিপূর্বে ঘর-বাড়ির দূরত্ব ও ঘনত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে। একটি বসতির উপরোল্লিখিত বৈশিষ্ট্যের যুগ্ম আলোচনায় বিন্যাস ধরন অনুশীলনী সম্ভব। আন্তর্জাতিক ভূগোল ইউনিয়ন বিন্যাসের ধরনকে প্রধানত দুটি ভাগে করেছে, সংঘবদ্ধ ও বিক্ষিপ্ত। তবে এগুলোর কিছু কিছু গণগত বৈশিষ্ট্যের জন্য আরো বিভাজিত করা যেতে পারে।

2.8 প্রশ্নাবলী

রচনাভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

1. বসতি ভূগোলের বিষয়বস্তু সম্পর্কে আলোচনা কর।
2. পৌর ভূগোলের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে আলোচনা কর।
3. গ্রামীণ বসতি ভূগোল বলতে কি বোঝায়? এর বিভিন্ন দিক দিয়ে আলোচনা কর।
4. বসতির বিবর্তনের বিভিন্ন ধাপ নিয়ে আলোচনা কর।
5. বসতির আকৃতি ও পারিবারিক বিন্যাস বলতে কি বোঝায়?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

1. বসতির আলোচনায় কোন কোন বিষয় প্রাধান্য পায়।
2. বসতির বিবর্তন বলতে কি বোঝায়?
3. স্থিতিকাল অনুসারে বসতিকে ক'ভাগে ভাগ করা যায় ও কি কি?
4. বাস্তুস্থান অনুসারে বসতির বিভাজন বলতে কি বোঝায়?

5. পারিবারিক বিন্যাস অনুসারে বসতির ভাগগুলি কি কি?
6. গ্রামীণ বসতিতে কি কি পেশা দেখা যায়।
7. জনসংখ্যা অনুযায়ী বসতিকে কয়ভাগে ভাগ করা যায়? ভাগগুলির নাম কর।
8. বসতির আঙ্গিক গঠন বলতে কি বোঝায়?
9. বসতির 'ঘনত্ব' বলতে কি বোঝায়?
10. বসতির 'বুনট' কথাটির ব্যাখ্যা কর।

2.9 উত্তর

পাঠ্যাংশ থেকে উত্তর সংগ্রহ কর।

একক 3 ❑ গ্রামীণ বসতি

গঠন ঃ

3.1 প্রস্তাবনা

3.2 গ্রামীণ বসতির সংজ্ঞা

3.3 সেন্সাস গ্রাম

3.4 বসতির শ্রেণীবিভাগ A. কর্মধারা ও সামাজিক প্রেক্ষাপটের ভিত্তিতে

  3.4.1A গ্রমীণ বসতি ও পৌর বসতির পার্থক্য

  3.4.1B স্থায়িত্বের ভিত্তিতে শ্রেণীবিভাগ

  3.4.1C আয়তনের ভিত্তিতে বসতির শ্রেণীবিভাগ

  3.4.2 অতীতের সাক্ষ্য হিসেবে বসতি

3.5 গ্রামীণ বসতি

  3.5.1 গ্রামীণ বসতির প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক পেক্ষাপট

3.6 গ্রামীণ বসতির প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট

  3.6.1 গ্রামীণ বসতির আয়তন

  3.6.2 গ্রামীণ বসতির আয়তন

  3.6.3 গ্রাম্য বসতির প্রকারভেদ

3.7 গ্রামীণ বসতির বিবর্তন

  3.7.1 গ্রামীণ বসতির বিবর্তন ঃ দুটি উদাহরণ

3.8 গ্রামীণ বসতবাড়ি

  3.8.1 গ্রামীণ বসতবাড়ি নির্মাণে পরিবেশের ছাপ

3.9 ভারতের গ্রামীণ বসতবাড়ির আকার ও তার শ্রেণীবিভাগ

3.10 বিভিন্ন রাজ্যের গ্রামীণ ঘরবাড়ির ধরণ

3.11 পৃথিবীর বিভিন্ন জলবায়ু অঞ্চলের গ্রামীণ বাড়ি ও তার নির্মাণ উপকরণ

3.12 প্রশ্নাবলী

3.13 উত্তর

3.1 প্রস্তাবনা

গ্রামাঞ্চলে কোন সম্পদ সংগ্রহের উপকরণকে কেন্দ্র করে যে প্রাথমিক জীবিকাদি গড়ে ওঠে তার ওপর নির্ভরশীল মানুষ ছড়ানো-ছিটোনোভাবে বা একত্রে বসতি গড়ে তোলে। এগুলো গ্রামীণ বলতি। এই গ্রামীণ বসতি একটি পাড়াকে কেন্দ্র করে নামাঙ্কিত (name) আবার অনেকগুলো পাড়া নিয়ে একটি নামের (Village name) হতে পারে। ভারতীয় জনগণনা দপ্তর গ্রামের বদলে (mouza) মৌজা কথাটি ব্যবহার করে থাকে। মৌজার নাম একটি পাড়াকে কেন্দ্র করে নাম পায় বা বহু পাড়ার সমাবেশে মৌজার নাম হতে পারে।

এখন মনে রাখতে হবে বসতি সব জায়গায় গড়ে ওঠে না। কিছু অনুকূল পরিবেশ বসতি বিস্তারে সাহায্য করে। কোন বসতি বড় হবে কি ছোট হবে তাও নির্ভর করেঅনুকূল পরিবেশের ওপর। এজন্য পাহাড়ী পরিবেশে কিংবা মরুভূমির রুক্ষ পরিবেশে বসতির বিস্তার বাধাপ্রাপ্ত হয়। আয়তনের ওপর নির্ভর করে কোন বসতিকে আমরা ক্ষুদ্রায়তন বসতি, কাউকে মাঝারি আয়তন বসতি, আবার কোন বসতিকে বৃহদায়তন বসতি বলে থাকি। মনে রাখতে হবে গ্রামীণ বসতি বিন্যাসে মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক ধরা পড়ে। তাই কোনটি মাছের কাঁটার মতো, আবার কোনটি L আকৃতির হয়। এ সর্বতো গ্রামের বাহ্যিক আকৃতি। কিন্তু বাহ্যিক আকৃতি শুধুমাত্র বসতির আকৃতি দিয়েই বিচার হবে না। এর মধ্যে আরও রয়েছে বাড়ীঘরদোয়ার মালমশলা, নকশা, রাস্তাঘাটের বিন্যাস ইত্যাদি। কোন স্থানের বাড়ীঘর কি দিয়ে তৈরী হবে তা মূলত নির্ভর করবে ঐ অঞ্চলের প্রাপ্য বস্তুর ওপর। এতেও আমরা প্রকৃতির দরাজ হাতের ছোঁয়া পাই। তাই বলছিলাম গ্রামীণ বসতির সাথে প্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে। এখন আমরা গ্রামীণ বসতির বিভিন্নর দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব।

3.2 গ্রামীণ বসতির সংজ্ঞা (Definition of Rural Settlement)

গ্রামীণ বসতির প্রকৃত সংজ্ঞা নির্ণয় করা খুব জটিল। কেননা, এক এক দেশে এক এক নিয়মানুসারে এর সংজ্ঞা নির্ধারিত হয়েছে। সাধারণত যে সব অঞ্চলের অধিবাসীরা তাদের জীবিকা নির্ধারণের জন্য মাটি তথা কৃষিকাজের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল, যে অঞ্চলের বসতিকে গ্রামীণ বসতি বা Rural Settlement বলে।

গ্রামীণ বসতির কার্যাবলী প্রাথমিকভাবে উৎপাদন নির্ভর। কৃষিকাজ মুখ্য উৎপাদনভিত্তিক কাজকর্ম। তবে মাছ ধরা, কাঠ কাটা কোন কোন গ্রামীণ বসতিতে গুরুত্বপূর্ণ। তবে তাঁতের কাপড় তৈরী, কারুশিল্প ও অন্যান্য হস্তজাত দ্রব্য উৎপাদন ও গ্রামবসতিতে হয়ে থাকে। এই সব উপজাবিকার পটভূমিতে গ্রামীণ বসতির বৈশিষ্ট্য বৈচিত্র্যপূর্ণ। In rural settlement, the most basic striking factor can be seen clearly at work।

সাধারণত কাঁচা পথ বা মোরাম বাঁধানো সড়কের একপাশে বা দু'পাশে রৈখিকভাবে অথবা ছড়ানো-ছিটানো অবস্থায় গ্রামীণ বসতি গড়ে ওঠে। পুকুর, কৃষিখেত, খোলা মাঠ, সবুজের প্রাচুর্য গ্রামবসতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

3.3 সেন্সাস গ্রাম (Census Village)

প্রতিবার জনগণনার সময় রাজধানী নগর থেকে গ্রাম অর্থাৎ সর্বনিম্ন স্তর পর্যন্ত সমস্ত প্রশাসনিক ইউনিটের একটা নবতম সংযোজন তালিকা রাখা হয়। এই বিচারে সেখানে গ্রাম হল একটি সর্বনিম্ন প্রশাসনিক ইউনিট, যার পোশাকী নাম হল মৌজা (Mouza)। এদের প্রতিটির একটি নির্দিষ্ট সীমা থাকে। প্রতিটি মৌজার একটি মানচিত্র (Cadastral map) থাকে। 16 ইঞ্চিতে 1 মাইল হিসেবে অঙ্কিত এই মানচিত্রে গ্রামের প্রতিটি জমির টুকরো, বাড়ি, মন্দির, মসজিদ, পথ, পুকুর, ঘাসজমি ইত্যাদি দেখানো থাকে। প্রতিটি মৌজার একটি নিজস্ব ক্রমিক সংখ্যা আছে। একে বলা হয় চৌহদ্দি। তালিকা ক্রমিক (jurisdiction list) এবং এই নির্দিষ্ট সংখ্যা দিয়ে একটি মৌজা থেকে অপর মৌজাকে সহজেই আলাদা ভাবে চেনা যায়। সেন্সাসগ্রাম বা মৌজার আর একটি বৈশিষ্ট্য হল তাতে একটি গ্রাম অবস্থিত হতে পারে, আবার একাধিক গ্রামও অবস্থিত হতে পারে। অনুরূপভাবে একটি গ্রাম পাশাপাশি দুটো আলাদা মৌজাতে অবস্থিত হতে পারে। আরও উল্লেখ করা যেতে পারে অনেক সময় দুটো পাশাপাশি বাড়ি দুটো আলাদা আলাদা রাজস্ব গ্রামে (মৌজা) অবস্থিত হতে পারে। সেন্সাস গ্রাম জনবসতি থাকতে পারে আবার তা জনহীনও হতে পারে। সেন্সাস গ্রাম সম্বন্ধে Roy Burman একটি সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন। তার মতে The census villages are, however, not always residential clusters. They are, as a rule, the lowest revenue units. It is not uncommon for two adjoining houses to belong to two different revenue villages. On the other hand, in a number of cases, one comes across uninhabited villages."

সেন্সাস গ্রাম খুব ছোট হতে পারে, আবার খুব বড় গ্রামও হতে পারে। জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জ থানার কথা ধরা যেতেপারে। এখানে যেমন সন্ন্যাসীকাটার (জে. এল. নং 27) মতন বড় মৌজা (5,671 হেক্টর) বা জঙ্গলমহলের (জে. এল. নং 1) মত বড় গ্রাম (25,306 হেক্টর) রয়েছে, যাদের লোকসংখ্যা যথাক্রমে 18,837 ও 9,821 (1991), আবার আরাজি বেলাকোবার 1 (জে. এল. নং. 11) মত ছোট গ্রাম (82 হেক্টর) রয়েছে, যার জনসংখ্যা মাত্র 199 (1991)। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে লোকগণনা মৌজা ভিত্তিক হয়ে থাকে, গ্রাম ভিত্তিক নয়।

কোন মৌজায় বসতি গড়ে উঠবে কিনা তা নির্ভর করে পারিপার্শ্বিক অবস্থার ওপর। বর্তমান লেখক এক সমীক্ষায় দেখেছেন যে সাধারণতঃ চর এলাকা, কৃষিভূমি ও জেলা জায়গায় (বিল, জলকর ইত্যাদি নামযুক্ত মৌজায়) বসতি গড়ে ওঠে না (Sen and Sen. 1991)।

3.4 বসতির শ্রেণীবিভাগ (Classification of settlements)

A. কর্মধারা ও সামাজিক প্রেক্ষাপটের ভিত্তিতে (On the basis of functions and social background) ঃ

উপরোক্ত বিশ্লেষণের ভিত্তিতে বসতিকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়—যথা গ্রামীণ বলতি ও পৌর বসতি বা শহর বসতি। প্রথমটি কৃষিকার্যের ওপর নির্ভরশীল, দ্বিতীয়টি প্রাথমিক দ্রব্যগুলোকে কল-কারখানায় পণ্যে পরিণত করে সেগুলোকে পরিবহণ ব্যবস্থার মাধ্যমে ক্রয়বিক্রয় মারফৎ অর্থোপার্জনের ওপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে। বারতীয় প্রেক্ষাপটে Mondal গ্রামীণ বলতির যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর মতে গ্রামীণ এলাকায় বাড়ি ওরাজপথসমূহের স্তানক পার্থক্য হল গ্রাম বসতি। এখানে সমাজদ ও মানুষের প্রয়োজনে সামাজিক যোগাযোগ ও সাংস্কৃতিক বন্ধন শক্তিশালী হয় (Rural settlement is the spatial differentiation of the grouping of house and highways in rural areas where social cohesion and cultural ties are strengthened according to the needs of the socieity and mankind.

3.4.1 গ্রামীণ বসতি ও পৌর বসতির পার্থক্য (Differences between rural and urban settlement) ঃ

গ্রামীণ বসতি ও শহর বসতির প্রেক্ষাপটেই কয়েকটি মৌলিক পার্থক্য খুব সহজেই ধরা যায় ঃ—

গ্রামীণ বসতি বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত আবার গোষ্ঠীবদ্ধও হতে পারে। এর কারণ হল গ্রামে প্রচুর জমি থাকে। স্বভাবতই গ্রামবাসীরা খোলামেলা জায়গায় বাড়ি তৈরি করতে পারেন। শহরে জমির অত্যধিক মূল্য এবং অভাব হেতু পৌরবাসীরা খুব সামান্য দূরত্ব রেখেই বাড়ি তৈরি করেন। অনেক সময় গায়ে গায়েও বাড়ি তৈরি করা হয়। ফলে এখানে ঘিঞ্জি, এমনিক অস্বাস্থ্যকর বসতি গড়ে ওঠে। তাই এখানকার বসতিগুলো সংঘবদ্ধ রূপ পায়।

আর এর অবশ্যম্ভাবী ফল হল বস্তির সৃষ্টি। কারণ বড় বড় শহরে কাজের সুবিধে থাকে অনেক বেশি। তাই রোজগারের আশার গ্রামাঞ্চল থেকে কপর্দকহীন মানুষ শহরে এসে ভীড় জমায়। শহরের মধ্যে জমি কেনার ক্ষমতা থাকে না বলে এরা যত্রতত্র ঝুপ্ড়ি বানিয়ে বাস করে আলো বাতাসহীন এবং নগরজীবনের বহুবিধ সুযোগসুবিধাহীন এইসব বস্তিতে তারা দিনের পর দিন কাটিয়ে দেয়। গ্রামাঞ্চলে এই ধরনের বস্তির সন্ধান পাওয়া যায় না। তবে অনেক ক্ষেত্রে বড় বড় গ্রামে 'টোলা' বা 'টুলী' দেখা যায়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এগুলোতে অস্পৃশ্য জাতির লোকেরা বাস করে। এদের আবাসস্থল অনেক সময়েই নিম্নমানের হয়। গ্রামে বস্তির অস্তিত্ব না থাকলেও অনেক সময় দেখা যায় খুব গরীব শ্রেণীর লোকেরা একচালা ঘরে কোনরকমে দিনাতিপাত করছে।

ঘর বাড়ির কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য, নির্মাণ উপকরণ, বাড়ির নক্‌শা ইত্যাদির বিচারে গ্রামীণ বসতিকে শহর বসতি থেকে সহজেই চিনে নেওয়া যায়। শহরের ইঁট-কাঠের জঙ্গল থেকে গ্রামের মাটির/কাঠের/পাথরের বাড়িকে সহজেই আলাদা করা যায়। কৃষি প্রধান গ্রামে গোলবাড়ি, গোয়ালবাড়ি, ঘরের ভেতরে উঠোন এ সবই এক অতি পরিচিত দৃশ্য। গ্রামে উঠোনের চারপাশ ঘিরে শোবার ঘর, রান্নার ঘর, গোয়ালঘর তৈরি করা হয়। উঠোনে গৃহস্থেরা ধান সেদ্ধ করা, ধান ভাঙা ছাড়াও গৃহস্থালীর নানান কাজ করে থাকে। গ্রামে শোবার ঘর, রান্নাঘর, গোয়ালঘর যেমন আলাদা আলাদাভাবে গড়ে ওঠে শহরে তা হয় না। এখানে এক ছাদের নীচে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্লাট বা বাসগৃহ তৈরি হয়।

গ্রাম্য বসতিতে পথঘাটের প্রাধান্য থাকে খুব কম। কারণ গ্রাম প্রধানত খাদ্য উৎপাদক অঞ্চল। কিন্তু শহর হল একটি বাজার এলাকা, যা গ্রামবাসী ও শহরবাসী উভয়ই ব্যবহার করে। পলে এখানে পথঘাটের প্রধান্য থাকে বেশি, কারণ পথঘাটই হল পণ্য আদান-প্রদানেব মাধ্যমে।

কৃষিকাজের বিভিন্ন অবস্থায় অর্থাৎ বীজ তোলা, ফসল কাটা ও গোলাজাত করা ইত্যাদি ব্যপারগুলোতে পরস্পরের সহযোগিতার প্রয়োজন হয় বলে গ্রামবাসীদের মধ্যে একটা সহজ ও সরল আন্তরিকতা দেখা যায়। কিন্তু শহরবাসীদের পরস্পরের মধ্যে মেলামেশার সুযোগ থাকে কম কারণ সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত তারা নিজেদের নানান কাজে ব্যস্ত রাখে।

গ্রাম্য বসতি প্রাথমিক উৎপাদন অর্থাৎ কৃষির ওপর নির্ভরশীল, কিন্তু পৌর বসতি কৃষি, খনি ও বনভূমি থেকে উৎপন্ন প্রাথমিক দ্রব্যগুলোকে কলকারখানায় শিল্পজাত করে পরিবহন ব্যবস্থার মাধ্যমে সেগুলো ক্রয়বিক্রয় করে অর্থাগমের ওপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে। এছাড়া শহরগুলোতে রাজনৈতিক, শিক্ষা, সাং স্কৃতিক, সামাজিক, ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপ বা বৃত্তিগুলো বিকাশলাভ করে এবং শহরগুলোকে তাদের গরিষ্ঠ বৃত্তি অনুযায়ী আখ্যায়িত করা যায়। যেমন শিল্পশহর (দুর্গাপুর, জামশেদপুর), অবসর বিনোদন শহর (দার্জিলিং, নৈনিতাল), বন্দর শহর (মূর্মাগাঁও)। অনুরূপভাবে কিছু কিছু গ্রাম্য বসতি আছে, যেগুলো কৃষি ছাড়াও অন্যান্য প্রাথমিক উৎপাদনের ওপর নির্ভরশীল। বৃত্তির প্রাধান্যনুসারে এই বসতিগুলোকে মৎস্যগ্রাম (শঙ্করপুর), কাষ্ঠভিত্তিক গ্রাম (যেমন নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে কাষ্ঠকর্তনকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা অসংখ্য গ্রাম) বা উত্তরবঙ্গের অরণে গড়ে ওঠা বন গ্রাম বা Forest village (পারো বস্তি) বলা যায়।

3.4.1B স্থায়ীত্বের ভিত্তিতে বসতির শ্রেণীবিভাগ (Classification of settlements of the basis of permanancy) ঃ

জন্মাবার পরেই মানুষের যা যা প্রয়োজন তার মধ্যে আশ্রয় ও খাদ্য প্রধান। রোদ, বৃষ্টি, ঝড়ের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য, নিরাপত্তার জন্য আর বিশ্রামের জন্য প্রয়োজন হয় আশ্রয়ের, তা সে কুঁড়েঘরই হোক আর অট্টালিকাই হোক। আদিম অরণ্যবাসী মানুষের বাস ছিল গুহায়। তাদের খাদ্য ছিল বনের ফলমূল

ও পশুর মাংস। তারপর ধীরে ধীরে শুরু হল চাষবাস। বুনো জন্তু জানোয়ারদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়াব জন্য তৈরি হল মাটি ও পাথর দিয়ে ঘর। চাষবাসের প্রয়োজনে গড়ে উঠল সঙঘবদ্ধ ও স্থায়ী বসতি। তবুও আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে বিশেষ বিশেষ প্রাকৃতিক অবস্থায় অস্থায়ী আস্তানার সন্ধান মেলে যেগুলো বছরের একটা বিশেষ সময়ে ব্যবহার হয়ে থাকে, অন্য সময় পরিত্যক্ত থাকে কিংবা বাড়ির মূল কাঠামো স্থানান্তরিত হয়। স্থায়িত্বের এই ভিত্তিতে বসতিকে দু'ভাগে ভাগ করা যায় ঃ অস্থায়ী বসতি ও স্থায়ী বসতি।

অস্থায়ী বসতি (Temporary settlement) ঃ—

এবার দেখা যাক্ কি কি অবস্থায় অস্থায়ী বসতি গড়ে ওঠে। সম্ভবত মাটির টানই অর্থাৎ কৃষিকর্ম মানুষকে এক জায়গায় স্থায়ীভাবে বাস করতে প্রেরণা জুগিয়েছে। এর অভাব মানুষকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। ফলে তাদের আস্তানার ঠিকানাও অস্থায়ী। এই ধরনের যাযাবর ব্যক্তিরা শিকার করে, প্রকৃতির দেওয়া খাদ্য সংগ্রহ করে থাকে। পশুপালন কিংবা স্থানান্তর কৃষিকাজ (Shifting agriculture) করে গ্রাসাচ্ছাদন করে থাকে। জৈবিক প্রয়োজন অল্প। তাই বুদ্ধি খাটিয়ে, কঠোর পরিশ্রম করে ভালোভাবে ঘর সংসার করার বাসনাও অল্প। সত্যি বলতে কি, আধুনিক বিজ্ঞানের যুগেও এরা এখন আদিম অবস্থাতেই রয়ে গেছে। শিকারীরা বা খাদ্য সংগ্রহকারীরা খাবারের খোঁজে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় ঘুরে বেড়ায়। তাই তারা হয় গুহায়, নয়তো স্থানীয় উপাদানের সাহায্যে তৈরি অস্থায়ী কুঁড়েঘরে বাস করে (চিত্র 1.1.2)। যাযাবররা প্রায় সব সময়েই ছোট পরিধির মধ্যে তাঁবু ফেলে। ফলে সাময়িকভাবে ঘনবসতি গড়ে ওঠে। আরবের 'ডোউয়ার'-রা (Douar) মোঙ্গল বা কিরঘিজদের তাঁবুর মত তাঁবু ফেলে। ইন্দো চীনের মই (Moi) ও পশ্চিম আফ্রিকার 'ফনরা' (Fan) স্থানান্তর চাষী। এরা সংঘবদ্ধ গ্রাম গড়ে তোলে যা ঋতু বিশেষে তারা পাল্টায়। শিকারী, পশুপালক ও স্থানান্তর চাষীদের শক্ত সামাজিক বাঁধন আছে। তবুও সাময়িকভাবে এই বাঁধন আলগা হয়ে যায় ও সেই ভাবে বসতির ধরন পাল্টে যায়। উদাহরণ হিসাবে বলা চলে যে শিকারের স্থানের ওপর নির্ভর করে এস্কিমোরা দুই ঋতুতে তাদের বাসস্থান পাল্টায়।য শীতকালে তারা দলবদ্ধভাবে মোটামুটি পাকাপোক্তভাবে তৈরি 'ইগলুতে' বাস করে। কারণ এই সময় কোন বড় কাজ হয় না। এই সময় কাবার হিসেবে ঘরের কাছেই সীল মাছ পাওয়া যায়। গরমকালে তারা শিরারের খোঁজে চারদিকে ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। প্রতিটি দলই চিরাচরিত পথ ধরে শীতের শুরুতে পুরনো আস্তানায় (ইগলু) ফিরে আসে। এই থেকেই বোঝা যায় এদের সামাজিক বন্ধন কত শক্ত। অবশ্য গরমকালে এদের সমস্ত সামাজিক ও ধর্মীয় বন্ধন আলাগা হয়ে পড়ে। এই রকম ভ্রাম্যমান জীবন উত্তর আমেরিকার রেড ইন্ডিয়ান বা পূর্ব সাইবেরিয়ার কিছু উপজাতিদের মধ্যে চালু ছিল। কিছু কিছু পশুপালকদের মধ্যেও এই ধরনের (শীত ও গ্রীষ্মের) বাসস্থান দেখা যায়। রাশিয়ার মেরু অঞ্চলের বল্‌গা হরিণ পালকরা ও উত্তর স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার ল্যাপরা (Lapp) শীতকালে বনের সীমানায় কুঁড়েঘর বানায়,

কারণ এখানে বল্গা হরিণের খাবার মেলে। এই সময় তারা আংশিক ঢাকা ঘর তৈরি করে। গরমকালে তারা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে তাঁবুতে বাস করে। দূরে যাওয়ার পলে খুব বেশি ঘাস পাওয়া যায়। উন্নত দেশেও পশুদের বাঁচার তাগিদে দেশান্তরে যাতায়াত প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ইউরোপের স্ক্যাণ্ডিনোভিয়া

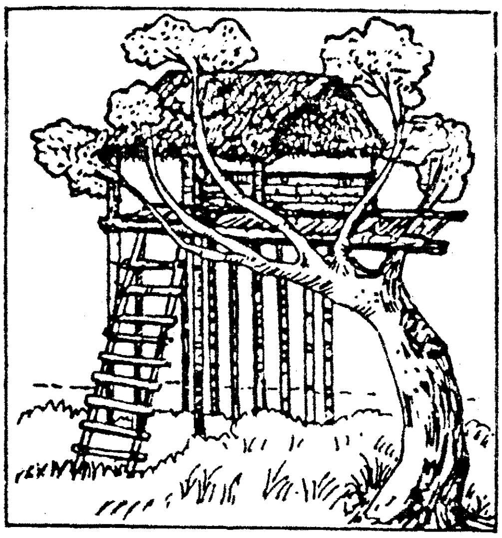

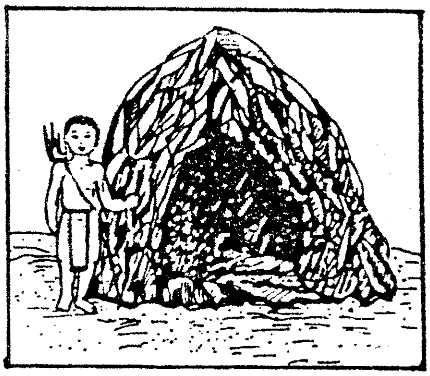

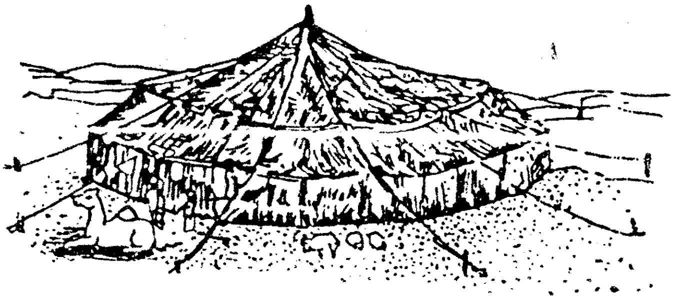

চিত্র 1.1.2 ঃ অস্থায়ী বসতির বিভিন্ন রূপ

ও ভূমধ্যসাগরীয় দেশগুলোর কথাই ধরা যেতে পারে। এখানকার যে সব স্থানে ঋতুভিত্তিক যাযাবর বৃত্তি চালু আছে সেখানে শীত ও গরমের দু'টি স্থায়ী শিবির সবসময়েই লক্ষ্য করা যায়। বহুবিধ কারণের জন্য পার্বত্য অঞ্চলের উপত্যকার বসতিগুলো স্থায়ী ও সংঘবদ্ধ রূপ নেয়। এছাড়া এই বাড়িগুলো সাধারণতঃ আকারে বড় হয়। এগুলোতে আসবাবপত্র থাকে। অন্যদিকে গরমকালের জন্য তৈরি বাড়িগুলো বিক্ষিপ্ত বসতির রূপ নেয়।

প্রাচীনপন্থী কৃষিজীবীদের সবসময়েই নতুন নতুন ভূখণ্ড পরিষ্কার করে চাষবাস করতে হয়, তাই তারা যৌথভাবে ভূমি পরিষ্কার করার জন্য প্রচণ্ড পরিশ্রম করে। গ্রামের কাছের জমির উর্ব্বরতা শক্তি নষ্ট হয়ে গেলে তারা অন্য জায়গায় ডেরা বাঁধে। পশুপালক যাযাবরদের মতন এদেরও সামাজিক বাঁধন আছে। কারণ এরাও খেয়াল খুশীমতো বসতি ছেড়ে যায় না! চক্রাকারে পরিব্রাজনের পর আবার পুরনো জায়গাতেই ফিরে আসে। তার কারণ ঐ অঞ্চলের পরিবেশ সম্পর্কে তাদের পূর্ব অভিজ্ঞতা আছে! ক্রান্তীয় অঞ্চলের আদিবসীদের মধ্যে সাময়িকভাবে জমি পরিষ্কার ও বসতি স্থাপন করার রীতি প্রচলিত আছে। আজকের দিনেও মেঘালয়ের গারো, মালয়ের ডাকুমা কিংবা মই (Moi), ফ্যান (Fan), টুপী (Tupi) ইত্যাদি উপজাতিরা যদি লক্ষ্য করে যে চাষের জন্য সে স্থানের মাটির উর্ব্বরতা কমে গেছে, তখন তারা অন্য জায়গায় গিয়ে বাস করে। কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় যে কোন রকম দুর্ঘটনা ঘটলে, সেই জায়গাটিকে অলক্ষুণে বলে মনে করা হয়। সেক্ষেত্রে তারা সেই জায়গা ছেড়ে চলে যায়।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই স্থানান্তর কৃষিজীবীরা কী সংঘবদ্ধভাবে বাস করে অথবা বিক্ষিপ্তভাবে বাস করে? আমজনের বনভূমিতে তারা পাশাপাশি বাস করে। রিও ব্রানকো (ব্রাজিলের) নদীর ঊর্ধ্ব গতিতে উপজাতিরা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে দু'তিনটি বাড়িতে বাস করে। দক্ষিণ ও মধ্য চিলির মধ্যাঞ্চলে বসবাসকারী আর ডি কার্নোস উপজাতিরা খুব বিক্ষিপ্তভাবে বাস করে। তাদের কুটিরগুলো গাছের ডাল ও ঘাস দিয়ে তৈরি। সুতরাং যখনই তারা কোন স্থান ছেড়ে চলে যায়, তখন কুটিরের কাঠামো তুলে নিয়ে যায়। এখানে তুলনামূলকভাবে অল্প জায়গায় বহু নদনদী থাকায় বিক্ষিপ্ত বসতি গড়ে উঠেছে।

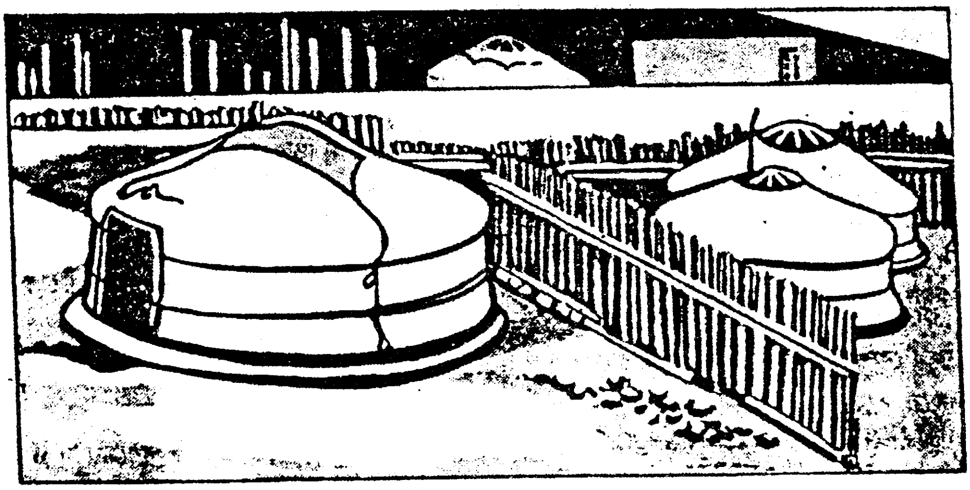

চিত্র 1.1.3 ঃ সুদৃশ্য চামড়ার তৈরি ইয়র্ট তাঁবু

পশুপালক যাযাবরদের বাসস্থান পশু শিকারীদের চেয়ে আরও অনেকটা জায়গা জুড়ে গড়ে ওঠে, কারণ পশুপালকদের সঙ্গে পশু থাকবেই। এই পশুপালের পিঠে তারা কুটিরের মালমশলা, আসবাবপত্র চাপিয়ে গুরে বেড়ায়। মধ্য এশিয়ার কিরাঘজ, কাজাক ইত্যাদি উপজাতিরা উইলো গাছের ছাল ও চামড়া (Felt) দিয়ে তাদের ইয়ার্ট (Yurt) বানায় (চিত্র 1.1.3)। আরব দেশের বেদুইনরা ছাগলের চামড়া দিয়ে তাঁবু বানায়। পূর্ব আফ্রিকার মাসাই-রা ঘাস দিয়ে কুঁড়েঘর বানায়। এই কুঁড়েঘরগুলো গোবর ও মাটি দিয়ে লেপে শক্ত করা হয়। সাইবেরিয়ার তুন্দ্রা অঞ্চলে তুঙ্গারা বল্‌গা হরিণের চামড়া দিয়ে শঙ্কু আকৃতির তাঁবু বানায়।

চিত্র 1.1.4 ঃ ক্রাল বসতি

অন্যদিকে স্থানান্তর কৃষিজীবীরা বাড়ি তৈরির জন্য পশুর চেয়ে উদ্ভিদ জগৎ ও ইঁটের ওপর বেশী নির্ভর করে। আফ্রিকার সাভানা অঞ্চলে বেশির ভাগ কুটির ছোট মৌচাক বা শঙ্কু আকৃতির। দেওয়াল হাল্কা কাঠের তৈরি, তার ওপর মাটি দিয়ে প্রলেপ দেওয়া, ছাদগুলো ঘাসে ছাওয়া। কাছাকাছি অনেকগুলো কুটির মিলে প্রায় বৃত্তাকার ক্রাল তৈরি করা হয়। ক্রালকে ঘিরে লতাপাতা দিয়ে শক্ত দেওয়াল থাকে। এখানে রাত্রিবেলা পশুরপালকে রাখা হয় (চিত্র 1.1.4)

অতএক্ষ আমরা কি ধরনের ভৌগোলিক পরিস্থিতিতে অস্থায়ী বসতি গড়ে ওঠে ও কি কি উপাদানে এখানকার বাসস্থানগুলো তৈরি, তা আলোচনা করলাম। এবার আমরা কি ধরনের পটভূমিতে স্থায়ী বসতি গড়ে ওঠে, তা নিয়ে আলোচনা করব।

স্থায়ী বসতি ঃ—

অতীতের মত বর্তমানেও লক্ষ্য করা গেছে যে অস্থায়ী বসতি স্থায়ী বসতিতে পরিণত হয়েছে। কোন জায়গায় জংসংখ্যা বাড়লে, মাথা পিছু কৃষি জমির পরিমাণ কমে আসে। তার ফলে ছোট জায়গা থেকে বেশি পরিমাণ খাদ্য উৎপাদন করা আবশ্যিক হয়ে পড়ে। ঐ অবস্থায় নিবিড় কৃষি (intensive cultivation) ব্যাপক কৃষির (Extensive cultivation) স্থান দখল করে। আর সেই সঙ্গে কৃষিযোগ্য ভূমি কম হওয়ার দরুন স্থায়ী বসতি গড়ে ওঠে। ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কথা ধরা যাক। এখানকার আদিমন কৃষিনির্ভর উপজাতিদের প্রচুর জমি ছিল, ফলে তারা অনেক দিন ধরে জমি ফেলে রাখতে (Fallow) পারত। সেটা ছিল স্থানান্তর কৃষির যুগ। ফলে জমির উর্বরতা নষ্ট হলে গ্রাম ছেড়ে অন্য জায়গায় গিয়ে ঘর বাঁধা ও নতুন জমি চাষ করা ছিল এক স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু যখন লোকসংখ্যা বাড়ল, তখন চাষের জমি গেল কমে, ফলে গ্রাম ছেড়ে চলে যাওয়ার সুযোগ কমে গেল। আজও কিছু কিছু উপজাতি আছে যারা অসমের অনুন্নত ও জনবিরল অঞ্চলে ঝুম চাষ চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু অন্য জায়গায় স্থায়ী গ্রাম গড়ে উঠেছে।

এশিয়ার মৌসুমী অঞ্চলে ধান চাষ স্থায়ী বসতি গড়তে সাহায্য করছে। ধান চাষ করতে যে জনবলের দরকার হয় বা জটিল কর্মযজ্ঞ এর সাথে জড়িত থাকে, তার জন্য চাষীরা সে জায়গা ছেড়ে যেতে চায় না (চিত্র 1.1.5)। একই ঘটনা সুদূর প্রাচ্যের দেশগুলোতেও লক্ষ্য করা যায়।

চিত্র 1.1.5 ঃ কৃষি অর্থনীতির পরিপ্রেক্ষিতে বসতির অবস্থান

প্রাগৈতিহাসিক যুগে এই ধরনের স্থানান্তর কৃষি ইউরোপ, বিশেষ করে জার্মান ও স্লেভ-অধ্যুষিত অঞ্চলে চালু ছি । পরে জনসংখ্যা বাড়লে একই জমিতে বার বার চাষ করে তা থেকে উৎপাদিত ফসল মানুষ ও পশুর খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হতে আরম্ভ হয়। এভাবে সেখানে স্থায়ী বসতির উৎপত্তি হয়।

স্থানান্তর কৃষি যেমন স্থায়ী কৃষিতে রূপান্তরিত হয়, তেমনি অন্যান্য ঘটনাও যাযাবর বৃত্তিকে স্থায়ী বৃত্তিতে পরিণত করে। তিবেতাসী (Tibetsi)-তে টোডারা বৃত্তিতে ছিল যাযাবর। এদের স্থায়ী বসতি ছিল না। তুয়ারদের (Tuarea) আক্রমণের ফলে তারা তাদের পশুগুলো হারায়। ফলে বাধ্য হয়েই তারা অনুর্বর জমিতেই চাষবাস শুরু করে। তাদের বসতি স্থায়িত্ব পেলে, যদিও তাদের কেউ কেউ কিছু দিন পর্যন্ত তাদের যাযাবর স্বভাব পুষে রেখেছিল।

উপরোক্ত কারণ ছাড়াও আর যে সব কারণে স্থায়ী বসতি গড়ে ওঠে, তার মধ্যে আছে খনিজ পদার্থের আবিষ্কার। উত্তর আমেরিকা ও মধ্য প্রাচ্যের তৈলখনিকে কেন্দ্র করে বহু স্থায়ী বসতি গড়ে উঠেছে।

3.4.1C আয়তনের ভিত্তিতে বসতির শ্রেণীবিভাগ (Classification of settlements on the basis of size) ঃ

আয়তনের ভিত্তিতেও বসতিকে শ্রেণীবিভাগ করা যায়। এক্ষেত্রে যেমন দু'চারটে ঘর নিয়ে গড়ে ওঠা সড়কপথের ধারে অবস্থিত চটি রয়েছে, তেমনি আবার কলকাতা, মুম্বাই, চেন্নাই-এর, মতো মহানগরও রয়েছে। নীচে এই ধরনের বিভিন্ন বসতির একটা চিত্র তুলে ধরা হল।

সড়ক বসতি (Roadside settlement)

এ ধরনের বসতিগুলো সাধারণতঃ রাস্তার ধারে গড়ে ওঠে। প্রদান বসতি থেকে প্রায় বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিত এই বসতিগুলোর বাসিন্দারা বিভিন্ন কর্মে নিয়োজিত থাকতে পারে। পুরোপুরি গ্রাম্য পরিবেশে দু চারটে ঘর নিয়ে গড়ে ওঠা এই ধরনের বসতিগুলোর অধিবাসীরা কৃষিকাজে নিয়োজিত থাকতে পারে বা দুই শহরের মধ্যবর্তী স্থানে গড়ে ওঠা এই ধরনের বসতি অনেক সময় বাস বা লরীর চালকদের মোটেল হিসেবে কাজ করে। অনেক ক্ষেত্রে এই ধরনের বসতির সাথে পেট্রোলপাম্প যুক্ত থাকে। সাধারণতঃ ঘর-বাড়ির একটি অংশে মালিক থাকে, অপর অংশ ব্যবসার কাজে লাগানো হয়। বর্তমান লেখক লক্ষ্য করেছেন যে পুরোপুরি গ্রাম্য পরিবেশে গড়ে ওঠা বসতিগুলোর বাসিন্দারা অনেক ক্ষেত্রে রাস্তার ধারে সরকারী খাস জমির আস্তানা বেঁধেছে।

ক্ষুদ্রগ্রাম (Hamlet)

আমাদের দেশে এই ধরনের বসতি অনেক সময় প্রধান গ্রামের অংশ হিসেবে বিবেচিত হয়। প্রধান বসতি থেকে একটু দূরে গড়ে ওঠা এ ধরনের বসতিগুলো "টোল", "টুলী", "ছোট" ইত্যাদি নামে পরিচিত। প্রধান বসতির নামের শেষে "টোল", "টুলী", বা নামের আগে "ছোট" শব্দ যুক্ত ঐ বসতিগুলো যে প্রধান বসতিরই অংশ তা বোঝা যায়। অনেক সময় গ্রামের শেষ প্রান্তে অবস্থিত এবং প্রধান গ্রাম থেকে সামান্য দূরত্বে গড়ে ওঠা এ ধরনের ক্ষুদ্র গ্রামগুলোতে সাধারণতঃ সমাজের তথাকথিত 'অস্পৃশ্য' শ্রেণীর লোকেরা বাস করে। বিহারের ছোটনাগপুর মালভূমিতে ইতঃস্তত বিক্ষিপ্তভাবে গড়ে ওঠা বসতিগুলোর নামের শেষে টোলা বা টুলী শব্দ যুক্ত থাকে।

ক্ষুদ্রগ্রামে 4/5টি বাড়ি (যেমন জলপাইগুড়ি জেলার টাঁড়ী বা জোত অর্থাৎ ক্ষুদ্র কৃষিগ্রাম) থেকে 20/25 টি বাড়ির সমাবেশ দেখা যায়। এসব বসতিতে ক্ষেত্র বিশেষে 2/1টি মুদীখানাও থাকে। আশপাশের গ্রাম যদি একটু দূরে থাকে, তবে এ ধরনের বসতিতে ইদ্‌গা, মসজিদ বা দুর্গামণ্ডপও দেখা যায়।

গ্রাম (Village)

ক্ষুদ্রগ্রাম অপেক্ষা আয়তন ও জনসংখ্যার দিক দিয়ে গ্রাম অনেক বড়। একটি গ্রামের মধ্যে অনেকগুলো ক্ষুদ্রগ্রাম বা পাড়া থাকতে পারে। গ্রামে জনসংখ্যা 150 হতে পারে আবার 10,000-ও হতে পারে (যেমন দক্ষিণ ভারতের গ্রামগুলো)। আমাদের দেশে গ্রামের জনসংখ্যা নির্দিষ্ট করে বেঁধে দেওয়া নেই। কিন্তু

যুক্তরাষ্ট্রের লোকগণনা কর্তৃপক্ষ গ্রাম বলতে 150 থেকে 1,000 লোকের আবাসকে বুঝিয়েছে। উন্নত দেশের গ্রামগুলোতে সব রকম সুযোগ সুবিধে মেলে। যেমন কৃষি যন্ত্রপাতির দোকান, গাড়ি মেরামতী কারখানা, ওষুধের দোকান, পশুখাবারের দোকান ইত্যাদি। আমাদের দেশে গ্রাম বলতে কৃষি এলাকাকে বোঝান হয়ে থাকে। তবে পাশ্চাত্য দেশের মত এখানেও জনঘনত্ব কম। আমাদের দেশের গ্রামগুলো কৃষি নির্ভর হলেও অন্যান্য বৃত্তির লোকজনও এখানে কম বাস করে না। তবে ইদানীং লোকসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে গ্রামবাসীকে বৃত্তির তাগিদে রোজ শহরে যাতায়াত করতে দেখা যায় (Sen, 1986, 1995)। আমাদের দেশের গ্রামগুলোতে জীবনযাপনের সুযোগ সুবিধে খুব কম মেলে বলে গ্রামবাসীকে শহরাভিমুখী হতে হয়। তবে উত্তর ভারতের চেয়ে দক্ষিণ ভারতের গ্রামগুলো অনেকাংশে স্বয়ংসম্পূর্ণ।

শহর (Town)

গ্রাম অপেক্ষা শহর আয়তন, জনসংখ্যা ও বৃত্তির দিক দিয়ে অনেক বড়। শহরের সংজ্ঞা এক এক দেশে এক এক রকম। যেমন ডেনমার্কে 250 জনসংখ্যা অধ্যুষিত বসতিকে শহর বলা হয়। যুক্তরাষ্ট্রে 2,500 লোকের বাসস্থানকে শহর বলে। আর ভারতে কোন স্থান শহর হতে গেলে নূন্যতম 5,000 জনসংখ্যা বাসভূমি হতে হবে। এছাড়া সে স্থানের শতকরা 75 ভাগ লোক অ-কৃষিজীবী হবে। এখানকার জনসংখ্যা ঘনত্ব প্রতি বর্গ কি.মি.-তে 400 জন হতে হবে। শহর হল অ-কৃষি এলাকা। এখানে বহুবিধ বৃত্তির সমাবেশ দেখা যায়। শহরের সংজ্ঞা নিয়ে পরে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা যাবে।

মহানগর (Metropolis)

গ্রীম শব্দ Metropolis-র মানে হল মূল নগরী বা "Mother city"। সাধারণতঃ আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এই সব নগরীর জনসংখ্যা নূন্যতম পক্ষে 10 লক্ষ হত। অনেক ক্ষেত্রে এটি আবার আঞ্চলিক রাজধানী হিসেবেও গণ্য হত। বর্তমান দিনে অবশ্য আশপাশের শহরগুলোর তুলনায় কয়েকগুণ বড় এইসব মহানগরের কর্মধারা বহুদূরব্যাপী বিস্তৃত হয়, সময় সময় তা দেশের গণ্ডী ছাড়িয়ে যায়। বহুসংখ্যাক বিদেশীর উপস্থিতি এই সব মহানগরকে এক বিশিষ্ট স্থানে প্রতিষ্ঠা করে। এই সব মহানগরী সৃষ্টির মূলে রয়েছে তার বহুবিধ কর্মধারা আর তা সম্ভবপর হয় উন্নত পরিবহণের মাধ্যমে। মহানগর সম্বন্ধে বিশদভাবে পরে আলোচনা করা হয়েছে।

3.4.2 অতীতের সাক্ষ্য হিসেবে বসতি (Settlement as evidence of the historical past)

নদীর ভাঙা গড়ার মত বসতিও ভাঙা গড়া ব্যাপারটা আছে। তবে বসতির ক্ষেত্রে গড়ার চেয়ে ভাঙা ব্যাপরটা কম লক্ষ্য করা যায়। কারণ একবার সৃষ্টি হলে বসতি আকার ও আয়তনে বাড়তে থাকে। তবুও কিছু কিছু বসতি পরিত্যক্ত হতে দেখা যায়, তা সে নদীর ভাঙনে হোক বা অন্য কোন কারণেই হোক। স্থানান্তরী কৃষিতে (Migratory farming) অবশ্য ঘন ঘন বসতি বদলানো খুব একটা সাধারণ ব্যাপার।

সাম্প্রতিকালে কিছু কিছু ভৌগোলিক পরিত্যক্ত বসতি বিশ্লেষণে (Abandoned settlement analysis) আগ্রহ দেখিয়েছেন। পরিত্যক্ত বসতি অনুসন্ধান পদ্ধতির তিনটি অংশ থাকে ঃ—A. মাটির ফস্‌ফোরাসের (Phosphorous) রাসায়নিক বিশ্লেষণ। ভূ-পৃষ্ঠের ওপর মানুষের অতীত ক্রিয়া-কর্ম বিশ্লেষণ এটি সবচেয়ে ভালো পদ্ধতি। B. ক্ষুদ্র পৃথকীকরণ (Mircro separation)—প্রাথমিকভাবে যান্ত্রিক উপায়ে মাটি ও বসতির উপাদানগুলোর পরীক্ষা। C. পরাগ বা ফুলরেণু বিশ্লেষণ (Pollen analysis)। Profit Eidt-এর মতে এই সব পদ্ধতির প্রয়োগের দ্বারা অতীতে কোন স্থানে বসতি ছিল কিনা, তা আমরা জানতে পারি। ভূগোলের এই নতুন দিগন্তটি এখনও তার শৈশবাবস্থাতেই রয়ে গেছে অর্থাৎ এ বিষয়ে খুব একটা কাজ হয় নি। এই ধরনের বিষয় বসতি পুরাতত্ত্ব (Settlement archaeology) বিষয়ের অনেক দিন পরে বিকাশ লাভ করেছে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে বসতি পুরাতত্ত্ব বিষয়ে পুরাতত্ত্বের কলাকৌশল প্রয়োগ করে মানুষের সামাজিক সম্পর্ক ও বসতির ধাঁচের (Pattern) ওপর আলোকপাত করা হয়।

3.5 গ্রামীণ বসতি (Rural settlement)

3.5.1 গ্রামীণ বসতির প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট (Physical and economic background of rural settlements)

Jean Burnhes যথার্থই মন্তব্য করেছেন যে বসতি স্থাপনের মধ্যে দিয়ে পরিবেশের সঙ্গে মানুষের প্রথম পরিচয় ঘটে (The typical village is a geopgraphical fact in itself, because it expresses the charter of the region and because of its relations, in appearance and sitaution, with the whole of its immediate surroundings)। এই পরিবেশ প্রাকৃতিক হতে পারে, আবার সাংস্কৃতিকও হতে পারে (সারণি 1)। সেগুলো নিয়ে এবার আলোচনা করা যাক্‌।

সারণি 1

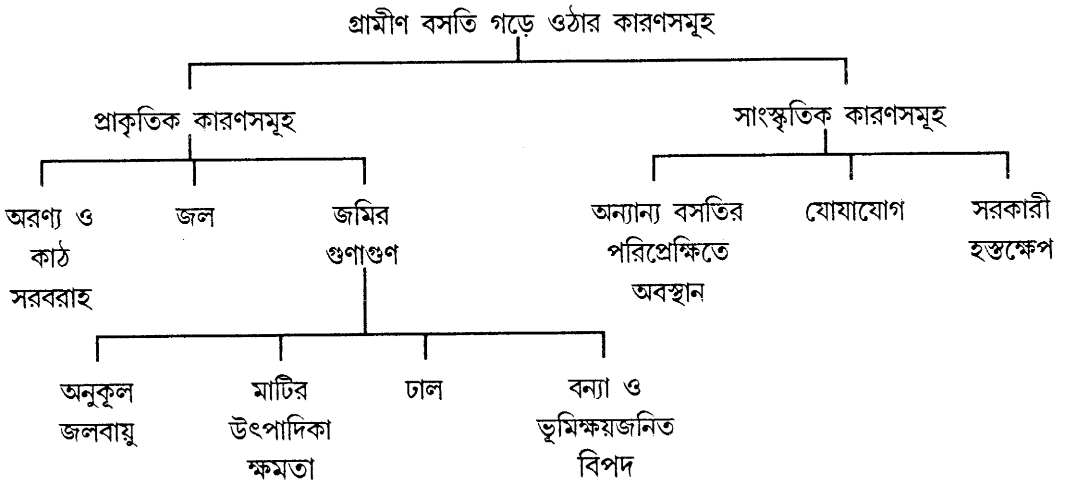

প্রাকৃতিক কারণসমূহ (Physical factors)

বসতি গড়ে ওঠার পেছনে বিভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব অপরিসীম। প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে ভূ-প্রকৃতি, মাটি, জলবায়ু ও জল সরবরাহ উল্লেখযোগ্য। পরিবেশের এই পারিপার্শ্বিক কারণগুলো মানুষের জীবনযাত্রাকে বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত করে।

(i) ভূ-প্রকৃতি (Relief)

বসতি স্থাপনে প্রাকৃতিক কারণগুলোর মধ্যে ভূ-প্রকৃতির প্রভাব সবচেয়ে বেশি। এটি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বসতি বিস্তারে হয় সাহায্য করে, নয়তো বাধার সৃষ্টি করে। জমির ঢাল, উচ্চতা ও বন্ধুর ভূ-ভাগের মাধ্যমে প্রাকৃতিক পরিবেশ বসতির ওপর সরাসরি প্রভাব বিস্তার করে। উচ্চতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাপমাত্রা কমে, খুব বেশি উচ্চতায় আবার শীতকালে বরফ পড়ে। এও লক্ষ্য গেছে যে পাহাড় ঘেরা মধ্য হিমালয়ের সুউচ্চ পর্বত ডিঙিয়ে কাশ্মীর উপত্যকায় খুব কম বৃষ্টিপাত ঘটে। পাহাড়ের যে ঢাল সূর্যের দিকে মুখ করে থাকে, সেই দিক বেশি উত্তাপ পায়। এইভাবে উচ্চতা প্রত্যক্ষভাবে বসতি বিস্তারে সাহায্য করে। এটা লক্ষ্য করা গেছে যে 1,800 মিটারের বেশি উচ্চতায় পৃথিবীতে বসতি বিস্তার খুব কম হয়েছে। নিরক্ষরেখা থেকে যত উত্তরে যাওয়া যায়, তত ভালো জাতের শস্য চাষ কমতে থাকে। কারণ শস্যোৎপাদন সময়সীমা কমতে থাকে। আবার 3,000 মিটার বা বেশি উচ্চতায় কৃষিযোগ্য জমির বদলে বনভূমি দেখা যায়।

চিত্র 1.2.1 ঃ বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বসতির অবস্থান

প্রাচীনকালে চাষবাসই ছিল মানুষের একমাত্র জীবিকা। বর্তমানেও অনেকে এই বৃত্তিকে অবলম্বন করে আছে। কৃষির জন্য প্রয়োজন হয় সমতল জমি। Vidal de la Blache-এর ভাষায় যেখানে একসাথে প্রচুর কৃষি জমি পাওয়া যায়, সেখানে সংঘবদ্ধ বসতি গড়ে ওঠে, কারণ এ ধরনের বসতি একই প্রকার কৃষি পদ্ধতি গড়ে উঠতে সাহায্য করে। নদী গঠিত উর্বর সমভূমিতে প্রচুর ফসল উৎপন্ন হয় বলে ঘনসংঘবদ্ধ বসতি গড়ে ওঠে, অন্যদিকে বিচ্ছিন্ন ভূ-প্রকৃতির দরুন কৃষিজমি টুকরো টুকরো ফালিতে পরিণত হয়। এই

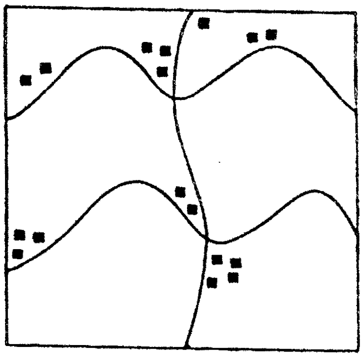

পাহাড়ে বিক্ষিপ্ত বসতি

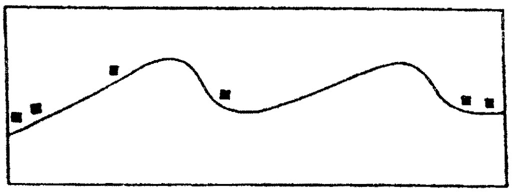

বিচ্ছিন্ন বসতি

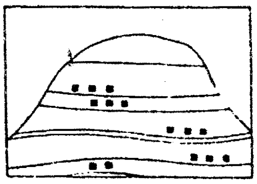

সমোন্নতি রেখা বরাবর বসতি

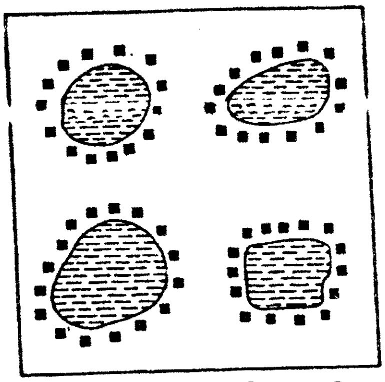

জলের উৎসকে ঘিরে বসতি

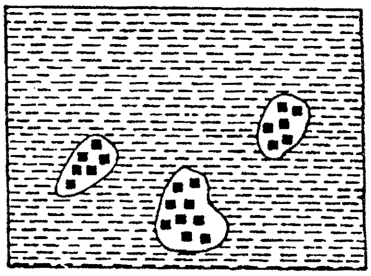

বন্যাপ্রবণ এলাকায় শুষ্ক বিন্দু বসতি

কারণে উত্তর ভারতে সংঘবদ্ধ বসতি আর নেপাল ও ভুটানে অনেক ক্ষুদ্রগ্রাম ও অস্থায়ী বসতি (ছাপ্পড় Chapar) দেখা যায়। বন্ধুর পার্বত্য অঞ্চলে নদী উপত্যকার ধারে (যেমন সিকিম) বা পর্বতের সানুদেশে নদী গঠিত ত্রিকোণাকার ভূমিভাগে (alluvial cone) বসতি গড়ে ওঠে, যদিও তা খুব ছোট আকারের হয়ে থাকে। হিমালয় আ আল্পস্‌ের উচ্চাঞ্চলে মাঝে মাঝে হিমবাহ দিয়ে গঠিত ধাপ বা মঞ্চগুলো কিছুটা সমতল। ফলে এগুলো কৃষিকার্যের পক্ষে অনুকূল। এখানেও কিছু কিছু বসতি গড়ে উঠেছে (চিত্র 1.2.1)।

বন্যাপীড়িত নদী-উপত্যকা বা নীচু উপকূলবর্তী এলাকা বা জলাভূমিতে মানুষ নদীর উঁচুপাড়ে বা অপেক্ষাকৃত উঁচুভূমিতে বসতি গড়ে তোলে। সমুদ্র উপকূলে দুই বালিয়াড়ির মধ্যবর্তী উর্বর ভূমিভাগে বসতি গড়ে ওঠে। পশ্চিমবঙ্গ ও নিকটবর্তী উড়িষ্যার উপকূলাঞ্চলে বালিয়াড়ির সমান্তরাল অনেক রেখাকৃতি বসতি গড়ে উঠেছে। অঞ্চলে স্থায়ী বালিয়াড়ির ওপর অনেক সময় বসতি গড়ে ওঠে।

(ii) মাটির বৈশিষ্ট্য ও বসতি

বসতি বিস্তারের মাটির বিশেষ দান আছে। পৃথিবীর হিমবাহ ও বরফ ঢাকা অঞ্চগুলোতে মাটি না থাকায় সেগুলো জলশূন্য বললেই চলে। একই কারণে কাশ্মীর, নেপাল ও ভুটানের অনেক অঞ্চল বসবাস যোগ নয়। ভারতের বন্ধ্যা ল্যাটেরাইট মাটি বা কিছু আর্কিয়ান (Archaean) যুগের নাইস্‌ (gniess) শিলায় গঠিত বন্ধ্যা ভূমিভাগ ও জনবসতি গড়ে ওঠার পক্ষে অনুকূল নয়। আবার উত্তর ভারতের বিশাল সমভূমিতে একই প্রকার মৃত্তিকার গঠন, তাদের উর্বরতা ও উৎপাদন ক্ষমতা জনবসতি গড়ে ওঠার পক্ষে খুব উপযোগী বলে এটি পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম জনবহুল অঞ্চল। এছাড়া সেচ ও পানীয় জল সহজে পাওয়া যায় ও নানা প্রকার শস্য উৎপাদন হয় বলে এ অঞ্চল বহু প্রাচীনকাল থেকেই লোকজনকে বসতি গড়তে আকর্ষণ করেছে। এখানকার নবীন পলিগঠিত এলাকায় (যা খাদার নামে পরিচিত) লোকবসতি বেশি, আর নদী থেকে একটু দূরে (যা ভাঙ্গার নামে পরিচিত) যেখানে জমিতে প্রতি বছর পলি পড়ে না, আর ভূমিক্ষয় হয়ে চলেছে, সেখানে লোকবসতি তুলনামূলকভাবে কম।

(iii) জলবায়ু ও বসতি

জলবায়ু উত্তাপ ও বৃষ্টিপাতের তারতম্যের মধ্য দিয়ে বসতি বিস্তারে প্রভাব বিস্তার করে। বসতি বিস্তারের দিক দিয়ে নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু সর্বোৎকৃষ্ট। এই জলবায়ু অঞ্চলে বেশি বসতি বিস্তার লাভ করেছে। অন্যদিকে আবার আর্দ্র ও ক্রান্তীয় জলবায়ু অঞ্চলে বেশি বৃষ্টিপাতের ফলে গাছপালা খুব তাড়াতাড়ি বাড়ে। তাই আমাজন ও কঙ্গো অববাহিকায় বসতি বিস্তার ঘটে নি। াবার খুব কম তুহিনমুক্ত দিন, প্রচণ্ড শীত আর সূর্যতাপ বিহীন লম্বা দিনের জন্য শীতল জলবায়ু অঞ্চল (যেমন কুমেরু অঞ্চল) জনমানবহীন। অতি শুষ্ক মরু প্রকৃতির জলবায়ু অঞ্চলে জীবনধারণ করা কষ্টকর বলে সাহারা বা আচাকামার মত মরুভূমিতে লোকজন থাকে না বললেই চলে। এভাবেই জলবায়ু মনুষ্য বসতির সীমা নির্দেশ করে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ

করা যেতে পারে জলবায়ুর উপাদান যেমন তাপমাত্রা বা বৃষ্টিপাতের হেরফের হলে তার প্রভাব বসতি বিস্তরের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যাবে। যেমন উত্তর প্রদেশের উত্তরাখণ্ড অঞ্চলের অনেক স্থানে আগে শীতকালে প্রতি বছর বরফ পড়ত, এখন সেখানে বরফ পড়ে না। পড়লেও সামান্যই পড়ে। আগে যেখানে চাষবাস সম্ভভ ছিল না, আজ সেখানে বছরে দু'বার করে চাশবাস হচ্ছে। ফলে সেখানে জনংসখ্যা বাড়ছে এবং বেড়েছে। একসময়ে উত্তরাখণ্ডের উপত্যকা অঞ্চলেই বেশি লোক বাস করত। কিন্তু জনসংখ্যা বাড়ার সাথে সাথে পাহাড়ের ঢালেও বসতি বেড়েছে।

জলবায়ু পরোক্ষভাবে মানুষের খাদ্য, পোষাক, বাসস্থান ও কিছু শিল্পজাত দ্রব্যের কাঁচামাল সরবরাহ নিয়ন্ত্রিত করে। সুতরাং যেখানেকার জলবায়ু বেশি ফসল ফলানোর পক্ষে উপযোগী সেখানেই অধিক বসতি লক্ষ্য করা যায়।

(iv) সূর্যের পরিপ্রেক্ষিতে বসতির অবস্থান

সূর্যের অবস্থান, সূর্যরশ্মির পতনকোণ (angle of inclination) ও সূর্যোলোকের সময়ের (duration of sunshine) ওপর নির্ভর করে বসতি গড়ে ওঠে। পার্বত্যাঞ্চলে এর প্রভাব বেশি হলেও সমভূমি অঞ্চলেও বাড়ি তৈরিতে সূর্যালোকের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। দক্ষিণ বাংলায় বহুল প্রচলিত নীচের শ্লোকটি থেকে ও কথাটির সত্যতা বোঝা যাবে।

"দক্ষিণ দুয়ারী ঘরের রাজা
পূর্ব দুয়ারী তাহার প্রজা
পশ্চিম দুয়ারী সদাই তাপ,
উত্তর দুয়ারী ঘরের পাপ*

(সূত্র ঃ সুবলচন্দ্র মিত্র ঃ বাংলা প্রবাদ ও প্রবচন)

দক্ষিণবঙ্গ বঙ্গোপসাগর থেকে গরমকালে বিকেলের দিকে মনোরম বাতাস বয়। তাই বেশিরভাগ লোক এই দিকে মুখ করে বাড়ি করতে চেষ্টা করেন। আর উত্তর দিক থেকে শীতে ঠাণ্ডা বাতাস বয় বলে সেই দিকে মুখ করে বাড়ি করলে ঠাণ্ডা ভোগ করতে হয়। পূর্ব দিকে উদীয়মান সূর্যের (rising sun) তাপ গৃহস্থের ভালোভাবে উপভোগ করেন। কিন্তু পশ্চিমদিকে মুখ করে বাড়ি করলে দুপুরের পর থেকে বাড়ি সূর্যের তাপে তেতে ওঠে।

---

* তুলনীয় পশ্চিমবঙ্গের আদর্শ বসতবাটি তৈরির ব্যাপারে আর একটি অর্থবহ ছড়া—"পূর্বে হাঁস, পশ্চিমে বাঁশ, উত্তরে বের, দক্ষিণে ছাড়।"

প্রচণ্ড ঠাণ্ডার হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য ইউরোপের অধিকাংশ বাড়ি উদীয়মান সূর্যের দিকে মুখ করে তৈরি কর হয়, যাতে বাড়িগুলো বেশি সূর্যলোকে পেতে পারে। অনুরূপভাবে হিমালয় অঞ্চলের অনেক জায়গায় বাড়িগুলো সূর্যালোকে পাওয়ার ফলে এখানে বসতি গড়ে উঠেছে (চিত্র 1.2.2.)। যেমন নৈনিতাল শহরে। কুমায়ুন ও গাড়োয়াল হিমালয়ের (হিমাচল প্রদেশের) সমস্ত বাড়ি উদীয়মান সূর্যের দিকে মুখ করে তৈরি করা হয়।

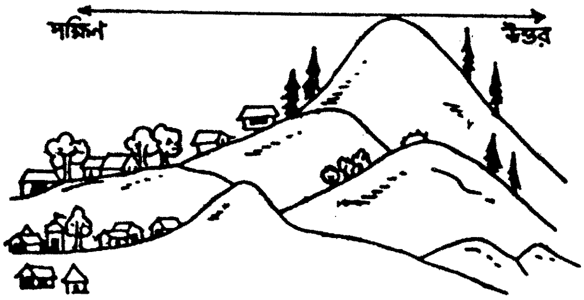

চিত্র 1.2.2 ঃ হিমালয়ের দক্ষিণ ঢালে বসতি

(v) **জলাশয়ের ভিত্তিতে বসতির অবস্থান**

পৃথিবীর সব জায়গাতেই বসতি, তা সে ছোট-ই হোক আর বড়-ই হোক, জলের উৎসকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। আর কোনো বসতিতে যদি জল না পাওয়া যায়, তবে অন্য কোথা থেকে এনে এই নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তুটির অভাব মেটাতে হয়। শুধু পানীয় হিসেবেই নয়, ফসল উৎপাদন ও পশুপালনের জন্যও জল খুব দরকারী। জলের অভাবের দরুন পৃথিবীর অনেকাংশে বসতি বিস্তার ঘটেনি। তাই একদিকে যেমন সাহারা ও আরবের ধূ ধূ মরু প্রান্তরে মরুদ্যানগুলোকে কেন্দ্র করে বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতন বসতি গড়ে উঠেছে, অন্যদিকে আবার জার্মানীর রাইন নদী, উত্তর আমেরিকার সেন্ট লরেন্স, চীনের হোয়াংহো ও ভারতের গহ্গা নদীকে কেন্দ্র করে খুব ঘনবসতি গড়ে উঠেছে। ব্রহ্মদেশের (মায়নামার) ইরাবতী, পাকিস্থানের সিন্ধু, অস্ট্রেলিয়ার 'মারে-ডার্লিং, দক্ষিণ আমেরিকার উরুগুয়ে ও প্যারেগুয়ের উপত্যকাগুলোতও খুব জনবসতি লক্ষ্য করা যায়। আমাদের বাংলাতেও একসময় বহু ছোট বড় জলপদ নদীর ধারে গড়ে উঠেছিল। এখানে নদী, খাল, থেকে সেচের জল পাওয়া ছাড়াও বর্ষার সময় জল ধরে রাখার জন্য অসংখ্য বাঁধ তৈরি করা হত। 'বাঙ্গাল' (বঙ্গ + আল = জল ধরে রাখার বাঁধ) যা পরবর্তীকালে 'বাংলা' শব্দে রূপান্তরিত হয়েছিল, তা চাষবাসের ক্ষেত্রে জলের প্রয়োজনীতার কথাই তুলে ধরে। আর একটা কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয়। এক সময়ে জলপথই ছিল বাংলায় পরিবহণের প্রধান উপায়। এছাড়া জলাশয় থেকে মিলত বাঙালীর প্রিয় খাদ্য মাছ। Brunches লিখেছেন "The rivers are both roads and fisheries".

জল সম্পদ পরোক্ষভাবে বসতি বিস্তারে সাহায্য করে। পার্বত্য উপত্যকায় ঝর্ণা ও প্রস্রবণগুলোকে কেন্দ্র করে বসতি গড়ে ওঠে। হিমালয়ের দক্ষিণ ঢালে যেখানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়, সেখানে বিক্ষিপ্ত বসতি গড়ে উঠেছে। হ্রদকে কেন্দ্র করেও অনেক বসতি সৃষ্টি হয়। যাতায়াতের সুবিধের জন্য উত্তর আমেরিকার পাঁচটি বড় হ্রদকে কেন্দ্র করে ঘনবসতি বা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে কেন্দ্র করে কাশ্মীরের ডাল হ্রদে জনবসতি এ প্রসঙ্গে উল্লেখের দাবী রাখে। আবার রাজস্থানের মরু অঞ্চলে বা দাক্ষিণাত্যের শুষ্ক অঞ্চলে খাল, কূপ বা জলাশয়গুলোকে কেন্দ্র করেও বসতি গড়ে উঠেছে।

● **অর্থনৈতিক কারণ**

বসতি গড়ে ওঠার অর্থনৈতিক কারণের মধ্যে খনিজপদার্থের আবিষ্কার বা বন থেকে কাট সংগ্রহের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। তাই মধ্যপ্রাচ্যের মরুভূমিতে খনিজ তেল, দক্ষিণ আমেরিকার চিলির মরুভূমিতে নাইট্রেট, অস্ট্রেলিয়ার মরুভূমিতে সোনাকে কেন্দ্র করে বসতি গড়ে উঠেছে। আবার গভীর বনাঞ্চলে কাঠ সংগ্রহকে কেন্দ্র করে বসতি গড়ে ওঠে। দার্জিলিং জেলায় এই ধরনের অনেক খাসমহল বসতির সন্ধান মেলে। বনভূমি থেকে কাঠ সংগ্রহকে কেন্দ্র করে জলপাইগুড়ি জেলার পারোতে রাভাদের অনেক বন বসতি (Forest village) দেখা যায়। মাছ শিকার বা মরু অঞ্চলে খালের ধারে জলসেচেব সুবিধেকে কেন্দ্র করে বসতিব সৃষ্টি হয়। মেদিনীপুর জেলার শঙ্করপুর মৎস্য বন্দরকে কেন্দ্র করে বসতি আরও বিস্তার লাভ করেছে। এছাড়া শিল্প স্থাপনের ম্যধ্যমেও বড় বসতি গড়ে ওঠে, যেমন পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমে ধূ ধূ প্রান্তরে গড়ে ওঠা দুর্গাপুর ইস্পাত নগরী বা ফরাক্কায় গড়ে ওঠা তাপবিদ্যুৎ উপনগরী।

● **সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণ**

বসতি স্থাপনে প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক কারণগুলোর গুরুত্ব যথেষ্ট হলেও কিছু কিছু সামাজিক বাধানিষেধ বসতি স্থাপনে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। ফলে এক জায়গার বদলে আর এক জায়গায় বসতি গড়ে ওঠে। উপজাতিদের ক্ষেত্রে এই ধরনের সংস্কার বেশি দেখা যায়।

সাংস্কৃতিক কারণের মধ্যে যাতায়াত ব্যবস্থা উন্নতি বসতি বিস্তারের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেয়। উদাহরণ হিসেবে বলা চলে স্বাধীনতার আগে জাতীয় সড়কের (পূর্বতন বাদশাহী সড়ক, মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতা) আশেপাশে ছিল জঙ্গল। নবাবী আমলে এই পথ দিয়ে সৈন্য চলাচল করত বেশি। এছাড়া এই পথ দিয়ে কলকাতার কসাইখানার জন্য পশু নিয়ে যাওয়া হত। সাধারণ মানুষ চলাচল করত কম। কারণ হিংস্র পশু ও ডাকাতের ভয় ছিল। স্বাধীনতার পর রাস্তাঘাটের উন্নতি ঘটায় বাংলাদেশ থেকে উদ্বাস্তুরা এই সড়কের দু'ধারে বাসা বেঁধেছে।

আগেকার মানুষ বুনো জন্তু ও হানাদারদের ভয়ে ভীত ছিল। স্বভাবতই মানুষ বিচ্ছিন্নভাবে বাড়ি তৈরির চেয়ে সবাই মিলে এক জায়গায় বাড়ি তৈরির তাগিদ অনুভব করত। হানাদারদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য অনেক সময় তারা গ্রামের চারপাশে (garh) বানাতো বা স্থানীয় শাসনকর্তা (Chieftain) প্রাসাদের

চারদিকে ডেরা বানাত। দক্ষিণ ভারতে আজও অনেক প্রাচীর ঘেরা গ্রাম (fortified village) দেখা যায়। বর্তমান দিনেও নিরাপত্তার খাতিরে মানুষ সংঘবদ্ধ গ্রাম গড়ে তোলে, যেমনটি আমরা দেখি পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী জেলা নদীয়া, মুর্শিদাবাদ ও জলপাইগুড়ি। বাংলাদেশী দুর্বৃত্তদের ভয়ে ভীত এখানকাব বাসিন্দারা একসঙ্গে থাকার তাগিদে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম (hamlet) থেকে বসবাস উঠিয়ে দিয়ে বড় সংঘবদ্ধ (compact) বসতিতে এসে ডেরা বেঁধেছে (Sen and Sen, 1989)। এর পাশাপাশি উল্লেখ করা যেতে পারে ভরাত-তিব্বত সীমান্তে জোহারের (উত্তর প্রদেশের উত্তরাখণ্ড বিভাগ) উত্তর দিকের গ্রামগুলো। 1962 সালে চীন আক্রমণের সময় 10 থেকে 15টি গ্রাম জলশূন্য হয়েছিল। তখন সেখানকার বাসিন্দারা নীচু উপত্যকায় নেমে এসে ডেরা বাঁধে। অনুরূপ ঘটনা এর আগে 1948 সালে ভারত-পাক যুদ্ধের সময় লক্ষ্য করা যায়। ঐ সময় পাক-অধিকৃত কাশ্মীরের অনেক গ্রাম জনমানবহীন হয়ে পড়েছিল। ঐ গ্রামবাসীরা জম্মু ও কাশ্মীরে নতুন গ্রাম গড়ে তোলে।

উপরের আলোচনা ভিত্তিতে আমরা বলতে পারি পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বসতি গড়ে উঠতে প্রাকৃতিক ও সামাজিক কারণগুলো কাজ করেছে। এককভাবে কোন কারণ কাজ করে না।

3.6 গ্রামীণ বসতির কায়িক গঠন (Morphological structure of rural settlement)

প্রতিটি বসতি তার নিজস্ব স্বকীয়তায় সমুজ্জ্বল। ধরাপৃষ্ঠে বিভিন্ন রূপে আমাদের চোখে ধরা দেয়। ছোট গ্রাম থেকে বড় গ্রাম, আবার গোলাকৃতি বসতি থেকে চতুষ্ক বসতি, গোষ্ঠীবদ্ধ বসতি থেকে বিক্ষিপ্ত বসতি—এ সবই বসতির ওপর ছাপ ফেলে। এবার আমরা গ্রামীণ বসতির কায়িক গঠনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করব।

3.6.1 গ্রামীণ বসতির আয়তন (Size of the village)'

গ্রামীণ বসতির আয়তন সাধারণতঃ দু'ভাগে নির্ধারণ করা যেতে পারে। (1) ঐ বসতির পরিধিগত বিচার অর্থাৎ ঐ গ্রামের এলাকা এবং (2) ঐ গ্রামের মোট জনসংখ্যা। সচরাচর দেখা যায় বড় গ্রামগুলোতে বেশি এবং ছোট ছোট গ্রামগুলোতে কম লোক বাস করে। কিন্তু এমনও দেখা গেছে যে কোন গ্রামের আয়তন অনুপাতে সেখানে কম সংখ্যক লোক বাস করে। স্বভাবতই এর পেছনে থাকে গ্রামের সেই প্রাকৃতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশ। যে সব অঞ্চলের ভূমিভাগ সমতল, মাটি উর্বর ও স্বাভাবিক ভাবেই কৃষি সমৃদ্ধ সেখানকার গ্রামগুলো বেশ বড়। পক্ষান্তরে পাহাড়ী অঞ্চলের মাটির স্তর পাতলা ও তার অনুর্বর হওয়ায় সেখানে বড় গ্রাম গড়ে উঠতে পারে না। যেমন উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজসমূহে (সারণি 2 দ্রঃ) প্রদানতঃ বন্ধুরতা ও তার দরুন যোগাযোগ ও অর্থনৈতিক বিকাশ না হওয়ায় এই সব জেলায় বড় গ্রাম গড়ে ওঠে নি। ভূমির অনুর্বরতার দরুন এখানকার কিছু কিছু এলাকায় স্থানান্তর কৃষি (shifting

cultivation) করা হয়। তাই দেখা যায় একমাত্র ত্রিপুরা ছাড়া উত্তর-পূর্ব ভারতের অন্যান্য রাজ্যে মাঝারি মানের (2,000-4999 জনসংখ্যা) গ্রাম নেই বললেই চলে। শুধু তাই নয়, বন্ধুর ভূ-প্রকৃতির জন্য অধিকাংশ পাহাড়ী রাজ্যে দুই গ্রামের মধ্যবর্তী গড় দূরত্ব খুব বেশি। একই কথা বলা যায় উত্তর-পশ্চিম ভারতের দুই পাহাড়ী রাজ্য জম্মু ও রাশ্মীর এবং হিমাচল প্রদেশ সম্পর্কে। বিহারের ছোটনাগপুরের অনুর্বর মালভূমির রুক্ষ মাটিতে ছোট ছোট গ্রাম গড়ে উঠেছে। কিন্তু কৃষি সমৃদ্ধ মজঃফরপুর, দ্বারভাঙ্গা, চম্পারণ জেলার গ্রামগুলো আকারে বড়।

পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমাংশ এক সময় বিস্তীর্ণ জঙ্গল (জঙ্গল মহল) ছিল। জঙ্গল পরিষ্কার করে বা জঙ্গলের মধ্যেই অসংখ্য ছোট ছোট গ্রাম গড়ে উঠেছে মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া জেলায় (পশ্চিম)। শুধু ভূ-প্রকৃতি বা মাটির অনুর্বরতা নয়, অন্যান্য প্রাকৃতিক অবস্থাও গ্রাম আয়তনকে যথেষ্ট প্রভাবিত করে। সাধারণতঃ বন্যাপীড়িত অঞ্চলের গ্রামগুলো ছোট নয়, কিন্তু যে সব এলাকায় বন্যার পরে পলি পড়ে ভূমিভাগ উর্বর হয়, সেখানে বড় বড় গ্রামে দেখা যায়। যেমন মুর্শিদাবাদ জেলার পদ্মার চরে কাতলামারি (রানিনগর)। দক্ষিণ হনুমন্তনগব (ভগবানগোলা) ইত্যাদি গ্রামগুলো। মরুভূমি অঞ্চলেব গ্রামগুলো ছোট নয়। দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার মরুভূমি অঞ্চলে বেদুইনদের গ্রামগুলো ছোট সাধারণতঃ 15-20টি পরিবার নিয়ে এক একটি গ্রাম গড়ে উঠে।

সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে মানুষের কর্মদক্ষতা বসতির আয়তনের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। উদাহরণ হিসেবে বলা চলে যে সুদানে যে সব উপজাতিরা কলা, কাসাভা ইত্যাদি ফসল ফলায় ও বন থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে, তারা অন্যান্য উপজাতি গোষ্ঠীর তুলনায় বড় গ্রামে বাস করে।

সারণি 2

পার্বত্য রাজ্য সমূহের জনসংখ্যা ভিত্তিক গ্রামের বন্টন (1)

রাজ্য	খুব ছোট গ্রাম 500-র কম জনসংখ্যা	মধ্যম মাঝারি গ্রাম 500-1,999 জনসংখ্যা	মাঝারি গ্রাম 2,000-4,999 জনসংখ্যা	বড় গ্রাম 5,000-9,999 জনসংখ্যা	খুব বড় গ্রাম 10,000 তার বেশী জনসংখ্যা	দুই গ্রামের মধ'বর্তী গড় দূরত্ব (কি.মি.)
সিকিম	53.41	44.77	1.82	—	—	26.35
মেঘালয়	91.57	7.63	0.5	—	—	4.55
ত্রিপুরা	14.60	45.92	32.01	6.54	0.93	12.19
অরুনাচল	93.03	6.42	0.49	0.06	—	25.71
নাগাল্যাণ্ড	61.65	34.53	4.23	0.09	—	14.8
মিজোরাম	69.62	26.22	4.16	—	—	24.47
মণিপুর	73.72	21.52	4.42	0.59	0.05	10.09
জম্মু ও কাশ্মীর	50.98	42.63	6.06	0.31	0.02	34.22
হিমাচলপ্রদেশ	89.87	5.56	0.55	0.02	—	3.29

(Source : Census of India 1981, Part II A(i) General Population Tables)

আবার যে সব দেশে জমি নিবিড় প্রথায় চাষ (Invensive farming) করা হয় ও কৃষিজমিতে যন্ত্রপাতির ব্যবহার কম, সে সব দেশের বসতিসমূহ বড় আয়তনের হয়। কৃষি-শ্রমিক নির্ভরশীল চীন, ভারত ও বাংলাদেশে চাষবাসে যন্ত্রপাতির প্রচলন কম। কৃষিতে সহযোগিতার প্রয়োজন হয় বলে এখানকার গ্রামগুলো আয়তনে বড় হয়। কিন্তু, যন্ত্রের ওপর নির্ভরশীল ইংল্যাণ্ড, যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার গ্রামগুলো ছোট। কৃষি খামার (farm house) এই দেশসমূহের বৈশিষ্ট্য।

বৃহৎ আয়তন বসতি পৃথিবীর সব দেশে দেখা যায়, বিশেষ করে উন্নত দেশগুলোতে। স্থানীয় সম্পদের সদ্ব্যবহার ছাড়া ও সামাজিক সহযোগিতা এই ধরনের বসতি গড়ে উঠতে সাহায্য করে। যে সকল গ্রামে কৃষক ছাড়া জেলে, তাঁতি, কামার, ছুতোর, কুমোর প্রভৃতি বিভিন্ন বৃত্তির লোক বাস করে, সেসব গ্রাম আয়তনে বড় হয়। এসব গ্রাম বলতে গেলে অনেকটা স্বয়ংসম্পূর্ণ। দক্ষিণ ভারতের অধিকাংশ বড় গ্রামই মোটামুটি স্বাবলম্বী। ক্ষেত্র বিশেষে পশুশিকার ও মৎস্যচাষের ওপর নির্ভরশীল গ্রামে বহু সংখ্যক লোক বাস করে। ইউরোপায়রা যখন প্রথম উত্তর আমেরিকার ক্যালিফোর্ণিয়া উপকূলে বসবাস শুরু করে, তখন তারা বড় বড় গ্রামেবাস করত। আজও সে সব নদীতে প্রচুর পরিমাণে স্যামন (salmon) মাছ পাওয়া যায়, সেসব নদীর ধারে ধারে বড় বড় বসতি দেখা যায়। মৎস্যচাষে বাণিজ্যিকভাবে সফল হতে গেলে বহু মানুষের সহযোগিতার প্রয়োজন হয়। বর্তমান বৈজ্ঞানিক প্রথায় মৎস্যশিকার ও সংরক্ষণের কাজে নিয়োজিত বহু সংখ্যক মানুষ সংঘবদ্ধ ভাবে বড় গ্রামে বাস করে (ভট্টাচার্য ও ভট্টাচার্য, 1977)।

ভারত, পাকিস্থান, বাংলাদেশ প্রভৃতি দেশে গত কয়েক দশক ধরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অপরিতহত থাকায় এই সব দেশের বহু ছোট গ্রাম বড় গ্রামে পরিণত হয়েছে। অইথকাংশ ক্ষেত্রে গ্রমের আয়তন একই প্রকার থাকে। তবে কোন প্রাকৃতিক কারণে যেমন নদীর ভাঙ্গনে গ্রামের কিছু অংশ বা গোটা গ্রামটাই নদীগর্ভে চলে যায়। পশ্চিমবঙ্গে পদ্মার তীরে অনেক গ্রাম ধ্বংস হয়েছে। উন্নয়নমূলক কাজের দরুন (বাঁধ, জলাধার, রাস্তা নির্মাণ) কোন গ্রামের আয়তনে সামান্য হেরফের হয়। তবে এগুলো খুব স্থানীয়ভাবে ঘটে থাকে। বসতি ভূগোলে কোন গ্রামে জনসংখ্যা হ্রাসবৃদ্ধি গ্রামীণ জীবনে বেশি প্রভাব ফেলে।

সবশেষে বলতে হয় গ্রাম কখনই স্থানু (Static) নয়, কারণ গ্রামের আয়তন ও জনসংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি হতে পারে। মহামারীর কবলে পড়ে অতীতে পশ্চিম বাংলার অনেক গ্রাম জনহীন হয়ে পড়েছিল ; কিন্তু স্বাধীনতার পর তদানীন্তনপূর্বপাকিস্থান (অধুনা বাংলাদেশ) থেকে বহ লোকজন এদেশে এসেছে। তারা এসে বন-জঙ্গল পরিষ্কার করে বসতি গড়ে তুলেছে। এমনও দেখা গেছে উদ্বাস্তু আগমনের ফলে বহু ছোট গ্রাম ফুলে ফেঁপে উঠেছে (চিত্র 1.3.1)। সে তুলনায় অনেক বর্ধিষ্ণু গ্রামে জনসমাগম ঘটে নি। ফলে ছোট গ্রামের কাছে সেগুলোকে নিষ্প্রভ মনে হয়।

জনবসতি ভূগোলে ছোট গ্রামের চেয়ে বড় গ্রমের গুরুত্ব অনেক বেশি। কারণ অনেক ক্ষেত্রেই পারিপার্শ্বিক এলাকা অনুন্নত হওয়ায় বা আধুনিক য়াতায়াতের পথ থেকে দূরে অবস্থিত হওয়ায় ছোট গ্রামগুলোতে জনবৃদ্ধি ঘটেনি। উপরন্তু, অনেক ক্ষেত্রেই দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাসকারী জনতা শহরের প্রলোভনের জন্য এসবগ্রাম ছেড়ে শহরে পাড়ি জমায়। খনিজ সম্পদ নিঃশেষ হয়ে গেলে খনিজ গ্রাম পরিত্যক্ত হয় ও ভূতুড়ে গ্রামে পরিণত হয়। আধুনিক উন্নত মানের বন্দরের নৈকট্যের দরুন কোন কোন মৎস্য গ্রামের অবনতি ঘটে। আবার পর্যটন শিল্পের প্রসার ঘটলে ঐ গ্রাম পুনরুজ্জীবিত হতে পারে। নগরের (City) কাছাকাঠি অবস্থিত অধিকাংশ গ্রাম তাদের চিরাচরিত বৈশিষ্ট্য হারিয়ে শহরে (town) পরিণত হতে পারে। কিন্তু সম্পূর্ণভাবে গ্রামীণ পরিবেশে গড়ে ওঠা অধিকাংশ গ্রাম তাদের সনাতনী ঐতিহ্যকে বজায় রাখে।

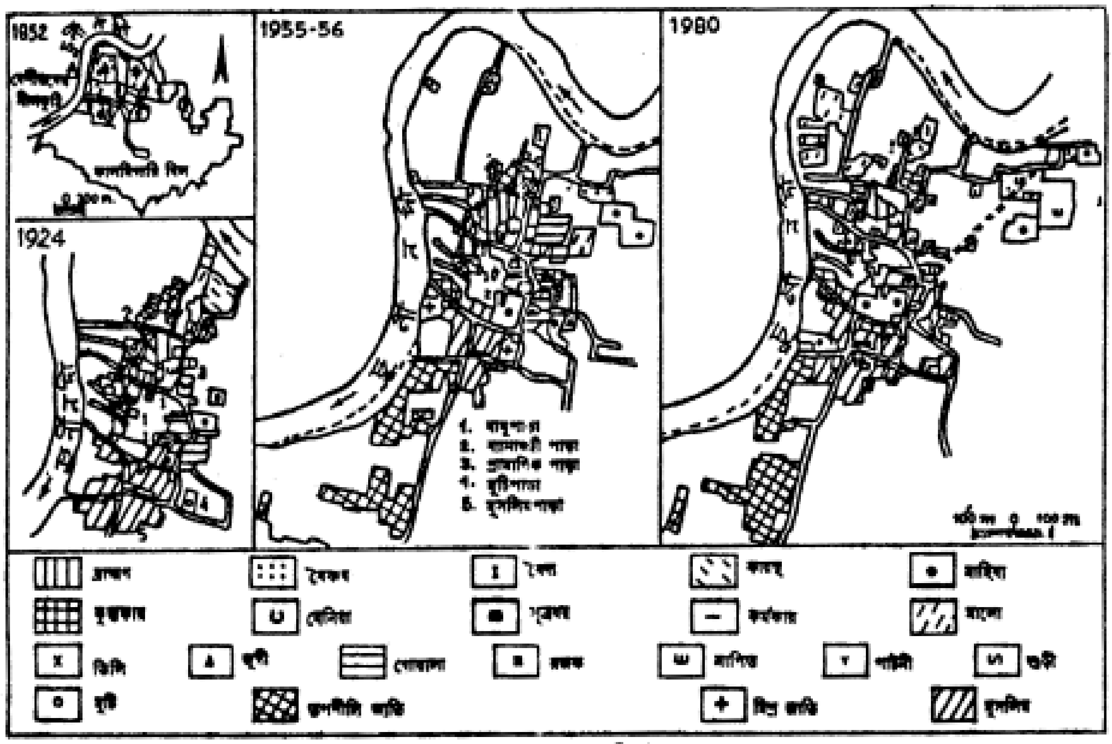

চিত্র 1.3.1 : নদীয়া জেলার রঘুনাথপুর গ্রামের বিবর্তন (Dasgupta অনুকরণে)

3.6.2 গ্রামীণ বসতির আকার (Shape of the village)

আকার বলতে আমরা বুঝি অনুকূল ও সুবিধাজনক বসতির স্থানে বাসগৃহ ও তার আনুষঙ্গিক উপাদান সমূহের নির্দিষ্ট বিস্তারের প্রবণতা ("Arrangement of houses and other assoicated infrastructures

in relation to their favourable and convenient sites which permit their expension in definite direction. "Singh S.B., 1977)। এর ফলে বসতির একটা বাহ্যিক রূপ সৃষ্টি হয়, যা ভৌগোলিকদের চোখে ধরা পড়ে। স্থানীয় বৈচিত্র্যসূচক মানচিত্র থেকে আমরা বিভিন্ন প্রকার গ্রামীণ বসতির আকারের সাথে পরিচিত হই। তবে প্রথমেই বলে রাখা ভালো যে অধিকাংশ বসতি তাদের আপন খেয়ালে এবং কোন প্রকার অনুকরণ ছাড়াই গড়ে ওঠে। তবে এই গড়ে ওঠার মধ্যেও আমরা প্রকৃতির হাতের ছোঁয়া পাই। যেমন উপত্যকায় গড়ে ওঠা গ্রামগুলো একটা তারের (string) মত লম্বাটে রূপ নেয়। আবার উত্তর ভারতের তরাই অঞ্চল বা জাপানের পাহাড়ী অঞ্চলের গ্রামগুলো সাধারণতঃ কৃষি জমির দিকে মুখ করে গড়ে ওঠে। পাহাড়ী এলাকায় কৃষি জমির মূল্য অপরিসীম। তাই কৃষির জন্য সংরক্ষিত সোপান জমিটুকু ছেড়ে দিয়ে ছোট সমতল জায়গায় গাদাগাদি করে বসতি গড়ে ওঠে।

কোন গ্রামের বাইরের আকৃতি ও আভ্যন্তরীণ গঠন প্রাকৃতিক (ভূ-প্রকৃতি, নদী, অরণ্যের পরিপ্রেক্ষিতে অবস্থান), সামাজিক (জাতি, গোষ্ঠী, ধর্মীয় একতা), ঐতিহাসিক (প্রথম অবস্থায় প্রতরক্ষার প্রয়োজন) এবং অর্থনৈতিক (কৃষিপদ্ধতি, রাস্তা ও শিল্পের অবস্থান) ইত্যাদি কয়েকটি কারণ দ্বারা প্রভাবিত হয়। কিন্তু পরিকল্পিত গ্রামে উপরিউক্ত প্রভাব থাকে না বললেই চলে।

গ্রামীণ আকার সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে আমরা দুটি মতবাদের সম্মুখীন হই। এটি হল (ক) ঐতিহ্যিক মতবাদ (traditional view) ও অপরটি হল (খ) পরিমাত্রিক (Quantitative) মতবাদ। প্রথমটিতে আমরা সচরাচর যে সব আকৃতি দেখতে পাই তার বিস্তৃত বিবরণ ও দ্বিতীয়টিতে বসতির জ্যামিতিক পরিমাণ সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়।

(ক) ঐতিহ্যিক মতবাদ (Traditional views)

বসতির আকার সম্বন্ধে সর্বপ্রথম আলোকপাত করেন Meitzen। আকার অনুসারে জার্মানীর গ্রামীণ বসতিকে তিনি কয়েকটি ভাগে ভাগ করেন Meitzen-এর চিন্তাধারাকে আরও কিছুটা এগিয়ে নিয়ে যান Demangeon এবং R.B. Hall ভারতের গ্রামীণ বসতির আকার সম্বন্ধে প্রথম বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করেন R. L. Singh। মধ্য গাঙ্গেয় সমভূমির বসতির বিবর্তন ("Evolution of Settlements in the middle Ganga valley") প্রবন্ধে বসতির ৷কার সম্বন্ধে তিনি দু'টি সাধারণ উপাদানের উল্লেখ করেছেন। প্রধান বসতি এলাকা (Main inhabited site) ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লী এলাকা (Hamleted sites)। প্রধান বসত এলাকায় গৃহগুলোর নিবিড় বিন্যাস (Close structural arrangement) পূর্বলিখিত প্রাকৃতিক ও ঐতিহ্যিক কারণে গড়ে ওঠে। নীচে ঐতিহ্যিক মতবাদের কয়েকটা সচরাচর দৃষ্ট গ্রামীণ বসতির আকার সম্বন্ধে আলোচনা করা হল।

সমকোণাকার বসতি (Rectangular settlement or village)

চীন, ভারত ও জাপানের মত কৃষিভিত্তিক দেশে বসতিগুলো সাধারণতঃ সমকোণ আকৃতির হয়। প্রাচীন ভারতে জমির "বিঘা" পদ্ধতি বা জাপানের জরি (Jori)পদ্ধতির দরুন এই সব দেশের জমিগুলো আয়তাকার রূপ পেয়েছে। জমির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বাড়িগুলো উত্তর, দক্ষিণ পূর্ব বা পশ্চিমমুখীভাবে গড়ে ওঠে। এইভাবে এক স্থানে বহু গৃহের একই প্রকার অবস্থান আয়তাকার বসতির সৃষ্টি করে।

ফাঁকা সমকোণাকার বসতি (Hollow rectangular pattern settlement or village)

এই ধরনের বসতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হল গ্রামের মধ্যেখানে ফাঁকা জায়গার অবস্থান। অতীতে যে সব স্থানে যুদ্ধ-বিগ্রহ লেগে থাকত, সেখানে সাধারণতঃ এই ধরনের বসতি হত। গ্রামের মধ্যভাগে থাকত স্থানীয় ভূ-স্বামীর প্রাসাদ বা কেল্লা বা দুর্গ। এর চারপাশ দিয়ে গ্রামবাসীরা বাস করত। আজও অনেক গ্রামে গ্রামে উঁচু ঢিবি অতীতের পুরনো কেল্লা বা প্রাসাদের সাক্ষ্য বহন করে। কুসংস্কারের ভয়ে অনেকেই ঐ সব স্থানে বাড়ি তৈরি করতে চায় না বলে ঐ স্থান ফাঁকাই থেকে যায়। পলে ফাঁকা বা ফাঁকা সমকোণ বসতির সৃষ্টি হয়। আর যে সব কারণে ফাঁকা সমকোণ বসতির সৃষ্টি হয় তার মধ্যে মন্দির, মসজিদ, পুকুর বা বড় ছায়াদানকারী গাছের কথা আমাদের মনে আসে। এই সব স্থানে এসে গ্রামবাসীরা গল্পগুজব করে, গরুবাঁধে বাফসল ঝাড়ে। গরমকালে তারা গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নেয়, আর শীতের সন্ধ্যেতে আগুন জ্বালিয়ে তার চারপাশে বসে গল্পগুজব করে। আবার অনেক গ্রামে এই স্থানে সাপ্তাহিক বা দ্বি-সাপ্তাহিক হাট বসে।

চতুষ্কাকার বসতি (Square pattern village)

চতুষ্ক আকার ও সমকোণ আকার পরস্পরের পরিপূরক। গ্রামে কোন উল্লেখযোগ্য প্রাকৃতিক সীমানা থাকলে চতুষ্ক গ্রাম সমকোণ গ্রামে এবং বিপরীতভাবে সমকোণ বসতি চতুষ্ক বসতিতে পরিণত হয়। সাধারণতঃ এই ধরনের বসতি রাস্তার সংযোগস্থলে গড়ে ওঠে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রাচীরের মধ্যে গড়ে ওঠা গ্রামও এই আকার প্রাপ্ত হয়। যে সব জায়গাব চারধারে ফলের বাগান বা পুষ্করিণী ও রাস্তা তাকে, সেখানেও এই আকার সৃষ্টি হয়। কারণ এই সব বস্তু গ্রামকে একটা নির্দিষ্ট আয়তনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে (চিত্র 1.3.2)।

ফাঁকা চতুষ্কাকার বসতি (Hollow square pattern village)

বসতির এই আকার চতুষ্ক গ্রামের সঙ্গে তুলনীয়, তবে গ্রামের মধ্যভাগে ফাঁকা জায়গা থাকবে। মধ্যের ফাঁকা অংশে চতুষ্ক পুষ্করিণী, মন্দির, মসজিদ, বাগান বা পশুচারণ ক্ষেত্র থাকবে।

দাবাছককাকার বসতি (Chessboard pattern settlement of village)

R. E. Dickinson-এর মতে গ্রামের এই আকার "a right angled mesh of streets with or without a central rectangular market place" কে নির্দেশ করে। এই ধরনের বসতিতে কোন স্থানে আয়তাকার

বাজার থাকতেও পারে, আবার নাও থাকতে পারে। এছাড়া এখানে দুই প্রধান রাস্তা বা গলি পরস্পরকে সমকোণে ছেদ করে এবং অন্যান্য গৌণ রাস্তা গলিপ্রধান রাস্তা বা গলির সাথে সমান্তরালে অবস্থান করে। এর ফলে বসতিটি জালের মত দেখতে হয়। রাস্তার এই ধরনের অবস্থানের দরুন গ্রামের মধ্যে সহজেই যাতায়াত করা যায়।

গোলাকার গ্রাম (Circular village)

কোন স্থানে যদি একদিকে খুব বেশি সংখ্যক বাড়ি গড়ে ওঠে, তবে ঐ গ্রাম গোলাকার রূপ নেবে। অতীতে শত্রুদের আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পেতে স্থানীয় জমিদারদের প্রাসাদের চারদিকে বাড়িগুলো তৈরি করা হত। অনেক সময় তৈরির জন্য উঁচু জায়গা পাওয়ার আশায়একদিকে মাটি খোঁড়া হয়। পলে

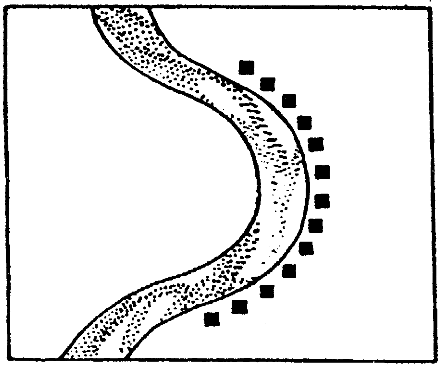

উপবৃত্তাকার গোষ্ঠীবদ্ধ

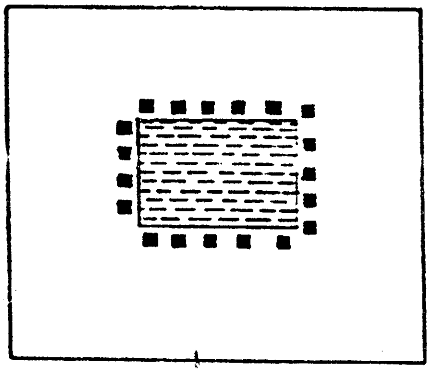

শূন্যগর্ভ আয়তাকার গোষ্ঠীবদ্ধ

বাড়িগুলো গোলাকার ভাবে গড়ে ওঠে। কখনো কখনো নদীর অর্ধচন্দ্রাকার বাঁককে কেন্দ্র করে গোলাকার গ্রাম গড়ে ওঠে। নদী বা রাস্তার তির্যক বাঁকের দরুন অনেক সময় অশ্বক্ষুরাকৃতি গ্রাম গড়ে ওঠে। কোন কোন গ্রামের মধ্যভাগে উন্মুক্ত স্থান থাকায় ফাঁকা গোলাকার গ্রাম গড়ে ওঠে। সাধারণতঃ গোলাকার বসতি কম স্থানেই দেখা যায়। আফ্রিকার যে সব স্থানে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব লেগে থাকে, সেই সব জায়গাতে এই ধরনের বসতি দেখা যায়। এই ধরনের বসতির বাইরের সীমায় নলখাগড়া দিয়ে বেড়া দেওয়া থাকে। (বাকী, 1994)। আফ্রিকার জুলু উপজাতিদের ক্রাল বাসগৃহ এই ধরনের বসতির ভালো উদাহরণ।

প্রাকার বেষ্টিত বসতি (Fortified village)

এই ধরনের বসতি অনেকটা গোলাকার বা বৃত্ত বসতির মতো। তবে এ ধরনের বসতিতে সাধারণতঃ গ্রামের চারদিকে এমন বেষ্টন বা দেওয়াল তৈরি করা হয় যে তা শত্রুদের পক্ষে অতিক্রম করা কঠিন হয়ে পড়ে। স্বভাবতই এই ধরনের বসতিতে নিরাপত্তার প্রশ্নটি বড় হয়ে দেখা দেয়, যেমন মধ্যপ্রদেশের বস্তার জেলায় গণ্ড মুরিয়াদের গ্রাম (চিত্র 1.3.3)। যদিও আজকের দিনে এই ধরনের বসতির

প্রয়োজনীয়তা অনেকাংশে ফুরিয়েছে, তবুও অতীতের সাক্ষ্য হিসেবে কোন কোন ক্ষেত্রে এই ধরনের বসতির সন্ধান মেলে।

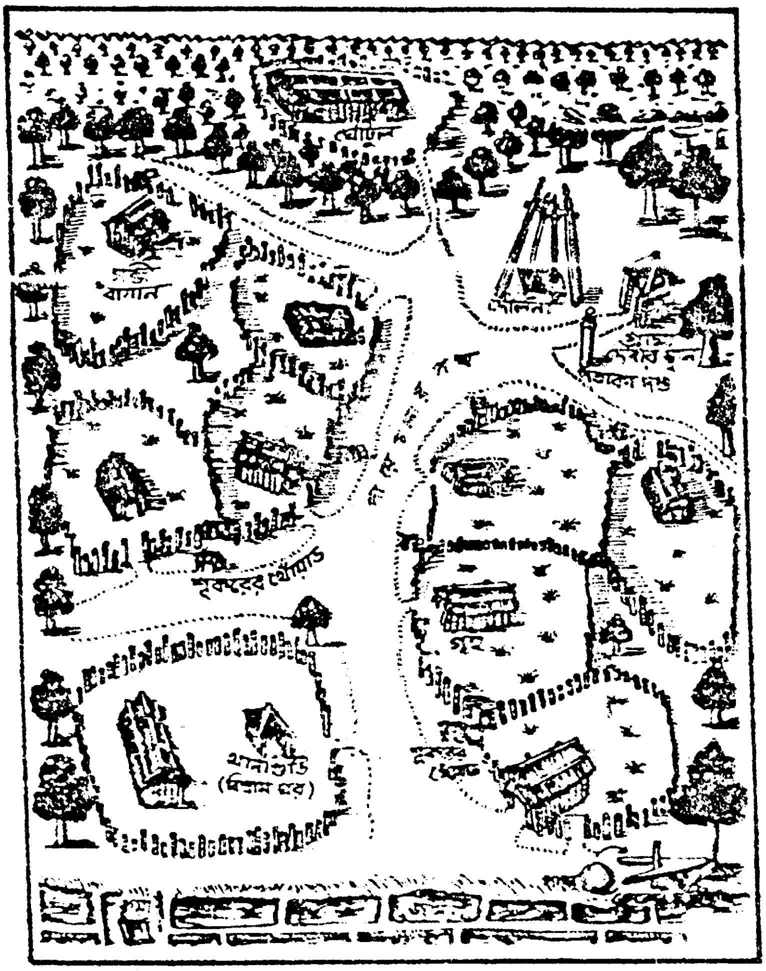

চিত্র 1.3.3 ঃ গণ্ড মুরিয়াদের গ্রাম

নক্ষত্রাকার বসতি (Start pattern village)

যখন গোলাকার বসতি পায়ে চলার পথ (foot path ও রাস্তা ধরে কয়েকটি দিকে বিস্তার লাভ করে, তখন ঐ গ্রামের আকার নক্ষত্রের ন্যায় হয়। এছাড়া যখন গ্রামের মাঝখান দিয়ে গরুর গাড়ি চলার পথ (cart track) ধরে নতুন নতুন বসতি চারদিকে বিস্তৃত হয় তখন তা নক্ষত্রাকার বলতি নামে পরিচিত হয়।

পাখাকৃতি বসতি (Fan pattern settlement)

এই ধরনের বসতিতে কোন কেন্দ্র থেকে চারদিকে বিস্তৃত গুরুত্বপূর্ণ গ্রাম্য পথের ওপর বাড়িগুলো অবস্থিত থাকে। কেন্দ্রবিন্দুতে জলাশয়, নদীর ধার, রাস্তা, ফলের বাগান, কূয়ো বা ধর্মীয় স্থান থাকতে পারে। গ্রামের পথগুলো এই কেন্দ্রে এমনভাবে এসে মিলিত হয় যে তা দেখতে অনেকটা পাখা বা শঙ্কুর মতো হয়। অনেক সময় গ্রামের একদিকে বেশি রাস্তা একত্রিত হয়। এর ফলেও এই ধরনের বসতির সৃষ্টি হয়।

টি (T) আকৃতি ও ওয়াই (Y) আকৃতি বসতি

যখন একটি রাস্তা অন্য একটি রাস্তার ঠিক বিপরীত থেকে এসে মিলিত হয়, তখন তা 'T' আকারের মতো দেখায় (চিত্র 1.3.4)। ঐ সব রাস্তার ধারে গড়ে ওঠা গৃহগুলোর সমন্বয় 'T' আকার বসতি সৃষ্টি

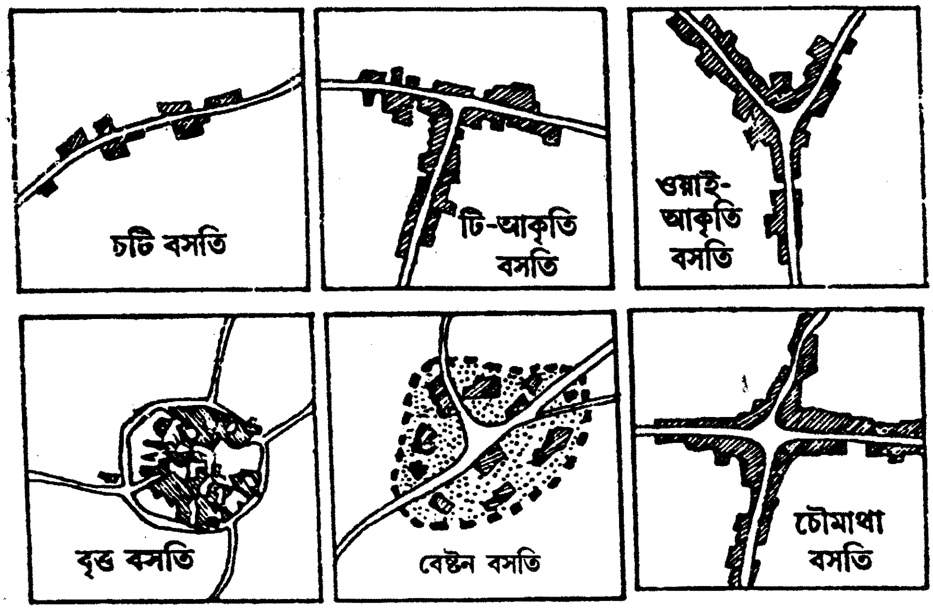

চিত্র 1.3.4 ঃ বসতির বিভিন্ন আকৃতিসমূহ (T, Y, Star ইত্যাদি)

করে। অনরূপভাবে, যখন তিনদিক থেকে আসা প্রতিটি রাস্তাই প্রায় স্থূল কোণ সৃষ্টি করে পরস্পর মিলিত হয়, তখন তা 'Y'-এর মতো দেখায়। ঐ সব রাস্তার পাশে গড়ে ওঠা বাড়িগুলো 'Y' বসতির সৃষ্টি করে। (বাকী, 1994)।

L আকৃতির গোষ্ঠীবদ্ধ (L-shaped compact) ঃ একটি রাস্তার সঙ্গে অপর একটি রাস্তা এসে সমকোণে মিলিত হলে এবং একটি রাস্তার দৈর্ঘ্য দৈর্ঘ্যের বসতি শেষ হয় অপর রাস্তাটির ক্ষুদ্র দৈর্ঘ্যে বসতির বিস্তার ঘটলে 'L' আকৃতির বসতি সৃষ্ট হয়।

মাছের কাঁটার ন্যায় গোষ্ঠীবদ্ধ (Fish-bone like compact) ঃ কোন প্রধান রাস্তার দুপাশ থেকেই যখন অপ্রধান রাস্তাগুলি সূক্ষ্মকোণে পরপর এসে প্রধান রাস্তার সঙ্গে মেলে এবং এইসব প্রধান ও অপ্রধান রাস্তাগুলিকে অনুসরণ করে বসতি গড়ে ওঠে, তখন বসতি অনেকটা মাঝের কাঁটার ন্যায় দেখতে হয়।

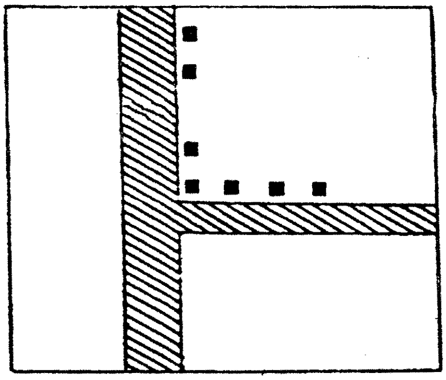

L-আকৃতির বসতি

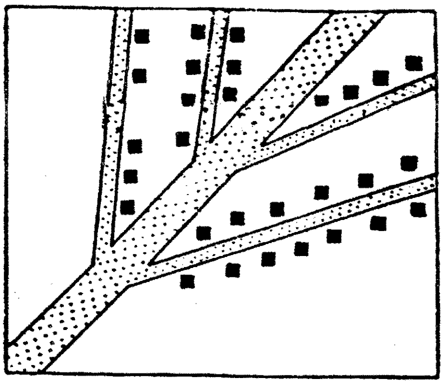

মাছের কাঁটার ন্যায় গোষ্ঠীবদ্ধ

ঝুলন্ত গোষ্ঠীবদ্ধ (Hanging compact) ঃ পার্বত্য অঞ্চলে সমতল ভূমির অভাবে সমোন্নতি রেখা বরাবর বিশেষ করে খাড়া ঢালের ঠিক ওপরে সংকীর্ণ স্বল্প ঢালে যে জনবসতি গড়ে ওঠে তা দূর থেকে দেখে পাহাড়ের গায়ে ঝুলন্ত বলে মনে হয়। উত্তর-পূর্ব ভারতের পাহাড়ী অঞ্চলে পূর্বঘাট পর্বতে এরূপ অনেক গ্রাম দেখা যায়।

বৃক্ষাকৃতি গোষ্ঠীবদ্ধ (Dendritic pattern compact) ঃ সমৃদ্ধ ও ঘনবসতি যুক্ত কৃষি এলাকায় নানদিক থেকে পথ মিলে মিশে বৃক্ষরূপ দারণ করে এরূপ বসতি নক্শার উদ্ভব হয়।

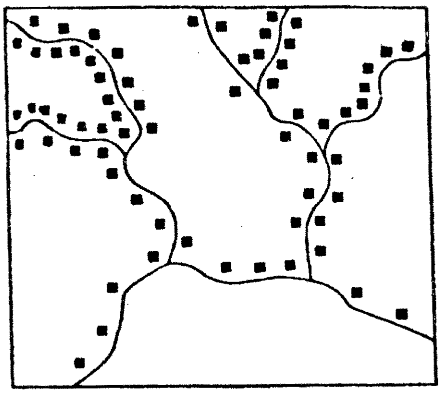

বৃক্ষরূপী জনবসতি

ত্রিভুজাকৃতি গোষ্ঠীবদ্ধ (Triangular compact) ঃ পরিত্যক্ত পরিশঙ্কুতে, পাহাড়ের গায়ে উপযুক্ত স্থানে বা একাধিক পথের সংযোগস্থলে বসতি অনেক ক্ষেত্রে ত্রিভুজাকৃতি প্রাপ্ত হয়।

পাখাকৃতি গোষ্ঠীবদ্ধ (Fan-shaped compact) ঃ পরিত্যক্ত পলল ব্যজনীতে (Alluvial Fan) সমতলে বিভিন্ন দিক থেকে বিভিন্ন কোণে রাস্তা এসে মিলিত হয়ে পাখার মতো বিস্তৃত বসতি সৃষ্ট হলে এই আকৃতি গড়ে ওঠে।

দ্বৈতগ্রাম (Double village)

যখন দু'টো মৌজা (রাজস্ব গ্রাম, revenue village) একই এলাকায় (site) বিকাশ লাভ করে, তখন তাকে দ্বৈত গ্রাম বলে। রাজস্ব ও প্রশাসনের দিক দিয়ে দুটো গ্রাম আলাদা কিন্তু ভৌগোলিক বিচারে তারা একই সত্তাবর অন্তর্ভুক্ত। কখনও কখনও ঢিবি, জলাশয় বা নদীর দু'পাড়ে এই ধরনের গ্রাম সৃষ্টি হয়। নতুন রেল স্টেশনের ধারে বাড়ি ও দোকান তৈরি হলেও এই ধরনের গ্রাম বিকাশ লাভ করে, যদিও দু'টি একই নামের গ্রামের মধ্যে 3/4 কি.মি. দূরত্ব থাকতে পারে। উত্তরপঙ্গের নিউ জলপাইগুড়ি-গুয়াহাটি রেলপথে এই রকম অনেক বসতি গড়ে উঠেছে, সেগুলো মূল বসতি থেকে দূরে, কিন্তু ঐ সব নতুন বসতির নামের আগে 'নিউ' কথাটি যোগ করা হয়েছে। নিউ দোমোহনি নিউ ময়নাগুড়ি, নিউ বাণেশ্বর ইত্যাদি। এই ধরনের নাম থেকে এটা পরিষ্কার যে ঐ একই নামে আর একটি বসতি আছে।

আকৃতি-বিহীন গ্রাম (Amorphous village)

এই ধরনের বসতির বৈশিষ্ট হল প্রধান বসতি থেকে সামান্য ব্যবধানে গড়ে ওঠা কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লী (hamlet) বা পাড়া, যা মেটো পথের সাহায্যে প্রধান বসতির সঙ্গে যুক্ত থাকে। এক্ষেত্রে গ্রামের কোনো নির্দিষ্ট আকার থাকে না, কারণ গোটা অঞ্চল জুড়েই বিক্ষিপ্তভাবে বসতিগুলো গড়ে ওঠে।

(খ) পরিমাত্রিক মতবাদ (Quantitative view)

এই মতবাদের প্রবক্তাদের মতে গ্রামের আদর্শ বহিঃস্থ আকার (Outer shape) হবে গোলাকার। এর থেকে ব্যতিক্রম হলে তা জ্যামিতিক নিয়মে পরিমাপ করা যাবে। এই মতবাদের প্রবক্তাদের মতে গ্রামটি সমতল জমির ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং সেখানে কোন রকম প্রাকৃতিক বা সাংস্কৃতিক বাধা নেই। সেক্ষেত্রে কোন কেন্দ্রস্থ বস্তু (Nucleus) যেমন পুষ্করিণী, মন্দির বা বড় গাছের চারধারে গ্রামটি গোলাকার ভাবে বিকাশ লাভ করবে।

Christaller ও Losch-এর মত তাত্ত্বিক ভৌগোলিকেরা কোন স্থানের (তা গ্রামও হতে পারে, শহরও হতে পারে) আকার (Shape) ও দু'টি স্থানের মধ্যেকার ব্যবধান নির্ণয় করতে গিয়ে কেন্দ্রীয় স্থানতত্ত্ব বা Central place theory-র (দ্বিতীয় খণ্ড তৃতীয় পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) ষড়ভূজ মডেলের (hexagonal model) সাহায্য নিয়েছেন। কিন্তু সাম্প্রতিককালে সমাজবিজ্ঞানীদের কাছে অন্যান্য আকারের চেয়ে "জাফিরির সরলরেখা আকার" (rectilinear pattern of lattice) মডেল অনেক বেশি গ্রাহ্য মনে হয়েছে।

Thompson সর্বপ্রথম বসতির আকার বিশ্লেষণ মতবাদ প্রবর্তন করেন। পরবর্তীকালে নদী অববাহিকার আকার বিশ্লেষণ করতে Miller আরও সহজভাবে ব্যাপারটাকে ফুটিয়ে তোলেন। তাঁর সূত্রটি হল—

$$S = \frac{Ab}{Ac}$$

নদী অববাহিকার আকৃতি (S) হল নদী অববাহিকার আয়তন (Ab) ও একই পরিসীমা যুক্ত বৃত্তের আয়তনের (Ac) অনুপাত। ব্রাজিলের অনেক গ্রামের আকার বিশ্লেষণ করতে Haggett একই সূত্র ব্যবহার করেছেন। সূত্রটি হল S = A/L, অর্থাৎ বসতির আকারের সূচক (Index) হল ঐ গ্রামের আয়তন (A) ও কোন ক্ষেত্রের পরিসীমা হিসেবে বৃত্তের আয়তনের অনুপাত। পরবর্তীকালে Simmon বা Bovce ও Clark শহরের াকার সম্বন্ধে নানা প্রকার গবেষণা করলেও এটা দেখা গেছে ভারতীয় গ্রামের ক্ষেত্রে Miller-এর বিশ্লেষণ যথোপযুক্ত (Singh, 1975)। Miller-এর আকারের সূচকের সর্বোচ্চ মান হল 1·00 ও সর্বনিম্ন মান হল 0। এর মাঝে অন্যান্য মান রয়েছে, যেমন 0·42 সূচক হল ত্রিকোণাকার, 0·64 চতুষ্ক ও 0·83 ষড়ভুজ আকার গ্রাম।

3.6.3 গ্রাম্য বসতির প্রকারভেদ (Types of Rural settlement)

বসতির উৎপত্তি আলোচনা থেকে আমরা দেখলাম কোথাও তা স্থায়ী সংঘবদ্ধ রূপ পেয়েছে, কোথও তা বিক্ষিপ্ত ভাবে, আবার কোথাও তা একটি সরলরেখা বরাবর গড়ে উঠেছে। উপরিউক্ত অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে ও বাসগৃহসমূহের পরস্পরের মধ্যে ব্যবধানের ভিত্তিতে বসতিকে তিন ভাগে ভাগ করা যায় ঃ—

1. সংঘবদ্ধ বা গোষ্ঠীবদ্ধ বা পিণ্ডাকৃতি বসতি (Compact or nucleated or agglomerated settlement)

2. ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন বসতি (Dispersed or scattered settlement)

3. রৈখিক বা দণ্ডাকৃতি বসতি (Linear settlement)

I. সংঘবদ্ধ বা গোষ্ঠীবদ্ধ বসতি

এই ধরনের বসতিতে কোন এক স্থানে বেশ কয়েকটি পরিবার অনেক বাসগৃহে, একত্রিত হয়ে বসবাস করে। এই ধরনের বসতি আয়তনে ছোটগ্রাম (Hamlet) হতে পারে, আবার মহানগরও (Metropolis) হতে পারে। এই ধরনের বসতির যে যে লক্ষণ চোখে পড়ে তা হল এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়ির দূরত্ব কম, বাসগৃহের একত্র সমাবেশ ও গৃহসমূহের পরস্পরের মধ্যে ও বহির্জগতের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা যা সেখানকার বাসিন্দারা নিজেদের সামাজিক বন্ধন ও অর্থনৈতিক লেনদেনের স্বার্থেই গড়ে তোলেন। যদি স্থানটি অর্থনৈতিক দিক দিয়ে উন্নত হয়, তবে সেখানে আরও জনসমাগম ঘটবে ও সেই সঙ্গে পথঘাটেরও উন্নতি হবে। এইভাবে একাধিক রাস্তার সংযোগস্থলে অবস্থিত বর্ধিষ্ণু বসতিটি কালক্রমে শহর বা নগরে পরিণত হবে। আয়তন ও কর্মধারার ভিত্তিতে সংঘবদ্ধ বা গোষ্ঠীবদ্ধ বসতিকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা—

(A) গ্রামীণ গোষ্ঠীবদ্ধ বসতি ঃ—

পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ গ্রামে বাস করে। এদের অর্থনীতির ভিত্তি হল কৃষি। তবে গ্রামের মধ্যেও কিছু কিছু অন্যান্য বৃত্তিধারী (যেমন তাঁতী, জেলে, কাঠুরে, কামার) পরিবার বাস করে। তবে এদের সংখ্যা কৃষিজীবীদের তুলনায় খুব কম। তাই বলা চলে অধিকাংশ গ্রামই হল কৃষি নির্ভর। এখানে ব্যবসা বাণিজ্যের স্থান নগণ্য।

(B) পৌর শহর বসতি ঃ—

যে সব বসতির বেশির ভাগ লোক কৃষি ছাড়া অন্যান্য বৃত্তিতে অর্থাৎ তৃতীয় পর্যায়ের (tertiary) কোনো অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের সাথে যুক্ত, তাকে অ-কৃষি গ্রামীণ বসতি বা পৌর বসতি বলে। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে গোষ্ঠীবদ্ধ বসতি দেখা যায়। বহু প্রাচীনকাল থেকেই এশিয়া, আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার অনেক স্থানে মানুষ গোষ্ঠীবদ্ধ ভাবে চাষবাস করে আসছে। নবপ্রস্তর যুগেও এশিয়া ও ইউরোপের অনেক স্থানে গোষ্ঠীবদ্ধ গ্রামের সন্ধান মিলেছে। এটা দেখা গেছে যে অতীতের স্থানান্তর কৃষি যখন স্থায়ী কৃষিতে পরিণত হয়েছে, তখন গোষ্ঠীবদ্ধ বসতি জন্ম নিয়েছে। C.I.S.-এ (সাবেকী রাশিয়ার) সরকারীক তত্ত্বাবধানে খামার পরিচালিত হয় বলে সেখানে বড় বড় খামার গড়ে উঠেছে। উত্তর-পশ্চিম ইউরোপে, এমন কি মেরু অঞ্চলেও গোষ্ঠীবদ্ধ বসতি দেখা যায়। ভারতের গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র সমভূমি, মালব মালভূমি, মহারাষ্ট্র ও রাজস্থানের কিছু অংশে সংঘবদ্ধ বসতি দেখা যায়।

সামাজিক কারণ সমূহ ঃ

এই ধরনের বসতি গড়ে ওঠার পেছনে মানুষের সংঘবদ্ধ ভাবে বসবাস করার প্রবণতা বহু প্রাচীনকাল থেকে কাজ করে আসছে। Man is a gregarious animal and to achieve very close contiguity may……prefer to inhabit a large communal dwelling". (Hudson, F.S.)। সমাজবদ্ধ জীব মানুষ তার নিজস্ব প্রয়োজনে একত্রে বসবাস করতে চায়। বুনো জন্তু জানোয়ার ও হিংস্র প্রাণীদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মানুষ বহু প্রাচীনকাল থেকে দলবদ্ধভাবে বসবাস করে আসছে। অতীতে দেখা গেছে যে যুদ্ধ বিগ্রহের সময় প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে কৃষকেরা একত্রিত হয়ে গ্রামে বসবাস করতে বাধ্য হত। কিন্তু যখন নিরাপত্তার প্রয়োজন ফুরিয়ে যেত, তখন তারা গ্রাম ছেড়ে নিজেদের খেয়াল খুশিমত জমিতে গিয়ে বসবাস করত। সংঘবদ্ধভাবে বসবাসের প্রয়োজনীয়তা ও নিরাপত্তার প্রশ্ন ছাড়া আর যে যে কারণে গোষ্ঠীবদ্ধ বসতির উদ্ভব হয়, তাদের মধ্যে আছে ভূ-প্রকৃতি, মাটির গুণাগুণ, জলের উৎস ইত্যাদি।

ভূ-প্রকৃতি ও মৃত্তিকা ঃ

সাধারণতঃ সমতল ভূমিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বাস করার সুবিধে আছে। কিন্তু বন্ধুর ভূমি বা পাহাড়ী এলাকায় যেখানে বসতি বিস্তারে বাধা আছে, সেখানে বসতি সংঘবদ্ধ রূপ নেয়। পাহাড়ী অঞ্চলে পর্যাপ্ত

চাষের জমি পাওয়া মুশকিল। তাই যেখানে একটু জমি পাওয়া যায়, সেই চাষযোগ্য জমিকে বাঁচিয়ে মানুষ অল্প স্থানেই বসতি স্থাপন করে। সুতরাং একথা যথার্থই বলা হয়ে থাকে। "The clustered villages are common in districts where the arable land are continuous, admitting of uniform and extensive exploiation". (Demangeon)।

জল ঃ

জীবন ধারণের জন্য ও চাষবাসের জন্য জলের প্রয়োজন। যে সব জায়গায় জল পাওয়ার অসুবিধে আছে, সেখানে জলের উৎসকে কেন্দ্র করে মানুষ ঘন সন্নিবিষ্টভাবে বাস করে।

2. ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন বসতি ঃ

"In areas of dispersed settlement, the houses are scattered among the fields or grouped in hamlets". (Leong and Morgan)। এই ধরনের বসতিতে একটি পরিবার অন্যান্য পরিবারে থেকে বহু দূরে বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস করে। কানাডা বা যুক্তরাষ্ট্রের খামার বসতি বা অস্ট্রেলিয়ার মেষপালন কেন্দ্র এই ধরনের বসতির উদাহরণ। কখনও কখনও দু'টি বা তিনটি পরিবারও একত্রে বসবাস করেন। তবে এক্ষেত্রেও এদের অতি ক্ষুদ্র বসতি অপর ক্ষুদ্র বসতি থেকে দূরে অবস্থান করে। জলপাইগুড়ি জেলায়র "জোত" বা "টাড়" (tanr) গ্রাম (কৃষি ভূখণ্ডের মধ্যে ভূস্বামী ও তার দু'একজন আধিয়ার প্রজার বসত গৃহ) কিংবা বিহারের পালামৌ বা রাঁচী মালভূমির দুর্গম অরণ্য অঞ্চলে (অরণ্য বসতি) বিচ্ছিন্নভাবে বসবাসকারী দু'তিনটি পরিবারের অতি ক্ষুদ্র গ্রাম এই ধরনের বসতির পর্যয়ে পড়ে। উপরোক্ত দু'ধরনের বিক্ষিপ্ত বসতি ছাড়াও আরও এক ধরনের বসতি আছে যেখানে এক গ্রাম থেকে অপর গ্রামের দূরত্ব খুব বেশি। পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ ও নদীয়া জেলার সীমান্ত অঞ্চলের (যার পোশাকী নাম হল কালান্তর) বসতিগুলো বড় হলেও একটি থেকে অপরটি বহু দূরে অবস্থিত (চিত্র I. 3.5)। সম্ভবতঃ এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে যেতে যথেষ্ট শারীরিক ক্লেশ হয় বলে ঐ অঞ্চলের নাম কালান্তর হয়েছে। হিমালয়ের বনধুর পার্বত্য অঞ্চলে শারীরিক ক্লেশ হয় বলে ঐ অঞ্চলের নাম কালান্তর হয়েছে। হিমালয়ের বন্ধুর পার্বত্য অঞ্চলে এমন কিছু বসতি আছে যেখানকার এক অঞ্চলের উপত্যকায় বসবাসকারী অধিকাবসীদের সঙ্গে অন্যদিকের উপত্যকাবাসীদের সারা জীবনে দেখা সাক্ষাৎ হয় না। এই ধরনের বসতিগুলো বিক্ষিপ্ত বসতির পর্যায়ে পড়ে। বিক্ষিপ্ত বসতির বৈশিষ্ট্যগুলো হল ঃ—

(1) দু'টি বাসগৃহ বা বসতির মধ্যে যথেষ্ট ব্যবধান।

(2) অতি ক্ষুদ্র পরিবারভুক্ত বসতি ও

(3) অধিবাসীদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিচ্ছিন্নতা।

কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই সব বাসিন্দারা বিশেষ সুযোগ সুবিধে-ভোগ করে। যেমন (a) কর্মস্থলে বসবাসের জন্য যাতায়াতের সময় সাশ্রয়, (b) কৃষকদের স্বাধীনভাবে নিজস্ব পদ্ধতিতে কৃষিকর্ম পরিচালনা করা ও (c) পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের কৃষকদের প্রভাব থেকে মুক্ত থাকা ইত্যাদি। কিন্তু এই সব বাসিন্দারা সামাজিক দিক দিয়ে বিচ্ছিন্নতায় ভোগে। অবসর সময়ে এরা একঘেঁয়েমিতে ভোগে। নিরাপত্তার অভাব ছাড়াও বিচ্ছিন্নাভাবে বাস করার দরুন তারা কৃষি ক্ষেত্রে নতুন আবিষ্কারের ফলে থেকে বঞ্চিত হয়।

বিক্ষিপ্ত বসতি গড়ে ওঠার পেছনে কতকগুলো প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক কারণ কাজ করে। পৃথিবীর অধিকাংশ বিক্ষিপ্ত বসতি বন্ধুর ভু-প্রাকৃতিক অঞ্চলে গড়ে উঠেছে। বনধুর ভু-প্রকৃতিতে যেমন কৃষিকাজের জন্য সমতল জায়গা পাওয়া যায় না, তেমনি এখানে যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলাও কষ্টসাধ্য। এখানকার

চিত্র 1.3.5 ঃ বন্যাকবলিত কালান্তর অঞ্চলের বসতি

অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা ও বিক্ষিপ্ত বসতি গড়ে ওঠার অন্যতম কারণ। জলাভাব, জলাভূমির অস্তিত্ব, ক্ষয়িত ভূমিভাগ, বনভূমি, অনুর্বর মাটি, মোরেন অধ্যুষিত অঞ্চল অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিক্ষিপ্ত বসতির জন্ম দেয়। সংঘবদ্ধ বসতিতে আমরা উল্লেখ করেছিলাম যে সব স্থানে জল পাওয়ার অসুবিধে আছে, সেখানে জলের উৎসকে কেন্দ্র করে সংঘবদ্ধ বসতি জন্ম নেয়। বিক্ষিপ্ত বসতিতে কিন্তু এর বিপরীত অবস্থা কাজ করে। যত্রতত্র জল পাওয়া যায় বলে বাড়িগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে গড়ে তুলতে অসুবিধে হয় না। ফলে বিক্ষিপ্ত বসতির সৃষ্টি হয়।

উপরোক্ত প্রাকৃতিক কারণগুলো ছাড়াও আরও কতকগুলো কারণ কোন কোন অঞ্চলে বিক্ষিপ্ত বসতির সৃষ্টি করে। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে অতীতে কৃষকেরা শত্রুদের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে একত্রে সংঘবদ্ধভাবে বাস করত। কিন্তু যখনই প্রতিরক্ষার আর কোন প্রয়োজন থাকল না, তখন তারা স্বাধীনভাবে কৃষি জমিতে ছড়িয়ে বাস করতে লাগল। এইভাবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিক্ষিপ্ত বসতির সৃষ্টি হল। পার্বত্য পশুপালক যাযাবররা বিক্ষিপ্তভাবে বাস করে। প্রযুক্তিবিদ্যায় উন্নত দেশগুলোতে আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতির সাহায্যে এক একজন কৃষক বহুদূরব্যাপী বিস্তৃত জমি চাষ করতে সক্ষম। যুক্তরাষ্ট্রের খামার বাড়ি (Farm house) এধরনের বিক্ষিপ্ত বসতির উদাহরণ। ঠিক কি কারণে যুক্তরাষ্ট্রের খামার বাড়ি (Farm house) এধরনের বিক্ষিপ্ত বসতির উদাহরণ। ঠিক কি কারণে বিক্ষিপ্ত বসতি গড়ে ওঠে, তা সঠিক ভাবে বলা যায় না তবে স্থানীয়ভাবে কিছু কিছু প্রাকৃতিক ও সামাজিক কারণ বিক্ষিপ্ত বসতি বিস্তারে সাহায্য করে।

Leong এবং Morgan যথার্থই মন্তব্য করেছেন যে, "Almost everywhere in the world nucleated settlement is more common than dispersed"। বস্তুতপক্ষে, পৃথিবীর অল্পস্থানেই বিক্ষিপ্ত বসতি দেখা যায়। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বিক্ষিপ্ত বসতির উদাহরণ হল কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রেইরির তৃণক্ষেত্র, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডের গোচারণ ক্ষেত্র ইত্যাদি। প্রদানত শুষ্ক জলবায়ু ও আংশিকভাবে অনুর্বর মাটির দরুন এখানকার কৃষিক্ষেত্রগুলো খুব বৃহদাকাব হয়। মধ্য ইউরোপের উচ্চভূমি, স্ক্যাণ্ডেনেভিয়ার দেশগুলো, মেক্সিকোর উচ্চভূমি, দক্ষিণ পর্তুগাল, পশ্চিম ফ্রান্স,উত্তর জাপান, পূর্ব আফ্রিকার উচ্চভূমি অঞ্চল এবং ভারতবর্ষের পশ্চিম হিমালয় অঞ্চল, বিহার ও উত্তরপ্রদেশের পূর্ব দিকের বন্যাকবলিত অঞ্চল, পশ্চিমঘাট পর্বতের অংশবিশেষ ও মালাবার মালভূমিতে এই ধরনের বসতি দেখা যায়।

3. লাইনবন্দী বা সারিবদ্ধ বসতি

এই ধরনের বসতিতে বাড়িগুলো একই সরলরেখায় গড়ে ওঠে। প্রধানত প্রাকৃতিক এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে সামাজিক কারণ এই ধরনের বসতি গড়ে উঠতে সাহায্য করে।

প্রাকৃতিক কারণ ঃ

নদী তীরবর্তী উচ্চ স্বাভাবিক বাঁধের ধারে বা উপকূল অঞ্চলে বালিয়াড়ি বরাবর এই ধরনের বসতি গড়ে ওঠে। অনেক সময় দুই বালিয়াড়ির মধ্যবর্তী অঞ্চলে ও ঝড়ের প্রকোপ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এই ধরনের বসতি দেখা যায়। যেমন দীঘা ও উড়িষ্যার সীমান্তবর্তী উপকূলে। বন্যাকবলিত অঞ্চলে রাস্তা উঁচু করে বাড়িঘরের তৈরি করা হয় (চিত্র 1.3.6)। এই সব এলাকায় রাস্তার ধারে সারিবদ্ধভাবে বসতি গড়ে ওঠে, যেমনটি দেখা যায় মুর্শিদাবাদ ও নদীয়ার সীমান্তবর্তী কালান্তর অঞ্চলে। ভারতীয় জরিপ

বিভাগ কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত মানচিত্রগুলো (Tapogyapmcal sheets) তুলনা করলে দেখা যায় বন্যাকবলিত কালান্তর অঞ্চলে রাস্তার ধারে বসতি গড়ে ওঠার প্রবণতা সাম্প্রতিককালে বৃদ্ধি পেয়েছে (চিত্র 1.3.5 দ্রঃ)।

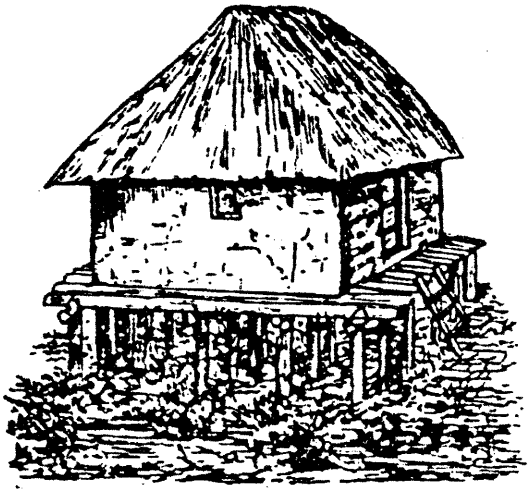

চিত্র 1.3.6. ঃ উড়িষ্যার উপকূলের জেলাগুলোর গৃহের চিত্র (Anthropological survey of India অবলম্বনে)

সামাজিক কারণ ঃ

ভারতবর্ষের অনেক উপজাতিরা একসঙ্গে বসবাস করে। অনেক সময় দেখা যায় বাড়ির চালগুলো একটাই। কিন্তু প্রত্যেক গৃহস্বামীর প্রকোষ্ঠ আলাদা। উত্তর-পূর্ব ভারতের নাগা, মিশমি উপজাতিরা এই ধরনের বাড়িতে বাস করে, যা লাইনবন্দী বসতিরই আর এক রূপ। সাঁওতাল উপজাতিরা রাস্তার দু'ধারে সারিবদ্ধভাবে বাস করে। এক সময় আমাদের দেশে নদীর ধারে বসতি গড়ে ওঠার প্রবণতা ছিল, কারণ নদীই ছিল আমাদের জীবন রেখা (Life line)। কিন্তু বর্তমান সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে এই মানসিকতায় কিছুটা পরিবর্তন এসেছে। এখন রাস্তার ধারে বসবাসের ঝোঁক লক্ষ্য করা যায় স্থানীয় বা পূর্ববঙ্গ থেকে আগত ছিন্নমূল উদ্বাস্তুদের মধ্যে (চিত্র I. 3.7)। বেশিৰ ভাগ্ ক্ষেত্রেই দেখা যায় পূর্ববঙ্গ থেকে আগত শরণার্থীরা রাস্তা বা রেললাইনের ধারে ঝুপড়ি বেঁধেছে। এই সব জমি খাস জমি (Vested land)। এই সব স্থানে বসতি গড়ে তোলার পেছনে তাদের যুক্তি হল যেহেতু এগুলো সরকারী সম্পত্তি, তাই তা সর্বসাধারণের সম্পত্তি এবং প্রত্যেকেই এই জায়গা জবরদখল করে বাস করতে পারে। তাই সাম্প্রতিকালে দমদম ক্যাণ্টনমেন্ট থেকে শুরু করে বনগাঁ পর্যন্ত রেলপথেৰ অনেক স্থানে একটানা লম্বা বসতি বা নদীয়ার রানাঘাট ও তেহট্ট বা মুর্শিদাবাদের বহরমপুর এলাকায় বা উত্তরবঙ্গের সেবক-নাগরাকাটা সড়ক পথেৰ ধারে এই ধরনের বসতি দেখা যায়।

3.6.4 **কর্মধারা ও গ্রামীণ বসতির প্রকারভেদ (Functions and types of rural settlements)**

এতক্ষণ আমরা আঞ্চলিক (জলবায়ু) ভিত্তিতে বাসগৃহ ও তার গঠন নিয়ে আলোচনা করলাম। এবার আমরা বৃত্তির ভিত্তিতে গ্রামীণ বসতির প্রকারভেদ নিয়ে আলোচনা করব। গ্রামীণ বসতির প্রধান কর্মধারা হল কৃষিকার্য। কিন্তু আমরা আগেই জেনেছি যে পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে কোথাও পশুচারণ, কোথাও মৎস্যশিকার, আবার কোথাও বা কাষ্ঠশিল্প বৃত্তিহিসেবে বিকাশ লাভ করেছে। এবার আমরা দেখব বসতির প্রকরভেদের ওপর বিভিন্ন বৃত্তির প্রভাব কি রকম?

পশুপালন বৃত্তি অতীতেও ছিল, বর্তমানেও আছে। সাভানা ও স্টেপ অঞ্চলসমূহে আধুনিক ও সনাতনী উভয় প্রথাতেই পশুপালন হয়ে থাকে। এই সকল স্থানে বিক্ষিপ্ত (যেমন যুক্তরাষ্ট্র) ও সংঘবদ্ধ উভয় প্রকার বসতিই আছে।

বর্তমান কম সংখ্যক লোকই পশুশিকার বৃত্তিকে আঁকড়ে আছে। তবুও নিরক্ষীয় অঞ্চলের অরণ্য পরিবেশে, তুন্দ্রা অঞ্চলে, তৈগা অঞ্চলে আজও এই বৃত্তি টিকে আছে। অরণ্য পরিবেশের বসতি ছোট আয়তনের ও বিক্ষিপ্ত ধরনের হয়ে থাকে। কারণ অরণ্যবাসীদের প্রাকৃতিক সম্পদের ওপরেই নির্ভর করতে হয়। প্রকৃতির নিজস্ব একটা সীমাবদ্ধতা থাকে, আর প্রকৃতি লালিত এই সব মানুষেরা প্রকৃতি থেকে অতিরিক্ত সম্পদ সংগ্রহ করার চেষ্টা করে না। স্বভাবতই এই ধরনের বসতিগুলো আয়তনে ছোট হয়। একই কথা খাটে তুন্দ্রা অঞ্চলের বসতি সম্পর্কে। আমাজন অববাহিকায় গ্রামগুলো ছোট ছোট হয়। রাস্তায় মাঝখানটা ছেড়ে দিয়ে দু'পাশে রৈখিক (Linear) বসতি গড়ে ওঠে।

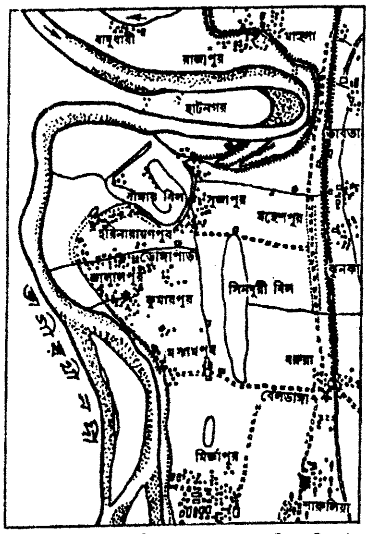

চিত্র 1.3.7.1 ঃ নদী উপত্যকায় বসতির বিবর্তন (1910-র দশকে)

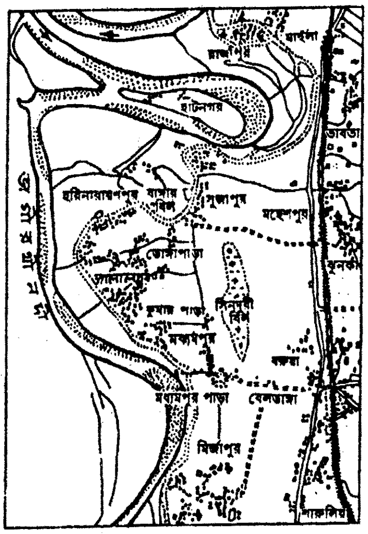

চিত্র 1.3.7.2 ঃ নদী উপত্যকায় বসতির বিবর্তন (1950-র দশকে)

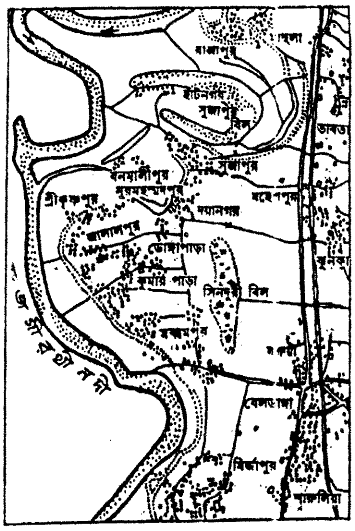

চিত্র 1.3.7.3 ঃ নদী উপত্যকায় বসতির বিবর্তন (1950-র দশকে S.O.I. টোপোম্যাপ অবলম্বনে)

মৎস্যশিকার ও মৎস্যচাষ এক শ্রেণীর মানুষের উপজীবিকা। মৎস্য ভিত্তিক গ্রামীণ বসতি বিভিন্ন প্রকারের হয়। যেমন বলা চলে স্বয়ংভোগী মৎস্যচাষ (Subsistence fishing) কেন্দ্রের চাষীরা নিজেরা খাবার পর সামান্য অংশই বাজারে বিক্রির জন্য রাখতে পারে। তাই এই সব বসতি বেশি সংখ্যক মানুষকে ভরণপোষণে সাহায্য করতে পারে না। ছোট ছোট জলাশয়ের কাছে বিক্ষিপ্তভাবে মৎস্য গ্রাম গড়ে ওঠে। ছোট ছোট মৎস্য গ্রামের স্থায়িত্ব নির্ভর করে মৎস্যের জোগানের ওপর। কোন জলাশয় বা নদীতে যদি মৎস্য জোগানে ভাঁটা পড়ে, তবে মৎস্যজীবীদের জীবিকাতেও টান পড়বে। ফলে মৎস্যজীবীরা সে সব

গ্রাম ত্যাগ করতে বাধ্য হবে। পদ্মার মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ায় দলঙ্গী, চূর্ণী, ইছামতীতে আর আগের মত মাছ পাওয়া যায়না। ফলে অনেক ধীবর পরিবার নদীর ওপরনির্ভরতা ত্যাগ করে হয় অন্য বৃত্তি অবলম্বন করেছে, নয়তো ঐ সব গ্রাম পরিত্যাগ করেছে। যে সব অঞ্চলে বৃহদায়তন মৎস্যচাষ গড়ে ওঠে, সেখানে বড় ঘনসন্নিবিষ্ট বসতি (large compact settlement) গড়ে ওঠে। সমুদ্র সৈকত অঞ্চলে এই ধরনের বসতি রৈখিক (Linear) রূপ নেয়। অনেক সময় মৎস্যচাষীদের পুনর্বাসন দেবার ফলে মৎস্য গ্রাম গড়ে ওছে। ঐ সব গ্রাম কিছু কিছু ক্ষেত্রে রৈখিক বসতির রূপ নেয়। যেমন নদীয়া জেলার হরিণঘাটা থানার পশ্চিম সাতবেড়িয়া গ্রাম। এখানে বিলের ধারে লাইন বন্দী বসতি গড়ে উঠেছে।

অরণ্য সম্পদের প্রাচুর্য ও ব্যবহার পরিবেশ অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকার বসতির সৃষ্টি করে। যেমন নিরক্ষীয় অঞ্চল অরণ্যসম্পদে সমৃদ্ধ হলেও বিভিন্ন কারণে তার ব্যবহার সীমিত। পরিবেশের প্রতিকূলতার দরুন মানুষ এখানে বৃক্ষবাসী বা ক্ষেত্রবিশেষে মাচার ওপর কুটির তৈরি করে। স্বভাবতই এই সব বসতি ক্ষুদ্র ও বিক্ষিপ্ত হয়। তবে ইদানীং ক্রান্তীয় অঞ্চলের উন্নত অরণ্য পরিবেশে গড়ে ওঠা বাগিচাকে (Forest plantation) কেন্দ্র করে ঘনসন্নিবিষ্ট বসতি সৃষ্টি হয়েছে। উন্নত দেশ উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপে সরলবর্গীয় অরণ্যের গুরুত্ব অপরিসীম। এখানে বিক্ষিপ্ত, সন্নিবিষ্ট বা রৈখিক বসতিও দেখা যায়। আবার কাঠ চেরাই শিল্পে উন্নত স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার দেশগুলোতে ঘন সন্নিবিষ্ট বসতি লক্ষ্য করা যায় (ভট্টাচার্য্য ও ভট্টাচার্য, 1977)

কৃষিসম্পদের ওপর নির্ভরশীল কৃষি বসতির আয়তন ছোট, মাঝারি ও বড় হতে পারে। এই সব বসতির আকার বৃত্তাকার, উপবৃত্তাকার বা বর্গাকারও হতে পারে।

যে সকল গ্রামীণ বসতিতে ক্ষুদ্রশিল্প ও কুটির শিল্প গড়ে ওঠে, সেই সব বসতি আয়তনে বড় হয়।ষ এই সব বসতি রেখাকৃতি, আবার ঘনসন্নিবিষ্টও হতে পারে। বাজার-কেন্দ্রিক এই সব শিল্প যোগাযোগের মাধ্যমকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে বলে এই সব বসতি রেখাকৃতি হয়। যেমন মুর্শিদাবাদের রেশম শিল্পকেন্দ্র চক্‌ ইসলামপুর। আবার অনেক সময় পথ ও উপপথকে (lane) কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা এই সব বসতি আয়তাকার হয়, যেমন বিখ্যাত তাঁত শিল্পকেন্দ্র ফলিয়া।

সবশেষে বলতে হয় বিভিন্ন দেশের বসতির বৈশিষ্ট্যের মধ্যে প্রভেদ থাকলেও তাদের কর্মধারার মধ্যে এক আশ্চর্য সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়, যেমন পশুশিকার, মৎস্যশিকার ও মৎস্যচাষে বিভিন্ন দেশের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য থাকা সত্ত্বেও তাদের কর্মধারার মধ্যে একটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়। বহুদূরে অবস্থিত হলেও আটলান্টিক মহাসাগরের উভয় দিকের নিরক্ষীয় অরণ্য পরিবেশে গড়ে ওঠা আমাজন ও কঙ্গো অববাহিকার কাষ্ঠকর্তন শিল্প বা ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার তৈগা বনভূমির কাষ্ঠকর্তন শিল্পের কর্মধারার মধ্যে একটা সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। তাই বলা চলে গ্রামীণ বসতির বৈচিত্র্যের মধ্যে একটা ঐকসূত্র পাওয়া যায়।

3.7 গ্রামীণ বসতির বিবর্তন (Evolution of rural settlement)

গ্রামীণ বসতির বিবর্তন সেই অঞ্চলের প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটকে নির্দেশ করে। যেহেতু গ্রামীণ বসতি প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে গড়ে ওঠে, তাই যদি পরবর্তীকালে এই প্রাকৃতিক পরিবেশে কোন পরিবর্তন ঘটে বা অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটের বদল হয়, তবে সেক্ষেত্রে ঐ বসতির বাহ্যিক পরিবর্তন ঘটবে। অতীতে প্রাকৃতিক পরিবেশ কোন বসতির স্থান নির্ণয়ে প্রভাব বিস্তার করত। বর্তমানে অবশ্য কোন নতুন বসতি গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক প্রভাবের চেয়ে অর্থনৈতিক প্রভাব অনেক বেশি কার্যকরী হয়। উপরের আলোচনার সূত্র ধরে দক্ষিণ-মধ্যবঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের বসতির বিকাশ, অবস্থান ও বসতির ধরন বা ধাঁচ (Pattern) নিয়ে খুব সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

মুর্শিদাবাদ (পূর্ব), সম্পূর্ণ নদীয়া ও উত্তর 24 পরগণার উত্তরাংশ নিয়ে গঠিত দক্ষিণ-মধ্যবঙ্গকে ভৌগোলিক সংজ্ঞায় 'মৃতপ্রায় ব-দ্বীপ' (moribund delta) অঞ্চল বলা হয়। এখানকার প্রধান নদী গঙ্গা বা পদ্মা থেকে নির্গত ভাগীরথী, জলঙ্গী, ভৈরব, ইছামতী প্রভৃতি শাখানদীতে বর্ষার সময় ছাড়া অন্য সময় জল ও পলি না আসায় এই অঞ্চলের মাটি ক্রমশই অনুর্বর ও বন্ধ্যা হয়ে যায়। অথচ অতীতে এই সব শাখা নদীর তীরে অসংখ্য রেশম কুটি, নীল কুঠি গড়ে উঠেছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে রেলপথ বসানোর কাজ শুরু হলে এখানকার নদীগুলোর স্বাবাবিক প্রবাহে ব্যাঘাত ঘটতেথাকে, বিশেষ করে বন্যার সময়ে। ফলে ম্যালেরিয়া রোগের প্রার্দুভাব ঘটে। আর তা এমন ব্যাপক আকার ধারণ করে যে গ্রামকে গ্রাম জনশূন্য হয়ে যায়। অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে জমিদার তাঁর গ্রামে বসবাসের জন্য অন্য স্থান থেকে অনেক সুযোগ সুবিধের লোভ দেখিয়ে লোক সমাগমের চেষ্টা করতে বাধ্য হয়। কারণ এই সময় অনেক বর্ধিষ্ণু গ্রাম বা একদা ঘন সংঘবদ্ধ গ্রাম (compact village) ছিল, তা বিক্ষিপ্ত সংঘবদ্ধ বসতিতে (loose compact village) রূপান্তরিত হয়, যেমন রঘুনাথপুর (চিত্র 1.3.1 দ্রঃ)।

স্বাধীনতার পর পূর্ব-পাকিস্থান (বর্তমানে বাংলাদেশ) থেকে যে উদ্বাস্তুস্রোত এল তাতে বসতির ধরন পাল্টে গেল। কারণ ঐ উদ্বাস্তু জনতা ফাঁকা জায়গা, পতিত জমি, জঙ্গল ও জলাজায়গা সংস্কার করে বসতি গড়ে তুলল। এর ফলে অনেক ছোট গ্রাম (hamlet) জনাকীর্ণ হল, অর্থাৎ সেগুলো সংঘবদ্ধ গ্রামে (compact) পরিণত হল। শুধু তাই নয়, বসতির অবস্থানেও পরিবর্তন চোখে পড়ল। একদা নদীকে কেন্দ্র করে বসতি গড়ার যে প্রবণতা ছিল, তার স্থান নিল সড়কপথ ও রেলপথ। এর কারণ হল পূর্ব-পাকিস্থানে থেকে আগত কপর্দকহীন উদ্বাস্তুরা সড়কপথ ও রেলপথকে বাসস্থান হিসেবে বেছে নিলে। কারণ তা ছিল সরকারী সম্পত্তি (খাস জমি বা vested land), যা নিয়ে বিরোধের আশঙ্কা কম। বর্তমানে দক্ষিণ-মধ্যবঙ্গের অনেক স্থানে রেলপথ বা সড়কপথের ধারে (চিত্র 1.3.8) ব্যাপকভাবে গড়ে ওঠা লাইনবন্দী বসতি (linear settlement) এইসব ছিন্নমূলদের সৃষ্টি। শুধু তাই নয়, গ্রামের মধ্যবর্তী অনেক খাস জমিতে এবং ব্যক্তিগত

জমিতের ও 1960-এর দশকের শেষভাগে যুক্তফ্রণ্টসরকারের আমলে বলপূর্বক জমি দখল করে সেখানে লাইনবন্দী ও চতুষ্কাকার সংঘবদ্ধ (square compact) বসতি গড়ে তোলা হয়েছে, যেমন মুর্শিদাবাদ থাকার শিবপুর, রানাঘাট থাকার আনুলিয়া, বনগাঁ থানার দক্ষিণ সুন্দরপুর ইত্যাদি গ্রামগুলোতে এই ধরনের বসতি রাতারাতি গড়ে উঠেছে (Sen and Sen, 1989)।

উত্তরবঙ্গে ও নেপাল ও ভুটান থেকে আসা ভুমিহীন কৃষক ও শ্রমিকরা তরাই বা ডুয়ার্স অঞ্চলে রাস্তার ধারে অনেক লাইনবন্দী বসতি গড়ে তুলেছে।

উপরের আলোচনার সূত্র ধরে আমরা বসতির বিবর্তনের কারণগুলিকে এবং তার আনুষঙ্গিক দিকগুলি নিয়ে এইভাবে বিশ্লেষণ করতে পারি। মনে রাখতে হবে বসতির বিবর্তনের অন্যান্য দিকও রয়েছে। যেমন—

অবস্থানগত পরিবর্তন ঃ বসতির স্থান নির্ধারণে অবস্থানগত পরিবর্তনটি সহজেই লক্ষণীয়। আগে পশুপালনের জন্যজল ও তৃণের সন্নিকটে, খাদ্য সংগ্রহের জন্য নদী বা অন্যান্য জলভাগের সান্নিধ্যে, কৃষিকার্যের জন্য জলের সুবিধাযুক্ত কর্ষণযোগ্য ভুমির সান্নিধ্যে গ্রামবসতি গড়ে উঠত। এমনকি নিরাপত্তার জন্য শৈলশিরার শীর্ষদেশে গ্রাম গড়ে উঠত। অবস্থানজনিত এই নিয়ন্ত্রণ এখন সীমিতভাবে দেখা যায়। বিশেষত উপজাতীর বসতিতে এর স্পষ্ট প্রভাব রয়েছে। বর্তমানে উন্নতর জনসম্প্রদায়ের মধ্যে একাধিখ কারণ বসতির স্থান নির্ধারণে বিবেচিত হয়। এর মধ্যে রয়েছে যোগাযোগ ব্যবস্থা, উর্বর কৃষিজমির সহজলভ্যতা, জলের সুবিধা ইত্যাদি।

বাড়ীর উপকরণগত পরিবর্তন ঃ প্রাচীনকালে মানুষ ছিল গুহাবাসী। মানুষ যখন বাসগৃহ নির্মাণ করতে শিখল তখন গৃহাদি নির্মাণের উপকরণ ছিল প্রস্তর, মৃত্তিকা, কাঠ ও বৃক্ষপত্র। স্থানীয় পরিবেশে নির্মাণোপযোগী যেসব উপকরণ সহজলভ্য হত তা দিয়েই কুটির নির্মিত হত। এই কারণে সেই স্থানের পরিবেশের বৈচিত্র্যে গৃহাদির গঠন ও উপকরণগত পার্থক্য হত। বর্তমানেও গ্রামীণ বসতি গঠনে এই ধারাটি লক্ষ্য করা যায়। তবে স্থানীয় উপকরণগত নির্ভরতা আগের মতো সর্বত্র আর লক্ষ্য করা যায় না। উন্নত গৃহনির্মাণের জন্য গ্রামবসতিতেও বাইরের থেকে উপকরণ নিয়ে আসা হয় অথবা কৃৎকৌশলের সাহায্যে উপকরণ তৈরি করা হয় (যেমন—মাটি পুড়িয়ে ইট তৈরি, বাঁশের পরিবর্তে কাঠের ব্যবহার ইত্যাদি)। গ্রামাঞ্চলেও এখন ইঁট-সিমেন্টের ব্যবহারে নির্মিত গৃহ বিরল নয়।

উপজীবিকার পরিবর্তন ঃ সভ্যতার আদিপর্বে বসতিসমূহ গড়ে উঠেছিল কেবল প্রাথমিক পেশাকে ভিত্তি করে। খাদ্যসংগ্রাহকদের কার্যকলাপের কেন্দ্রে ছিল অরণ্য, তাই বাসগৃহ গড়ে উঠেছিল অরণ্যমধ্যে অরণ্য পরিষ্কার করে। তাদের বসতি অস্থায়ী ভ্রাম্যমাণ ছিল। এগুলি ছিল অতিবিচ্ছিন্ন গোষ্ঠীবদ্ধ জনবসতি।

প্রাচীন কৃষিকার্যকে যারা উপজীবিকা হিসেবে গ্রহণ করে তাদের বসতি স্থায়ী না অস্থায়ী হবে তা নির্ভর করত প্রাচীন কৃষিব্যবস্থার স্থায়ী কিংবা স্থানান্তর প্রকৃতির ওপর।

1) বসতি বিবর্তনে প্রাকৃতিক উপকরণের প্রভাব (Impacts of Physical Elements in the Evolution of Settlements)

জল ঃ পানীয় জল ছাড়া জীবনধারণ সম্ভব নয়। তাই প্রাচীন মানুষ জলের উৎসকে বসতি কেন্দ্র হিসেবে বেছে নিত। বর্তমানেও বসতি বিকাশে জলের সান্নিধ্যকে স্বীকার করা হয়। বর্তমানে নলকূপ খননের মাধ্যমেও পাইপলাইনে জল সরবরাহের ফলে জলের প্রাকৃতিক উৎসকেন্দ্রের আকর্ষণ কিঞ্চিৎ হ্রাস পাচ্ছে।

উদ্ভিদের আবরণ ঃ প্রাচীন বসতি গড়ে উঠেছিল অরণ্যকে আশ্রয় করেই। অরণ্য খাদ্য ও জ্বালানীর যোগান দেয়। পরবর্তীকালে অরণ্য পরিষ্কার করে কৃষি-নির্ভর বসতি গড়ে ওঠে। অরণ্যের প্রয়োজনীয়তা বজায় থাকে বিশেষত আসবাব, জ্বালানী কাঠ ও অন্যান্য উপজাত দ্রব্য এবং পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য। বর্তমানে গ্রামীণ বসতির প্রধান আকর্ষণ উর্বর কৃষিভূমি যা একসময় অরণ্য পরিষ্কার করে গড়ে উঠেছিল।

সমতলভূমি ঃ পৃথিবীর শতকরা 90 ভাগ জনবসতি সমভূমি অঞ্চলে গড়ে উঠেছে। এ থেকে সহজেই বোঝা যায়, সমতলভূমি চিরকলাই বসতি বিস্তারে উৎসাহ দিয়েছে। পার্বত্য অঞ্চলেও অপেক্ষাকৃত স্বল্প ঢালে অথবা ঢাল কেটে সমতল করে বসতি গড়ে তোলা হয়।

পশুপালনকে ভিত্তি করে যেসব বসতি গড়ে উঠত, সেগুলি ছিল তৃণভূমির সন্নিকটে এবং জলের জন্য কূপ বা জলাশয়ের সান্নিধ্যে। এগুলি ছিল ক্ষুদ্র বিক্ষিপ্ত গোষ্ঠীবদ্ধ জনবসতি। পরবর্তীকালে জনসংখ্যা বাড়তে থাকায় কৃষিকার্য সম্প্রসারণের প্রয়োজনে অনেক তৃণভূমি পরিষ্কার করে কৃষিফসল উৎপাদনে নিয়োজিত হয়। এর ফলে পশুপালনভিত্তিক গ্রামগুলির বসতিবিন্যাসে পরিবর্তন হয়। অনেক ক্ষেত্রে গ্রামগুলির আয়তন বাড়ে। অণুকেন্দ্রিক, দণ্ডাকৃতি, গোষ্ঠীবদ্ধ নানান বিন্যাসে গ্রাম গড়ে ওঠে।

মৎস্য সংগ্রহকে কেন্দ্র করে গড়ে-ওঠা বসতি ছিল ক্ষুদ্র, বিক্ষিপ্ত, দণ্ডাকৃতি, অণুকেন্দ্রিক বা গোষ্ঠীবদ্ধ। কোন্ উৎস থেকে মাছ ধরা হয় তা বসতিবিন্যাসে গুরুত্ব পায়। যেমন—সমুদ্রোপকূলে দণ্ডাকৃতি, নদীতীরে দণ্ডাকৃতি বা গোষ্ঠীবদ্ধ অন্যান্য জলাশয়ের আকৃতি অনুসারে শূন্যগর্ভ বৃত্তাকার, চতুষ্কৌণিক ইত্যাদি নানারূপ বসতিবিন্যাস হতে পারে।

কৃষিব্যবস্থায় বিশেষীকরণের ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। কৃষকদের আর্থিক উন্নতির সুযোগ বাড়লে অধিখ সংখ্যক জনবসতি আকৃষ্ট হয়। ফলে জনবসতি ঘনসন্নিবিষ্ট হয়ে ক্ষুদ্র থেকে মাঝারি ও পরে বড় বসতিতে পরিণত হয়।

অস্থায়ী থেকে স্থায়ী বসতিতে পরিবর্তন ঃ আগে ভ্রাম্যমণতা ছিল গ্রামবসতির স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। খাদ্যসংগ্রাহক বৃত্তি ছিল আদিম মানুষের জীবিকা। অনুন্নত অস্থায়ী কৃষি-নির্ভর হওয়ার পরও বসতির এই ভ্রাম্যমাণতা চলতে থাকে। উন্নত স্থায়ী কৃষিকার্য শুরু হবার পর মানুষ স্থায়িভাবে বসতি গড়ে তোলে। এই ভ্রাম্যমাণতা খাদ্যসংগ্রাহক, স্থানান্তর কৃষিজীবী এবং যাযাবর পশুপালদের মধ্যে আজও দেখা যায়।

ভারতে আন্দামানী, মালয়েশিয়ার সেমাঙগণ খাদ্যসংগ্রাহক। খাদ্যের সন্ধানে তারা ভ্রাম্যমাণ বসতি গড়ে তোলে। স্তেপ অঞ্চলের কিরঘিজ, পূর্ব আফ্রিকার সাভানার মাসাই, আরবের বেদুইনগণ পশুপালক যাযাবর। তৃণ ও জলের সন্ধানে তারাও ভ্রাম্যমাণ বসতি নির্মাণে করে। স্থানান্তর কৃষিজীবিগণও অরণ্য পরিষ্কার করে কৃষিকাজ করার উদ্দেশ্যে অস্থায়ী বসতি নির্মাণ করে বাস করে। ভারতে ঝুম চাষী, শ্রীলঙ্কার চেনা, ইন্দোনেশিয়ার লাদাঙ, আফ্রিকায় ফ্যাঙ্ চাষিগণ এরূপ অস্থায়ী বসতিই গড়ে তোলে। তবে বর্তমান পৃথিবীর অধিকাংশ স্থানে স্থায়ী কৃষিকার্য চালু হওয়ায় বেশির ভাগ বসতিই স্থায়ীরূপে গড়ে উঠেছে।

3.7.1. কয়েকটি গ্রামীণ বসতির বিবর্তনের ইতিহাস (Some examples of evolution of rural settlement)

এবার দক্ষিণবঙ্গ ও উত্তরবঙ্গ থেকে দু'টো গ্রামকে বেছে নেওয়া যাক্। শুরু থেকে আজ পর্যন্ত এই দু'টি গ্রামের বিবর্তন কেমন হয়েছে, তা নিয়ে আলোচনা করা যাক্। দক্ষিণবঙ্গের গ্রামটি হল একটি ঐতিহাসিক গ্রাম, আর উত্তরবঙ্গের গ্রামটি হল হাল আমলের।

ঐতিহাসিক গ্রাম চুণাখালি (দক্ষিণবঙ্গ)

মুর্শিদাবাদ জেলার অধীনে এই গ্রামটি (থানা মুর্শিদাবাদ, জে. এল. নং 24) বহরামপুর ও মুর্শিদাবাদ শহরের মধ্যস্থলে অবস্থিত। দু'টি শহর থেকেই বাসযোগে সরাসরি এই গ্রামে পৌঁছানো যায়। এই গ্রামটিকে ঘিরে রয়েছে আরও কতকগুলো ঐতিহাসিক গ্রাম, যেমন শিবপুর, মাদাপুর, হাতীনগর ইত্যাদি, পশ্চিম রয়েছে ভাগীরথীর পুরনো খাত কাটিগঙ্গা। গ্রামের দক্ষিণ ও পূর্বদিকে রয়েছে পাকা সড়কপথ।

গ্রামটির কবে উৎপত্তি হয়েছিল তা জানা নেই। তবে গ্রামের নামকরণ থেকে এই গ্রামের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা করা যায়। গ্রামবাসীরা বলেন যে 'চুন খালি' (unloading of lime) করা হয়েছিল বলে গ্রামের নাম চুণাখালি হয়েছে। জনশ্রুতি এই যে আজ থেকে প্রায় পাঁচশো বছর আগে মোসলাম সাহেব নামে এক ফকির মূলতান (পাকিস্থান) থেকে ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে এখানে বসেছিলেন। কথিত আছে যে পরম ধার্মিক এই ফকির তাঁর অলৌকিক শক্তির প্রভাবে এক রাতের মধ্যে দুটো মসজিদ তৈরি করেছিলেন। পুরষ্কার হিসেবে তদানীন্তন নবাব তাঁকে 360 হেক্টর জমি উপহার দিয়েছিলেন।

গ্রামের নামকরণ প্রসঙ্গে প্রচলিত কাহিনীটি নিম্নরূপ। একদিন রাস্তা দিয়ে চুণবোঝাই একটা গরুর গাড়ি যাচ্ছিল। ফরিক মোসলাম (আসল নাম মসনদ আউলিয়া) গাড়োয়ানকে জিজ্ঞাসা করলেন গরুর গাড়িতে কি আছে? গাড়োয়ান উত্তর দিল গাড়িতে দই আছে। ফকির গাড়োয়ানকে গাড়ি থামিয়ে চুণ নামাতে বললেন। ফকির তাঁর অলৌকিক শক্তির প্রভাবে চুণকে দইয়ে পরিণত করলেন ও উপস্থিত ব্যক্তিদের তাঁ চিঁড়ে দিয়ে পরিবেশন করলেন। এই ঘটনার স্মরণে সেই গ্রামরে নাম হল চুণাখালী। ফকির মোসলামের কিছু কিছু কীর্তির কথা ইতিহাসেও লিপিবদ্ধ আছে। ঐতিহাসিক বেভারেজ (Beveridge) তাঁর "Old Places

in Murshidabad" প্রবন্ধে (Calcutta Review, Vol. X) উল্লেখ করেছেন চুণাখালীতে পঞ্চদশ শতাব্দীর দু'টো ধ্বংসপ্রাপ্ত মসজিদ ও ফকির মসনদ আউলিয়ার কবর (1490 সাল খোদিত) রয়েছে। গ্রামের পরবর্তী দু'শো বছরের ইতিহাস অন্ধকারে ঢাকা পড়ে আছে। আকবরের রাজস্ব বিভাগে চুণাখালি সুবে বাংলার

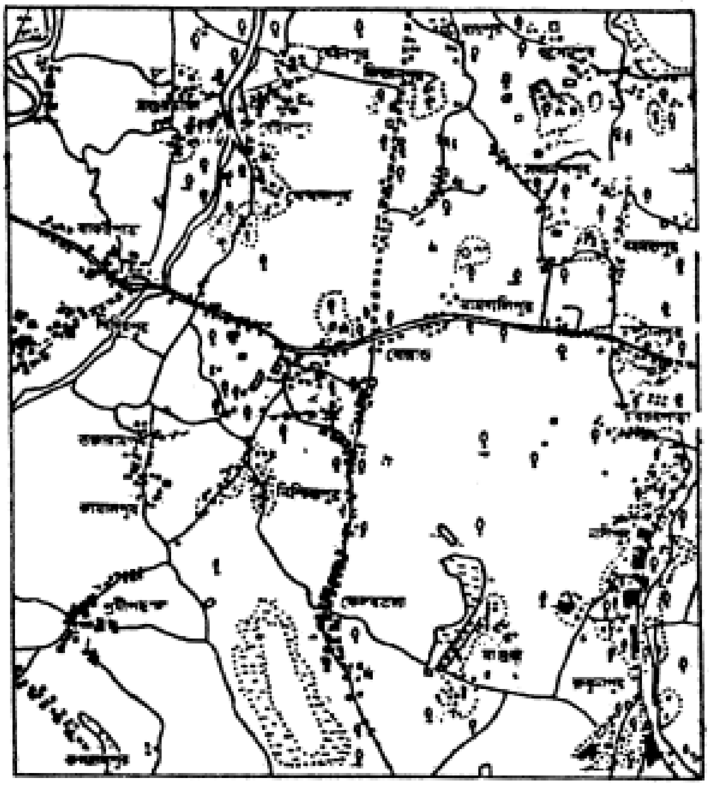

চিত্র 1.3.8.3 ঃ সংখ্যালঘু এলাকায় বসতির বিবর্তন (1960-র দশকে)

একখানি পরগণা ছিল। রেনেল (Rennell) সাহেবের জরীপের (1770 সাল) চুণাখালীকে ভাগীরথী তীরের এক বসতি হিসেবে দেখতে পাই। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বর্গীদের পুনঃপুনঃ আক্রমণের ভয়ে রাঢ় অঞ্চলে (ভাগীরথীর পশ্চিম পাড়) থেকে বহু লোক বাগড়ী অঞ্চলে (ভাগীরথীর পূর্ব পাড়) চলে এল। চুণাখালীতেও এর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। শুধু তাই নয়, মুর্শিদাবাদ বাংলার রাজধানী হওয়ার চুণাখালীর গুরুত্ব বাড়ল। Beveridge সাহেবের লেখাতেও এর প্রমাণ পাই। নিশাতবাগ (চুণাখালীর একটি টোলা বা পাড়া) সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন যে মুর্শিদাবাদ থেকে 5 মাইল (8 কি.মি.) দূরে অবস্থিত। নিশাতবাগ হল ইংরেজদের কায়দায় সাজানো একটি স্থান। মহম্মদ রেজা খান ওরফে নবাব মজঃফর জঙ্গ এখান থাকতেন ও দেওয়ান হিসেবে চুণাখালী থেকে তাঁর সাসনকার্য চালাতেন। কাছেই ছিল চাঁদ পাহাড় নামে

একটি গোলাকার জলাশয় যার মাঝখানে ছিল একটি দ্বীপ। এই দ্বীপে নবাব জঙের বাংলো ছিল। এই সময় চুণাখালী ছিল মুর্শিদাবাদের একটি শহরতালী। মুর্শিদাবাদ থেকে রাজধানী কলকাতায় স্থানান্তরিত হবার পর চুণাখালীও তার গুরুত্ব হারিয়ে একাট গ্রাম পরিণত হল।

উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি "Burdwan Fever" শুরু হলে দক্ষিণ-মধ্যবঙ্গের অন্যান্য গ্রামের মত এই গ্রামও তার আক্রমণ থেকে অব্যাহতি পায় নি। এই রোগে প্রচুর লোক মারা যায়। 1854 সালে (অপ্রকাশিত রেভিনিউ সার্ভের পরিসংখ্যান) থেকে 1954 সালের (জনগণনা) মধ্যে অর্থাৎ প্রায় 100 বছরের মধ্যে জনসংখ্যা 1720 থেকে 373-এ দাঁড়াল। মহামারীর (Burdwan Fever) দরুন অবস্থা এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছাল যে শবদেহ বহন করার মত পর্যাপ্ত লোক পাওয়া যেত না। উত্তরাধিকারী না থাকায় অনেক চাষের জমি আগাছায় ভরে গেল। গ্রামের অনেক স্থানে জঙ্গলে ঢেকে গেল। সেখানে বাঘ থাকত। খালে

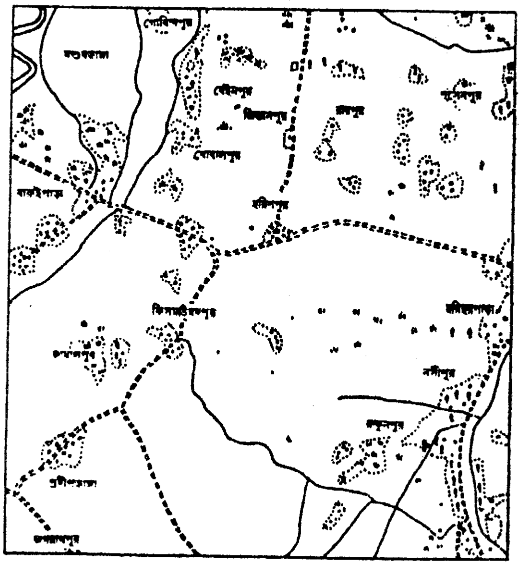

চিত্র 1.3.8.1 ঃ সংখ্যালঘু এলাকায় বসতির বিবর্তন
(1910-র দশকে S.O.I. টোপোম্যাপ অবলম্বনে)

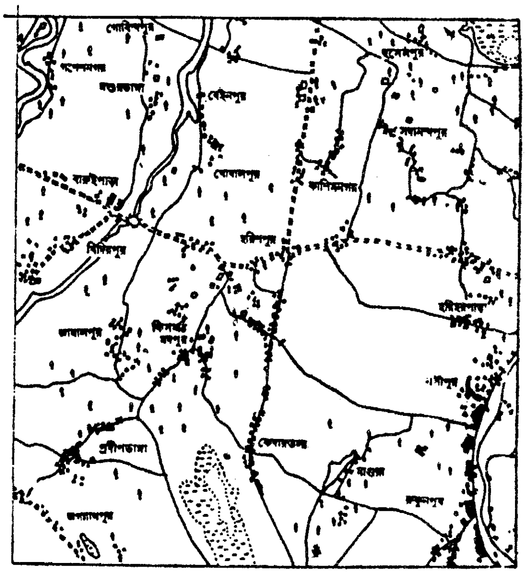

চিত্র 1.3.8.2 ঃ সংখ্যালঘু এলাকায় বসতির বিবর্তন
(1910-র দশকে)

কুমীর থাকত (Sen and Sen, 1989)। জনসংখ্যা এত কমে গেছিল যে গৃহস্থের গোয়ালে 1930-র দশকের দিনদুপুরেও কুমীর দেখা যেত। এই অবস্থায় বেশির ভাগ গ্রামবাসী রাঢ় অঞ্চলে চলে গেল।

স্বাধীনতার পর বিশেষ করে 1960-র দশকে দেশ বিভাগের জন্য চুণাখালীর প্রায় সব পাড়াতেই উদ্বাস্তুরা এসে ডেরা বাঁধল। তবে সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় লোকজন চুণাখালী—নিমতলাতে এল। 1970 সালে বাংলাদেশে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়েও বেশ কিছু লোক এখানে এসেছে। বলতে গেলে চুণাখালীর শতকরা আশী ভাগ হিন্দুই হল উদ্বাস্তু। জনাকীর্ণ চুণাখালী আজ একটা গঞ্জের চেহারা নিয়েছে। প্রাত্যহিক বাজার ছাড়াও হাট, দোকান, জুট করপোরেশনের ক্রয় কেন্দ্র ও বড় বড় গুদামঘর এখানে রয়েছে।

জনসংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি জনবসতির ধাঁচের ওপর প্রভাব ফেলেছে। 1854 সালের রেভিনিউ সার্ভে (অপ্রকাশিত) মানচিত্র থেকে আমরা এখানে ঘন সংঘবদ্ধ বসতি লক্ষ্য করছি (Sen 1985, Sen 1988, Sen and Sen 1989)। পূর্ব দিক বাদ দিলে এবং কিছু কিছু বিক্ষিপ্ত অংশ ছাড়া গোটা গ্রামেই বসতির অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়, যেমন কোমনগর, গোয়ালপাড়া, চৈতন্যপুর, চুণাখারী কসবে ইত্যাদি। 1930 সালেও এখানকার গোয়ালপাড়ায় অর্থাৎ নিশাতবাগেও ঘনসংঘবদ্ধ বসতি লক্ষ্য করা যায় (Sen & Sen, 1989)। অন্যত্র কয়েকটি বিক্ষিপ্ত ছোট বসতি ছিল। কিন্তু 1955-র Revisional Survey-র সময় জনবসতির পরিবর্তন খুব চোখে পড়ে। এমন কি নিশাতবাগেও বসতির আকার ছোট হয়ে গেছে। মুসলমান-অধুষিত কুতবাপুরে একই চিত্র লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু 1970 সালে বাংলাদেশে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় বহু সংখ্যক উদ্বাস্তু এখানে চলে আসে। এদের বেশির ভাগই ছিল কপর্দহীন। ফলে তারা রাস্তার ধারের খাস জমিতে ঘর বাঁধল। এই কারণে বসতি রৈখিকাকৃতি ধারণ করেছে। কোথাও কোথাও বা আয়তাকার চতুষ্কোণ বসতি গড়ে উঠেছে (চিত্র 1.3.9)।

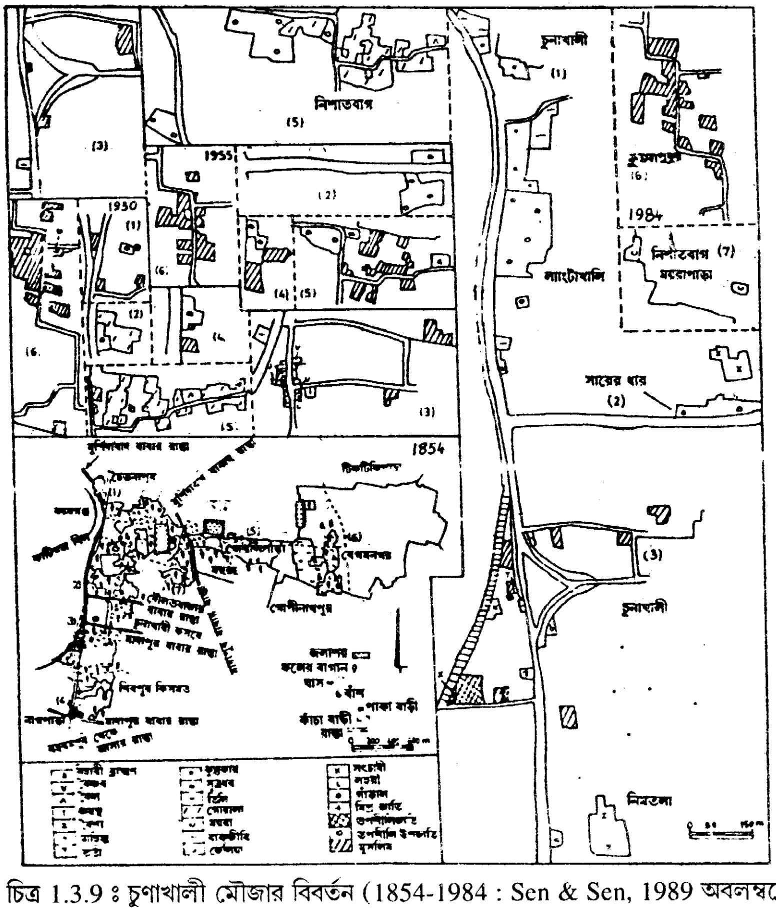

চিত্র 1.3.9 : চুণাখালী মৌজার বিবর্তন (1854-1984 : Sen & Sen, 1989 অবলম্বনে)

জনবসতির পরিবর্তনের মতন এখানে ধর্মীয় বণ্টনেও পরিবর্তন এসেছে। যেমন চুণাখালী-নিমতলার 174টি পরিবারের (স্বাধীনতার পূর্বে 27টি পরিবার) বেশির ভাগই হল হিন্দু অথচ স্বাধীনতার সময় এখানে মুসলমানরা সংখ্যাগুরিষ্ঠ ছিল। এর কারণ স্বাধীনতার পর তারা এখান থেকে পূর্ব পাকিস্থানে চলে যায়। অন্যারা আশেপাশের মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ গ্রামগুলোতে বসবাস শুরু করে।

জনসংখ্যা ও জনবসতির বিবর্তনের মত এখানকার অর্থনীতিতে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। 1854 সালে (অপ্রকাশিত রেভিনিউ সার্ভে রিপোর্ট) এই গ্রামে রেশম, ধান ও ডাল চাষ হত। এমনিক, 70 বছর আগেও এখানে রেশমের চাষ হত। এখানকার আমের খুব খ্যাতি নিশাতবাগের গোয়ালারা দুধ ও দুধজাত দ্রব্য বিক্রী করত। বর্তমানে এখানকার বেশিরভাগ বাসিন্দা কৃষিকাজে যুক্ত রয়েছে।

নতুন পর্যটন জনপদ দুধিয়া (উত্তরবঙ্গ)

দু'দিকে শাল, সেগুন বনে ঢাকা অব-হিমালয়ের নাতিউচ্চ পাহাড় আর তার মাঝে এক ফালি নীচু জায়গা, চওড়ার খুব বেশি হলে 300 মিটার আর লম্বায় প্রায় 1·5 কি.মি.। এমনি এক উপত্যকার বুকে চিরে একদিক দিয়ে বয়ে চলেছে দুরন্ত বালাসন, আর একধারে গড়ে উঠেছে ছোট শান্ত জনপদ, যার পোশাকী নাম দুধিয়া। শিলিগুড়ি-মিরিক সড়কপথের ধারে গড়ে ওঠা এই পাহাড়ী গ্রামটি শিলিগুডি থেকে প্রায় 18 কি.মি., কার্শিয়াং থেকে 10 কি.মি. মিরিক থেকে 15 কি.মি. ও পাংখাবাড়ি থেকে 4 কি.মি. দূরে অবস্থান করছে।

দার্জিলিং জেলার কার্শিয়াং থানার অর্ন্তগত এই বসতিটি হাল আমলের যুক্তফ্রন্ট আমলে যখন সারা পশ্চিমবাংলায় জমি দখলের আন্দোলন চলেছিল, তখন তার ঢেউ উত্তর বাংলার এই অনামী স্থানেও এসে লেগেছিল। দেখা গেল, 1967 সালে-এর 18ই আগস্টের সকালে পাংখাবাড়ি ও তিনধারিয়া থেকে 6টি পরিবার এসে "খাসমহল" (আপার দুধিয়া) অংশটি দখল করে বসল। খাসমহল হল এই জেলার চাষের জমি যার রাজস্ব আদায়ের ভার ছিল এক একজন "মণ্ডলের" হাতে আলোচ্য জমির মালিক ছিল শ্রী আর. বি. প্রদান মহাশয়। জঙ্গলে ঢাকা শাপদসংকুল এই পিরবেশে তখন প্রদান মহাশয়ের কর্মচারী ছাড়া আর কেউ থাকতে না। সরকারী নথিপত্র জমাদার ভিটা খাসমহল (জে. এল. নং 16) নামে পরিচিত এই স্থানের ঠিক বিপরীত দিকের পাহাড় থেকে দুধিয়া ঝোরা (সার্ভে অফ্ ইণ্ডিয়ার মানচিত্রও উল্লিখিত) নামে এক ছোট্ট নদী বালাসনে এসে মিশছে। তার দুধের মত সাদা জল দেখে এখানকার আগন্তুকরা এই জায়গায় নাম রাখল দুধিয়া। শুরু হল এই পাহাড়ী জনপদের নতুন ইতিহাস। 1970 সালে আপেশপাশের এলাকা থেকে আরও কিছু পরিবার এসে এই উপত্যকার মাঝখানে (মধ্য দুধিয়া) যে সরকারী জমিটুকু ছিল তা দখল করে বসল। এইভাবেই ছোট পাহাড়িয়া গ্রামটির কলেবর বেড়ে চলল। কাছাকাছি থাকার সুবাদে পাংখাবাড়ি থেকেই বেশি লোকজন এখানে চলে এসেছে, বলতে গেলে অর্ধেকের বেশি। বাকীরা

কার্শিয়াং, বিজনবাড়ি, আর অল্প কয়েকটি পরিবার নেপাল থেকে এসেছে। পাহাড় ঘেরা এই গ্রামটির শতকরা 99 জন হল নেপালী, বাকী এক শতাংশ অন্যান্য ভাষাভাষী—দু'ঘর বাঙালী, তিনঘর বিহারী ও এক ঘর . মুসলমান। জন্মলগ্নে যার জনসংখ্যা ছিল বিশের কাছাকাছি, আজ (1991 সনের জনগণনা অনুযায়ী) তা গিয়ে দাঁড়িয়েছে দু'হাজার চার-এ।

পাহাড়ী এলাকায় চাষযোগ্য জমি পাওয়া খুব মুশকিল, কিন্তু এই উপত্যকায় চাষের জন্য জমির অভাব ছিল না, তাও আবার বিনা পয়সায় (জবর দখল)। তাই জমির লোভে ভূমিহীন শ্রমিকেরা এখানে এসে ভিড় করেছে। এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে অস্বীকার করার উপায় নেই। উত্তরে খানিক দূরে পাহাড়-বেষ্টিত গিরিখাতের (ইণ্টারলকিং স্পার) মধ্যে দিয়ে বালাসন এই উপত্যকায় নেমে এসেছে। বলতে গেলে এখান থেকেই তার সমতলে যাত্রা শুরু। সত্যি বলতে কি, এখান থেকেই পাহাড়ের শুরু। তাই এই জায়গাটি না পাহাড়ী, না সমভূমি, অথচ উভয় প্রকৃতির রূপরস অনুভব করা যায়। শীত-গ্রীষ্ম কোনটাই বেশি নয়, আবার বৃষ্টিপাতেও খুব একাট নয়। নদীর ডান তীর ঘেঁসে উঠে গেছে খাড়া পাহাড়, বাম তীরে অবশ্য পাহাড় কয়েক হাজার পর্যটক প্রতি শীতকালে চলে আসত। আবার সন্ধ্যের আগেই এখান থেকে তারা ফিরে যেত। তখন এখানে রাতে থাকার মত হোটেল ছিল না। খাওয়ার হোটেল অবশ্য ছিল, কারণ শিলিগুড়িগামী বা মিরিকগামী বাস এখানে কয়েক মিনিটের জন্য যাত্রা বিরতি করে। GNLF আন্দোলনের প্রভাব এই স্থানেও কিছুটা পড়েছিল। ফলে সাময়িকভাবে পর্যটন শিল্প মার খেয়েছিল। দার্জিলিং গোর্খা পার্বত্য পরিষদ (DGHC) এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সম্যক অনুধাবন করে 1991 সালে 9ই নভেম্বর 'গোকুল' নামে একটি 'ওয়েসাইড ইন' খুলেছে। আপার দুধিয়া থেকে সামান্য দূরে বালাসনের ডানতীরে গড়ে ওঠা এই লজে (Lodge) দু'টি দু'-শয্যাবিশিষ্ট ঘর রয়েছে, যার প্রতিটির ভাড়া হল 472 টাঃ 50পয়সা। লজ ছাড়াও পার্বত্য পরিষদ এই গ্রামে বৈদ্যুতিক আলো, জলসেচ, ফুটবলের মাঠ ও সাধারণের জন্য শৌচাগার তৈরি করে দিয়েছে। ঝুলন্ত সেতুর পাশেই একটি পাকা ব্রীজ তৈরি করা হচ্ছে। এই ব্রীজ তৈরি হয়ে গেলে মিরিকের সাথে বাগডোগরার (বিমান ঘাঁটি) যোগাযোগ আরও সহজ হয়ে যাবে।

দুধিয়া জনপদের আলোচনা থেকে দেখা যায় যে এখানকার জনসংখ্যা ধীরে ধীরে বেড়েছে, অথচ জমি সীমাবদ্ধ। তাই মানুষ একদিকে যেমন প্রাকৃতিক দিকে হাত বাড়িয়েছে, অন্যদিকে তেমনি জনগণের জন্য কিছু কিছু উন্নয়নমূলক কাজকর্মও হচ্ছে। এদের মিলিত প্রভাব এই জনবসতির ওপর পড়েছে।

জলসেচের সুবিধে হওয়াতে এখন বছরে একবারের জায়গায় দু'বার ধান চাষ হচ্ছে। নিম্ন দুধিয়ার যে সব অংশে জলসেচ হয় না ও যেসব জমি একটু উঁচুতে রয়েছে সেখানকার কৃষিচিত্রটা কিন্তু পাল্টায়নি। ধান ও মরুয়া (ভুট্টা) এখনও সেসব জায়গায় চাষ হচ্ছে। জনসংখ্যা বাড়ার সাথে সাথে চাষের জমিতে টান পড়েছে। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে নদীর পাড়ে ছোট ছোট পাথর সাজিয়ে সেখানে চাষের চেষ্টা

চলছে। সরকার থেকে চাযের উন্নতির জন্য ব্যাঙ্কের মাধ্যমে কৃষিঋণের ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়া এখানকার অর্থনীতিকে জোরদার করতে সরকার থেকে মাছ চাষের দিকে নজর দেওয়া হচ্ছে। এই উদ্দেশ্যে চাষীদের মাছের পোনাও দেওয়া হয়েছে। কিন্তু উপযুক্ত প্রশিক্ষণের অভাবে মাছ চাষে আশানুরূপ ফল মিলছে না। 1984 সালে এখানে দু'টি হোটেল ছিল এখন তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে 9টিতে। ঐ একই সময়ের মধ্যে মুদির দোকানের সংখ্যা কয়েকগুণ বেড়েছে। বিহারের মজঃফরপুর থেকে কয়েকটি মুসলমান পরিবারে এসে এখানে একটি রুটির কারখানা (bakery) খুলেছে। আর এইসব উন্নয়ন ঘটেছে মধ্য দুধিয়াতেই। গত দশ বছরে এখানে লোকসংখ্যা এতো বেড়েছে যে বর্তমানে এই অংশে বসবাসের জন্য কোন জমি নেই। নতুন যারা আসছে তাঁদের অনেকেই নদীগর্ভকে বসবাসের জন্য বেছে নিয়েছে। হাল্কা কাঠ বা কঞ্চির দেওয়াল আর খড়ে ছাওয়া নতুন কুঁড়েঘরগুলোকে পুরানো বসতবাড়ি থেকে সহজেই আলাদা করে চিনে নেওয়া যায়। গত কয়েক বছরে বেশ কিছু কাঠের দেওয়াল ও টিনের ছাউনি দেওয়া বাড়ি পুরোপুরি পাকা বাড়িতে পরিণত হয়েছে। অবস্থা এখন এমন দাঁড়িয়েছে যে মধ্য দুধিয়াতে আর পিকনিক সারাতে বাধ্য হয়। কিন্তু এখানকার অবস্থা এমন যে পর্যটকরা খুব একটা স্বস্তি পায় না। কারণ নদীর অপর পাড়ে কিছুটা (চিত্র 1.3.10)। পাহাড়গুলো খুব বেশি উঁচু নয়—300 থেকে 600 মিটার। পাহাড়ের ঢালু অংশকে ধাপ ধাপ করে কেটে চাষর জমি বানানো হয়েছে। পাহাড়ের গায়ে কমলালেলবুর গাছ। শীতকালে যখন কমলালেবু পাকে, তখন দেখতে সুন্দর লাগে। সংখ্যায় কম হলেও পাহাড়ের ওপরে ছোট ছোট গ্রাম রয়েছে। সেখানকার বাসিন্দারা কাঠ ও দুধের ব্যবসার ওপর নির্ভরশীল। পাহাড়গুলোর গায়ে গড়ে উঠেছে বেশ কয়েকটি বড় বড় চা বাগান।

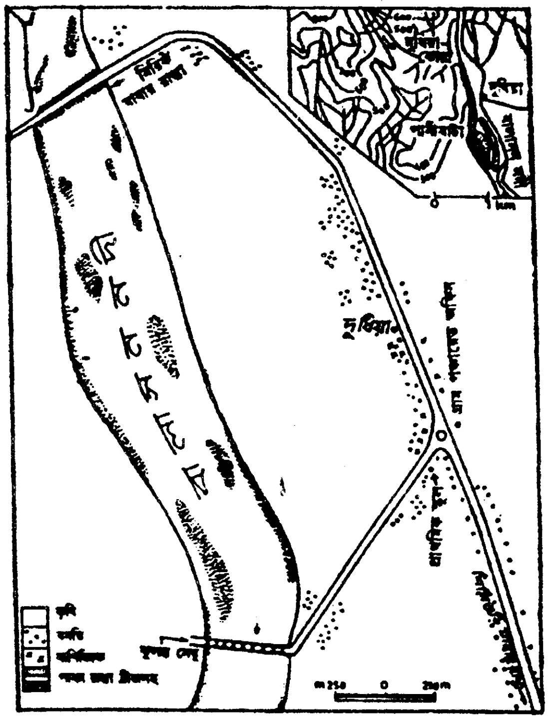

চিত্র 1.3.10 ঃ দুধিয়া মৌজার জমি ব্যবহারের নক্সা (সূত্র ঃ লেখক, Geog. Rev. of India, vol. 48, No. 1, 1986)

নদীর ডান তীরে গড়ে উঠেছে পানিঘাটা নামে এক বির্ধিষ্ণু গ্রাম যেখানে থেকে বাসযোগে শিলিগুরি শহরে যাওয়া যায়, যদিও এই ঘুরপথে সময় লাগে একটু বেশি। এই গ্রামে যাবার জন্য রয়েছে বালাসনের ওপর ঝুলন্ত কাঠের সেতু, যা এখানকার অন্যতম প্রধান আকর্ষণ। এই ঝুলন্ত সেতু ও তার আশেপাশের

নৈসর্গিক দৃশ্য নিয়ে অনেক সিনেমার শুটিং হয়েছে। গোটা পশ্চিমবঙ্গে তো বটেই, এমনকি পূর্ব-ভারতে এরকম ঝুলন্ত সেতু খুব কম আছে। তাই GNLF আন্দোলনের সময় এটিকে পুড়িয়ে দেওয়া হলেও পরবর্তীকালে দার্জিলিং গোর্খা পার্বত্য পরিষদ (DGHC) এই সেতুর পর্যটক আকর্ষণের কথা মাথায় রেখে এটিকে আবার তৈরি করেছে। ঝুলন্ত সেতু ছাড়াও এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যে রয়েছে বালাসন নদী। পাহাড় থেকে নামার সময় বালাসন তার গর্ভে বিরাট বিরাট পাথর এনে ফেলেছে। তার ওপর দিয়ে ছোট ছোট ঝারনা সৃষ্টি করে নদীটি বয়ে চলেছে। অনতিদূরে উত্তরের দুই পাহাড়ের দু'দিকে থেকে নেমে এসেছে স্পার (spur) বা পাহাড়ের শাখা। দেখে মনে হয় দু'দিকের দু'টো পাহাড় এসে এক জায়গায় মিলে গেছে (ইন্টারলকিং স্পার)। আর এর মধ্যে দিয়ে উত্তর থেকে দক্ষিণে নেমে এসেছে বাসাসন। শুধু ভৌগোলিকদের কাছেই নয়, পর্যটকদের কাছেও এর আকর্ষণ কম নয়। পাহাড়গুলো ট্রেকিং-এর পক্ষে খুব উপযুক্ত।

আজ থেকে কয়েক বছর আগে যখন মিরিক পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেনি বা সাম্প্রতিককালে মংপং-এর মতে পর্যটন কেন্দ্র গড়ে ওঠে নি, তখন সমতলের কাছাকাছি পর্যটন স্থান ছিল হাতে গোনা তাই শিলিগুড়ি থেকে মাত্র 45 মিনিটের পথটুকু পেরিয়ে সীমান্তরক্ষী বাহিনী (B.S.F) একটি স্থায়ী চাঁদমারি স্থাপন করেছে। সকালে থেকে বিকেল পর্যন্ত গুলির আওয়াজ কানে তালা লাগিয়ে দেয়। এছাড়া গুলির প্রতিধ্বনি পাহাড়ের ওপর প্রতিক্রিয়া ফেলেছে। গত কয়েক বছরের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে নদীর ডানদিকের পাহাড়ের অনেক জায়গায় ধ্বস (Landslide) নেমেছে। ধ্বসের সাথে সাথে স্বভাবতই অনেক গাছপালার বিলুপ্তি ঘটেছে।

সবশেষে বলা চলে যে সত্তরের দশকের শেষদিকে দুধিয়ার যে পর্যটক আকর্ষণ করার ক্ষমতা ছিল, আজ আর তা নেই। হালে শিলিগুড়ির আশেপাশে কয়েকটি পর্যটন কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। যেমন সুকানা, মংপং ইত্যাদি। এগুলোতে কৃত্রিম হ্রদ বা নদীতে নৌচালনের ব্যবস্থা, পার্ক, ছোটখাটো চিড়িয়াখানা ইত্যাদির ব্যবস্থা রয়েছে, যা দুধিয়াতে নেই। তাই দুধিয়াকে তার হারানো গৌরব ফিরে পেতে হলে এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সম্বন্ধে যেমন সংবাদপত্র মারফৎ বিজ্ঞাপন দিতে হবে, তেমনি এই পর্যটনকেন্দ্র সম্পর্কে পরিকল্পনাও নিতে হবে।

উপরের আলোচনার ভিত্তিতে আমরা বলতে পারি যে বসতির বিবর্তনে প্রাকৃতিক এবং ঐতিহাসিক প্রভাব, এমনিক সাংস্কৃতিক প্রভাব কাজ করে। যেমন বলা চলে একসময়ে নদীকে কেন্দ্র করেই বসতি গড়ে উঠেছিল। পরবর্তীকালে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটায় রাস্তা বা রেলপথের ধারে লাইনবন্দী বসতি গড়ে উঠল, যা কালক্রমে আয়তাকার সংঘবদ্ধ বসতির রূপ পেল। স্বাধীনতার পর আমাদের সরকারী আনুকূল্যে সৃষ্ট বসতিগুলোও আয়তাকার সংঘবদ্ধ বসতির রূপ পেল। স্বাধীনতার পর আমাদের দেশে

সরকারী আনুকুল্যে সৃষ্ট বসতিগুলোও আয়তকার বসতির রূপ নিয়েছে। কারণ সরকারী খাসজমিতে বহু পরিবারকে সমপরিমাণ জমি ও বাড়ি করার টাকা অনুদান দেওয়া হয়।

3.8 গ্রামীণ বসতবাড়ি (Rural house)

ভূমিকা ঃ

"The form of the house interests the geography not for its details, but as a whole for its general plan and the way it is adapted to geographical conditions" (Brunhes).

জন্মাবার পর মানুষের অতি প্রয়োজনীয় বস্তুটি হল মাথা গোঁজবার ঠাঁই। এই বাসগৃহ আয়তাকার বা গোলাকার হতে পারে, ছাদ একদিকে বা দু'দিকে ঢালু থাকতে পারে। ফসল, গৃহপালিত পশু ও সব্জি-বাগান একই বাড়ির বিভিন্ন অংশে থাকতে পারে। স্থায়ী বসতি এলাকায় এক-এর বেশি ঘর থাকে। বাড়ির মাঝে থাকে উঠান। এর পাশে দিয়ে সমকোণে দু'টো বা তিনটে ঘর তোলা হয়। ওড়িশা, পশ্চিমবঙ্গ, অসম, ত্রিপুরা ও মণিপুরে উঠানের চারপাশ দিয়ে ঘর তোলা হয়। ফলে বাড়ির মেয়েদের আব্রু রক্ষা করা সম্ভব হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর সূচনায় Ritter-এর গবেষণা বাসগৃহ ও পরিবেশে সম্পর্কে ভৌগোলিকদের কাচে এক নতুন দিগন্ত খুলে দিল। পরবর্তীকালে এই বিষয়টি নিয়ে Ratzel জার্মানীর বাসগৃহ নিয়ে গবেষণা চালিয়েছিলেন। জার্মানী ও ফরাসী বাসগৃহের মধ্যে দু'টো মৌলিক পার্থক্য তাঁর লক্ষ্য করেছিলেন। Brockmann, Cvijic, Jerosch, Hunziker, krebs, Demangeon-এর ন্যায় গবেষকদের চেষ্টায় বাসগৃহ ও তার পরিবেশ সম্বন্ধে আমরা জানতে পেরেছি। ভারতেও এ বিষয়ে যথেষ্ঠ গবেষণা হয়েছে।

3.8.1 গ্রামীণ বসতবাড়ি নির্মাণে পরিবেশের ছাপ (Environmential influence on rural house building)

বসতবাড়ির নির্মাণকার্যে জলবায়ু স্থানীয় উপাদান, অর্থনৈতিক ও ঐতিহাসিক কারণ ছাড়াও অন্যান্য কতকগুলো কারণ প্রভাব বিস্তার করে।

জলবায়ু ঃ

বসতবাড়ি নির্মাণ করতে জলবায়ুর প্রভাব আমরা বেশি অনুভব করি। উত্তাপ ও বৃষ্টিপাতের হেরফের তার প্রধান কারণ। বৃষ্টিপাত ছাড়া সূর্যালোক, বাতাসের দিক, বরফপাত বাড়ির অবস্থান ও গঠনের ওপর প্রভাব ফেলে। শীতের দেশের বাড়ির সঙ্গে গরমের দেশের বাড়ির অনেক তফাৎ দেখা যায়, যেমন দেখা যায় বৃষ্টিবহুল অঞ্চলের বসতবাড়ির সঙ্গে বৃষ্টিহীন অঞ্চলের বাড়িঘরের। Brunhes-এর ভাষায় কোন জায়গায় জলবায়ু ছাদের আকৃতির মাধ্যমে বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বেশি বৃষ্টিবহুল অঞ্চলে ঢালু ছাদওয়ালা বাড়ি তৈরি হয়, তাতে করে জল সহজেই গড়িয়ে নীচে নেমে যায়। ঘরের সামনে বারান্দার চালও ঢালু

হয়। তার ফলে বৃষ্টির জলের ছাট ঘরের মধ্যে সহজ প্রবেশ করতে পারে না। কম বৃষ্টিপাত এলাকায় সমতল ছাদওয়ালা বাড়ি তৈরি করে। এছাড়া ঘরের মধ্যে চুল্লি জ্বালান হয় এবং ধোঁয়া বেরোবার জন্য ছাদে চিমনি থাকে।

অন্যদিকে, নিম্নগাঙ্গেয় সমভূমিতে গরম বেশি, আবার বৃষ্টিও বেশি। তাই গরমের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এখানকার বাসিন্দারা মাটির দেওয়াল ও খড়ে ছাওয়া ঢালু চালা দেওয়া ঘরে বাস করে। যে সব বৃষ্টিবহুল অঞ্চলে বাতাসের গতিবেগ বেশি, সে সব স্থানে বৃষ্টির ছাট থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ঘরের চাল অনেকটা ঢালু করা হয়। বাতাস ও বৃষ্টির ঝাপটা থেকে বাঁচবার জন্য ঘরের সামনে টানা বারান্দা থাকে। ঘরের সামনে বারান্দা থাকলে সরাসরি রোদের তাপ ঘরে আসতে পারে না। ফলে ঘরের তাপমাত্রা কম থাকে। এছাড়া বিকেলের দিকে অবকাশ উপভোগ করার জন্যও বারান্দার দরকার রয়েছে।

যে সব অঞ্চলে বেশি বরফ পড়ে, সেই সব স্থানে ঘরের চাল ঢালু করে তৈরি হয়ে থাকে, যাতে বরফ জমা হতে না পারে। মরু অঞ্চলে গরম বায়ু যাতে ঘরের মধ্যে না আসতে পারে। তার জন্য ঘরের ছাদ মাটির কাছাকাঠি পর্যন্ত নেমে আসে। দাক্ষিণাত্য ও উত্তর-পশ্চিম ভারতের যে সকল অঞ্চলে বৃষ্টিপাত কম, আবার শীত ও গরম দুই-ই বেশি, যে সব জায়গায় সমতল ছাদযুক্ত মাটির বাড়ি দেখা যায়। মাটির ছাদ ও দেওয়াল ঘরের ভেতরের তাপ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। শীতের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য অনেক পুরনো বাড়িতে দরজা জানলার সংখ্যা কম থাকে। উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের মত গরমের দেশে জানলার আকার ছোট হয়, আর তা থাকে ছাদের ঠিক নীচেই।

সূর্যলোক ঃ

হিমালয়ের দক্ষিণঢালে বেশি সূর্যালোক পায়। এখানে সহজে জল নিকাশ হয় বলে এই দিকটা শুকনো থাকে, আর উত্তর ঢালে যেমন তুষারপাত হয়ে, তেমনি খাড়া এর ঢাল। তাই হিমালয়ের দক্ষিণঢালেই বেশি লোক বাস করে (চিত্র 1.2.2.)।

যে সব জায়গায় বছরের বেশির ভাগ সময় জল জমে থাকে (যেমন মুর্শিদাবাদ জেলার নওদা থানার কালান্তর অঞ্চল বা ঐ জেলার কান্দী মহকুমার হিজল বিল অঞ্চল বা মেদিনীপুর জেলার সবং থানা) কিংবা যেখানে অতিরিক্ত বৃষ্টি হয় (যেমন মেঘালয়) সেখানকার অধিবাসীরা মাটি থেকে প্রায় 2 মিটার উঁচু বিথর করে বাড়ি বানায়। মুর্শিদাবাদ বা মেদিনীপুরের ঐ সব অঞ্চলে বর্ষার সময়ে এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়িতে যেতে নৌকা লাগে। এছাড়া মুর্শিদাবাদের পদ্মার চর এলাকায় প্রতিবছরই বন্যা দেখা যায়। তাই এই অঞ্চলের বাসিন্দারা হাল্কা ছাউনি ও হাল্কা দেওয়াল দিয়ে অস্থায়ী কুঁড়েঘর বানায়, যাতে বন্যার সময় তারা বাড়িঘর ও অন্যান্য জিনিসপত্র সহজেই সরাতে পারে। উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের গঙ্গার চর এলাকায়ও অনেক বসতি অস্থায়ী।

ঘূর্ণিঝড়ের দরুন অন্ধ্রপ্রদেশের কৃষক ও অন্যান্য শ্রমিকেরা তালগাছের পাতা দিয়ে ঘর তৈরি করে।

স্থানীয় উপকরণ ঃ

জলবায়ুর পরেই যে করণটি বসতবাড়ি তৈরিতে সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলে তা হল হাতের কাছে পাওয়া বাড়ি তৈরির মালমশলা। পশ্চিম রাজস্থান, পশ্চিম সৌরাষ্ট্র, কচ্ছ, উত্তর-পশ্চিম হিমালয়, দাক্ষিণাত্যের মালভূমির দক্ষিণ-মধ্যাংশ ইত্যাদি স্থানে বাড়ি তৈরির জন্য স্থানীয়ভাবে পাথর ও কাঠ সহজেই পাওয়া যায়। তাই শীতের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এখানকার বাসিন্দারা পাথরের চওড়া দেওয়াল, কাঠের তক্তার মেঝে আর শ্লেট পাথৰ বা টালির তৈরি ছাদযুক্ত ঘরে বাস করে। প্রচুর পাথর পাওয়া যায় বলে রাজস্থানে ছাদ তৈরি করতে পাথরের ব্যবহার হয়। অনেক সময় ঘরের চাল ও কাঠ দিয়ে বানানো হয়। অন্যদিকে, আবার নিম্নগাঙ্গেয় সমভূমি ও তার নিকবর্তী এলাকায় প্রচুর বাঁশ জন্মায়। এখানকার তরাই অঞ্চল, সুন্দরবন অঞ্চল ও পশ্চিমের মালভূমি অঞ্চলে নানা ধরনের কাঠ পাওয়া যায়। এছাড়া এখানে প্রচুর পরিমাণে ধানের খড় পাওয়া যায়। একসময় ঘর ছাওয়ার জন্য উলুখড় ও কেশে ঘাস পশ্চিমবঙ্গে পাওয়া যেত। তাই এখানে মাটির দেওয়াল এবং বাঁশ ও পাটাতনের ওপর খড়ে ছাওয়া ঢালু চালের ঘর দেখা যায়। সুন্দরবনে হোগলা পাতা বেশি পাওয়া যায় বলে এখানে হোগলার চাল দেখা যায়। অসমের বনভূমিতে ও সমতল এলাকায় প্রচুর বাঁশ ও 'খের' নামে একপ্রকার ঘাস পাওয়া যায়। তাই অসমে ঘরের দেওয়াল বাঁশ ও ছাদ 'খের' ঘাস দিয়ে ছাওয়া হয়। বর্তমানে কাঠের কাঠামোর ওপর টিনের চাল ও বাঁশের দেওয়ালের ওপর সিমেন্ট প্লাস্টার করা ঘর প্রচুর দেখা যায়। অসমের বনভূমিতে অনেক দামী দামী কাঠ পাওয়া যায় বলে এখানে অনেকে কাঠের তৈরি বাড়িতে বাস করে।

অর্থনৈতিক কারণ ঃ

বসবাড়ির আয়তন, ছাদের নকশা ও বাড়ি তৈরির মালমশলার ব্যবহার বেশির ভাগ ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক কারণের ওপর নির্ভর করে। গ্রামাঞ্চলে মাটির ঘর বেশি দেখা যায়। বসতবাড়িতে কাঠ ও ইঁটের ব্যবহার গৃহস্বামীর অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতার ওপর নির্ভর করে। গবীবেরা পর্ণকুটীরে বাস করে। আর ধনীরা তিন বা চার কামরার ঘরে বাস করে। এই একই কারণের জন্য গরীবদের বাড়ি এক বা দুই চালের হয়। আর অবস্থাপন্নদের বাড়ি চারচালা থেকে আটচালা পর্যন্ত হয়। অনুরূপভাবে দেখা যায় গরীবদের ঘরের চাল খড়, শন ও পাতা দিয়ে আর স্বচ্ছল ব্যক্তিদের ঘরের ছাদ টিন, টালি ও অ্যাসবেসটাস দিয়ে তৈরি হয়।

ঐতিহাসিক কারণ ঃ

উপরের আলোচিত কারণগুলো ছাড়া ঐতিহাসিক কারণ ভারতের বিভিন্ন ধরনের বসতবাড়ির গঠনশৈলীকে প্রভাবিত করেছে। যুগ যুগ ধরে বিভিন্ন জাতি বাড়ি তৈরিতে তাদের নিজস্ব রীতি এদেশে বয়ে নিয়ে এসেছে। উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে যেমন মোগল ছাড়াও অন্যান্য জাতির অনুপ্রবেশ ঘটেছে,

তেমনি বিভিন্ন ইউরোপীয় জাতিরা এদেশে এসেছে। সেকারণে পূর্ব ও উত্তর ভারতের বসতবাড়ির সঙ্গে যেমন প্রাচ্য ও পার্বত্য মধ্য এশিয়া, তেমনি দক্ষিণ ভারতের সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকার বসতবাড়ির অনেকটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়। উদাহরণ হিসেবে বলা চলে উত্তর-পূর্ব ভারতের বাঁশ ও পাটাতনওয়ালা বসতবাড়িতে পূর্ব এশিয়ার, উত্তর ভারতের পাথর ও কাঠের বাড়িতে পার্বত্য মধ্য এশিয়ার, দক্ষিণ ভারতের প্রাচীর ঘেরা বাড়িতে পারস্যের, আর পশ্চিম ভারতের গোলাকার বাড়িঘরে আফ্রিকার ছাপ উল্লেখ করা যায়। এছাড়া পশ্চিম উপকূলের বাড়িঘরে ইউরোপীয় ছাপ লক্ষ্য করার মত। এবিষয়ে কেরালার জাহাজ আকৃতি বাড়িঘর উল্লেখের দাবী রাখে (চিত্র নং 1.4.8)।

ধর্মীয় কারণ ঃ

অনেক দেশেই বাড়ির অবস্থান সামাজিক বিশ্বাস কিংবা ধর্মীয় কারণের ওপর নির্ভর করে। কুমায়ূন ও গাড়োয়াল গ্রামে পুরোহিত মশায় বাড়ির স্থান ঠিক করে দেন। এখানে কিছু ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান বাড়ির স্থান ঠিক করার পক্ষে আবশ্যিক হয়ে পড়ে। কারণ তাদের বিশ্বাস ঐ সব অনুষ্ঠানের পর অশুভ শক্তি, ভূতপ্রেত ঐ নির্দিষ্ট জায়গাটি ছেড়ে যায়। এরপর একই বর্ণের (Cash) লোকেরা এক একটি জায়গায় পাশাপাশি বাড়ি তৈরি করে। স্থানীয় ভাষায় এই বসতিকে বলে 'খোলা', যেমন পাণ্ডিখোলা, যোশীখোলা।

ভারতবর্ষের অনেক জায়গায়, বিশেষ করে উত্তর ভারতে, বর্ণব্যবস্থার খুব বিধিনিষেধ আছে। বাড়ির অবস্থানের ওপর এই ব্যবস্থার প্রভাব অনেকখানি, কুমায়ূনও গাড়োয়ালের রাজপুত ও ব্রাহ্মণরা ভূমিভাগের প্রকৃতি অনুযায়ী এক এক জায়গায় শ্রেণীবদ্ধভাবে বাড়িগুলো তৈরি করে। বাড়ির সামনে চক্ বা আঙিনা থাকে। প্রধান গ্রাম থেকে সাধারণতঃ কিছুটা নীচে গোশালা থাকে। কখনই উচ্চবর্ণের খোলার মধ্যে অন্যদের বাড়ি তৈরির অনুমতি দেওয়া হয় না। উচ্চবর্ণের বসতি ও গ্রামের পানীয় জলের উৎস থেকে কিছুটা দূরে অর্থাৎ গ্রামের শেষ মাথায় নীচুবর্ণের লোকেরা বাড়ি তৈরি করে। এই রকম ব্যবস্থার কারণ হল যাতে উঁচু বর্ণের লোকেরা নীচু বর্ণের লোকেদের নিশ্বাসে কলুষিত না হয়। অতীতে বর্ণব্যবস্থার কড়াকড়ি এত বেশি ছিল যে উঁচু জাত ও নীচু জাতের এক জায়গায় বাস করার ব্যাপারটা কল্পনার অতীত ছিল। আজও উত্তর ভারতের গ্রামে, এমন কি সরকারী অফিসে, দুটো আলাদা আলাদা স্থানে বা পাত্রে পানীয় জলের ব্যবস্থ থাকে, একটা উঁচু জাতের আরেকটা নীচু জাতের। যেখানে জল পাওয়া কষ্টকর ব্যাপার, সেখানে ঝর্নার চারধার দিয়ে চৌবাচ্চা করে জল ধরে রাখা হয়। এক এক দিকে এক এক জাতের জন্য নির্দিষ্ট থাকে। এই নিয়ম তখনই শিথিল করা হয়, যেখানে জল পাওয়া খুবই দুষ্কর।

অন্যান্য কারণ ঃ

হিমালয়ের কোলে লালিত উত্তর-পূর্ব ভারতের ঘনজঙ্গলে ঢাকা অনেক স্থানে হিংস্র জন্তু জানোয়ারের বাস। তাই সেখানকার বাসিন্দারা গাছে মাচা তৈরি করে তার ওপর বাসগৃহ নির্মাণ করে। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার

জলাজায়গার অধিবাসীরা ছাড়া ও মিরি ও দেউরি উপজাতিরা মাটি থেকে উঁচুতে কাঠের পাটাতনের ওপর তৈরি বাড়িতে বাস করে। হিমালয় অঞ্চলে কাঠ সহজে পাওয়া যায়, আবার এখানে ভূমিকম্প লেগেই থাকে। এই দুই কারণে এখানকার বাড়িগুলো হাল্কাভাবে তৈরি করার জন্য কাঠের ব্যবহার বেশি হয়। আজ থেকে ত্রিশ বছর আগেও শিলিগুড়ি শহরে পাকা বাড়ির সংখ্যা ছিল কম। ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকার কাছে অবস্থানের জন্য এখানকার অধিকাংশ বাড়ি ছিল কাঠের তৈরি। সাধারণতঃ কাঠের খুঁটির ওপর পাটাতন করে তার ওপর ঘর তৈরি করা হত। কারণটা ছিল আশেপাশের বনজঙ্গলের জন্তু জানোয়ারের উৎপাত। আজও শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি কিংবা শিলিগুড়ি মালবাজার সড়কপথের ধারে কাঠের খুঁটির ওপর মাচা তৈরি করে তার ওপর বাড়ি তৈরি হয়। কিন্তু মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের অরণ্য পরিবেশে প্রচুর গাছপালাথাকা সত্ত্বেও মাটির তৈরি পর্ণকুটির বেশি দেখা যায়। এর প্রধান কারণ হল মাটি এখানে সহজলভ্য। এতে আগুন লাগায় ভয় কম। হিমালয়ের বনভূমি অঞ্চলের সব জায়গাতেই কাঠের বাড়ি দেখা যায় না। দার্জিলিং হিমালয়, কাশ্মীর হিমালয় ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলে কাঠের একতলা ও দোলতা বাড়ি দেখা যায়। কুমায়ুন অঞ্চলে কিন্তু এর ব্যতিক্রম আছে। সেখানে কাঠের বাড়ির নিদর্শন বিরল, যদিও বাড়ি তৈরিতে যথেষ্ট কাঠ ব্যবহার হয়।

3.9 ভারতের গ্রামীণ বসতবাড়ির আকার ও তার শ্রেণীবিভাগ (Shape of Indian rural houses and its classification)

ভারতীয় নৃতত্ত্ব সর্বেক্ষণ (Anthropological survey of India) তাদের প্রকাশিত 'Peasant Life in India'-তে মেঝে ও ছাদের বৈশিষ্ট্যানুসারে ভারতের গ্রামাঞ্চলের বাড়িগুলোকে তিনভাগে ভাগ করেছে—(A) অনুভূমিক ছাদ ও আয়তাকার মেঝেযুক্ত বাড়ি, (B) ঢালু ছাদবিশিষ্ট আয়তাকার বাড়ি, (C) শঙ্কু আকৃতির ছাদযুক্ত গোলাকার বাড়ি (চিত্র 1.4.1)।

(A) অনুভূমিক ছাদ ও আয়তাকার মেঝেযুক্ত বাড়ি (Horizontal roof with rectangular ground plan)

যেখানে বাৎসারিক বৃষ্টিপাত প্রায় 60 সে. মি. সেখানে সমতল ছাদ দেখা যায়। উত্তর ভারতের দক্ষিণপূর্ব কাশ্মীর ও কাংড়া বাদে পাঞ্জাব ও উত্তরপ্রদেশের 24টি জেলায় যেখানে বৃষ্টিপাত প্রায় 75 সে.মি. সেখানেও এই ধরনের বাড়ি চোখে পড়বে (চিত্র নং 1.4.1)। এছাড়া মধ্যভারত, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশের রাটলাম, ধার জেলা, মহারাষ্ট্রের পূর্ব ও পশ্চিম খান্দেশ, বুলন্দা ঔরঙ্গাবাদ, পরভানী, বীর, নান্দেড়ে, আমেদনগর, ওসমানাবাদে সমতল ছাদওয়ালা বাড়ি দেখা যায়। দক্ষিণ ভারতে কর্ণাটকের ধারওয়ার, মান্দি, কোলার, রাইচুর, বিজাপুর ইত্যাদি 12টি জেলায় ও অন্ধ্রপ্রদেশের কুর্ণুল, অনন্তপুর, কুড্ডাপা, মেডাক প্রভৃতি

7টি জেলায় সমতল ছাদওয়ালা বাড়ি দেখা যায়। কেরালা ও তামিলনাড়ুতে বেশি বৃষ্টি হয় বলে এই ধরনের ছাদ চোখে পড়ে না।

চিত্র 1.4.1 ঃ ভারতের বাসগৃহের ছাদ ও মেঝের বন্টন (ASI-র মতে)

এখন একটু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের (1) বাড়ির অবস্থান ও (2) উঠানের ক্ষেত্রে একটু পার্থক্য রয়েছে।

. উত্তর ভারতের গ্রামগুলোর অনেক ক্ষেত্রেই কোন নির্দিষ্ট আকার নেই। কিন্তু দক্ষিণ ভারতে বাড়ির লাগোয়া একটি চওড়া পথের অবস্থান চোখে পড়ে। 'পর্দা' প্রথার প্রচলন উঠানের অবস্থানের ক্ষেত্রে আং শিকভাবে প্রভাব বিস্তার করে। উত্তর ভারতে 'পর্দা' প্রথার প্রচলন বেশি, আর এই কারণেই বাড়ির মাঝখানে উঠান থাকে, কারণ এইখানে বাড়ির মেয়েরা দিনের বেলায় সমস্ত কাজকর্মকরে। কিন্তু দক্ষিণ ভারতে 'পর্দা' প্রথার প্রচলন নেই বললেই চলে। তাই এখানে বাড়ির মাঝখানে খোলা উঠান থাকে না। কর্ণাটক ও তামিলনাড়ুতে বাড়ির পিছনে একটু করে ঘেরা জায়গা তাকে। আর অন্ধ্রপ্রদেশে এই ঘেরা অংশটুকু বাড়ির সামনেই থাকে। আবার মহারাষ্ট্রে 'পর্দা' প্রথার চলন নেই, কিন্তু সেখানে বাড়ির মাঝখানে উঠান থাকে।

মহারাষ্ট্র ও তার লাগোয়া মধ্যপ্রদেশে বাড়ির চারদিকে ঘিরে দেওয়াল থাকে, আর ঘরগুলো দেওয়ালের ভেতরের দিকে পরপর তৈরি হয়। কিন্তু উত্তর ভারতের ঘরগুলো মাঝের উঠানকে কেন্দ্র করে আলাদা আলাদা ভাবে গড়ে ওঠে। গরীবদের বাড়ির ওঠানের একদিকে ঘরগুলো থাকে, কোন কোন ক্ষেত্রে একটি বারান্দাও এর সঙ্গে দেখা যায়। যাদের আরো ঘরের দরকার আছে তারা উঠানের চারদিকে আর ঘর তৈরি করে।

বাড়ির ভিত ঃ

নিম্ন আয়ের লোকেদের বাড়ির ভিত নেই বললেই চলে। কিন্তু অবস্থাপন্নরা প্রায় 0·60 মিটার উঁচু ভিত বানায়। সাধারণতঃ মাটি দিয়েই ভিত বানানো হয়। কিন্তু বিজাপুর বা কুর্ণুল জেলার পাথরগুলোকে সমান মাপ করে কেটে মাটির সঙ্গে মেশানো হয়। আবার ক্ষেত্রবিশেষে পোড়া ইঁট দিয়েও ভিত করা হয়। তবে এসবই গৃহস্থের আর্থিক সঙ্গতির ওপর নির্ভর করে।

বাড়ির ছাদ ঃ

রাজস্থান ও পাঞ্জাবে কাঠের চওড়া তক্তা, নলখাগড়া, চেরা বাঁশের চাটাই, এমনকি পাথরগুলোকে সমান মাপ করে কেটেও ছাদ তৈরি হয়। এগুলোর ওপর মাটির প্রলেপ দিয়ে লেপা হয় ও প্রয়োজনবোধে গোবর দিয়ে নিকানো হয়। গরীব লোকেরা ছাদ তৈরি করতে খাগড়া বা বাঁশের চাটাই ব্যবহার করে। এগুলোর ওপর পুরু করে পাতা দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়, যাতে করে জল ছাদ চুঁইয়ে ঘরে না আসে।

গ্যাস ও ধোঁয়া বেরোবার চিমনি ঃ

দক্ষিণ-পশ্চিম কর্ণাটকে ধোঁয়া বেরোবার জন্য ছাদে একটা চিমনি বসান হয়। কোথাও ছাদে একই লাইনে পরপর তিনটি চিমনি বসানো হয় যাতে ধোঁয়া সম্পূর্ণভাবে বেরিয়ে যেতে পারে। মহারাষ্ট্রের নাগপুর বিভাগ, পাঞ্জাব ও কাশ্মীরে ছাদে একটা গর্ত রাখা হয়। মাটির ভাঙা পাত্র দিয়ে তা ঢাকা থাকে, যাতে বৃষ্টির জল ঘরে না পড়ে।

(B) ঢালু ছাদবিশিষ্ট আয়তাকার বাড়ি (Sloping roof with rectangular ground plan)

এই ধরনের বাড়ি ভারতের অধিকাংশ জায়গায় দেখা যায়। এই ধরনের অধিকাংশ বাড়ির লম্বা দেওয়ালে কয়েকটা দরজা থাকে, যা দিয়ে সর্বসাধারণের ব্যবহার্য বড় হলঘরের কিংবা বিভিন্ন ঘরে প্রবেশ করা যায়।

ব্যবহারের দিক দিয়ে এই দু'ধরনের ব্যবস্থার মধ্যে কিছু রকমফের আছে। কারণ যে ঘরগুলোর ভিন্ন প্রবেশপথ আছে সেগুলোর আব্রু (privacy) থাকে, যেমন ওড়িশায়। কিন্তু অরুণাচল প্রদেশের আদিম উপজাতিদের বাড়িগুলোতে একটা দরজার ভেথর দিয়ে প্রবেশ করে আলাদা আলাদা বাড়িতে পৌঁছান যায়। শুধুমাত্র উত্তর-পূর্ব ভারতের লম্বা বাড়িতে আর একটা বৈশিষ্টলক্ষ্য করা যায়।তা হল মাটির ওপর কাঠ

পেতে অনুভূমিক মাচা বা পাটাতন (horizontal platform) তৈরি করে তার ওপর বাড়ি তৈরি করা হয়। বন্যাপ্লাবিত অঞ্চলে এই ধরনের বাড়ি তৈরি হয় না। কোন একটি জায়গায় ঢালু ছাদওয়ালা আয়তাকার বাড়ি এককভাবে অবস্থান করতে দেখা যায় বা অনেক বাড়িও দেখা যেতে পারে। বাড়িগুলোর মাঝখানে উঠান থাকতেও পারে, আবার বাড়িগুলোর সামনে বা পেছনেও ঘেরা উঠান থাকতে পারে।

দেওয়াল ঃ

এগুলো মাটি, পাথর, বাঁশের বেড়া, কিংবা গাছের ডালপালা দিয়ে বানানো হয়। যেখানে যা পাওয়া যায় কিংবা ব্যবহারের উপযোগী বলে মনে হয় তাই কাজে লাগানো হয় (চিত্র নং 1.4.2)। ধনীর সাধারণতঃ ইঁটের দেওয়াল গাঁথে, গরীবেরা মাটির দেওয়াল বা গাছের ডালপালার ওপর মাটির প্রলেপ দিয়ে

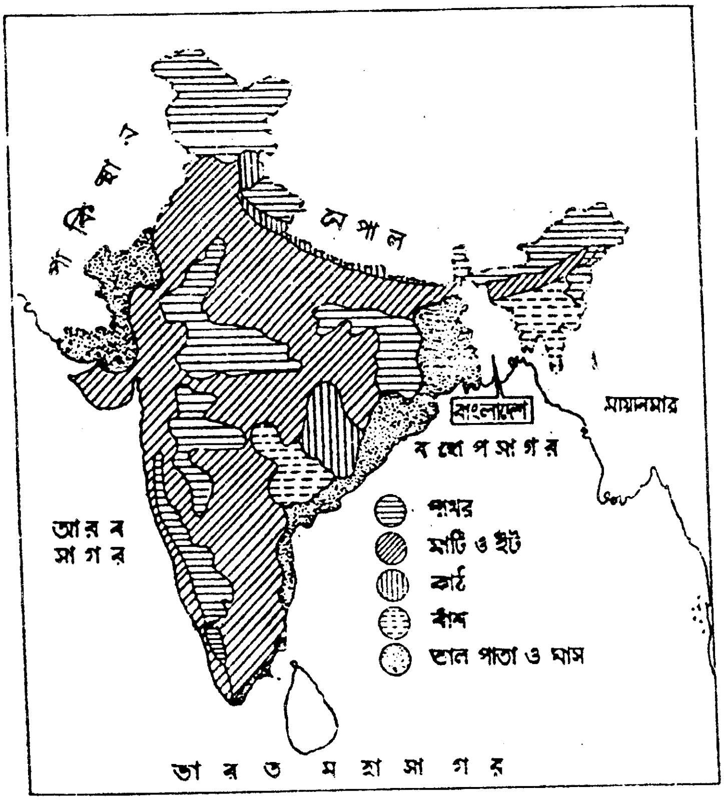

চিত্র 1.4.2 ঃ ভারতের বাসগৃহের দেওয়াল তৈরির উপকরণ (সূত্র ঃ ASI মতে)

দেওয়াল গাঁথে। যেমন বলা চলে পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ অংশে যে মিহি কাদা পাওয়া যায়, তা পা দিয়ে পিষে কোদাল দিয়ে কেটে একটার পর একটা ধাপ গেঁথে দেওয়াল তোলা হয়। যেখানকার কাদা মাটি একটু মোটা ও কাঁকরযুক্ত সেইসব মাটি লম্বা লম্বা করে পাকিয়ে একটার পর একটা সাজিয়ে দেওয়াল

গাঁথা হয়। ওড়িশা ও পশ্চিমবঙ্গে আকৃতিহীন কাদার দলা দেওয়াল গাঁথতে কাজে লাগে। একটা প্রস্থ শুকোবার পর আবার তার ওপর আর এক প্রস্থ মাটি লেপা হয়। এইভাবে পুরো দেওয়ালটাকে মসৃণ ও পলেস্তারা করা হয়। ভরাতবর্ষের কোন কোন অংশে, বিশেষ করে কিছু আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে, দেওয়ালগুলো পলেস্তারা এবং মসৃণ করে তার ওপর লাল, কালো রঙ দিয়ে রাঙানো হয়। আবার পশুপাখি এঁকে দেওয়ালকে চিত্রিত করার রীতিরও চলন আছে।

ছাদ ঃ

ভারতের বিভিন্ন অংশে ছাদ তৈরির পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন রকমের (চিত্র নং 1.4.3)। ছাউনির নীচে ছাদের কাঠামো এক এক অঞ্চলে এক এক রকমভাবে তৈরি হয়। কোন কোন অঞ্চলে তা বাঁশ বা কাঠের তৈরি। কোথাও কোথাও নালখাগড়াকে ঘনভাবে বুনোট করেও কাঠামোর কাজ চালানো হয়। পূর্ব বা উত্তর-পূর্ব

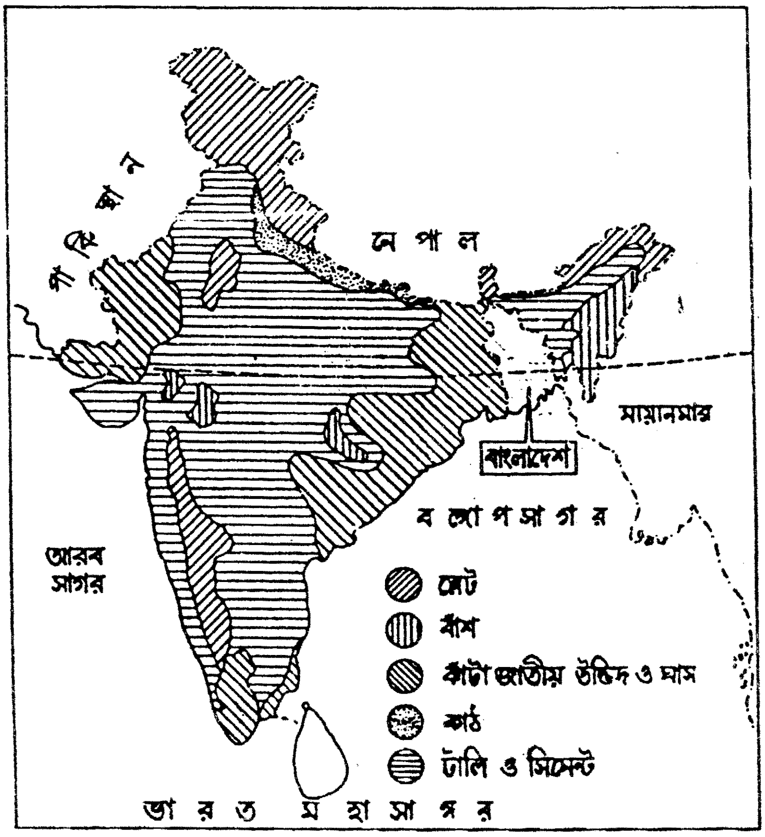

চিত্র 1.4.3 ঃ ভারতের বাসগৃহের ছাদ তৈরির উপকরণ (সূত্র ঃ ASI মতে)

ভারতে ঘাস বা বিশেষ ধরনের ঘাস দিয়ে ছাদ ছাওয়া হয়। আবার টালির বা খাপরার (এগুলো দেখতে আধখানা গোলকারা খুরির মত) ছাদও দেখা যায়। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে পশ্চিমবঙ্গ, কেরালা

ও অন্ধ্রপ্রদেশের কিছু কিছু জায়গায় টালির চলন আছে এবং বিহারের অনেক জায়গাতেই খাপরার ছাউনিচোখে পড়বে। আরও পশ্চিমে উত্তরপ্রদেশের পূর্বাংশে পৌঁছালে হাতে তৈরি চ্যাপ্টা টালি দেখা যায়। রাজস্থানের পূর্বাংশের চ্যাপ্টা টালির চলন আছে। ওড়িশায় খড় দিয়ে ছাদ বানানো হয়। ওড়িশার গঞ্জামে হাতে তৈরি আধখানা গোলাকার টালি (খাপরা) ছাদ তৈরিতে ব্যবহার করা হয়। এখানে মাত্র এক প্রস্ত টালি দিয়ে ঘরের ছাউনি দেওয়া হয়। কিন্তু আরও দক্ষিণে গেলে দেখা যাবে তিন বা চারপ্রস্ত দিয়ে ঘরের ছাদ করা হয়েছে। প্রতিটি দেওয়াল চুণ বা বালি দিয়ে পলেস্তারা করা হয় যাতে করে ছাদ পাকাপোক্ত হয়।

এবার ছাদের চালের কথায় আসি। পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে দুই চালবিশিষ্ট ছাদ দেখা যায়। মুম্বাই-এর উত্তর থেকে যদি একটা লাইন উত্তর-পূর্ব দিকে টানা যায় তবে সেই লাইনের ডানদিকের অঞ্চলটিতে চারচালা বিশিষ্ট ছাদ দেখা যায়। বিহারের বেশির ভাগ জায়গায় ও মধ্যপ্রদেশের পূর্বাংশে তিনচালা ও চালচালা বাড়ি দেখা যায়। ওড়িশায় সাধারণতঃ তিনচালা ছাদ দেখা যায়। অসমের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা ও তার লাগোয়া পাহাড়ী রাজগুলোতেও এই তিনচালা বাড়ি দেখা যায়। পশ্চিমবঙ্গ ও দক্ষিণ ভারতের প্রায় সবখানেই চারচালা বাড়ি দেখা যায়। ছাদের চারটে কোণ যখন একটা কেন্দ্র বিন্দুতে এসেমেলে, তখন তা পিরামিডের মতন দেখতে লাগে।

পশ্চিমবঙ্গের ঘরের চালগুলো হাতীর পিঠের উত্তর আকারের হয়, তাই চালগুলোর শেষপ্রান্ত মাটির কাছাকাছি নেমে আসে। চালের মাঝখানটা উঁচু থাকে, সেখান দিয়ে বাড়ির ভেথরে প্রবেশ করতে হয়। মোগলযুগের গৌরবের দিনে এই ধরনের গৃহচাল তাদের বিভিন্ন শিল্পশৈলীতে অনুকরণ করা হয়েছিল। উত্তর-পশ্চিম ভারতে এই ধরনের চাল 'বাংলা ছাত্রী' বা 'বাংলা চালা' নামে পরিচিত। কেরালার আলেপ্পী, ত্রিবান্দ্রম, মহারাষ্ট্রের নাগপুর, ভাণ্ডারা, বালাঘাটের অনেক বাড়িতেই বহুচালবিশিষ্ট বাড়ি দেখা যায়।

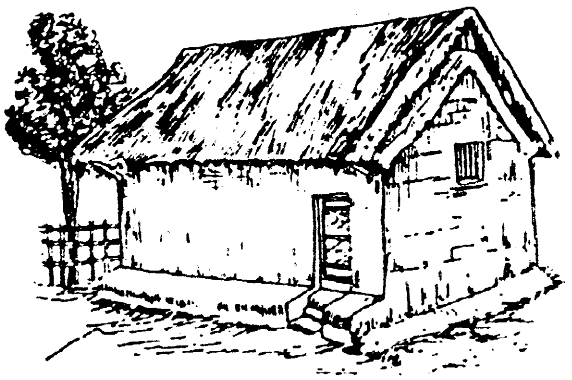
চিত্র 1.4.4 ঃ ওড়িশার দুই চালাবিশিষ্ট বাসগৃহ
(Census, 1961)

ওড়িশায় বাড়ির চালের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। এখানে দুই চাল বিশিষ্ট বাড়ি দেখা যায় (চিত্র 1.4.4)। দুইটি চালের মধ্যে বাতাস চলাচলের উপযোগী জায়গা থাকে। উপরের চাল খড় দিয়ে তৈরি করা হয়। নীচের চালার ভেতর ও বাইরে মাটি দিয়ে পলেস্তারা করা হয়। ওপর ও নীচের চালের মাঝখানে কাঠ বা মাটির ছোট ছোট খুঁটি

থাকে। এই ধরনের চালের আর একটি সুবিধে হল এই যে উপরের চালে যদি আগুন লাগে, তবে নীচের চাল রক্ষা পায়। কারণ গৃহস্বামী ছাদে উঠে দড়ি কেটে ওপরের চালকে নীচে নামিয়ে আনাতে পারে।

ভারতবর্ষের অনেক জায়গা, বিশেষ করে ওড়িশায়, চালের কাঠামো বেশ বড় হয়। এখানে ঢালু চালযুক্ত বাঁশের খুঁটিগুলোকে কাঠের কড়িকাঠের ওপর বাঁধা হয়। এই কাঠামো ক্রমশ নীচের দিকে চওড়া হয়। চার, ছয়, কিংবা তার বেশি সংখ্যক চালের কাঠামোওয়ালা বাড়ি এখানে দেখা যায়।

(C) শঙ্কু-আকৃতির ছাদওয়ালা গোলাকার বাড়ি (Conical roof with circular ground plan)

এই ধরনের বাড়ির ছাদ ছুঁচালো আর মেঝে চারকোণার বদলে গোলাকার করে তৈরি করা হয়। তাই এই ধরনের বাড়িতে জায়গা কম হয়। সত্যি বলতে কি, এগুলো কুঁড়েঘর ছাড়া আর কিছু না। এই ধরনের

চিত্র 1.4.5.1 ঃ ভিজিয়ানানাগ্রাম জেলায় তালপাতার তৈরি শঙ্কু বাসগৃহ (সূত্র ঃ 1.4.4)

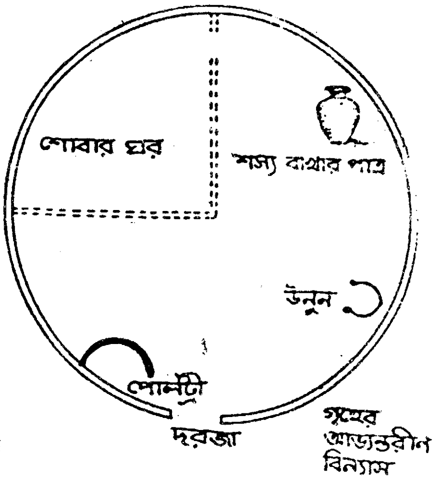

চিত্র 1.4.5.2 ঃ শঙ্কু বাসগৃহের অভ্যন্তরভাগ (সূত্র ঃ 1.4.4)

বাড়ি ভারতের কিছু উপজাতিদের মধ্যে দেখা যায়। ছোটনাগপুরের বীরহোরদের ভুলুয়া (যাযাবর) শ্রেণীরা এই ধরনের কুঁড়েঘর বানায়। গাছের ডাল ও পাতা দিয়ে তারা এই ঘরগুলো তৈরি করে। অন্ধ্রপ্রদেশের ওয়ালটেয়ারে বিশেষ করে তথাকথিত নিম্নজাতিরা ছুচালো ও শঙ্কু আকৃতির চালযুক্ত গোলাকার (চিত্র নং 1.4.5, 1.3.2), এমনকি আয়তক্ষেত্রাকার বাড়ি তৈরি করে। অন্ধ্রপ্রদেশের পশ্চিমে পাহাড়ী অঞ্চলে বসবাসকারী চেঞ্চু উপজাতিরা একই পদ্ধতিতে তাদের বাড়ি তৈরি করে। বাড়ির দেওয়াল মাটির আর ছাদ তালপাতার তৈরি। ঘরের চালার শেষভাগ মাটির খুব কাছাকাছি নেমে আসে। অন্য প্রদেশ থেকে আসা ওড়িশায় বসবাসকারী কিছু সংখ্যক আদিবাসী মৌচাকের মত কুঁড়েঘর বানায়। এই ধরনের বাড়িতে বাঁশের কঞ্চি বাঁকিয়ে দেওয়াল করা হয়, আর তালপাতা দিয়ে ছাদ দেওয়া হয়।

গুজরাটেরর সৌরাষ্ট্র ও কচ্ছে বসবাসকারী ওয়াগরী, রাবাবী প্রভৃতি উপজাতিরা গোলাকার ঘরে বাস করে। পূর্বভারতের গোলাকার ঘরের তুলনায় এখানকার বাড়িগুলোর দেওয়াল কিছুটা উঁচু। ছাদগুলো ছুঁচালো ও গোলাকার, কিন্তু অপেক্ষাকৃত কম উচ্চতাবিশিষ্ট।

অন্ধ্রপ্রদেশের কাউরা উপজাতিদের কুঁড়েঘরে দেওয়াল থাক না। কুঁড়েঘরগুলো দেখতে খিলানের (arch) মতন হয়। ঘরের সামনেটা সম্পূর্ণ খোলা থাকে। কয়েক প্রকারের চাটাই দিয়ে ঘরের ছায় তৈরি হয়।

উপরের আলোচনা ভিত্তিতে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের ঘরবাড়ি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা যেতে পারে।

3.10 বিভিন্ন রাজ্যের গ্রামীণ ঘরবাড়ির ধরন (Rural House types of different states)

❑ **কাশ্মীর ঃ**

এখানকার বাড়ি তৈরির মালমশলা এক এক অঞ্চলে এক এক রকম। শিবালিক পার্বত্যাঞ্চলে অর্থাৎ উধমপুর, ডোডা জেলায় প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। বরফও পড়ে খুব। সেইজন্য এখানকার অধিকাংশ বাড়ির দেওয়াল পাথরের তৈরি। তার ফলে ঠাণ্ডা বাতাস ঘরে প্রবেশ করতে পারে না। বাড়িগুলোর চাল খড়ের তৈরি। বৃষ্টির জন্য চালগুলো ঢালুবাবে তৈরি করতে পারে না। বাড়িগুলোর চাল খড়ের তৈরি। বৃষ্টির জন্য চালগুলো ঢালুভাবে তৈরি করা হয়। জম্মু ও কাশ্মীরের বাড়ির ছাদ সমতল। বাড়ি তৈরিতে মাটির ব্যবহার বেশি। ছাদে পাতলা কাঠ, মাটি ও গোবর ব্যবহার করা হয়। পুঞ্চ ও কাঠুয়া জেলার পার্বত্যাঞ্চলে বাড়ির দেওয়াল তৈরি করতে মাটি বা পোড়া ইঁটের চলন আছে। নওশেহরাতে অধিকাংশ বাড়ির দেওয়াল পাথরের তৈরি। কারণ এখানে কম দামে পাথর পাওয়া যায়। এই দুই জেলার বাড়ির ছাদ সমতল ও তা মাটি বা পাথরের তৈরি। ছাদের পাটাতন কাঠের তৈরি। ঝিলাম উপত্যকা অঞ্চলে পাথৰ খুব একটা পাওয়া যায় না বলে বাড়ি তৈরিতে ইঁটের ব্যবহার বেশি। এর ওপর চুণ বা মাটির পলেস্তারা দেওয়া হয়। টিনের ছাদের চল হওয়ার আগে এখানকার সমস্ত ছাদ বার্চ গাছের পাতলা কাঠ দিয়ে তৈরি হত। এর নীচে থাকত মোটা কাঠের কাঠামো বা ফ্রেম (Frame)। ঐ ছাদের ওপর প্রায় 15 সে.মি. মোটা মাটির পলেস্তারা দেওয়া হত। তার ওপর ছড়িয়ে দেওয়া হত টিউলিপ (tulip) গাছের ব্রীজ। বসন্তকালে যখন তাতে ফুল ধরত, ছাদগুলোকে সুন্দর বাগানের মতন দেখাত। আজও অধিকাংশ শহর এলাকায় এবং আংশিকভাবে গ্রামে এই ধরনের ছাদ দেখা যায়। লাডাক হল শীতল মরুভূমি। এখানে বৃষ্টি খুব কম, আবার ঠাণ্ডাও প্রচণ্ড। এখানে বৃষ্টি কম হওয়ার দরুন ছাদগুলো সমতলভাবে তৈরি হয়। বাড়ি তৈরিতে পাথরের ব্যবহার বেশি

হয়। বাড়িগুলো দোতালা হয়। নীচের তলায় সাধারণতঃ পশুদের রাখা হয়। ওপর তলায় থাকে শোবার ঘর।

❑ **হিমাচল প্রদেশ ঃ**

এখানকার বাড়িগুলো সাদামাটা। ঘরগুলোতে চাষী ও তার পরিবাস বাস করে। আবার এই ঘরগুলোতে ফসল ও চাষের সাজসরঞ্জামও রাখা হয়। স্থানীয় উপকরণের ওপর ভিত্তি করে এখানকার বাড়িঘর তৈরি করা হয়। এই রাজ্যের প্রধান তিন ধরনের বাড়ি হল ঃ—নুরপুর বাড়ি, কাঙরা বাড়ি ও কুলু বাড়ি।

নুরপুর বাড়ি ঃ এই ধরনের বাড়ি বহির্হিমালয়ের দেখা যায়। এখানে বৃষ্টিপাত কম, তাই বাড়ির ছাদগুলো সমতল। বাড়ির দেওয়াল ও মেঝে মাটি ও পাথরের তৈরি। এই ধরনের বাড়ি নুরপুর, উনা ও অন্যান্য বহির্হিমালয় অঞ্চলে দেখা যায়।

কুলু বাড়ি ঃ উচু পার্বত্য অঞ্চলে যেখানে বাড়ি তৈরির জন্য সমতল জায়গা নেই বললেই চলে সেখানে বাড়িগুলো তিনতলা পর্যন্ত হয়। বাড়িগুলো কাঠের ও পাথরের তৈরি। যেখান উপযুক্ত পাথৰ পাওয়া যায় না, সেখানে কাঠ দিয়ে পুরো বাড়ি তৈরি করা হয়। নীচের তলা গোয়ালঘর হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। গরুর খাবারও এখানে গুদামজাত করে রাখা হয়। শোবার ঘর ও রান্নার ঘর তিনতলায় থাকে। রান্নাঘরে চিমনি থাকে। দোতলার ঘরে শৌচাগার রাখা হয়। তিনতলায় দুটো ঘর থাকে। একটাতে শোয়া হয়। ঘরের এক কোণে তাঁত বসান থাকে।

দ্বিতীয় ঘরে কখন কখন খোল, জ্বালানী কাঠ ও ঘাস রাখা হয়। বাড়ির ছাদ, সমতল রাখা হয়, কারণ এখানে মাঝে মাঝে যে দমকা হাওয়া বয়, তাতে ঢালু ছাদ ঝড়ে উড়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে। তাছাড়া এই সমস্ত ছাদে ঘাস, ফসল, তরকারী ও মাংস রোদে শুকাতে দেওয়া হয়।

কাঙরা বাড়ি ঃ উপত্যকা ও উঁচু জায়গায় যেখানে যেখানে বৃষ্টিপাত অপেক্ষাকৃত বেশি, সেখানকার বাড়ির চালগুলো ঢালু, বাড়ির ভিত পাথরের তৈরি, প্রায় এক ফুট উঁচু (0·3 মি.)। দেওয়াল কাঁচা বা পোড়া ইঁটের তৈরি। নীচের তলার মেঝে মাটি ও পাথরের তৈরি, দোতলার মেঝে কাঠের পাটাতন দিয়ে তৈরি। যেখানে প্রচুর পাথর পাওয়া যায় সেখানে দেওয়ালগুলো পাথরের তৈরি হয়। ঘরের ছাদগুলো সাধারণতঃ শ্লেট পাথর কিংবা খড়ে ছাওয়া হয়। বাড়িগুলো সাধারণতঃ সূর্যের দিকে মুখ করে তৈরি করা হয়। বাতাসের ঝাপটা থেকে বাঁচিয়ে বাড়ি তৈরি করা হয়। কৃষিজীবীরা কাঁচা ইঁটের বাড়ি ও শ্লেট পাথরের তৈরি ছাদ কিম্বা খড়ের ঘরে বাস করে। বাড়িগুলো তে-তলা। প্রত্যেক বাড়িতে চার-পাঁচটা করে ঘর থাকে। এগুলোর কোনটি শেবার ঘর, কোনটি ভাঁড়ারঘর, কোনটি রান্নার ঘর, আবার কোনটি অতিথিদের ঘর।

যে তিন ধরনের বাড়ির কথা বলা হল তাদের প্রত্যেকটিতে অঙ্গন বা কোনটি অতিথিদের ঘর। বাড়ি ছাড়াও গৃহস্থালীর অন্যান্য কাজও করা হয়। প্রত্যেক বছর নববর্ষের সময় বাড়িগুলো পরিষ্কার করা ও

নানা রঙে চিত্রিত করা হয়। আঙ্গিনার চার ধার দিয়ে গাছ থাকে। এতে একদিকে আবরু রক্ষা হয়, অন্যদিকে জ্বালানী ও পশুখাদ্য পাওয়া যায়। বাড়ির সঙ্গে থাকে শাক্-সব্জির বাগান।

❑ **পাঞ্জাব ঃ**

পাঞ্জাবের অনেক জায়গাতেই বাড়িগুলো কাছাকাছি তৈরি করা হয়। প্রতিটি বাড়িকে ঘিরে আছে এক দেওয়াল। বাড়ির প্রবেশের জন্য রয়েছে এক ফটক। প্রধান ফটক অনেক সময় বেশ চওড়া করে তৈরি করা হয় যাতে করে ফসলভর্তি গরুর গাড়ি বা উটের গাড়ি সরাসরি আসতে পারে। প্রধান ফটকের ভেতরে থাকে ছোট ছোট ঘর (পাওলী, paoli বা দেওরী, Deoori)। ফটক পেরোলেই খোলা উঠান (অঙ্গন/সাহানা/বিসালা)। উঠান পেরোলেই দু'ধারে বারান্দা। এর পর থাকে শোবার বা থাকার ঘর (কোঠা বা সুফা)। এরকম ঘরের সংখ্যা হল তিনটে কি চারটে। মোটামুটি এটা হল জাঠ পরিবারের বাড়ির নমুনা। কিন্তু এরও রকমফের আছে যেমন প্রধান দেওয়ালের ভেতর আরও দু'তিনটে দেওয়াল থাকে। এগুলোতে একের বেশি চুল্লী থাকে। এইগুলো একই বাড়ির ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ও তাদের চাকরবাকরদের জন্য নির্দিষ্ট থাকে। গবাদি পশুগুলো রাতে সাধারণতঃ অঙ্গন বা পাওলীতে বেঁধে রাখা হয়। পশুর খাদ্য সাধারণতঃ সমতল ছাদের ওপর রাখা হয়। অবস্থাপন্ন চাষীদের আলাদা গোয়ালঘর ও তার সঙ্গে লাগোয়া গরুর খাবার ঘর থাকে। বাড়িগুলো একতলা ও এবড়ো খেবড়ো পাথর ও সিমেন্ট দিয়ে তৈরি। সেহেতু নদী উপত্যকা ছাড়া অন্যত্র বন্যার ভয় নেই তাই পাঞ্জাবের বাড়িগুলোর ভিত নীচু, প্রায় এক ফুটের (0·3 মিটার) মত। আবার বৃষ্টিপাত কম বলে এখানকার বাড়িগুলোর ছাদ সমতল রাখা হয়। গরমকালে লোকে ছাদে শুয়ে ঘুমায়। কৃষির দৌলতে এখানকার অনেক বাড়ি পাকা হয়েছে। নীচু জাতের বাড়ি মাটির তৈরি। বাড়িতে একটা ঘর থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে এই সব বাড়িতে বারান্দাও থাকে। অনেক ক্ষেত্রে কয়েকটা বাড়ির একটা যৌথ উঠান থাকে। কাঁচা বাড়ি বছরে দু'বার (জৈষ্ঠ ও কার্তিক মাসে) সারান হয়। নরম মাটি (পাণ্ডু মিট্টি, Pandoo Mitti) দিয়ে ঘরের ভেতরকার দেওয়ালে রং করা হয়। দেওয়ালী বা বিয়ে উপলক্ষে পাকা বাড়ি রং করা হয়।

❑ **হরিয়ানা ঃ**

হরিয়ানার বাগাড় অঞ্চলের ঘরবাড়িগুলো ব রাজ্যের উত্তর-পূর্ব্বাংশের ঘর-বাড়ির তুলনায় অনেকটা নীচু মানের। এখানকার বালি মাটি এত হাল্কা যে তা ছাদ তৈরির পক্ষে মোটেই উপযুক্ত নয়। তার ওপর একটু বেশি বৃষ্টি হলেই মাটি ধুয়ে যায়। তাই এখানে খড়ের চাল দেওয়া হয়। দেওয়াল মাটির তৈরি। এই ধরনের বাড়ির স্থানীয় নাম **ছাপুর** (chhapur) বা কুড়ী (kuddi)। কয়েকটি পরিবার মিলে একটা অঙ্গন বা ঘেরার চারধারে এই রকম কয়েকটি ঘর তৈরি করেন। বাইরে থেকে এই সব বাড়িতে আসতে গেলে একটা মাটির প্রবেশ পথ পেরিয়ে আসতে হয়। আর প্রতিবেশীরা যদি অবস্থাপন্ন হয় তাহলে এই প্রবেশ

পথের মাথায় খড়ের ছই দেওয়া থাকবে। এখানকার গরীব লোকদের বাড়িগুলো দেখতে গোলাকার। অনেক গাছের ডালপালা একসঙ্গে করে বেঁধে দেওয়াল বানানো হয়। বহুবার খড় দিয়ে ঘরে চালতৈরি করা হয়। একটু সমৃদ্ধশালী বাগড়ী অঞ্চলের বাড়ি জাঠ গ্রামের মত।

হরিয়ানার ঘর্ঘরা অঞ্চলের ঘরবাড়ি খুব নীচু মানের। এই অঞ্চলের গ্রামগুলো খুব ছোট। দক্ষিণ-পশ্চিমের বড় গ্রামগুলোর চেয়ে এখানকার বাড়িগুলো খুব বিক্ষিপ্ত থাকে। এখানকার বাড়ির চারধার কাঁটা গাছ দিয়ে ঘেরা থাকে। আঙ্গিনার মাঝে থাকে মাটির এক কামরার কুঁড়ে ঘর। এখানে পোষা জন্তু জানোয়ারদের জন্য সাধারণতঃ একটি ছোট ঘেরা জায়গা থাকে। এছাড়া দু'টি খুঁটির ওপর একটা ঢাকা দিনের বেলা থাকা হয়। আবার গরমের রাতেও শোওয়া হয়। ঘর্ঘরা অঞ্চলের এই ধরনের ঘরবাড়ি রাজ্যের অন্যান্য অংশেও দেখা যায়।

❑ উত্তরপ্রদেশ ঃ

প্রাকৃতিক পরিবেশ ও অধিবাসীদের সাংস্কৃতিক মান উত্তরপ্রদেশের ঘরবাড়ির আকার ও আয়তনের ওপর অনেকখানি প্রভাব বিস্তার করেছে। গঙ্গা-যমুনা দোয়াবের পশ্চিমাঞ্চলের বাড়িগুলো একটু উঁচু ও অল্প জায়গার ওপর ঘন সংঘবদ্ধভাবে গড়ে উঠে। বাড়িগুলো মাটির তৈরি। কিছু কিছু বাড়ি ইঁট ও পাথৰ দিয়ে তৈরি করা হয়। ছাদ খড় কিম্বা টালি দিয়ে তৈরি। বাড়ি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা হয়। ফসল রাখা ও শুকোবার জন্য উঠান পরিষ্কার রাখা হয়। এখানকার বাড়িগুলোকে ঘিরে থাকে উঁচু উঁচু মাটিরতৈরি দেওয়াল। মাঝে মাঝে প্রবেশ পথ আছে। অতীতে প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে এই ধরনের গ্রাম গড়ে উঠেছিল। মধ্য-দোয়াব অঞ্চলে একটু অবস্থাপন্নদের বাড়িতে মাটির তৈরি সমতল ছাদ ও তার নীচে কাঠের বরগা খুঁটির কাজ করে। মাঝারি আয়ের ব্যক্তিদের বাড়িগুলো সাধারণতঃ দেশি টালি দিয়ে ছাওয়া। গরীব লোকদের বাড়িগুলো সাদামাঠা। মাটির তৈরি আয়তাকার টালি বা খড়ের চাল, একটিমাত্র প্রবেশের দরজা। ক্ষেত্রবিশেষে বাড়ির সামনের অংশ খুব সাধারণভাবে ঘেরা থাকে।

নিম্ন দোয়াব অঞ্চলের বাড়িগুলো মাটির দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। চারদিকে ঘর আর মাঝে খোলা উঠান থাকে। উত্তরপ্রদেশের পূর্বাংশে ছোট ছোট গ্রাম বেশি। কোথাও একশ বাড়ি কোথাও বা পঞ্চাশটি বাড়ি নিয়ে গ্রাম গড়ে উঠেছে। এই বাড়িগুলো উঁচু জায়গার ওপর তৈরি করা হয়ে থাকে, যাতে বাড়িগুলো বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। বাড়িগুলো ক্ষেতের কাছে তৈরি করাই হল প্রধান উদ্দেশ্য। তাই বাড়িগুলো অস্থায়ী ভাবে তৈরি করা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে উত্তরপ্রদেশের (পূর্ব) বালিয়া, দেওরিয়া, গাজিপুর, আজমগড় ও আরও কয়েকটি জায়গার বাসিন্দারা দিয়ারা ও বাৎসরিক বন্যা কবলিত এলাকায় বাস করে। নদীতে যখন বন্যা (বার্) আসে, তখন জীবন ও সম্পত্তির নিশ্চিত বিপদ জেনে তারা সেই সব এলাকা থেকে পাততাড়ি গোটায়। বন্যার জল সরে গেলেই আবার সেই সব জায়গায় তারা ফিরে আসে। খড়ের চাল ও ডালপালা দিয়ে এইসব অস্থায়ী বাড়ি (স্থানীয় নাম ছাপরা) বানানো হয়।

উত্তরপ্রদেশের তরাই অঞ্চলে খড়, ঘাস পাতা ও কাঠ দিয়ে বাড়ি তৈরি হয়। এই সব বাড়িতে সহজেই আগুন ধরে যাওয়ার ভয় থাকে। আগুন যাতে ছড়াতে না পারে, তাই দু'টো বাড়ির মধ্যে দূরত্ব রাখা হয়। এই রাজ্যের হিমালয় অঞ্চলের পার্বত্য জলবায়ু ও স্থানীয় পরিবেশ এখানকার গ্রাম ও ঘরবাড়ির ওপর ছাপ ফেলেছে। কুমায়ূন ও উত্তরখণ্ডের পার্বত্য জেলাগুলোর নিজস্ব ধরনের বাড়িঘর তৈরি করার রীতি আছে। বাড়িগুলো নানা আকার ও আয়তনের—তাদের আলাদা আলাদা নামও আছে। একতলা বাড়ি (ভূমিন্দা, Bhuminda) প্রায় নেই বললেই চলে। দক্ষিণ উত্তরখণ্ডের বাড়িগুলোকে কুঁড়েঘর (ঝোপড়া) বলে। গরীবরা শ্লেট পাথরের ছাদ দেওয়া একতলা বাড়ি তৈরি করে। দোতলা বাড়িতে (দোপুরা মাকান, Dopura makan) চারটে কামরা থাকে—নীচের তলায় (ওবরা, obra) দু'টো, ওপর তলায় (মাজুয়া বা পান, Majuwa or pan) দু'টো। দোতলা বাড়ির সামনে দরজা থাকে। বাইরের দিক দিয়ে তৈরি সিঁড়ি দিয়ে দোতালায় যাতায়াত করা যায়। সামনের ঘরটিকে বলে দাণ্ডিলা (Dandyla)। এখানে একটা বারান্দা থাকে। বসবার জায়গা হিসেবে এবং গরমকালে শোবার জায়গা হিসেবে এটাকে ব্যবহার করা হয়। উত্তরখণ্ডেব ভোটিয়া উপত্যকার নানা এলাকায় স্থানীয় ঐতিহ্যের ওপর নির্ভর করে বিভিন্ন ধরনের বাড়ি গড়ে উঠেছে। ভোটিয়াদের বাড়িগুলো পাথরের তৈরি। এগুলো তাদের শীতকালের ঘাস ও খড়ে ছাওয়া বাড়ির চেয়ে আরামদায়ক। ভোটিয়াদের গরমকালের বাড়ির চার/পাঁচটা ঘর ও একটা রান্নাঘর থাকে। সত্যি বলতে কি, গরমের দিনের বাড়িগুলো হল ভোটিয়াদের আসল বাড়ি। এখানে তাদের গরু, মোষ থাকে, আবার এখানে তারা একটু আধটু চাষবাসও করে। টেহরি গাড়োয়াল জেলার বাড়িগুলো আয়তাকার, দোতলা ও ঢালু চালযুক্ত। ওপর তলায় বসবাস করে এবং নীচের তলায় গৃহপালিত পশু রাখা হয়। নীচের তলার ঘরগুলো অনেক নীচু। নীচের তলায় বারান্দা আছে, যার স্থানীয় নাম হাতি (Hati)। এখানকার ঘরগুলোকে বলে ওরবাস। বেশির ভাগ বাড়িতে দূষিত বাতাস বের হবার পথ নেই। আলাদা রান্নাঘরও নেই। শীতকালে প্রচণ্ড ঠাণ্ডার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য অগ্নিকুণ্ডের ব্যবস্থা আছে। কিছু কিছু বাড়িতে দেওয়ালের সঙ্গে চিমনি লাগান থাকে, যাতে ধোঁয়া সহজেই বেরিয়ে যেতে পারে। বাড়ির পেছনে একটু উঁচু করে দেওয়াল তৈরি করা হয়, যাতে পেছনের পাহাড়ের স্যাঁতস্যাঁতে ভাব থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। অধিকাংশ অবস্থাপন্ন, গৃহস্থের বাড়ির বারান্দায় নানারকম কারুকার্য করা থাকে। বেশির ভাগ বাড়িতে দু'টো থেকে চারটে ঘর থাকে। গরীবদের একটা করে ঘর থাকে। বাড়ির দেওয়াল বেশির ভাগ মাটি ও পাথরের তৈরি। প্রতিটি বাড়ির কাঠের সিলিং ও শ্লেটের ছাদের মাঝখানে ফাঁক থাকে। এখানে দামী জিনিষপত্র রাখা হয়। সাধারণতঃ ব্রাহ্মণদের বাড়িতে সাদা রং করা হয়। অন্যান্য জাতের বাড়ি একদিকে সাদা, অন্যদিকে বাদামী রং করা হয়। কোন কোন জায়গায় দেওয়ালীর আগে, আবার কোথায় কোথাও জানুয়ারী মাসে বাড়িরঙ করান হয় (স্থানীয় ভাষায় ফৌক)। বর্ষার আগে বাড়িঘরদোর সাবান হয়। নতুন বাড়িঘরদোর সাধারণতঃ শীতকালে শুরু করা হয়। কারণ এই সময়ে লোকের হাতে কোন কাজ থাকে না। নতুন বাড়ি

তৈরি সামাজিক উৎসবের অঙ্গ হিসেবে ধরা হয়। এখানে পাড়া প্রতিবেশীদের সহায়তার (স্থানীয় নাম পাদিয়ালি) বাড়ি তৈরি করা হয়, যার ফলে খরচ অনেক কম পড়ে। বিনিময়ে তাদের মাসে মাসে নেমন্তন্ন খাওয়াতে হয়। এছাড়া নাচগানেরও ব্যবস্থা থাকে। বাড়ি তৈরির আগে পুরুতমশাইকে ডাকা হয়। তিনিই শুভদিন ও শুভক্ষণ ঠিক করে দেন। প্রতিটি বাড়িতে প্রবেশ করার জন্য সিঁড়ি তৈরি করা হয়। এগুলো ধাপে ধাপে ওপরে উঠে গেছে। সবচেয়ে উঁচু সিঁড়িকে বলে **খুতি**। আয়তাকার এই সিঁড়ি মাটি বা পাথর, সিমেন্ট ও কাঠ দিয়ে তৈরি করা হয়। প্রতিটি বাড়িতে উঠান আছে। কৃষিপ্রধান এই অঞ্চলের বাড়ির উঠানকে নানা কাজে লাগান হয়।

❑ **বিহার ঃ**

বিহার সমভূমিতে কৃষিজীবীদের বাড়ি সাধারণতঃ মাটির দেওয়াল দিয়ে তৈরি হয়। বাড়ির লাগোয়া জমি থেকে যে মাটি পাওয়া যায় তার সঙ্গে ভাঙ্গা মাটির পাত্রের টুকরো ও খড় দিয়ে ছাদ বানানো হয়। ফলে সহজেই ঘরে আগুন ধরে যায়। একটু অবস্থাপন্নরা টালি দিয়ে ছাদ বানায়। ঘরে বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা থাকে না। এতে খুব একটা কষ্ট হয় না। কারণ দিনের বেলায় তারা ঘরে রান্না করে না এবং অন্য সময় ঘরের বাইরে কাটায়। নদীর ধারে বন্যা কবলিত অঞ্চলের চাষীরা ডালপালা দিয়ে দেওয়াল ও খড়ের কুঁড়েঘর বানায়। এই সব এলাকার বালি মাটি দিয়ে দেওয়াল তৈরি সম্ভবপর নয়। বন্যা ভীতির দরুন তারা বাড়ি তৈরিতে অন্য কোন মালমশলার ব্যবহারকে অপচয় বলে মনে করে। এই প্রসঙ্গে ছাপরা জেলার নামকরণ উল্লেখের দাবী রাখে। ছাপরা নামটি এসেছে ছাপার (chhaper) থেকে যার মানে হল খড়ের চাল। এ থেকে প্রমাণ হয় যে অতীতে এই অঞ্চলটি ফি-বছরই বন্যার কবলে পড়ত। সুতরাং যেখানে বন্যার জল প্রবেশ করতে পারে না, সেখানেই বাড়িগুলো তৈরি করা হয়। খড়ের চাল ও বাঁশের ওপর পুরু করে মাটি দিয়ে দেওয়াল তৈরি করা হয়। খুব গরীবরা শুধু নলখাগড়া দিয়েই কুঁড়েঘর বানায়। একটু অবস্থাপন্নরাই ইঁটের বাড়ি তৈরি করে। সাধারণ চাষীদের ইঁট কেনার ক্ষমতা নেই। তাছাড়া কোন কোন অঞ্চলে অন্ধ বিশ্বাস আছে যে ইঁটের দেওয়ালে অশুভ দৃষ্টি পড়ে। কোন কোন জায়গায় আবার এই ধরনের কুসংস্কারও আছে যে বাড়ি আয়তাকার হওয়া উচিত, এই ধরনের বাড়ির দুটো লমবা বাহু উত্তর-দক্ষিণাভিমুখী হবে। দক্ষিণ-পশ্চিম বিহারের অবস্থাপন্নদের দোতলা বাড়ির সামনে লাগোয়া বড় বারান্দা থাকে। দোতলা বাড়ির একতলায় রান্নাঘর, ভাঁড়ার ঘর থাকে। পূর্ব-বিহারে বিশেষতঃ সাঁওতাল পরগনার সাঁওতালরা তাদের বাড়িতে রোজকার ব্যবহারের জন্য কিছু কিছু গাছ লাগায়। একটা লম্বা রাস্তার দু'ধারে বাড়িগুলো তৈরি হয়। এদের গ্রামগুলো উঁচু ও শুকনো জায়গায় গড়ে ওঠে। প্রধান ঘরের পাশে গোয়াল ঘর, গোলা ও কোন কোন সময়ে শুয়োরের খোঁয়াড় থাকে। সাঁওতালরা মাটির দেওয়ালে নানারকম ছবি আঁকে। তুলনামূলকভাবে ছোটনাগপুরের অন্যান্য অঞ্চলের বাড়িগুলো ছোট্ট—2·5 মিঃ উঁচু, 3 মিঃ চওড়া। দেওয়াল মাটির ও ছাদ লাল টালি বা ঘাস দিয়ে ছাওয়া। বাড়ির দু'দিকেই একটু উঁচু করে বারান্দা তৈরি করা হয়। ছোটনাগপুরের

উত্তর ও পশ্চিমে বসবাসকারী ওঁরাও উপজাতিদের ঘরবাড়ি সাদামাটা। ঘরগুলো বেশ ছোট। বাড়িগুলো অপরিষ্কার, এগুলো ঘেরা থাকে না। বাড়িগুলো তিন চারটে সারিতে মুখোমুখিভাবে বানানো হয়। প্রতি বাড়িতে ছোট্ট উঠান থাকে। উঠানে জল বের হবার ভালো ব্যবস্থা থাকে না। মানুষ ও পোষা জন্তুজানোয়ার এক সঙ্গে বাস করে, তবে শুয়োরের খোঁয়াড় আলাদা থাকে। এখানকার দেওয়াল ল্যাটারাইট মাটি দিয়ে তৈরি বলে তা খুব শক্ত হয়। পুরনো ওঁরাও গ্রামে অবিবাহিত পুরুষদের রাতে থাকা ও আমোদ-প্রমোদের জন্য ধুমকারিয়া নামে আলাদা যুবগৃহ (Dormitory) থাকে। সেখানে কেউ গরহাজিরা থাকলে কিম্বা অন্য জায়গায় রাত কাটালে তাকে জরিমানা দিতে হয়। গ্রামের অনূঢ়া বালিকারা একত্রে অন্য একটি ঘরে রাত কাটায়। ওঁরাও পরিবারের ছোট ছোট বাড়ির কথা চিন্তা করলে এধরনের ব্যবস্থা খুব প্রয়োজনীয় বলে মনে হয়। সিংভূম জেলায় "হো" উপজাতিরা পাহাড়ের গায়ে সুন্দরভাবে গ্রাম তৈরি করে। বহু প্রকার প্রয়োজনীয় গাছপালা দিয়ে সাজানো এই গ্রামগুলো দূর থেকে দেখতে সুন্দর লাগে। কোন কোন অবস্থাপন্ন চাষীরা এই অরণ্য পরিবেশেই বাস করে। এখানকার বাড়িগুলোতে ভিত উঁচু। বাড়িগুলো আয়তনে বড়। বাড়িতে বারান্দাও আছে। বাড়ির দেওয়াল মাটি বা কাঞ্চি দিয়ে তৈরি। চাল খড় কিংবা শুকনো ডালপাতা দিয়ে ছাওয়া হয়।

❑ **অসম ঃ**

বাঁশের বেড়া দিয়ে এখানকার বাড়ির সীমানা নির্দিষ্ট করা থাকে। রাস্তা ও নদীর ধারে উঁচু জায়গার ওপর বাড়ি তৈরি করা হয়। বাড়ির চারপাশে থাকে বাঁশবন ও ফলের বাগান। রোজকার ব্যবহারের জন্য এখানকার বাড়ির সঙ্গে সব্জিবাগানও থাকে। গৃহস্থালির কাজে বাঁশ লাগে। বাড়িগুলো খের নামে এক ধরনের খড়ে ছাওয়া। বাঁশ বা ইকার দিয়ে দেওয়াল বানানো হয়। দরজা ও জানালা বাঁশ বা কাঠের তৈরি। বর্তমানে ছাদে এ্যাসবেসটসের ব্যবহার চালু রয়েছে। ইদানীংকালে দেওয়ালে বাঁশের ওপর সিমেন্টের পলেস্তারা বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। বৃষ্টিবহুল এই অঞ্চলের ছাদগুলো ঢালু করে বানানো হয়, যাতে বৃষ্টির জল সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে গড়িতে যেতে পারে। বাড়িগুলো সাধারণতঃ দো-চালা টিনের বাড়িগুলো অবশ্য চারচালা। বাংলাদেশে বিশেষ করে ময়মনসিংহ জেলা থেকে যারা এখানে এসেছে, তারা তাদের দেশের অদলেই বাড়িঘব তৈরি করে। সাবেকী আমলের বাড়িতে চোরঘর (Chora-ghar) বা অতিথি অভ্যাগতদের ঘর ও **বড়ঘর** (baraghar) বা শোবার ঘর থাকবেই। **মিরি** (miri) ও **দেউরী** উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় **চ্যাঙঘর** (কাঠের পাটাতনের ওপর বাড়ি) চোখে পড়ে। মাটি থেকে এ বাড়িগুলো প্রায় 1.5 মিটারের মতন উঁচু করা হয়। প্রচলিত নিয়মের জন্য হোক বা আরামের জন্যই হোক বাড়িগুলো উদীয়মান সূর্যের দিকে মুখ করে তৈরি করা হয়। বাড়ি তৈরিতে বাঁশের প্রাধান্য লক্ষ্য করার মত। বাঁশ চিরে এমন সুন্দর বুনোট করে দেওয়াল বানানো হয় যে তাতে মাটির পলেস্তারা করার দরকার লাগে না।

খড়ে ছাওয়া ছাদ 4/5 বছর পরপর পাল্টাতে হয়। জানালা দরজা না থাকাতে বাড়ির ভেতরটা অন্ধকার থাকে। একটা উঁচু পাটাতনের ওপর উনুন তৈরি করা হয়। উনুনের চারধারে মাটি ও গোবর দিয়ে লেপা হয়। ঘরের কড়িকাঠ থেকে দড়ি দিয়ে বাঁশের কঞ্চি দিয়ে তৈরি কয়েকটা থালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। মাছ ও মাংস যেগুলো শুকিয়ে রাখার দরকার সেগুলো এই থালার ওপর রেখে দেওয়া হয়।

❑ **ত্রিপুরা ঃ**

এখানকার অনুপজাতীয় অধ্যুষিত সমতল এলাকার বাড়িগুলো খুব একটা উল্লেখেরদাবী রাখে না। কারণ এখানকার বাড়ির ধরন অনেকটা বাংলাদেশের মত। দোচালা ঢালু ছাদ, কোন বাড়ির ভিত নীচু (0·4 মিঃ), আবার কোনটার উঁচু (0·6 মিঃ)। দেওয়াল বাঁশ ও কাঠ দিয়ে তৈরি। মাটি দিয়ে দেওয়াল তৈরি হয়। বাড়ির চাল বেশির ভাগ ক্ষেত্রে শণে ছাওয়া অবশ্য টিনের চালও আছে। পুরোপুরি মাটির তৈরি দেওয়াল খুব কমই দেখা যায়। কারণ এখানে বাঁশ প্রচুর পাওয়া যায়। আর দামেও সস্তা। দ্বিতীয়ত সমতল এলাকা বর্ষাকালে বন্যায় প্লাবিত হয়। তাই বাড়ি নষ্ট হলে তা সারানো এক খরচ সাপেক্ষ ব্যাপার। বন্যার স্যাঁতস্যাঁতে অবস্থা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বাড়িতে ভিত উঁচু করা হয়। বাড়ির চারপাশে থাকে উঁচু দেওয়াল সমতল ছেড়ে যতই পাহাড়ের দিকে এগোনো যায়, ততই ভিতওয়ালা বাড়ির বদলে খুঁটিওয়ালা বাড়ি দেখা যায়। পাহাড়ী অঞ্চলের বাড়ির মালমশলা সমভূমির মতই। এখানে বাড়ি করতে খুঁটির খুব দরকার। হয়ে পড়ে। কারণ এখানে সমান জায়গা পাওয়া যায় না। খুঁটির ওপর কাঠের তক্তা বিছিয়ে মেঝে (মাচা) সমান করা হয়। এই ধরনের বাড়ির (স্থানীয় নাম টং) দু'টো সুবিধে আছে। (এক) বুনো জন্তুজানোয়ারের হাত থেকে বাঁচা যায়। (দুই) বর্ষাতে এই ধরনের বাড়ি নষ্ট হয় না। বাড়িগুলোর চাল সামনের দিকে বাড়ানো হয়। এর ফলে যে বারান্দা পাওয়া যায়, সেখানে অতিথিরা এসে বসে, আর মেয়েরা কাপড় কাচে। মই দিয়ে এই সব বাড়িতে ওঠানামা করতে হয়। ঘরের মাঝখানে চুল্লী থাকে। বাসনপত্র রাখার জন্য ঘরের চারপাশে চারটে তাক থাকে। আকার অনুসারে বাড়িগুলোকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়—(i) ঢালু ছাদওয়ালা আয়তাকার বাড়ি (a) টং ঘর—কুকী, রিয়াং চাকমা, মগ উপজাতি এলাকায় এগুলো বেশি দেখা যায়। (b) দোচালা ও চারচালা বাড়ি। (ii) সমতল ছাদওয়ালা আয়তাকার বাড়ি। এই সব বাড়ি সমতল এলাকায় পশু ও ফসল রাখার জন্য ব্যবহার করা হয়।

❑ **মণিপুর ঃ**

ভূ-প্রকৃতির দিক দিয়ে মণিপুরকে দু'ভাগে ভাগ করা যায় ঃঃপাহাড় ও উপত্যকা। এখানকার পাহাড়ী এলাকায় নাগা ও কুকীদের অনেক উপদল বাস করে। কিন্তু সমস্ত বসতিকে এক বলে মনে হয়। স্থানাভাবের দরুন এখানে উঁচু পাহাড়ের সমতল এলাকা বা পাহাড়ের পাদদেশের অল্প জায়গাতেই সমস্ত বাড়িঘর গড়ে ওঠে। পাহাড়ের সমস্ত উপজাতিদের গ্রামগুলোতে বাড়িগুলো দু'টো সারিতে গড়ে ওঠে। মাঝে থাকে

সাধারণের চলাচলের পথ। গ্রামের শেষভাগে দু-একটা ঘরবাড়ি খুব কম ক্ষেত্রেই নজরে পড়ে। উপজাতিরা পূর্ব দিকে মুখ করে বা যে দিকে বেশি সূর্যের আলোচ পাওয়া যায়, সেই দিকে মুখ করে বাড়ি তৈরি করে। যদি গ্রামের কোন প্রধান ব্যক্তি থাকে, তবে তার বাড়ি গ্রামের মাঝখানে থাকে। কুকীরা মাটি থেকে প্রায় 1 মিটার উঁচুতে খুঁটিয়ে ওপর বাড়ি তৈরি করে। সমতলের বাড়িগুলো নির্দিষ্ট ঘেরার মধ্যে তৈরি হয়। সাধারণতঃ বাঁশঝাড় ও ঝোপঝাড় কোন পরিবারের বাড়ির সীমানা নির্দিষ্ট করে। এখানে গ্রামের মাঝখানে দিয়ে রাস্তা থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাস্তার পাশে বাড়িগুলো তৈরি হয়। প্রত্যেক বাড়ির মাঝখান দিয়ে রাস্তা তাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাস্তার পাশে বাড়িগুলো তৈরি হয়। প্রত্যেক বাড়ির সামনে বেশি জায়গা থাকে। পেছনের দিকে জায়গা কম থাকে। প্রত্যেক হিন্দু মণিপুরীর বাড়ির সামনে উঠান (সুনঙ) থাকে। আর ব্রাহ্মণ বাড়িতে উঠান পেরোলেই মন্দির চোখে পড়বে। মন্দির ছাড়া ও মণিপুরের সমতল এলাকায় যা চোকে পড়বে তা হল মণ্ডপ। এখানে গ্রামবাসীরা জমায়েত হয়ে ধর্ম সংক্রান্ত আলোচনা করে। এখানে পূজা পার্ব্বণও হয়। অধিকাংশ বাড়ি পূর্ব দিকে মুখ করে গড়ে ওঠে। কিন্তু কখনই পশ্চিম দিকে মুখ করে বাড়ি তৈরি করা হয় না। বাড়ির ভিত সাধারণতঃ 0·3 মিটার থেকে 1 মিটার পর্যন্ত উঁচু হয়। সমস্ত বাড়ির সামনে বারান্দা আছে। বাড়ির মধ্যে কোন আলাদা ভাগ থাকে না। কাঠ, বাঁশ, মাটি, গোবর ও খড়ের টুকরো দেওয়াল তৈরি করা হয়। বাড়িগুলো দোচালা ও চারচালা। ছাদগুলো ঢালু। চারচালার বাড়িগুলো সাবেকী আমলের। বাড়িগুলোর স্থানীয় নাম উমজাও (Yomjao) অর্থাৎ বড় বাড়ি। মণিপুরী ভাষায় দোচালা বাড়ির নাম সানগাই (sangai)। প্রধান পথ ও পেছনের পথ ছাড়া এসব বাড়িতে জানালা থাকে না বললেই চলে।

❑ অরুণাচল প্রদেশ ঃ

এই রাজ্যের সুবর্ণশিরি বিভাগে আপতনী উপজাতিদের বাড়ি উঁচু জমির ওপর সরু রাস্তার দু'ধারে সারিবদ্ধভাবে গড়ে ওঠে। বাড়ির মধ্যে ফাঁক থাকে। ঐ সরু রাস্তা থেকে আরও গলি বেরিয়ে থাকে এবং ঐ গলির দু'ধারে বাড়ি তৈরি করা হয়। আপাতনীদের বাড়িগুলো পাশাপাশি গড়ে ওঠে। বাড়ির চালাগুলো দেখলে মনে হয় পিরামিড়ের সারি। এখানকার সব বাড়ি ঘেরা নয়। যে সব বাড়িতে ফলের গাছ রয়েছে, তাদের কোন নির্দিষ্ট সীমা নেই। সাধারণতঃ একটা গাছের ডালকে হেলান দিয়ে রাখা হয়। বাড়িগুলোক মাটি থেকে দু'এক মিটার উঁচুতে কাঠের খুঁটির ওপর তৈরি হয়। বাড়ির দু'দিকে বারান্দা আছে। সামনের বারান্দাকে **ব্ল্যাগো** (Blago) বলে। পেছনের বারান্দাকে বলে **উকো** (Uko)। বাড়িতে একটা প্রধান হলঘর থাকে। প্রধান হলগরের সামনের দিকটা ঘেরা থাকে, একে বলে **ব্ল্যাচী** (Blachi)। এখানে ধান ভাঙার জন্যে দু'একটা উদখুল, ঢেঁকি রাখা হয়। আর একটা অংশে মুরগীর ঘর। বাড়িগুলো ওড়ায় 4 থেকে 5 মিটার পর্যন্ত হয়। বাড়ি কতটা লম্বা হবে তা নির্ভর করবে বাড়িতে কতগুলো চুল্লী (Heater) থাকবে তার ওপর।

আপাতানীদের বাড়িতে খুব বেশি হলে তিনটে চুল্লী থাকে। সাধারণতঃ এদের একজন স্ত্রী থাকে। অবশ্য বিয়র পর প্রত্যেক ছেলের আলাদা হাঁড়ি হয়। জঙ্গলে যে সব উপকরণ পাওয়া যায়, তাই দেয়ই বাড়ি তৈরি হয়। বাড়ি তৈরিতে কাঠের তক্তা, বাঁশ, বেত, ধানের ঘড়, বেতের পাতা বা শন জাতীয় ঘাস দিয়ে ঘর ছাওয়া হয়। সিলিং, দেওয়াল, মেঝে সব-ই চেরা বাঁশের তৈরি। মাঝে মধ্যে ব্যবহারের জন্য ছাদে কিছু জিনিসপত্র রেখে দেওয়া হয়। দেওয়ালে কোন জানলা থাকে না। বাতাস চলাচলের জন্য বাড়িতে দু'টো দরজা তাকে, অবশ্য প্লাচীতে একটা দরজা তাকে। ঘরের মাঝখানে থাকে চুল্লী। চুল্লীগুলো সারি দিয়ে বানানো হয়। চিলে কোঠায় পর পর কাঠের ট্রে রাখা হয়। এতে জ্বালানী কাঠ ও ভুট্টা শুকোতে দেওয়া হয়। চুল্লীর চারপাশে বাসনপত্র রাখা হয়। এদের বাড়িঘর অপরিষ্কার থাকে। এরা শৌচাগার (নেকা) বানায়। প্রতি বছর মলক্কো (Molkko) উৎসবের সময় বাড়িতে বাইরে বেদী বানানো হয়। আগুন লাগার ভয়ে গ্রামের বাইরে শস্য গোলা তৈরি করা হয়। গৃহস্বামীর যদি প্রচুর জমি থাকে তবে তিনি বাড়ির বাইরে গোলা তৈরি করেন।

এই রাজ্যের **বাঙরু** (Bangru) উপজাতিদের বাড়িতে দু'টো থেকে পাঁচটা চুল্লী আছে। বড় গাছের গুঁড়িকে কেটে দরজা তৈরি করা হয়। সাধারণতঃ বাড়িতে কোন জানলা থাকে না। কিছু কিছু বাড়ির একদিকে ছোট ছোট জানালার মত দরজা থাকে। এছাড়া বাড়ির সামনে ও পেছনে দু'টো দরজা তো থাকবেই। মাটি থেকে তিন মিটার উঁচু করে বাড়ি তৈরি করা হয়। বাড়ির মেঝে বাঁশের তৈরি। ছাদ ও মেঝের মাঝখানে প্রায় দুই মিটার উঁচুতে থাকে মাচাং। এটা হল ভাঁড়ার ঘর। ঘরের এককোণে দরজাওয়ালা ছোট একটা খুপরি থাকে। এখানে তারা তাদের মূল্যবান সম্পত্তি রাখে।

এখানকার সলুং উপজাতিদের বাড়িগুলো পাহাড়ের ঢালে গড়ে ওঠে। বাড়িগুলো খুব ছোট, প্রত্যেক বাড়িতে একটা করে রান্নাঘর আছে। বাড়িগুলো দেখলে মনে হয় যেন স্থায়ীভাবে বাস করার চেয়ে কোন মতে ঘরে রাত কাটানো ও ঠাণ্ডার দিনে বাস করার জন্যই তৈরি হয়েছে। সলুংদের বাড়ি বাঁশের তৈরি। টাসী (tasse) পাতা আড়াআড়ি করে এরা দেওয়াল তৈরি করে। এদের বাড়িতে কোন জানালা নেই, ভাঁড়ার ঘরও নেই। সত্যি কথা বলতে কি, সঞ্চয় করার মত এদের কিছু নেই। বাঁশের চোঙাতে লঙ্কা, চা, নুন রাখা হয়। প্রত্যেক উনুনের ওপর এক একটা ছোট তাক থাকে, এতে মাংস রাখা হয়। উনুনের ধোঁয়াতে মাংস টাটকা থাকে।

অরুণাচলের লোহিত সীমান্ত বিভাগের মিশমি উপজাতিদের বাড়িগুলো এক সারিতে গড়ে ওঠে। একে বাড়ি থেকে আরেক বাড়িতে দূরত্ব পাঁচশো মিটারের মত। বাড়ি কোথায় তৈরি করতে হবে এ নিয়ে কোন নির্দিষ্ট নিয়ম নেই। বাড়িগুলো চালা লম্বা (চিত্র নং 1.4.6) ও খড়ে ছাওয়া। দেওয়াল মাটি ও বেতের, মেঝে বাঁশের তৈরি। বেত বা দড়ি দিয়ে এই বাঁশগুলো বাঁধা থাকে। বেশির ভাগ বাড়ি 15×3 মিটার

মাপের। পরিবারের লোকসংখ্যা অনুযায়ী ঘৰগুলোকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়। প্রত্যেক ঘর একটা করে চুল্লী থাকে। এখানে রান্নাবান্না হয়। প্রত্যেক ঘরে স্বামী-স্ত্রী বা আত্মীয় স্বজন বাস করে। বাড়িগুলো আয়তাকার। বাঁশ ও কাঠের খুঁটির ওপর বাড়িগুলো দাঁড়িয়ে থাকে। বাড়ির সামনে বারান্দা আছে। বাড়ির প্রথম ঘরটা অতিথিদের জন্য নির্দিষ্ট থাকে। মিশমিদের বাড়িতে জানালা খুব কমই থাকে। ঘরের মধ্যে দিয়ে লম্বা বারান্দা আছে। প্রত্যেক বাড়ির কাছে থাকে গোলা। অন্যান্য উপজাতিদের মতো মিশমিরা তাদের

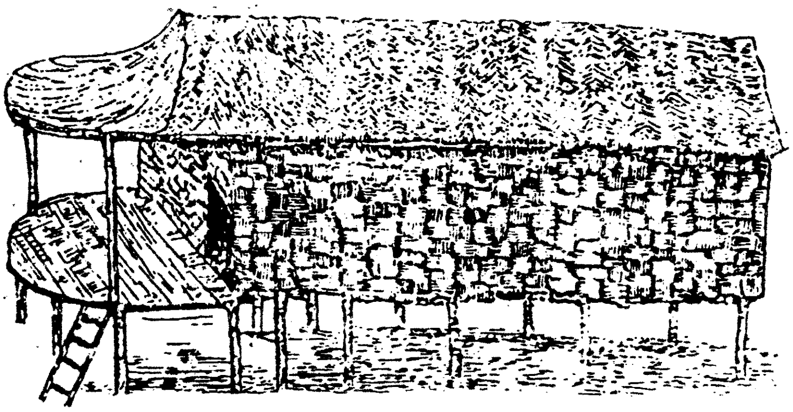

চিত্র 1.4.6 ঃ মিশমি উপজাতিদের বাড়ি (সূত্র ঃ 1.4.4)

দামী জিনিষপত্র শস্যের মধ্যে লুকিয়ে রাখে। বাড়ির প্রবেশপথের দু'ধারে থাকে মুরগীর ঘর। উৎসবের সময় বাড়িতে যে সব মোষ, গরু কাটা হয় তাদের শিং দেওয়ালে সাজিয়ে রাখা হয়। এতে পরিবারের কর্তার মর্যাদা বাড়ে। মিশমিদের বাড়িগুলো একদিকে হেলান থাকে, যাতে প্রচণ্ড বাতাস হলেও বাড়িগুলোর কোন ক্ষতি না হয়। বাড়িগুলো ঢালু বলে মিশমিরা চুল্লীর কাছে ঘুমোয় না।

এই বিভাগের ডিহং উপত্যকায় বসবাসকারী ইদু মিসমি উপজাতিদের গ্রামে 'গোলা' একটা অতি সাধারণ বৈশিষ্ট্য। সাধারণ বসতবাড়ির চেয়ে একটু উঁচুতে খুঁটির ওপর গোলা তৈরি করা হয়। গোলাগুলোতে প্রবেশের একটা দরজা থাকে। বাড়ির মেঝে কাঠের ও দেওয়াল চেরা বাঁশেৰ তৈরি। বাঁশের কাঠামোর ওপর চাল তৈরি করা হয়। ছাদ দোচালা। মাটি থেকে 1 মিটার উঁচুতে বাড়ি তৈরি করা হয়। বাড়ির সামনে থাকে ছোট বারান্দা ইদু মিসমিরা একের বেশি বিয়ে করে। বাড়িতে ক'জন স্ত্রী আছে তার ওপর বাড়ির আয়তন নির্ভর করে। প্রত্যেক স্ত্রীর জন্যে ছোট ছোট ঘর থাকে। বাড়ির প্রবেশ পথে থাকে। বাঁ দিকে। দরজা কাঠের কত্াকর তৈরি। প্রবেশ পথেৰ কাছেই তাকে শৌচাগার, এরপরে থাকে একটা বড় ঘর। এখানে অতিথি ও অবিবাহিত পুরুষেরা রাতে ঘুমোয়। প্রত্যেক ঘরের মাঝখানে থাকে একটা চুল্লী তার ওপর ছোট বাঁশের মাচা ঝোলান থাকে। এখানে মাংস শুকোতে দেওয়া হয়। প্রত্যেক ছোট ঘরে যাবার জন্য বারান্দা থাকে। ঘরের ডানদিকে জানালা থাকে। জানালার নীচে ছোট পাটাতনের ওপর

মুরগীর ঘর তৈরি করা হয়। বাড়ি তৈরির মালমশলা জঙ্গল থেকে পাওয়া যায়। এই এলাকার আরেকটি উপজাতি হল **পাদাম।** ইদু মিসমিদের সঙ্গে এদের তফাৎ এই যে এদের (i) যুব আবাসস্থল আছে (মোশুপ)। (ii) বাড়ি থেকে একটু দূরে এরা গোলা তৈরি করে, যাতে আগুন না লাগে (iii) এদের বাড়িতে কোন শৌচাগার নেই।

❑ নাগাল্যাণ্ড ঃ

এখানকার বাড়ি বলতে **অঙ্গামী** ও **আও** নাগাদের বাসগৃহের কথা উল্লেখ করতে হয়। এরা পাহাড়ের চুড়োয় বাড়ি ঘর তৈরি করে।

অঙ্গামী নাগাদের বাড়ির বৈশিষ্ট্য হল বাড়িগুলো মাটির ওপর গড়ে ওঠে। এ জন্য জমিকে মোটামুটি সমান করে নেওয়া হয়। বাড়িগুলো একতলা, লম্বায় 10 মিটার পর্যন্ত উঁচু হয়। বড় লোকদের বাড়ির সামনের চালে অনেক সময় মানুষের মাথার খুলি ও মিথানের মাথা দিয়ে সাজান থাকে। বাড়ির পেছনের দিকে ছাদ সাধারণতঃ নীচু হয়। ছাদগুলো সাধারণতঃ ঘাস দিয়ে তৈরি করা হয়। আজকাল অবশ্য ঘাসের বদলে টিনের ব্যবহার বৈশি হয়। বাড়ির সামনের দেওয়াল কাঠের, পেচনের ও পাশের দেওয়াল বাঁশের কঞ্চি দিয়ে তৈরি হয়। বাড়িগুলো চারটে খুঁটির ওপর তৈরি করা হয়। চারকোণে চারটে, আর মাঝে চারটে খুঁটি দিয়ে ছাদটা উঁচু করা হয়। একটা ঘরকে সরু সরু তক্তা দিয়ে তিন বাগে ভাগ করা হয়। সামনের ঘরটা গোটা বাড়ির অর্ধেক। এখানে বড় বড় ঝুড়িতে ধান রাখা হয়। পরের ঘরে উনান, বিছানা, খাদ্যদ্রব্য ও রান্নার বাসন রাখা হয়। এটা বসবাস ঘর। শোবার ঘর, রান্নাঘর হিসেবেও ব্যবহার করা হয়। সবশেষে ঘরটা বাড়ির পেছনে থাকে। এটি আকারে ছোট। এখানে মদের ভাঁটি রাখা হয়।

আও নাগাদের বাড়ি একতলা, লম্বায় 10 মিটার থেকে 15 মিটার, চওড়ায় 5 মিটার থেকে 8 মিটার হয়ে থাকে। বাড়িগুলোতে দু'টো করে ঘর থাকে। সামনের ঘরে (স্থানীয় নাম সুইন Tsuin) ধান ভাঙার ঢেঁকি ও জ্বালানীর কাঠ রাখা হয়। রাতে শুয়োরও রাখা হয়। ঘরের মেঝে, দেওয়াল, ছাদ সবই বাঁশের তৈরি। প্রধান ঘরে উনুন (dep) থাকে। ছাদের প্রধান কড়ি (Beam) থেকে তিনটে বাঁশের মাচা (একটার পর একটা) উনুনের ওপর ঝুলতে থাকে। এই ম্যাচাগুলোতে বাসনপত্র রাখা হয়। বাড়ির মালিকদের সঙ্গতি অনুযায়ী ছাদ তৈরিতে হেরফের লক্ষ্য করা যায়। অবস্থাপন্নদের বাড়ির সামনেটা নীচের দিকে নেমে আসে। ফলে একটা ঘৰ বেশি পাওয়া যায়। এখানে তারা শিকার পটুতার নিদর্শন হিসেবে মিথান (প্রাণী) কঙ্কাল রেখে দেয়।

❑ মেঘালয় ঃ

এখানকার বাড়ির বিন্যাস ভূ-প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে। বাড়ি তৈরির জন্য সাধারণতঃ ঢালু জায়গা পছন্দ করা হয়। যদিও কিছু কিছু বাড়ি সমতল জায়গাতেও তৈরি করা হয়। যখন ঢালু জায়গার ওপর

বাড়ি তৈরি করা হয়, তখন বাড়ির সামনের দিকটা (নক্‌রেঙ, Nokkreng) মাটির সঙ্গে সমান্তরালভাবে তৈরি করা হয়। আর বাড়ির পেছন দিকটা (নোকগিল Nokgil) ভূ-প্রকৃতি অনুযায়ী 2 থেকে 3 মিটার উঁচু করা হয়। বাড়ি তৈরিতে কাঠ ও বাঁশ ব্যবহার করা হয়। কড়িকাঠ তৈরিতে কাঠ লাগে। এছাড়া কাঠ ও বাঁশ দিয়ে খুঁটি বানানো হয়। খড় দিয়ে ছাদ ছাওয়া হয়। বাঁশ চিরে কঞ্চি বানিয়ে তা সুন্দর করে বুনোট করে মেঝে বানানো হয়। এই কঞ্চিত মেঝেকে শক্ত করার জন্য মেঝের নীচে আড়াআড়িভাবে দু'টো বাঁশ দিয়ে কঞ্চিগুলোকে পুনরায় বাঁধা হয়। এছাড়া চারধারে আয়তাকার কাঠের ফ্রেমের সঙ্গে ও কঞ্চিগুলো বেঁধে মেঝেকে পাকাপোক্ত করা হয়। দেওয়াল তৈরি করতে মোটা বাঁশের খুঁটি পোঁতা হয়। এখানকার বাড়ি তৈরি করতে মাটির চল নেই (Census of India, 1961)।

বাড়ির সামনের অংশে অর্থাৎ নকরেঙে জ্বালানী কাঠ, চাষের সরঞ্জাম, এমন কি শুয়োর ও মুরগী রাখা হয়। বাড়ির সামনের অংশ থেকে পেছনের অংশে যাবার জন্য দরজা আছে। নোকগিল বা বাড়ির পেছনে দিকে দু'টো অংশ আছে। প্রথম অংশে থাকে খাবার ঘর। এছাড়া এখানে উনুন থাকে। এর চারপাশ দিয়ে বাসনপত্র রাখা হয়। এই অংশের এক কোণায় বসবার জন্য উঁচু করে পাটাতন তৈরি করা হয়। কঞ্চির বেড়া দিয়ে প্রথম অংশ থেকে দ্বিতীয় অংশ আলাদা করা থাকে। অবশ্য দু'অংশে যাতায়াতের জন্য দরজা থাকে। দ্বিতীয় অংশ হল শুধুই শোবার ঘর। এর এক কোণে থাকে পরিবারের কর্তার ব্যক্তিগত ছোট একটা ঘর। আর তার পাশেই থাকে ধানের পাত্র। পুরনো বাড়ির পাশিপাশি আধুনিক বাড়িও রয়েছে, যাতে দু-তিনটি করে ঘর আছে। ঘরের সংখ্যা পরিবারের সদস্য সংখ্যার ওপর নির্ভর করে। এই বাড়িগুলো খড়ে ছাওয়া বলে গরমকালে ঠাণ্ডা থাকে। দেওয়াল বাঁশের কঞ্চির তৈরি। তার ওপর বালি ও মাটি দিয়ে পলেস্তারা ও চুনকাম করা হয়। বাড়ির খুঁটিগুলো শাল কাঠের তৈরি। কখনও কখনও পাথরের চাঁই ও শালখুঁটির সাথে গাঁথা হয়। বাড়ির খুঁটি ও দরজা আলকাতরা দিয়ে রং করা হয়। ফলে ঘুন ধরার ভয় থাকে না। প্রত্যেক বাড়িতেই জানলা থাকে। এক ঘর থেকে আর এক ঘরে যাবার জন্য দরজা থাকে। অতিথিদেরবসার ঘরটি সাজানগোছান থাকে। তিনটে পাথর দিয়ে তৈরি উনুন রান্নাঘরের এক কোণে থাকে। ধোঁয়া বেরনোর জন্য কোন চিমনি থাকে না।

❑ মিজোরাম ঃ

সাধারণতঃ এখানকার বাড়ির সামনের দিকে একটা বারান্দা থাকে। এ ছাড়াও বাড়ির পেছনে আর একটা খোলা বারান্দা থাকে। প্রত্যেক বাড়িতে একটা বড় ঘর থাকে—আয়তাকার এই বড় ঘরে শোওয়া হয় আবার রান্নাও করা হয়। এই ঘরে ঢুকলেই বাঁশের তৈরি ধান রাখার ঝুড়ি চোখে পড়বে। ঘরের দেওয়ালে তাক থাকে। ঘরে মুরগী রাখার খাঁচাও থাকে। ঘরের এক কোণে পাথৰ দিয়ে উনুন বানান হয়। কয়েকটা থাকা উনুনের ওপর ঝুলন্ত অবস্থা রাখা হয়। এতে রান্না করা খাবার রাখা হয় যাতে সেগুলো গরম থাকে।

বর্ষাকালে ঐ থালাতে ধান শুকোতে দেওয়া হয়। বড় ঘরকে কাপড়ের পর্দা দিয়ে কয়েকটা ছোট ছোট ভাগে ভাগ করা হয়। এতে পরিবারের লোকেরা ঘুমোয়। সামনের বারান্দার চাষবাসের সরঞ্জাম ও জ্বালানী কাঠ রাখা হয়। দান ভাঙবার উদুখলও এখানে রাখা হয়। সাধারণতঃ সামনের রাবান্দার কোন দেওয়া থাকে না। অধিকাংশ বাড়ি ঢালু জমির ওপর তৈরি করা হয়। বাড়ি তৈরিতে বিভিন্ন মাপের খুঁটি ব্যবহার করে প্রাকৃতিক বাধা দূর করা হয়। বাড়ির মেঝে বাঁশ কিম্বা কাঠের তক্তা দিয়ে তৈরি হয়। একে আরও শক্ত করার জন্য মেঝের নীচে আড়াআড়িভাবে লম্বা দু'খণ্ড কাঠ দেওয়া হয়। বাড়ির দেওয়াল বাঁশের চাটাইয়ের তৈরি। খুঁটির সঙ্গে এগুলো শক্ত করে বাঁধা থাকে। দরজা জানালা বাঁশের দরমার তৈরি। ছাদ খড়ে ছাওয়া ও বাঁশেৰ বরগা ব্যবহার করা হয়। বাড়ি তৈরি করতে গ্রামের আশেপাশের জঙ্গলের বাঁশ ও কাঠ কাজে লাগান হয়। নতুন বাড়ির মালমশলা বেশির ভাগই বাইরে থেকে আমদানী করা হয়। মেঘালয়ের মত এখানেও নতুন বাড়িতে দুটো তিনটে করে ঘর থাকে। পুরনো বাড়িগুলো আয়তাকার। কিন্তু নতুন বাড়িগুলো বিভিন্ন আকারের ও তা গৃহস্বামীর রুচির ওপর নির্ভর করে। আর একটা বৈশিষ্ট্য হল যে নতুন বাড়িগুলো স্থায়ীভাবে তৈরি করা হয়।

❑ ওড়িশা ঃ

ওড়িশার মাটির দেওয়াল ও খড়ের ছাওয়া এক একটা বাড়িতে গড়ে তিনটে করে ঘর থাকে—শোবার ঘর, রান্নার ঘর ও গোয়ালঘর। চার কোণা এক খণ্ড জমির তিনদিকে এই তিনটে ঘর থাকে। আর খোলা দিকের জমিতে দৈনন্দিন খাবার জন্য নানা রকম সব্জির চাষ করা হয়। ঐ তিনেট ঘরের যে কোন একটার পেছনে মাটির দেওয়াল দিয়ে ঘেরা একটুকরো জমিতে শস্য মাড়ানো হয় এবং পশুর খাদ্য ও সার রাখা হয়। বাড়ি তৈরির আগে জায়গাটা শুভ কিনা ও বাড়ি তৈরির পক্ষে কোন দিকটা ভাল তা পুরোহিত মশাইয়ের সঙ্গে পরমার্শ করে ঠিক করা হয়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে কোন কোন উপজাতিরা কোন এক রাতে নির্বাচিত স্থানটির ওপর ধানের একুশটা দানা রেখে আসে ও পরের দিন সকালে ফলাফল দেখার জন্য ঐ জায়গায় যায়। যদি দানাগুলো ঐ জায়গায় ঠিকমত না থাকে তবে ধরে নেওয়া হয় যে জায়গাটা অশুভ। অন্যথায় জায়গাটা বাড়ি তৈরির পক্ষে উপযুক্ত বলে বিবেচিত হয়। বেশি বৃষ্টির দরুন এখানকার ছাদগুলো ঢালু করে তৈরি করা হয়। ছাদে খড়ের চাল দেওয়া হয়। দেওয়াল মাটির। মধ্যবিত্তদের বাড়িগুলো খুব ছোট, বাড়িতে জানালা থাকে না, আর থাকলেও দুই মিটার উঁচুতে থাকে। বাড়িগুলো এত ছোট করে তৈরি করা হয় যে ঘরে আলো আসতে পারে না। গরীব ও ভূমিহীন মানুষদের কুঁড়েঘরগুলো এক কাঠামোর। ঘরের চালগুলো সাধারণতঃ একটু নীচুতে নেমে এসে বারান্দার কাজ করে।

এই রাজ্যের কোন কোন উপজাতিরা পুরনো ধাঁচের বাড়ি তৈরি করে। ঢেনকানাল ও কেওনঝড়ের জুয়াং উপজাতিদের কুঁড়েঘরগুলো খুবই ছোট, লম্বায় 3 মিটার, চওড়ায় 2 মিটার ও উচ্চতায় 2 মিটার।

দু' কামরার এই কুঁড়েঘরগুলোর দেওয়াল কাঠের, চাল ঘাসের ছাওয়া। দুটো কামরার একটাতে ভাঁড়ার ঘর ও গৃহস্থালীর অন্যান্য জিনিষপত্র থাকে। অপরটি বাড়ির স্ত্রীলোকদের কোনরকমে মাথা গোঁজাব ঘর। প্রায় 1 মিটার ভিতওয়ালা শক্ত মাটির তৈরি যুবগৃহে (গোটুল) গ্রামের কিশোর ও যুবকেরা ঘুমোয়। এই দু'কামরার যুবগৃহের একটায় গ্রামের আমোদ প্রমোদের জন্য বাদ্যযন্ত্র রাখা ও শোওয়া হয়, অপর ঘরটি অতিথিদের অভ্যর্থনার জন্য। এই যুবগৃহ থেকে সমস্ত গ্রামের ওপর নজর রাখা হয়। আবার প্রয়োজনে অন্য গোষ্ঠীর আক্রমণ বা বন্য পশুর হাত থেকে গ্রামকে রক্ষা করার জন্য ব্যবস্থা করা হয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে জুয়াংরা জন্তু জানোয়ারের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য গাছের ওপর কুঁড়েঘর বানায়। ওড়িশার দক্ষিণ ভাগ ও নিকটবর্তী অন্ধ্রপ্রদেশে বাড়িগুলো দু'টো সমান্তরাল সারিতে বিন্যস্ত থাকে। বাড়িগুলো একই লাইন বরাবর তৈরি করা এক বিশেষ রীতি। খড় বা ঘাসে ছাওয়া সব ছাদগুলো একই মাপের উঁচু হওয়ায় মনে হয় সব মিলে একটা লম্বা বাড়ি। সাদা চুন দিয়ে ও বুড়ো আঙুল বা তর্জনীর সাহায্যে বাড়ির দেওয়ালগুলো আপ্যায়নের জন্য বারান্দা থাকে। বাড়িগুলো দূ'কামরার—একটি মহিলাদের, অপরটি পুরুষদের। বাড়ি থেকে সামান্য দূরে গোলাকার শস্যাগার তৈরি করা হয়। ওড়িশার ময়ূরভঞ্জ ও তার নিকটস্থ বিহারের সিংভূম ও পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলার রুক্ষ পাহাড়ী অঞ্চলে খরির উপজাতির বাস। পাহাড়ী খরিয়াদের পাঁচ দশটি পরিবারের এক একটা দল পাহাড়ে বিক্ষিপ্তভাবে বাস করে। কিন্তু একটু উন্নত খরিয়ারা সুসংবদ্ধভাবে গ্রামে বাস করে।

খরিয়া অবিবাহিত পুরুষ মহিলাদের আলাদা আলাদা যৌথ ঘর থাকে। সাধারণতঃ একটি আয়তাকার ঘরকে খরিয়ারা শেবার ঘর ও রান্না ঘর হিসেবে ভাগ করে নেয়। ক্ষেত্র বিশেষে রান্না ঘর আলাদা করে শেবার ঘরের সামনে তৈরি করা হয়। স্থানীয় মালমশলা দিয়ে ঘর তৈরি করা হয়। এগুলো তৈরির কলাকৌশল ছোটনাগপুরের উপজাতিদের মত।

❑ অন্ধ্রপ্রদেশ ঃ

এখানকার শ্রীকাকুলাম ও ভিজিয়ানগ্রাম জেলার তাল পাতায় ছাওয়া শঙ্কু আকৃতির ছাদ বেশি দেখা যায়। বাড়িগুলো পরস্পরের খুব কাছাকাছি এক সারিতে তৈরি হয় বলে দূর থেকে দেখলে মনে হয় একটাই ছাদ। বাড়ির ছাদগুলো খুব নীচুতে নেমে আসে। এতে ঘূর্ণী ঝড়-ঝাপটার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। বাড়ির দেওয়ালগুলো সবাই যৌথভাবে ব্যবহার করে। এখানকার উপজাতিরা বাড়ি তৈরির মালমশলা বন থেকেই যোগাড় করে। পূর্ব গোদাবরী জেলায় ঢালু চাল তৈরি করতে দেশীয় (ম্যাঙ্গালোর) টালি ব্যবহার করা হয় (চিত্র I. 4.7)। জেলাটি সমৃদ্ধশালী হওয়ার এখানে অনেক টালির কারখানা আছে। দেওয়াল মাটি ও ইঁটের তৈরি। পশ্চিম গোদাবরী ও কৃষ্ণা জেলায় প্রচুর ধান জন্মায় বলে এখানে খড়ে ছাওয়া চাল বেশি দেখা যায়। নেলোর জেলায় কিছু ল্যাটারাইটের তৈরি দেওয়াল আছে তবে অধিকাংশ গরীব লোকদের

বাড়ির দেওয়াল মাটির তৈরি। শুষ্ক রায়লসীমা অঞ্চলের অন্তর্গত কুড্ডাপা, কুর্ণল, অনন্তপুর ও চিত্তোর জেলায় এক সঙ্গে অনেকগুলো সাধারণ মানের গোলাকৃতি কুঁড়েঘর দেখা যায়। দেওয়াল মাটির ও সমতল চাল শুকনো ভুট্টার খড় বা আগাছা দিয়ে তৈরি। দেখলে মনে হয় প্রাগৈতিহাসিক কোন কুঁড়েঘর। কুর্ণল ও তার নিকটবর্তী কুড্ডাপা জেলার বেশির ভাগ দেওয়াল পাথরের তৈরি। কুর্ণল থেকে শ্রীকাকুলাম পর্যন্ত

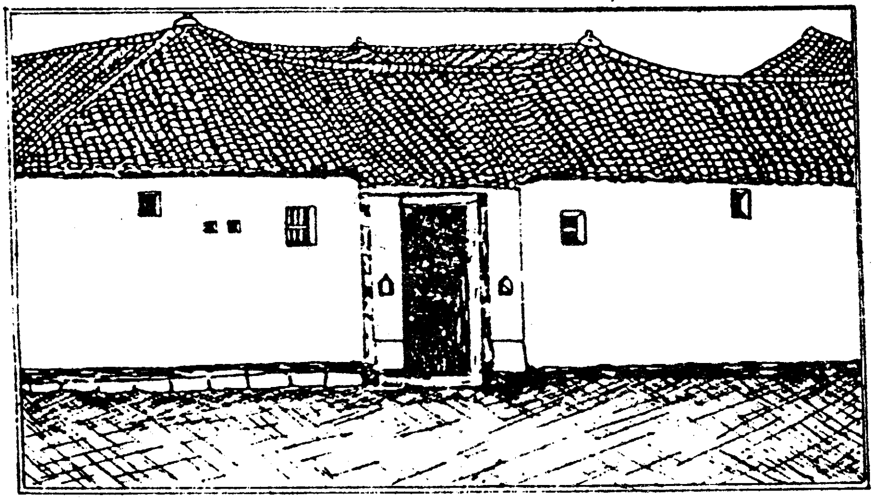

চিত্র 1.4.7 ঃ তেলেঙ্গানায় টালির বাড়ি (সূত্র ঃ 1.4.4)

এলাকায় পাথরের তৈরি ছাদ ও দেওয়াল দেখা যায়। নাল্লামালাইয়ের চেঞ্চু উপজাতিরা বন থেকে জোগাড় করা মালমশলা দিয়ে গোলাকার কুঁড়েঘর তৈরি করে। অভাবের দরুন অনন্তস্তরের বাসিন্দারা খেজুর পাতার চাল দিয়ে কুঁড়েঘর বানায়। দেওয়ালগুলো অমসৃণ পাথরের তৈরি। কর্ণাটকের নিকটবর্তী চিত্তোর জেলার টালির ছাদ দেখা যায়। জেলার অন্যত্র অভাবের দরুন অধিবাসীরা মাটির তৈরি গোলাকার দেওয়াল ও ভুট্টার ঘর দিয়ে ছাদ বানায়। ওয়াবেঙ্গল ও নিজামাবাদের কিছু অংশ বাদে তেলেঙ্গনা অঞ্চলের সব জায়গাতেই টালির ছাদ বেশি দেখা যায়। আদিলাবাদ, ওয়াবেঙ্গল ও খান্মানের উপজাতি অধ্যুষিত বনাঞ্চলে বাড়ি তৈরির মালমশলা বন থেকেই যোগাড় করা হয়। দেওয়ালগুলো বেতের তৈরি। তার ওপর মাটি বা গোবর দিয়ে পলেস্তারা করা হয়। ডালপাতা দিয়ে ছাদ ছাওয়া হয়। ভিজিয়ানগ্রামের মত এখানকার ছাদ খুব ঢালু ও নীচু হয়।

❑ তামিলনাড়ু ঃ

এখানকার বাড়িগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়—(A) খড়ের চাল দেওয়া কুঁড়েঘর (B) ছোট ও মাঝারি ধরনের টালির বাড়ি ও (C) বড় ধরনের টালির বাড়ি। গরীব লোকদের কুঁড়েঘর খড়ের চাল দেওয়া, সামনে খোলা বারান্দা। ছাদের কিছুটা অংশ সামনের দিকে নেমে এসে বারান্দার কাজ করে। সময় বিশেষে

এখানে শোওয়া হয়। দেওয়ালগুলো নীচু। তাল বা নারকোল গাছের গুঁড়ি বা বাঁশ দিয়ে ছাদের খুঁটি বানানো হয়। মেঝেতে মোটা করে মাটি বা গোবর দিয়ে লেপা হয়। ছাদের নীচে ফসল রাখার জন্য ছোট ঘর (loft) করা হয়। মাঝারি কআয়ের ব্যক্তিরা দুই-তিন কামরায় টালির ঘর তৈরি করে। বাড়ির সামনে খোলা বারান্দা থাকে। বারান্দা দিয়ে বাড়ির ভেতর প্রবেশ করলে বড় শোবার ঘরে পৌছান যায়। বড় ঘরের কিছুটা অংশ রান্নাঘর হিসেবে ব্যবহার করার হয়। রান্নাঘরের মুখোমুখি থাকে ভাঁড়ার ঘর। বাড়িগুলোর মেঝে পোড়া ইঁটের এবং দেওয়াল গ্রানাইট পাথরের তৈরি। লাল মাটি ও বালি হাল্কা করে মিশিয়ে দেওয়াল পলেস্তারা করা হয়। শুকনো এলাকায় পাথরের দেওয়াল তৈরি করা হয়। ব-দ্বীপ অঞ্চলের কোন কোন জায়গায় ল্যাটারাইট মাটি ব্যবহার করা হয়। এখানে নারকেল, তাল ও ধান প্রচুর জন্মায় বলে বাড়ির চাল করতে এগুলোর ব্যবহার দেখা যায়। এখানে ঘূর্ণীঝড়ের প্রকোপ বেশি। তাই অনেক উপকূলবর্তী গ্রামে দু-থাকওয়ালা ছাদ দেখা যায়। প্রথম ছাদটা নারকেল বা তালপাতা দিয়ে শক্ত করে বাঁধা থাকে। ছাদকে প্রবল বাতাসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য অনেক সময় লতানো গাছ লাগান হয়।

❑ কেরালা ঃ

কেরালার বেশির ভাগ বাড়িই সেগুন কাঠের তৈরি। মালাবার উপকূলে এই সব শক্ত পাকাপোক্ত বাড়ি অনেক ক্ষেত্রেই 400 বছর বা তার বেশি সময় ধরে আজও অক্ষত অবস্থায় টিকে আছে। তালপাতার চাল দেওয়া এই বাড়িগুলো আলো বাতাস চলাচলের খুব উপযোগী বলে স্বাস্থ্যকর। সাধারণতঃ এক একটা বাড়িতে চারটে করে কামরা থাকে। আরাপুরা বা প্রথান কামরা, পুটিপুরা বা প্রবেশ গৃহ, টেকিকিটু বা দক্ষিণের ঘর ও ভাটাকটি বা উত্তরের ঘর (রান্নাঘর)। মালায়লিয়া পরস্পরের থেকে দূরে থাকতে ভালবাসে। তাই তারা রাস্তার ধারে বাড়ি তৈরি করে না। ঘন পাম গাছের সারির আড়ালে বাড়িগুলো ঢাকা পড়ে যায়। বাড়ি তৈরির মালমশলা, ভিত ও ঘরের সংখ্যা অনুযায়ী কেরালার বাড়িগুলোকে চারভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমটা হল সাবেকী আমলের বাড়ি, যা কয়েক শতাব্দী ধরে টিকে আছে। এই ধরনের বাড়িগুলো কাঠের তৈরি। ছাদ টালির। বাড়িতে অনেক ঘর থাকে। এই ধরনের বাড়িকে বলে মালুকেট্টু। দ্বিতীয় শ্রেণীর বাড়ি হল অবস্থাপন্নদের। আধুনিক এই সব বাড়িতে বৈঠকখানা, খাবার ঘর, শোবার ঘর ও তার সঙ্গে লাগোয়া শৌচাগার থাকে। প্রয়োজনমতো ঘর বানানো হয়। অধিকাংশ বাড়ি একতলা। উত্তর কেরালার বৃষ্টিবহুল এলাকার বাড়ির ছাদ টালির তৈরি। সিমেন্টের হোক, আর টালির হোক, ছাদের চারধারে সুন্দর সুন্দর নকশা করা হয়। আধুনিক এই বাড়ির দেওয়াল ও মেঝে পাকা, দেওয়ালগুলো রং করা হয়। বাড়িতে বৈদ্যুতিক আলো ও জলের পাইপ লাইন থাকে। তৃতীয় শ্রেণীর বাড়ি হল মাঝারী আয়ের ব্যক্তিদের। এদের বাড়িগুলো আয়তাকার। ভিতর ল্যাটারাইট বা পোড়া বা কাঁচা ইঁটের তৈরি। কদাচিৎ গ্রানাইট পাথর ব্যবহার করা হয়। উপকূলের নীচু এলাকায় মেঝে উঁচু করে তৈরি করা হয় যাতে বর্ষার জল বাড়িতে প্রবেশ করতে না

পারে। অধিকাংশ বাড়ির মেঝে গোবর বা কাঠকয়লার গুঁড়ে দিয়ে নিকোনো হয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে চুন ও লাল ল্যাটারাইট মাটি দিয়ে পলেস্তারা করা দেওয়ালের গায়ে দেবদেবী ও পশুর ছবি আঁকা হয়। বাড়িগুলোর সামনে ও পেছনে বারান্দা থাকে। সামনের বারান্দা বৈঠকখানা হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এটা অতিথিদের ঘর। সময় সময় বাড়ির কর্তা একে শোবার ঘর হিসেবে ব্যবহার করে। এছাড়া আর দু'-একটা শোবারঘর, একটা খাবারঘর, রান্নাঘর, আবার কোন কোন বাড়িতে ভাঁড়ার ঘর থাকে। বাড়ির ছাদগুলো ঢালু। গৃহস্বামীর আর্থিক অবস্থানুযায়ী বাড়ির ছাদ নারকেল পাতা বা তালপাতা দিয়ে ছাওয়া হয়। গরীবদের বাড়ির ছাদ ও দেওয়াল কাওজ্যান পাতার (যা কেরালার সর্বত্র পাওয়া যায়) তৈরি। বেশির ভাগ বাড়িতে ভিত আছে। মাটির তৈরি এই ভিতগুলো 0·6 মিটার পর্যন্ত উঁচু হয়। মেঝের মাটির তৈরি। গোবর ও নারকেল পাতার ছাই দিয়ে তা নিকানো হয়।

এই রাজ্যের কাজিকোড জেলায় এক ধরনের গৃহ তৈরি করা হয় যা জাহাজের মত দেখতে হয়। বাড়িগুলো দেখতে খুব সন্দুর হয়, অনেকটা জাহাজের মত (চিত্র I. 4.8)।

পাহাড়ী উপজাতিদের বাড়ির ধরন কিছুটা আলাদা। কুরুমাদের বাড়ির ভিতর 1 মিটার থেকে 2 মিটার উঁচু ও তা আয়তাকার। বাড়ির দেওয়াল মাটি বা কাঁচা ইঁটের তৈরি। চালের পাটাতন জঙ্গলের কাঠ ও বাঁশ দিয়ে তৈরি এবং ছাদ খড়ের। বাড়িগুলো হেলান অবস্থায় থাকে যাতে বাসাতে কোন ক্ষতি না হয়। বাড়িতে একটাই দরজা ও সব বাড়িতেই একটা করে ঘর। বাড়ির দেওয়ালের ওপরের অংশে লাল মাটি দিয়ে সুন্দর করে রং করা হয়ে থাকে। নীচের অংশ গোবর ও কাঠকয়লা দিয়ে নিকানো থাকে। নীলগিরি পাহাড়ে এক ধরনের বড় পাতা পাওয়া যায়। তা দিয়ে **বাদাগা** উপজাতিরা ঘর ছাওয়ায়। বাঁশ ও মহুয়া গাছের খুঁটি দিয়ে এরা দেওয়াল তৈরি করে। নীলগিরি পাহাড়ের আর এক উপজাতি হল **টোডা**। এদের অর্ধবৃত্তাকার বাড়িগুলোর প্রবেশপথ খুব নীচু (চিত্র I. 4.9)। দরজার বদলে একখণ্ড চওড়া পাথরের টুকরো বা কাঠের তক্তা দিয়ে প্রবেশপথের মুখট আটকানো থাকে। এছাড়া ধোঁয়া বেরনোর জন্য বা বাতাস চলাচলের জন্য অন্য ছিদ্র থাকে। বাঁশের দেওয়াল ও খড়ের চালের এই সুন্দর বাড়িগুলোর ভেতরে প্রায় 0·6 মিটার উঁচু পাটাতন আছে। এর ওপর সম্বর বা মোষের চামড়া, ক্ষেত্রবিশেষে মাদুর বিছিয়ে **টোডারা** ঘুমোয়।

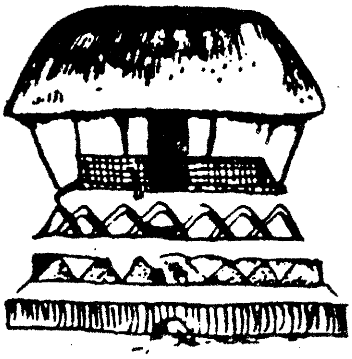

চিত্র 1.4.8 ঃ কেরালার জাহাজ বাড়ি
(সূত্র ঃ 1.4.4)

কোচিনের গভীর বনে **কাদার** নামে এক উপজাতি সুন্দর কুঁড়েঘরে বাস করে। এদের ঘরের দেওয়াল বাঁশের বা কঞ্চির বেড়ার তৈরি। আর ঘরের চাল শাল, সেগুন পাতা দিয়ে ছাওয়া। ঘরগুলো কয়েকটা

কামরায় ভাগ করা থাকে। যাযাবর স্বভাবের কাদাররা ছোট ছোট দলে বাস করে ও জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়। যেখানে বুনো জন্তুজানোয়ারের আক্রমণের ভয় থাকে সেখানে তারা গাছের ডালে খুব হালকা কুঁড়েঘর বানায়। এই সব কুঁড়েঘরের দেওয়াল পাতা বা বাঁশ দিয়ে তৈরি, মেঝে বাঁশ বা কাঠ, ছাদ খড় ও পাতা দিয়ে ছাওয়া।

চিত্র 1.4.9 ঃ টোডাদের অর্ধবৃত্তাকার বাড়ি (সূত্র ঃ 1.4.4)

❑ কর্ণাটক ঃ

এখানকার বাড়িগুলোকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়। প্রথমতঃ সমতল ছাদওয়ালা আয়তাকার বাড়ি, দ্বিতীয়, ঢালু ছাদওয়ালা আয়তাকার বাড়ি। যে সব জেলায় বৃষ্টিপাত কম হয়, সেখানে সমতল চাল তৈরি হয়। গবীর লোকেরা পাতা, বেত ও বাঁশের কঞ্চি দিয়ে ছাদ তৈরি করে তার ওপর মাটি দিয়ে প্রলেপ দেওয়া হয়। ধোঁয়া বেরনোর জন্য দু'তিনটি মাটির পাইপ ছাদে বসানো থাকে। এছাড়াও ছাদে ছোট ছোট কয়েকটি আয়তাকার গর্ত থাকে। বর্ষাকালে এগুলো ভাঙা মাটির টুকরো দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। অবস্থাপন্নরা চাল তৈরিতে পাথরের টুকরো ব্যবহার করে। দুই পাথরের টুকরোর মাঝখানের অংশে সিমেন্ট বা চুণের গুঁড়ো দিয়ে ভরাট করা হয়। পাথর পাওয়া যায় বলে সেখানে সাধারণতঃ পাথর দিয়ে ছাদ বানানো হয়। অন্যত্র মাটির তৈরি সমতল চাল দেখতে পাওয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ উপকূলের জেলাগুলোতে ও মালনাদ অঞ্চলে যেখানে 300 থেকে 675 সেন্টিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টি হয় সেখানে ঢালু ছাদওয়ালা আয়তাকার বাড়ি তৈরি হয়। ছাদগুলো চারচালা, বাড়িগুলোর স্থানীয় নাম থোট্টীমানা (Thottimana)। বাড়ির সমানে বসার জন্য বারান্দা থাকে। চার দিকে দিয়ে ঘর তৈরি হওয়ায় বাড়ির ভেতরে উঠান পাওয়া যায়। চাষীজীবিরা আব্রু

রক্ষার ব্যাপারে খুব উৎসাহ দেখায় না। বাড়িতে অনেক বড় বড় দরজা থাকে। জানালা থাকলেও তা ছোট করে তৈরি করা হয়। ফলে বাড়ির কিছু অংশে ভাল আলো বাতাস পাওয়া যায় না। স্থানীয় অর্ধ-গোলাকার টালি দিয়ে ঘর ছাওয়া হয়। ঢালু দো চালা বাড়িতে (স্থানীয় নাম কাভালী গেমানে) দিশী ও ম্যাঙ্গালোর টালি ব্যবহার করা হয়। এছাড়া অনেক ঢালু বাড়িতে ঘাস, এমনি কি শুকনো নারকেল, সুপারী, তাল ও আখের পাতা ছাদ তৈরিতে লাগে। মাটির দেওয়াল তৈরিতে অঞ্চল বিশেষে হেরফের লক্ষ্য করা যায়। যেমন পূর্ব ও পশ্চিমে এক থেকে দেড় ফুট (0·3 মিটার থেকে 0·5 মিটার) পর্যন্ত গাঁথার পর তাকে শুকাতে দেওয়া হয়। কোন কোন জায়গায় প্রথমে বাঁশের খাঁজা করা হয়। তাকে মাটি দিয়ে ভর্তি করা হয়। এই সব দেওয়াল সরু হলেও শক্ত হয় অধিকাংশ বাড়ির সামনের দিকে কোন বারান্দা থাকে না। তবে পেছনের বারান্দা থাকে। বিজাপুরের কিছু কিছু অংশে তাঁতিদের বাড়ির সামনে বারান্দা থাকে। মালনাদ অঞ্চলে বাড়ির মাঝখানে উঠান থাকে। এই অঞ্চলের বাড়িগুলো একটু বিছিন্ন অবস্থায় দেখা যায়।

❑ মহারাষ্ট্র ঃ

এখানকার গ্রামাঞ্চলে দো'তলা বা তে'তলা বাড়ি দেখা যায়। বাড়িগুলোর দেওয়াল পাথর ও পোড়া ইঁটের তৈরি এবং ছাদ টালির। প্রবেশ পথ সাধারণতঃ চওড়া থাকে। এই প্রবেশ পথ দিয়ে উঠানে এসে পড়লেই গোশালা, ঘোড়াশালা নজরে পড়বে। ওপরতলা ও নীচের তলার একটা বা দু'টো করে ঘর চুণকাম করা হয়। গণপতি ও শিবের ছবি ছাড়াও নানারকম শখের ছবি আঁকা হয়। এই ঘরগুলো অতিথি ও অভ্যাগতদের থাকা ও ব্যবসার জন্য ব্যবহার করা হয়। অন্য ঘরগুলো ভাঁড়ার, শোবার ও রান্নার জন্য ব্যবহার করা হয়। এয়েকটি বিশেষ ঘর ছাড়া বাড়িগুলো খুব কমই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে। গরীবদের বাড়িগুলো ছোট এবং তাতে দু'একটা ঘর থাকে। কিছু কিছু অবস্থাপন্নদের বাড়ি নারকেল পাতা, উলু খাগড়া, ধানের খড বা শুধুমাত্র ঘাস দিয়েও ছাওয়া হয়। শুধু আর্থিক কারণেই নয়, টালি ব্যবহারের পেছনে সাবেকী প্রথাও রয়েছে। পশ্চিম দিকের বাড়িগুলো চারচালা, কারণ এই অংশে বেশি বৃষ্টি হয়। উপকূল এলাকাতে বেশি বৃষ্টির জন্য বাড়ির ছাদ পুরু ও বেশ ঢালু করে বানানো হয়। ছাদ হয় টালির কিম্বা ঘাস পাতা, ডালপালা বা বাঁশের কঞ্চি দিয়ে ছাওয়া। দেওয়াল সাধারণতঃ মাটির তৈরি। থানে, কোলবা, রত্নগিরির উপকূলবর্তী জেলাগুলোতে কৃষিজীবী ও কারুশিল্পীরা মাটি বা পাথরের তৈরি উঁচু ভিতের ওপর বাড়ি তৈরি করে। বাড়ির ছাদ খড় বা টালি দিয়ে ছাওয়া। বাঁশের কঞ্চি দিয়ে দেওয়াল তৈরি হয়। দেওয়ালের দু'দিকের গোবর দিয়ে লেপা হয়। বাড়িগুলো আয়তাকার। এতে একটি বা দুটি ঘর থাকে।

❑ মধ্যপ্রদেশ ঃ

ছাদ ও দেওয়ালে ব্যবহৃত মালমশলার ভিত্তিতে এখানকার বাড়িগুলোকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। রাজ্যের সব জায়গাতেই দেওয়াল তৈরিতে মাটি, ছাদ তৈরিতে টালি ব্যবহার করা হয়। উপজাতি

এলাকায় অবশ্য বাড়ি তৈরিতে একটু অন্য ধরনের উপকরণ ব্যবহার করা হয়। রাজ্যের পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিমে **ভীলদের** গ্রামে দেওয়াল তৈরিতে বাঁশ ও ছাদ তৈরিতে টালি ও ঘাসের খুব চল আছে। বাঁশকে চিরে দরজা বানানো হয়। ক্ষেত্রবিশেষে এর ওপর মাটি দিয়ে লেপা হয়। ভীলরা একটা ঘরে বাস রতে পছন্দ করে। এমনকি বড় বড় বাড়িতে একটা করে ঘর থাকে। দূর থেকে দেখলে মনে হয় যেন একটাই বড় হলঘর। যেখানে পরিবারের সদস্য সংখ্যা বেশি সেখানে ঐ বড় ঘরটাকে বাঁশের দরজা দিয়ে ভাগ করা হয়। কিন্তু সেই সব ঘরের জন্য একটা সাধারণ প্রবেশ পথ থাকে। বাড়ির দেওয়াল 2 মিটারের বেশি উঁচু হয় না। দেওয়ালগুলো ছাদ পর্যন্ত উঁচু হয় না। হোসাঙ্গাবাদের উপজাতি অধুষিত এলাকায় বাঁশের কঞ্চি ও ডালপালা দিয়ে দেওয়াল বানানো হয়। রায়পুর ও বিলাসপুর বিভাগের উপজাতি-অধ্যুষিত পূর্বাংশে মাটির দেওয়াল ও খড়ে ছাওয়া ছাদ খুব বেশি রকম দেখা যায়। মাটির সঙ্গে খড়ের টুকরোও মেশান হয়। রাস্তার ও রায়পুরের উপজাতি **গণ্ডদের** ঘর তৈরির কথা আগেই বলা হয়েছে।

❑ **গুজরাত ঃ**

গুজরাতের বাড়িগুলো পাশাপাশি গড়ে ওঠে। এই বাড়ির মধ্যে সকলের জন্য ব্যবহারের দেওয়াল রয়েছে। এখানকার বাড়ির ভিতগুলো খুব একটা উঁচু নয়। দেওয়ালগুলো পোড়া ইঁট, বালি বা মাটি। ক্ষেত্রবিশেষে শক্ত কাঠেরও হয়। বাড়ির ছাদ টালির। কোন কোন ক্ষেত্রে দোতলা বাড়িও চোখে পড়বে, বাড়ির সামনের দেওয়ালে প্রবেশ পথ থাকে। এটা প্রতিবেশী ও তাদের গৃহপালিত পশুর জন্য ব্যবহার হয়। একটু অবস্থাপন্নদের সামনের দেওয়ালের পাশে আলাদা প্রবেশ পথ থাকে, যা দিয়ে সরাসরি আস্তাবলে যাওয়া যায়। কিছু কিছু গ্রামে বাড়ির সামনে যে ফাঁকা জায়গাটা থাকে তাতে গরু, মোষ ও ষাঁড়ের জন্য চালাঘর থাকে। মাঝখানের দরজা দিয়ে প্রবেশ করলে যে ঘরটায় পৌছানো যায়, তা হল **পার্সাল** (parshal) বা প্রবেশ ঘর। এখানে মাঝখানে পৌছানো যায়। এর একদিকে একটা দেওয়াল থাকে। দেওয়ালের গায়ে তিনটে দরজা দিয়ে তিনটে ঘরে পৌছানো যায়। প্রথম ভাঁড়ার ঘর। এখানে কাপড়, গয়না ও শস্য রাখা হয়। মাঝেরটা রান্নাঘর **(রষুদ)** ও শেষেরটা খাবার এবং শোবার ঘর। যে সব বাড়ি দোতলা সেখানে দোতালায় ঘুনানোর ব্যবস্থা থাকে। গুজরাতের তপশীলি জাতিদের বাড়িগুলো (কুঁড়েঘর) গ্রামের শেষপ্রান্তে থাকে। মাটির দেওয়াল আর ঘাস বা তালপাতার চাদ দিয়ে তৈরি এই এক কামরায় ঘরকেই ক্ষেত্রবিশেষে বাঁশের কঞ্চি দিয়ে দু'ভাগ করে এক ভাগকে অর্থাৎ ভেতর ঘরকে রান্নাঘর, আর বাইরের ঘরকে শোবার জন্য ব্যবহার করা হয়। এই রাজ্যের ভীলদের পেরেক বিহীন কাঠের বাড়ি তৈরি তারিফ করার মত। ভীলরা নিজেদের বাড়ি নিজেরাই তৈরি করে। তাদের বাড়ি তৈরির প্রধান যন্ত্রপাতি হল বাটালি ও হালকা ছোট কুড়োল। এগুলোর সাহায্যে তারা এমন খাঁজ খাঁজ করে কাঠ কাটে যে একটি আরেকটির সঙ্গে পেরেক ছাড়াই জোড়া দেওয়া যায়। কাঠের ফ্রেমের ওপর খড়ের চাল দিয়ে ঢালু চাদ তৈরি করা হয়। অবশ্য

প্রতি বৎসর চালের খড় বদলাতে হয়। ঘাসের ছোবড়া দিয়ে ঘরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। এক ভাগে রান্না ও শোবার ঘর, অন্য ভাগে গোয়াল ঘর। এখানে আবার ফসলও মজুত রাখা হয়।

❑ **রাজস্থান ঃ**

এখানকার বাড়ির গঠন ও বিন্যাস অনেকাংশেই পরিবেশ-ভিত্তিক। তবে সামাজিক প্রভাবকেও অস্বীকার করা যায় না। যেমন মেও (Meo) উপজাতি-অধুষিত ভরতপুর ও আলোয়ার জেলায় বাড়িগুলো কাছাকাছি তৈরি হয়। সব পরিবারের বাড়িগুলোকে ঘিরে একটা যৌথ উঁচু দেওয়াল তোলা হয়। ব্রাহ্মণ, জাঠ ও আহির প্রধান গ্রামের নিজস্ব চৌহদ্দি আছে। দক্ষিণের **গজ্জর** (Guggar) গ্রামে অনেকখানি জায়গার ওপর বাড়িগুলোর বিক্ষিপ্তভাবে তৈরি করা হয়। **গিরাসিয়া** (Girasia) ও **ভীল** (Bhil) উপজাতিরা তাদের প্রতিবেশীদের থেকে কিছু দূরে কুঁড়েঘর তৈরি করে। এদেরর প্রত্যেকের নিজস্ব চৌহদ্দি আছে। মরুভূমিতে যেখানে পানীয় জল পাওয়া যায় ও প্রচণ্ড ধূলিঝড় থেকে আশ্রয় পাওয়ার ব্যবস্থা আছে, সেখানেই বাড়ি তৈরি করা হয়। এখানকার সব পরিবার মিলে যৌথ দেওয়াল গড়ে তোলে। এখানকার মরুভূমিতে শঙ্কু আকৃতির **ঝানপার** ঘর দেখা যায়। ঝোনপার দেওয়াল গোলাকার। এই ধরনের শঙ্কু আকৃতির ঘর তৈরি করতে যেটা দরকার তা হল ঘরের মাঝখান থেকে চাল পর্যন্ত একটা শক্ত লম্বা খুঁটি। সরু সরু কাঠের ফালি দিয়ে এই চালের পাটাতন তৈরি হয়। মরুভূমির প্রচণ্ড ঝড় ও আচমকা প্রচণ্ড বৃষ্টিপাতের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এই ধরনের বাড়ি তৈরি করা হয়। এই বাড়িতে একটাই ছোট দরজা থাকে। জানালা থাকে না। ছাদের ছিদ্র থেকে অল্প অল্প আলো ঘরে এসে পড়ে। ঘরের বাইরে যথেষ্ট উত্তাপ থাকলেও পুরু মাটির দেওয়াল ও খড়ের চাল ঘরের অভ্যন্তরভাগ যথেষ্ট ঠাণ্ডা রাখে। মাটির সঙ্গে খড়ের টুকরো মিশিয়ে এই দেওয়াল ধাপে ধাপে তৈরি করা হয়। এক ফুট (0·3 মিটার) গাঁথার পর তাকে শুকাতে দেওয়া হয়। তারপর আবার এক ফুট গাঁথা হয়। এই দেওয়াল তৈরি করতে প্রায় দু'-সপ্তাহ সময় লাগে। ঘরের চাল বজরার খড়ের তৈরি (চিত্র 1.4.10)। সাধারণতঃ এক এক পরিবারের দু'টি ঝোনপা থাকে—একটি শোবার, আর একটি রান্নার। ফসল রাখার জন্য ঝোনপার পাশে বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়। ঝোনপা তৈরি করতে খরচ কমই লাগে। চালের খড় কয়েক বছর পরপর পাল্টান হয়। মাটি ও গোবর দিয়ে যৌথ দেওয়াল পলেস্তারা করা হয়। অনেকগুলো ঝোনপা মিলে একটাই যৌথ দেওয়াল থাকে। মরুভূমির পূর্ব প্রান্তে অর্থাৎ প্রায় শুষ্ক

চিত্র 1.4.10 ঃ মরু অঞ্চলের স্থায়ী বাসগৃহ ঝোনপা (সূত্র ঃ 1.4.4)

অঞ্চলে যেখানে বাবলা ও খেজুর গাছ জন্মায়, সেখানে দু'ধরনের বাড়ি দেখাতে পাওয়া যায় ঃ **ঘর** (Ghar) ও **পাড়ো** (Padwa)। কাঠের পাটাতনের ওপর মাটির সমতল ছাদ ও মাটির দেওয়াল "ঘরের" বৈশিষ্ট্য। রোদে পোড়া ইঁট দিয়ে দেওয়াল তৈরি করা হয়। ছাদ ঢালু ও তা তৈরি করতে পোড়া টালি ব্যবহার করা হয়। আরাবল্লীর পূর্ব অংশে নানা ধরনের বাড়ি নজরে আসে। পর্ব্বতের পূর্ব ঢালে গুঁড়িগুলো মাটির তৈরি। অসমান মাপের টালি দিয়ে ছাদ ছাওয়া হয়। পাহাড়ী এলাকায় বাড়িগুলো মাটির তৈরি। অসমান মাপের টালি দিয়ে ছাদ ছাওয়া হয়। পাহাড়ী এলাকায় গিরাসিয়া নামে উপজাতিরা বাড়ি তৈরিতে আশপাশের বনজঙ্গলের বাঁশ, কাঠ ও ঘাস ব্যবহার করে প্রায় 2·5 মিটার উঁচু কাঠের কয়েকটা খুঁটির ওপর বাড়ি তৈরি করা হয়। মই বা খাঁজ কাটা কাঠের খুঁটি বেয়ে ওঠানামা করা হয়। বাঁশ চিরে তা বুনোট করে ও সেই সঙ্গে ঘাস মিশিয়ে দেওয়াল ও মেঝে তৈরি করা হয়। ছাদ ঢালু ও চ্যাপ্টা টালির তৈরি। এই ছাদ ঘরের সামনের দিকে কিছুটা প্রলম্বিত থাকে। মেঝে সামনের দিকে বাড়ানো থাকে। এখানে গবাদি পশুর খাবার রাখা হয়। গরমের দিনে শোয়াও হয়। এর নীচে গবাদি পশু রাখা হয়। বাড়িতে একই মাপের দু'টো ঘর থাকে। বাইরের ঘরে রান্না করা হয়। ভেতরের ঘরে থাকে প্রায় 2মিঃ উঁচু শক্ত মাটির পাত্র। তাতে সারা বছরের শস্য রাখা হয়। আরও পূর্বে উদয়পুর, ডঙ্গারপুর ও বানাসওয়ারা জেলার বাড়িগুলো সমতল ছাদ-বিশিষ্ট, আর তা কাঁচা টালি বা মাটি দিয়ে তৈরি হয়। কোন কোন অঞ্চলের আধা পোড়া টালি দিয়ে ঢালু ছাদ তৈরি করা হয়। ছাদের পাটাতন কাঠের তৈরি। বৈশির ভাগ বাড়ি নীচু। বায়ু চলাচলের ভালো ব্যবস্থা নেই। বাড়িগুলো আয়তাকার দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। রাজস্থানের আর এক উপজাতি হল ভীল। বনে ঢাকা ছোট ছোট পাহাড়ের ঢালে এরা কুঁড়েঘরে বাস করে। খড় ও পাতায় ছাওয়া বা আধ পোড়া টালি দিয়ে এরা ঢালু ছাদ তৈরি করে। আশপাশের বনের বাঁশ চিরে তা সুন্দর করে বুনে ভীলরা দেওয়াল বানায়। মাটি ও ছোট ছোট পাথৰ দিয়েও দেওয়াল তৈরি করা হয়। যেখানে প্রচুর পাথর পাওয়া যায়, সেখানে বাড়ির দেওয়াল ও ছাদ পাথর দিয়ে তৈরি করা হয়। উঠানের চারপাশ দিয়ে ঘর তৈরি করা হয়।

❑ **পশ্চিমবঙ্গ ঃ**

দার্জিলিং ঃ এই জেলার ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ু ও স্থানীয় উপকরণ বাড়ি তৈরিতে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে। যেমন বলা চলে প্রচুর বৃষ্টিপাতের জন্য এখানকার ছাদগুলো ঢালু করে তৈরি করা হয়। অন্যদিকে এখানকার পাহাড়ী এলাকার দরুন বাড়ি তৈরির জন্য একসঙ্গে অনেকখানি জমি পাওয়া এক সমস্যার ব্যাপার। তাই এই এলাকার বাড়িঘর ছোট। উঠান বলতে গেলে নেই। গরীব লোকেরা একটি ঘরেই দিন কাটায়। একটা ঘরের মধ্যে ছোট একটা দেওয়াল তুলে সেখানে রান্নাও ভাঁড়ারের কাজ চালানো হয়। বাড়িগুলো আয়তাকার, বাড়িতে জানালা থাকে না বললেই চলে। প্রধান ঘরের পাশেই থাকে পশু খোঁয়াড়। তাই এখানকার অধিকাংশ বাড়িই অস্বাস্থ্যকর। অবস্থাপন্নদের বাড়িতে শোবার ঘর, রান্না ঘর, খাবার

ঘর ও ভাঁড়ারঘর থাকে। বাড়ির পাশে থাকে বাগান। এখানকার বাড়িঘর কাঠের তৈরি, কারণ এখানে খুব সহজেই কাঠ পাওয়া যায়। অনেকক্ষেত্রেই ঢালু জমির ওপর কাঠের খুঁটি পুঁতে তার ওপর বাড়ি তৈরি করা হয়। ছাদ টিনের তৈরি, তার নীচে থাকে কাঠের পাটাতন। দরজা ও জানালা কাঁচের তৈরি, কেন না এখানকার প্রচণ্অড বৃষ্টিপাত ও কুয়াশার জন্য দরজা ও জানালা প্রায় সব সময় বন্ধ রাখতে হয়। সেই মত কাঁচের দরজা ও জানালা দিয়ে ঘরে আলো আসতে পারে। নানারকম ফুলের টব দিয়ে বাড়ির সামনেটা সাজানো হয়। প্রধান বাড়ির পাশে গোয়ালঘর ও রান্নাঘর থাকে। পাহাড়ী এলাকায় সব্জি বাগান এখানকার বাড়ির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কাঠ ছাড়া বাঁশ, ঘাস, পাতা ও তাল পাতা বাড়ি তৈরিতে কাজে লাগে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে মাটিও ব্যবহার করা হয়। পাহাড়ী এলাকায় প্রচণ্ড ঠাণ্ডার জন্য বাড়ি তৈরিতে সিমেন্ট ব্যবহার করা হয় না। মেঝে মাটির তৈরি, আবার কাঠের তৈরিও হাতে পারে। দেওয়াল তৈরিতেও অনেক সময় পাথর ব্যবহার করা হয়। এই জেলার সমতল এলাকার ঘরবাড়ি আশপাশের জেলাগুলোর মত।

জলপাইগুড়ি ঃ এই জেলার উঠানের চারপাশ দিয়ে চার পাঁচটা ঘর বানানো হয়। দু'টো বা তিনটে শোবার ঘর, একদিকে রান্নাঘর ও আর একদিকে গোয়াল ঘর। একটু সঙ্গতিপন্নদের একটা বৈঠকখানা ও আলাদা ঠাকুরঘর থাকে। বাড়ির চারপাশ দিয়ে পাটকাঠির বেড়া বা কঞ্চির বেড়া দেওয়া থাকে। বাড়িতে প্রবেশের একটা পথ থাকে। এখানকার সাবেকী আমলের বাড়িতে খড়ের চাল ও বাঁশের বা কঞ্চির বেড়ার দেওয়াল দেখা যায়। বাঁশের ভাগ বেশি থাকায় এখানে মাটির দেওয়াল তৈরি করা সম্ভবপর হয় না। এখানকার অধিকাংশ বাড়িতে জানালা ও পায়খানার ব্যবস্থা নেই। একটু অবস্থাপন্নরা কাঠের দেওয়াল ও টিনের ছাদ দেওয়া বাড়ি তৈরি করে। বন্যার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বাড়ির ভিত 60 সে.মি. থেকে 90 সে.মি. উঁচু করা হয়। এই জেলার জনসংখ্যার একটা বড় অংশ হল রাজবংশী। 50 থেকে 60 বিঘা (জমি) মাঝখানে ঘর বেঁধে বাস করতেই এরা অভ্যস্ত। বৈঠকখানা (দারি ঘর), গোলঘর (গোলা ও মুরকি), গোয়ালঘর, ঠাকুরাণীর ঘর, শোবার ঘর, রান্নাঘর ও ঢেঁকিশাল নিয়ে এদের এক একটি বাড়ি। এদের প্রজাদের (আধিয়ার) নিজের জমি বলতে গেলে নেই। জোতদারদের বাড়ির লাগোয়া জমিতে তারা বাস করে। এই রকম কয়েকটি গৃহগুচ্ছকে **টরি** (পোড়া) বলে। বাড়ি বানাতে এরা খড় ও বাঁশ ব্যবহার করে। সাণ্ডার সাহেব (D. H. E. Sunder) তাঁর Report (1895-এ লিখেছেন যে প্রত্যেক রাজবংশীয় বাড়িতে চারটে ঘর থাকে। এগুলো উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিমমুখী। আর একখানি অতিরিক্ত ঘৰ (দারিঘর) থাকে। যেখানে অতিথি বা বন্ধুবান্ধবরা রাত কাটায়। বাড়ি তৈরির সময় নজর দেওয়া হয় যাতে উত্তরে সুপুরি বাগান, দক্ষিণে ক্ষেতি, পূর্বে জলাশয় ও পশ্চিমে বাঁশবন থাকে। উত্তরদিকে পাহাড়ী এলাকায় বন থাকায় এখানকার বেশির ভাগ বাড়ির দেওয়াল কাঠের তৈরি। বাড়ির ছাদে টিন বা অ্যাসবেসটস্ দেওয়া হয়। জলপাইগুড়ি জেলাতে (ডুয়ার্স) অনেক চা বাগান রয়েছে। আগে শ্রমিক শ্রেণীর বাড়ির দেওয়াল তৈরিতে কাঠের ব্যবহার থাকলেও এখন অনেক বাগানে সিমেন্টের দেওয়াল ও টিন বা এ্যাসবেসেটস্ দিয়ে ছাদ বানানো হয়।

এই জেলার মাদারীহাট থানার টোটোপাড়ার **টোটো** উপজাতির বাস। এদের ঘরবাড়ি প্রায় সুমাত্রা-জাভার আদিম মানুষদের ঘরের মত। মাটির ওপরের 2 মিটার উঁচু কাঠের বা বাঁশের খুঁটির ওপরে বাঁশের চাটা দিয়ে মেঝে তৈরি হয়। এই মেঝের চারপাশে বাঁশের খুঁটির সাহায্যে চালা তৈরি করে খড়ের চাল

চিত্র 1.4.11.1 ঃ রাভাদের বাসগৃহ (সূত্র ঃ লেখক)

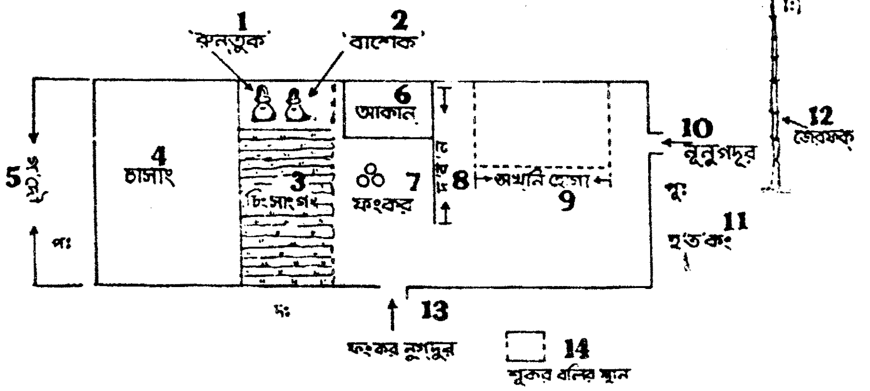

চিত্র 1.4.11.2 ঃ রাভা বাসগৃহের অভ্যন্তরভাগ (সূত্র ঃ লেখক)

দেওয়া হয়। বাড়িতে মাত্র একটি ঘর, সামনে লম্বা বারান্দা। ফাটা বাঁশের মেঝে প্রায় দুই মিটার চওড়া। এই ঘরের একদিকে ঘুমানোর জায়গা। মাঝে রান্নার জায়গা, আরেক দিকের মেঝেতে একটু ফাঁকা। এটিই পায়খানা। ঘরের নীচে থাকে গরু ও শুয়োর। ওপর থেকে মল নীচে পড়লেই শুয়োরেরা তা খেয়ে ফেলে। তাই ঘরে দুর্গন্ধ হয় না। ঘরে উঠবার সিঁড়ি (কাইবু) নেই। একটি গাছের কাণ্ডে খাঁজ কেটে জমি থেকে বারান্দা পর্যন্ত হেলান দিয়ে রাখা হয়। এটা সিঁড়ির কাজ করে। বর্তমানে এখানে সরকারী প্রচেষ্টায় কয়েকখানা টিনের চাল ও তক্তার বেড়া দেওয়া বাড়ি তৈরি হয়েছে।

কুচবিহার ঃ এই জেলায় মধ্যবিত্তদের বাড়ির চাল, বিশেষ করে শোবার ঘরের চাল, টিনের তৈরি। রান্নাঘর টালির দোচালা, গোয়ালঘরের চাল টিন ও এ্যাসবেসটস্সে তৈরি। দেওয়াল মূলী বাঁশের তৈরি।

দেওয়ালে নকশা করা থাকে। ঘরের ভেতরে বাঁশের তৈরি পাটাতন থাকে। অধিকাংশ বাড়িতেই তিন/চারটে শোবার ঘর, একটা রান্নাঘর, একটা গোয়াল ঘর ও মা মনসার পুজোর জন্য ঠাকুর ঘর থাকে। প্রত্যেক বাড়ির চারদিকে বাঁশের বা পাটকাঠির বেড়া থাকে। বাড়িতে প্রবেশের জন্য একটা ও দু'টো দরজা থাকে। গরীবদের বাড়ির চাল খড়ের তৈরি। ঘরের বেড়া বৈশির ভাগ ক্ষেত্রে বাঁশের কিংবা পাটকাঠির হয়, কারণ এখানে প্রচুর বাঁশ ও পাটকাঠি পাওয়া যায়। বাড়িতে ভিত 0·3 মিটার থেকে 0·5 মিটার পর্যন্ত উঁচুকরে করা হয়। গরীবদের বাড়িতে একটা কি দু'টো শোবার ঘর, তার সঙ্গে রান্নাঘর, আর গরু ও ছাগল রাখার ঘর। বেশির ভাগ বাড়িতে শোবার ঘরের এক পাশে ছাগল রাখার ব্যবস্থা থাকে। ইদানীং গরীব মধ্যবিত্তদের মধ্যে পাটকাঠির সাহায্যে ঘরের চাল ছাওয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তবে মধ্যবিত্তরা বেশির ভাগ সময় পাটকাঠির সাহায্যে গোয়ালঘর ছাইয়ে নেয়।

জলপাইগুড়ি ও কুচবিহার জেলার আরেক উপজাতি হল **রাভা**।এদের বাড়ি পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা (চিত্র 1.4.11 দঃ) ও রাস্তার বিপরীত দিকে মুখ করে তৈরি করা হয়। বাড়ির বাইরে থেকে ভেতের প্রবেশ করলে প্রথমেই পড়বে বারান্দা। তারপর একে একে শোবার ঘর, রান্নাঘর ও গোয়ালঘর। অবস্থাপন্ন ও শিক্ষিত রাভা ছাড়া অন্যদের বাড়িতে জানালা থাকে না।

বারিন্দ ঃ মালদহ ও পশ্চিম দিনাজপুরের কিছু অংশ নিয়ে গঠিত এই ভৌগোলিক অঞ্চলে বাড়ির দেওয়াল মাটির পুরু প্রলেপ দিয়ে তৈরি করা হয়। পশ্চিম দিনাজপুরের মাটিতে বালির ভাগ বেশি থাকে বলে দেওয়াল তৈরিতে কঞ্চি বা মূলী বাঁশ ব্যবহার করা হয়। চাল খড়ের তৈরি। ছাদের পাটাতন বাঁশের তৈরি। তাতে মাটির প্রলেপ দেওয়া হয়। আজকাল অবশ্য ছাদ তৈরিতে টিন ও টালির খুব চল হয়েছে যা 15/20 বছর আগে দেখা যেত না। ঘরের চারপাশ দিয়ে থাকে দেওয়াল, মাঝখানে রয়েছে উঠান। বাড়ি থেকে বেরুবার একটাই পথ। এখানকাব সাঁওতালরা মোটা দানার মাটি দিয়ে বাড়ি তৈরি করে। প্রথমে গোবর ও খড়ের টুকরোর সঙ্গে মাটি মিশিয়ে এক একটা তাল তৈরি করা হয়। তারপর একটার পর একটা তাল চাপিয়ে দেওয়াল গাঁথা হয় যাতে ঘরগুলো ঠাণ্ডা থাকে। বাড়ি তৈরিতে কাঠের ব্যবহার খুব কম দেখা যায়। শোবার ঘরে দরজা ও ছোট জানালও থাকে। এতে ঘরে আলো আসা ছাড়াও শীতের দিনে ঘর গরম ও গরমের দিনে ঘর ঠাণ্ডা থাকে। প্রত্যেক বাড়ি স্বয়ংসম্পূর্ণ। বাড়িতে থাকে বৈঠকখানা, উঠান, শোবার ঘর, রান্নাঘর, গোয়ালঘর, শূয়োরের খোঁয়াড় ও ধান মাড়াইয়ের জায়গা। বাড়ির চারপাশে থাকে দেওয়াল, সামনেটা থাকে খোলা। এখানে লোকেরা সন্ধ্যাবেলায় গল্পগুজব করে। অনেক সময় দেওয়ালের নীচের অংশ সামনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বসার জন্য বেঞ্চির মত করা হয়। গোটা বাড়িটা এমনকি ধান মাড়াইয়ের জায়গাটাও লেপা হয়। এছাড়া সুন্দর চিত্র এঁকে বাড়িকে সাজানো হয়।

বাগড়ী ঃ নদীয়া, মুর্শিদাবাদ ও উত্তর চব্বিশ পরগনা নিয়ে গঠিত। বাগড়ী অঞ্চলে (অর্থাৎ ভাগীরথী

নদীর পূর্বপাড়) দু'কামরার একতলা বাড়ি বেশি দেখা যায়। আবার শোবার ঘর, রান্নাঘর, গোয়ালঘর, বৈঠকখানা নিয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ বাড়িও রয়েছে। মুর্শিদাবাদের পূর্ব দিকে অর্থাৎ রানিনগর, ডোমকল ও জলঙ্গী (থানা) এলাকার দিকে যতই যাওয়া যায়, ততই মাটির দেওয়ালওয়ালা বাড়ির সংখ্যা কমতে থাকে, কারণ এদিকের মাটিতে বালির ভাগ বেশি থাকায় তা দেওয়াল তৈরির পক্ষে অনুপযুক্ত। তার বদলে বাঁশ ও পাটকাঠি দিয়ে দেওয়াল তৈরি হয়। তার ওপর পাতলা একের মাটির পলেস্তারা দেওয়া হয়। ইউ পোকার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য দেওয়ালে চুণ দিয়ে রং করা হয়। বাগড়ী অঞ্চলের বাড়িতে উঠান আছে, তবে অনেক ক্ষেত্রে বাড়ির চারদিকে ঘেরা থাকে না। গণ্যমান্য মুসলমানরা 'পর্দা' প্রথার কড়াকড়ি মেনে চলে। এজন্য বাড়ির চারপাশে বাঁশের কঞ্চি দিয়ে দেওয়াল বানানো হয়। বাগড়ী অঞ্চলে বন্যা ও বিষাক্ত সাপের ভয়ে বারান্দা 1 মিটার থেকে 1·5 মিটার পর্যন্ত উঁচু করা হয়। এখানকার অনেক বাড়িতেই জানালা থাকে না। পায়খানার ব্যবস্থা নেই। এ প্রসঙ্গে বলা দরকার যে বাগড়ীর বেশির ভাগবাসিন্দাই বাংলাদেশ থেকে এসেছে এবং এখানও আসছে। এদের অনেকেই আবার খালি হাতে চলে এসেছে। একটা বা দু'টো ঘর নিয়ে তারা কোনরকমে দিন কাটিয়ে দেয়। একটু যারা অবস্থাপন্ন, তাদের বাড়িতে তিন চারটে ঘর থাকে—রান্নাঘর, উঠোন, গোয়ালঘরেরও ব্যবস্থা থাকে। পুরনো বাসিন্দাদের কিছু কিছু পাকাবাড়ি আছে। এখানে বাড়ির লাগোয়া বাগানও রয়েছে। নতুন গ্রামেও পাকাবাড়ি দেখা যায়। বন্যার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য অনেকে পাকাবাড়ি তৈরি করেছে।

পদ্মার চর এলাকার বাসিন্দারা অস্থায়ী কুঁড়েঘর বানায়। কিছুটা অভাবের দরুন এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বন্যার ভয়ে এরা হাল্কা চাল ও হাল্কা দেওয়ালের কুঁড়েঘর বানায়। বন্যার জল ঘরে ঢুকলেই এগুলো সরিয়ে দিয়ে উঁচু জায়গায় চলে যায় আবার বন্যার জল সরে গেলে আগের জায়গাতে কুঁড়েঘর সমেত ফিরে আসে (Gastrell, 1860)।

এখানকার **কালান্তর** অঞ্চলে (মুর্শিদাবাদের বেলডাঙ্গা) ও নওদা থানার পূর্ব দিক এবং নদীয়া জেলার উত্তর দিকের কিছু অংশে) বছরের প্রায় পাঁচ মাস বন্যার জল জমে থাকে বলে বাড়ি উঁচু করে তৈরি করা হয়। বাড়ির লাগোয়া জমি থেকে মাটি তোলা হয় বলে সেইস্থান ডোবাতে পরিণত হয়। কালান্তরে বাড়ি ও ডোবার পাশাপাশি অবস্থান এক অতি সাধারণ দৃশ্য (Sen & Sen, 1989)। এখানে বন্যার ভয়ে বেশ কিছু পাকা বাড়ি তৈরি হয়েছে। সাধারণ লোকেরা মাটির দেওয়াল ও খড়ের চাল দিয়ে বাড়ি বানায়। এখানকার মাটি (এঁটেল মাটি) খুব শক্ত বলে তা দেওয়াল তৈরির পক্ষে উপযুক্ত।

রাঢ় ঃ ভাগীরথীর পশ্চিম পাড় অর্থাৎ মুর্শিদাবাদের পশ্চিম দিক ও বীরভূম জেলা নিয়ে গঠিত এই অঞ্চলের চটচটে এঁটেল মাটি দেওয়াল তৈরির পক্ষে বিশেষ উপযোগী। এখানে প্রচুর তাল গাছ জন্মায় বলে তা ছাদের পাটাতন তৈরিতে ব্যবহার করা হয়। মাটিকে একটার পর একটা স্তর করে দেওয়াল গাঁথা

হয়। দেওয়াল সাধারণতঃ 5 মিটার উঁচু করা হয়। আর 0·4 মিটার থেকে 0·6 মিটার (1·5 ফিট থেকে 2 ফিট) চওড়া করে গাঁথা হয়। বাতাসের সংস্পর্শে এসে মাটি পাথরের মত শক্ত হয়ে যায়। তার ফলে একটা দেওয়াল 70/80 বছর পর্যন্ত টিকে যায়, যদি ঐ দেওয়ালের মাথায় খড়ের চাল থাকে। অনেক সময় দেওয়াল তৈরিতে ইঁট ব্যবহার কবা হয়। দেওয়াল তৈরিতে ঘেঁষ বা মাটি ব্যবহার করা হয়। দেওয়াল তৈরি হয়ে গেলে তার ওপর পুরু করে মাটির প্রলেপ দেওয়া হয় (Sen & Bhattacharyya, 1957)। খড় দিয়ে ঘরের ছাউনি দেওয়া হয় বলে ঘর ঠাণ্ডা থাকে। এখানকার ঘরের চাল হাতীর পিঠের মত দেখতে হয়। দেওয়াল ও ঘরের মাঝে থাকে উঠান। এখানে ধান সেদ্ধ মড়াই ও শুকানো ছাড়াও বাড়ির অন্যান্য কাজকর্ম হয়। বাড়ির বাইরে বারান্দা থাকে। এখানে বন্ধুবান্ধব ও অতিথিরা এসে বসে।

সচারাচর একটা বাড়িতে চারটে ঘর থাকে—বড় ঘরটা বসবাসের জন্য, অন্যান্য ছোট ঘরগুলোর কোনটাতে চাষবাসের সরঞ্জাম থাকে। কোনটাতে বা রান্না হয়। রান্নাঘরটা বড় ঘর থেকে একটু দূরে রাখা হয় যাতে ধোঁয়া সেখানে না যেতে পারে। অবস্থাপন্ন গৃহস্থ চাষীদের বাড়িতে ঢেঁকিশাল ও গোয়ালঘর থাকে। গোয়ালঘরের পাশে থাকে গোলা বা মরাই। বাঁশের তৈরি এই মরাই দেখতে শঙ্কুর মত হয়। এখানে সারা বছরের ধান মজুত থাকে। মরাই থেকে একটু দূরে গোবর রাখার জন্য খড়ের পলুই থাকে। রান্নাঘরের পেছনে থাকে আস্তাকুঁড়। এখান থেকে ভূ-স্বামী তার ক্ষেতের সার সংগ্রহ করে।

রাঢ়ের সংঘবদ্ধ গ্রামে দোতলা বা তেতলা বাড়ি দেখা যায়। দোতলা বাড়ির একতলায় রান্না করা হয়। এছাড়া বিভিন্ন জিনিষ রাখা হয়। দোতলায় শোওয়া হয়। অনেক বাড়ির দোতলায় বারান্দা থাকে। সঙ্গতিসম্পন্ন চাষীরা আটচালা বাড়ি তৈরি করে। এই ধরনের উঁচু বাড়ি তৈরির কারণ হল স্থানাভাব ও গরমের অসহ্য তাপ থেকে রক্ষা পাওয়া। অধিকাংশ বাড়ি দক্ষিণমুখী যাতে হাওয়া পাওয়া যায়। অন্যান্য স্থানের মত এখানকার সাঁওতালরা বাড়ি তৈরির জন্য উঁচু ও শুকনো জায়গা বেছে নেয়। সাঁওতালদের বাড়িতে শোবার ঘর, ভাঁড়ার ঘর, শূয়োরের খোঁয়ার ও মুরগীর ঘর থাকে। সাঁওতাল সমাজের প্রধানের (মাঝী) বাড়ি গ্রামের মাঝখানে থাকে।

বর্ধমান ঃ এই জেলার পূর্বদিকের বাড়িগুলোর আলাদা কোন বৈশিষ্ট্য নেই। অবস্থাপন্নদের একটা শেবার ঘর, একটা রান্নাঘর, একটা বৈঠকখানা, একটা গোয়ালঘর, ঠাকুরঘর, ধান রাখার মরাই আছে। প্রত্যেক বাড়িতে তুলসীমঞ্চ ও ঠাকুরঘর থাকবেই। বাড়ির মাঝখানে থাকে উঠান। বাড়ির প্রথম অংশটি হল বৈঠকখানা, রান্নাঘরের পেছনে থাকে সব্জিবাগান। সাধারণতঃ বাড়ির চারধার দিয়ে মাটির প্রাচীর দেওয়া হয়।

বাড়ির দেওয়াল মাটির তৈরি হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে বাঁশের কঞ্চি দিয়ে বেড়ার দেওয়াল হয়। এখানকার চার চালা ছাদ খড় বা টিনের তৈরি হয়। একটু অবস্থাপন্নদের শোবার ঘরে দু' একটা জানালা

থাকে। গরীব লোকদের একটাই শোবার ঘর থাকে। তার সঙ্গে থাকে একটা বারান্দা। এখানে রান্নাবান্না হয়। জেলার পশ্চিমাংশে কয়লাখনি রয়েছে। এখানে খাপড়ার চাল ও ইঁটের দেওয়ালের বাড়ি দেখা যায়।

বাঁকুড়াঃ এই জেলার অধিকাংশ বাড়ি মাটির তৈরি। দেওয়াল তৈরিতে মাটির সঙ্গে তুষ মেশানো হয়। তবে একতলার বাড়ির দেওয়াল তৈরিতে মাটির সঙ্গে তুষ মেশানো হয় না। অনেক একতলা বাড়ির ছাদ টালির তৈরি। অধিকাংশ বাড়ির ভিত এক মিটার পর্যন্ত উঁচু হয়। মেঝে তৈরিতে মাটির সঙ্গে ছোট ছোট পাথরের টুকরো মেশানো হয়। ফলে মেঝে খুব শক্ত থাকে। এখানকার তিনতলা বাড়িগুলো মাটির তৈরি। এখানকার মাটি এমনিতেই খুব শক্ত। বাড়ির ছাদ খড়ের তৈরি হয়। একতলা হোক বা দোতলা হোক প্রতি বাড়িতেই জানালা থাকে। এখানকার তিনতলা বাড়িগুলো মাটির তৈরি। এখানকার মাটি এমনিতেই খুব শক্ত। বাড়ির ছাদ খড়ের তৈরি হয়। একতলা হোক বা দোতলা হোক প্রতি বাড়িতেই জানালা থাকে। একতলা বাড়ির ক্ষেত্রে ছাদের কিছুটা নীচে ছোট মাপের জানালা থাকে। তেতলা বাড়ির একতলার উঠানের দিকে জানালা থাকে। চুরির ভয়ে এইভাবে জানালা তৈরি করা হয়। দোতলা বা তেতলা বাড়ির একতলায় রান্নাঘর ও ভাঁড়ার ঘর থাকে। সচরাচর দোতলায় শোওয়া হয়। আর তেতলায় দামী জিনিস রাখা হয়। একতলা বাড়িতে সাধারণতঃ তিন চারটে ঘৰ থাকে। দু'টো শোবার ঘর, রান্নাঘর, ভাঁড়ার ঘর, গোয়ালঘর। বাড়ির মাঝখানে থাকে উঠান। একতলা হোক বা তেতলা হোক প্রত্যেক বাড়ি ঘিরে মাটির দেওয়াল তৈরি করা হয়।

মেদিনীপুর ঃ এখানকার মধ্যবিত্তদের অধিকাংশের বাড়ি ঘিরে চাল খড়ে ছাওয়া থাকে। ইদানীং কিছু কিছু বাড়ির ছাদ টালি ও এ্যাসবেসটস্ দিয়েও তৈরি হচ্ছে। উপকূল অঞ্চলের বাড়ির ছাদ গরান কাঠের তৈরি হয়। তার ওপর মাটিব প্রলেপ দিয়েও তৈরি হচ্ছে। উপকূল অঞ্চলের বাড়ির ছাদ গরান কাঠের তৈরি হয়। প্রায় বাড়িতে দুটো শোবার ঘর, একটা রান্নাঘর, একটা গোয়াল ঘর একটা কি দুটো গোল ঘর থাকে। বাড়ির চারপাশে এগুলো তৈরি করা হয়। বাড়ির ভিত প্রায় এক মিটার উঁচু করা হয়। কারণ এই জেলার পূর্বাংশে বেশি বৃষ্টি হয়। শোবার ঘরের দেওয়ালে বাঁশের তৈরি। রান্নাঘর ও গোয়াল ঘরের দেওয়াল মাটির তৈরি। ধান রাখার জন্য প্রত্যেক বাড়িতে সামনে কিছু ফাঁকা জায়গা থাকে। এখানকার কিছু কিছু বাড়ি দোতালা/তেতলা পর্যন্ত হয়। দোতলার সামনের দিকে বারান্দা থাকে। এখানে পাট, ডাল ইত্যাদি শুকতে দেওয়া হয়। আবার পড়ুয়ারা পড়াশুনো করে। পুরুলিয়ার কতো মেদিনীপুরের পশ্চিমাংশেও অনেক উপজাতির বাস। যেমন ভূমিজ পরিবারে গড়ে 2/3টি ঘর থাকে। দুই বাড়ির মধ্যে একটু ফাঁক থাকে। মাটির তৈরি বাড়ির ভিত 1·5 ফুট থেকে 2 ফুট (0·5-0·6 মিটার) পর্যন্ত উঁচু হয়। দু'ধরনের দেওয়াল এরা তৈরি করে। এক ধরনের দেওয়াল মাটির, আর এক ধরনের দেওয়াল ডালপালার তৈরি। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ডালপাতার ওপর মাটির প্রলেপ দেওয়া হয়। যে সব অঞ্চলে বন আছে সেখানে ব

সাধারণতঃ ডালপাতা দিয়ে দেওয়াল তৈরি হয়। বাড়িতে কোন জানালা নেই, তবে বাতাস চলাচলের জন্য আয়তাকার ছোট গর্ত থাকে। বাড়িগুলো সাধারণতঃ খুব নীচু করে তৈরি করা হয়।

লোধাদের বাড়িগুলো একটা থেকে আরেকটা দূরে দূরে বিচ্ছিন্নভাবে গড়ে ওঠে। এরা বেশ কিছু গোলকার বা ছুঁচালো চালওয়ালা আয়তাকার কুঁড়েঘর তৈরি করে। চাল খড়ে ছাওয়া হয়। এছাড়া কিছু দোচালা বাড়ি দেখা যায়। অধিকাংশের একটা করে ঘর থাকে। কোন জানালা বা বারান্দা থাকে না। বাড়িগুলো খুব নীচু, বাড়িতে প্রবেশ করতে গেলে মাথা নীচু করতে হয়। বাড়ির ভেতরে সূর্যকিরণ বা বাতাস আসতে পারে না বলে ঘর অন্ধকার থাকে। মেদিনীপুরের সবং থানার মধ্যেকার অংশ **(ময়না)** খুব নীচু। এই এলাকাটি প্রায় প্রতি বছরই বন্যার কবলে পড়ে। তাই এখানকার বাড়িগুলো আশপাশের ধান জমি থেকে প্রায় 3-4 মিটার উঁচু করে তৈরি করা হয়। এখানকার বাড়ির উপাদান মেদিনীপুরের পূর্বাংশের মত। তবে কিছু কিছু বাড়িতে টালির ছাদ ও ইঁটের দেওয়াল দেখা যায়।

পুরুলিয়া : এই জেলার গ্রামাঞ্চলে পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য গ্রামাঞ্চলের মতই খাপড়া ও টালির বাড়ি দেখতে পাওয়া যায়। শোবারঘর, রান্নাঘর ও গোয়ালঘর। আরেকদিকে থাকে খোলা একটা বাস্তু জমি। উঁচু সমতল এই জমিতে ভাদই ও রবিশস্য ফলানো হয়। ঐ তিনটে ঘরের যে কোন একটির পেছনে থাকে খামার বাড়ি—একটা খোলা জায়গাকে সাধারণতঃ মাটির দেওয়াল দিয়ে ঘিরে খামার বাড়ি বানানো হয়। বাড়ির পেছনের দেওয়াল সাধারণতঃ রাস্তার বিপরীতদিকে মুখ করে থাকে। বাড়ির দেওয়াল সাধারণতঃ রাস্তার বিপরীত দিকে মুখ করা থাকে। বাড়ির চাল 8 সে.মি. থেকে 23 সে.মি. পুরু হয়। চালের পাটাতন কাঠের তৈরি। খুঁটিগুলো শাল কাঠের, বাড়ির দেওয়াল সুন্দর করে চিত্রায়িত করা হয়। অনেক সময় দেওয়ালগুলোর নীচের অংশ সামনের দিকে বাড়ানো থাকে। তাতে করে বসার পাটাতন তৈরি হয়। পুরুলিয়ার পশ্চিমাংশে যত যাওয়া যায় ততই পাথরের দেওয়াল চোখে পড়ে। চাল খড়ের তৈরি। এই সব স্থানে কিছু কিছু ক্ষেত্রে খাপড়ার চাল দেখা যায়।

3.11 পৃথিবীর বিভিন্ন জলবায়ু অঞ্চলের গ্রামীণ বাড়ি ও তার নির্মাণ উপকরণ (Rural house and its building materials in different climatic regions of the world)

পরিবেশ মানুষের বসতির ওপর কি ধরনের প্রভাব ফেলে সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এবার আমরা লক্ষ্য করব জলবায়ুর পার্থক্য মানুষের বিভিন্ন ধরনের বৃত্তি (চিত্র 1.5.1) ও বাসস্থানের ওপর কিরূপ ছাপ ফেলে।

জীবন ধারণের তাগিদে মানুষ এমন কিছু অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছে যেখানে প্রতিনিয়তই তাকে

বিরুদ্ধ প্রকৃতির সাথে সমঝোতা করে চলতে হচ্ছে। আবার প্রকৃতি থেকে প্রাপ্ত সহজলভ্য উপকরণকে সে গৃহ নির্মাণের কাজে লাগাচ্ছে।

স্থায়িত্ব ও বৈচিত্র্যানুসারে পৃথিবীর বসত গৃহসমূহকে প্রধান চারটে অঞ্চলে ভাগ করা যায়—নিরক্ষীয় অঞ্চলের উপজাতিদের অরণ্য কুটীর, উষ্ণ মরু অঞ্চলের অস্থায়ী বাসগৃহ, নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের কাঠের বাড়ি ও মেরু প্রদেশের ঋতুভিত্তিক বাসগৃহ।

নিরক্ষীয় অঞ্চলের জনসংখ্যার এক বড় অংশ হল অরণ্যবাসী। দৈনন্দিন জীবনযাত্রার জন্য এরা অরণ্যের ওপর নির্ভরশীল। বনের ডালপালা দিয়ে দেওয়াল (চিত্র 1.5.2) ও তালজাতীয় গাছ বা ঘাস দিয়ে এরা বাড়ির চাল বানায় (চিত্র 1.5.3)। ভিজে ও স্যাঁতসাঁতে মাটি এবং বন্যজন্তুদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মাটি থেকে কিছুটা উঁচুতে হাল্কা বাড়ি বানায়। কাঠ ও বাঁশের ওপর মাচা তৈরি করে, এমন কি ক্ষেত্রবিশেষে গাছে মাচা করে এরা বাস করে, যেমন মালয়ের **সেমাং** বা সিংহলের **ভেদ্দা** সম্প্রদায় কিংবা আমাজন অববাহিকার **আমেরিণ্ডিয়ান**-রা। অধিকাংশ বাড়ি নদীর ধারে অথবা পানীয় জলের উৎসের কাছাকাছি গড়ে ওঠে। কোন কোন অঞ্চলে একটি বড় চারকোণা ঘরকে দরমার বেড়া দিয়ে ছোট ছোট প্রকোষ্ঠ বা কুঠুরীতে ভাগ করা অনেক পরিবার একত্রে বসবাস করে। মালয়ের **সাবা** ও **সারাওয়াক**-এর

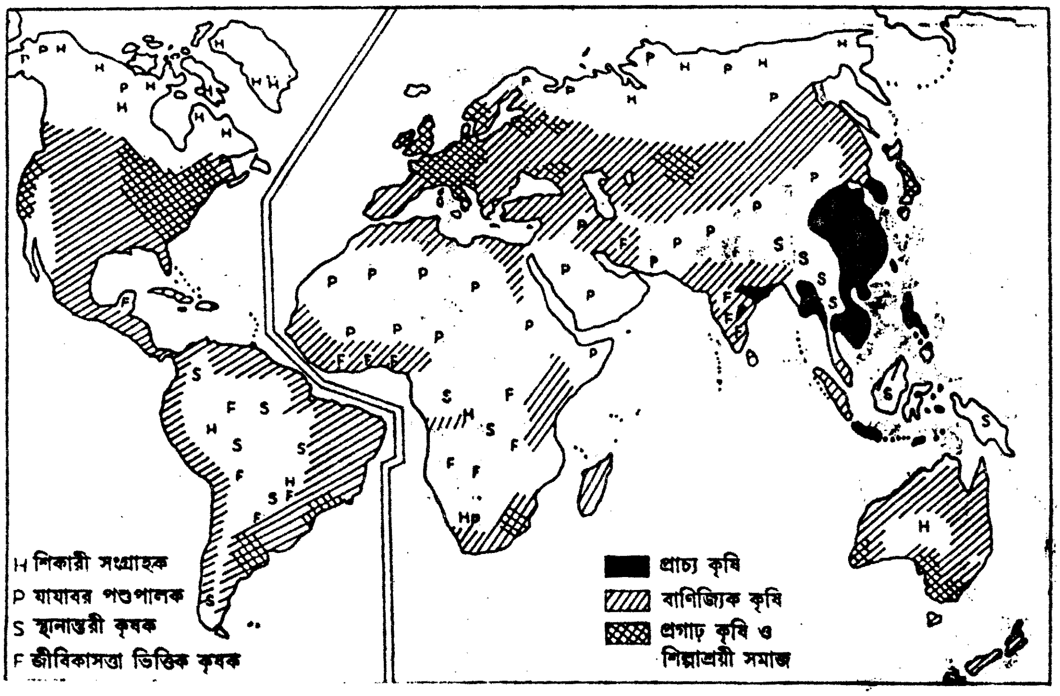

চিত্র 1.5.1 ঃ পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের বৃত্তি (Long & Rongen অবলম্বনে)

ঘন জঙ্গলে বসবাসকারী **ইবান**-রা একটা লম্বা বাড়ির মধ্যে প্রায় 50টি ছোট ছোট ঘরে (স্থানীয় নাম **বিলেক**) বাস করে। আফ্রিকার **পিগমী**-রা গাছের ডালপালা দিয়ে ছোট ছোট কুঁড়েঘর তৈরি করে। এগুলো দেখতে অনেকটা মৌচাকের মতন। এক একটি গ্রাম প্রায় 10-12টি বাড়ি দেখা যায়। নিরক্ষীয় অঞ্চলের অরণ্য পরিবেশে বসবাসকারী উপজাতিরা ঘাস ও পাতার সাহায্যে আদিম প্রথায় বাড়ি তৈরি করে। নিতান্তই সাদামাটা এইসব বাড়ি উপজাতিদের আর্থিক অসচ্ছলতাকে তুলে ধরে। মরু বাসিন্দারা মুখ্যতঃ যাযাবর এবং আংশিকভাবে কৃষক। ঘাসের সন্ধানে ঘুরে বেড়াতে হয় বলে এদের বাসস্থান অস্থায়ী। পশুর লোম ও চামড়া দিয়ে তৈরি তাঁবুতে এদের বাস। কালাহারির **বুশম্যান** বা অন্যান্য উপজাতিরা কাঁটাগাছের সাহায্যে তৈরি অস্থায়ী কুঁড়েঘরে বাস করে। পশ্চিম এশিয়ার মরু ও মরুপ্রায় অঞ্চল হল প্রাচীন সভ্যতার কেন্দ্রবিন্দু। এদের গৃহসজ্জা ও রুচির মধ্যে তার পরিচয় মেলে। কে কোন সচ্ছল আরববাসীরা তাঁবুর অভ্যন্তর তার শিল্পী মনের পরিচয় দেয়। এদের তাঁবুর মেঝেতে গালিচা পাতা থাকে। মেঝের একধারে গালিচা ও তাকিয়া সমন্বিত শয্যা থাকে যা গৃহস্বামী ও তার আতিথি অভ্যাগতরা ব্যবহার করে থাকে (ভট্টাচার্য ও ভট্টাচার্য, 1977)। একটু নিম্নবিত্ত বেদুইনরা হল প্রকৃত মরুবাসী। এরা প্রায়শই স্থান পাল্টায়। তাঁবুর দৈন্যদশা থেকে বোঝা যায় যে এদের জীবনে বৈচিত্র ও সৌন্দর্য প্রিয়তার স্থান খুব কম। আরবদেশের উৎকৃষ্টও নিকৃষ্ট বাসগৃহ সেখানকার অর্থনৈতিক বৈষম্যকেই নির্দেশ করে। উৎকৃষ্ট বাড়ির দেওয়াল মজবুত। দেওয়ালে সুন্দর সুন্দর কাঠের কাজ থাকে। সাদা রঙের গম্বুজাকৃতি মসজিদ এখানকার উচ্চবিত্তের গৃহের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। নলখাগড়া ও মাজির তৈরি নিকৃষ্ট বাড়ির চাল সমতল হয়।

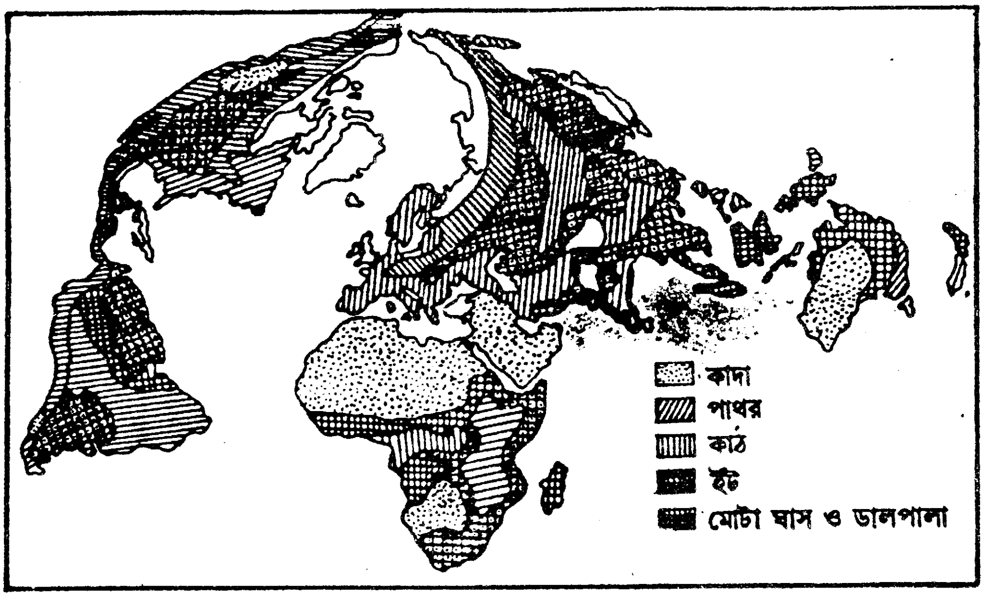

চিত্র 1.5.2 ঃ পৃথিবীর বিভিন্নাঞ্চলের বাড়ির দেওয়াল তৈরির উপকরণ (Negi অবলম্বনে)

এবার আমরা নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের বাসগৃহ নিয়ে আলোচনা করব। উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপের উত্তর দিকের অরণ্য পরিবেশের ওপর নির্ভরশীল মানুষ সনাতনী ধারাকে অনুসরণ করে আজও কাঠের গুঁড়ি দিয়ে বাড়ি তৈরি করে (চিত্র 1.5.7)। যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে এইসব বাড়িতে কাঠের গুঁড়ি বা কাঠ নির্বাচন করা হয়। আগুনের ভয় থাকা সত্ত্বেও অর্থনৈতিক কারণ এবং সহজলভ্য বলেই এই ধরনের লম্বা

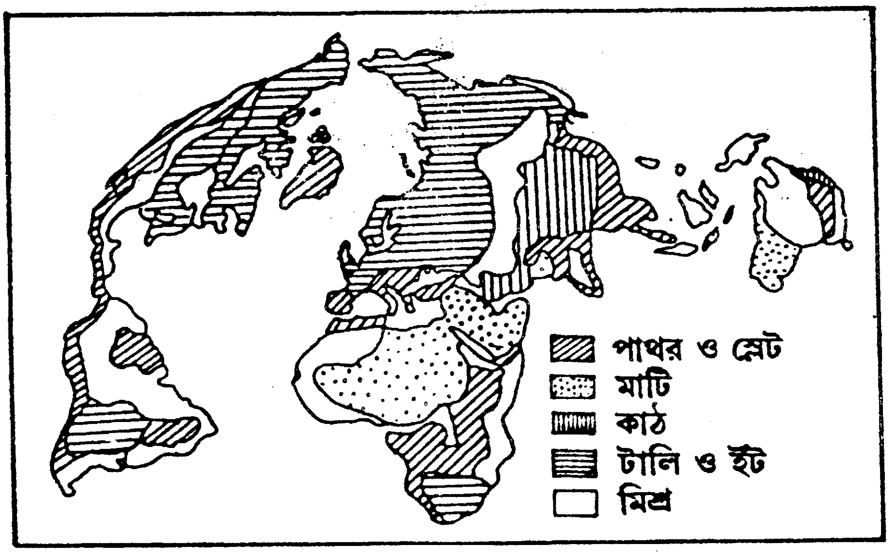

চিত্র 1.5.3 ঃ পৃথিবীর বিভিন্নাঞ্চলের বাড়ির ছাদ তৈরির উপকরণ (Negi অবলম্বনে)

কাঠ এখানকার বাড়িগুলোতে ব্যবহার করা হয়। মসৃণ পাথর বা নল, শর ইত্যাদি দিয়ে এখানকার বাড়ির চাল বসানো হয়। কিন্তু ভূমধ্যসাগরীয় অরণ্য অঞ্চলে কাঠের বাড়ি খুব একটা চোখে পড়ে না। তার কারণ হল এখানে কাঠের চাইতে পাথর খুব সহজলভ্য। দ্বিতীয়ত কাঠের বাড়িতে সহজে আগুন লাগে। এখানকার স্পেন, হার্জেগেভিনা, দক্ষিণ ফ্রান্স, গ্রীস, টিউনিসিয়া ও আলজিরিয়ার পার্বত্য অঞ্চলের প্রায় সর্বত্রই বহুবিধ সুন্দর সুন্দর পাথরের বাড়ি চোখে পড়ে। প্রধানতঃ অর্থনৈতিক কারণ এবং অধিবাসীদের সৌন্দর্যবোধের অভাব হেতু পৃথিবীর সর্বত্র পাথরের তৈরি বাড়ির গঠন প্রণালী অধিবাসীদের সৌন্দর্যবোধের অভাব হেতুর পৃথিবীর সর্বত্র পাথরের তৈরি বাড়ির গঠন প্রণালী এক নয়। আফ্রিকা এশিয়া ও দক্ষিণ আমেরিকার অনুন্নত পরিবেশে গড়ে ওঠা নিম্নমানের প্রস্তর কুটির ওই সব মহাদেশের বাসিন্দাদের নৈপুণ্য ও সৌন্দর্যবোধের অভাবকে নির্দেশ করে।

মেরুপ্রদেশে এস্কিমোদের ঋতু অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন বাসগৃহ নির্মাণে এক ঐতিহ্যের ধারা আজও সমান তালে চলে আসছে। খাদ্যসংগ্রহের জন্য সমুদ্রের ওপর বেশি নির্ভর করতে হয় বলে এস্কিমোরা সমুদ্রের ধারে এমন উঁচু খাড়া পাড়কে (Cliff) বেছে নেয় যাতে কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়ার হাত থেকে রক্ষা পাওয়

যায়। গ্রীষ্মকালে পাথর, ঘাসের চাপড়া, চামড়া ও ভেসে আসা কাঠ দিয়ে দেওয়াল এবং সীল ও সিন্ধুঘোটকের চামড়া দিয়ে তৈরি চালের ঘরে এরা বাস করে। সেগুলো দেখতে গম্বুজের মতো বা উল্টানো বাটির মতো। ঘরে প্রবেশ পথটি সুড়ঙ্গের মতো দেকতে হয় যাতে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকতে হয়। এরূপ ঘর তৈরির ধারণা তারা সীল মাছের কাছ থেকে পেয়েছে। শীতকালে বরফের নীচে শ্বাসকার্য চালাবার জন্য মাছের শ্বাসরন্ধ্র (breathing hole) রেখে তার ওপর বরফের ফাঁপা গম্বুজ তৈরি করে। এটির ইগলু নামে পরিচিত।

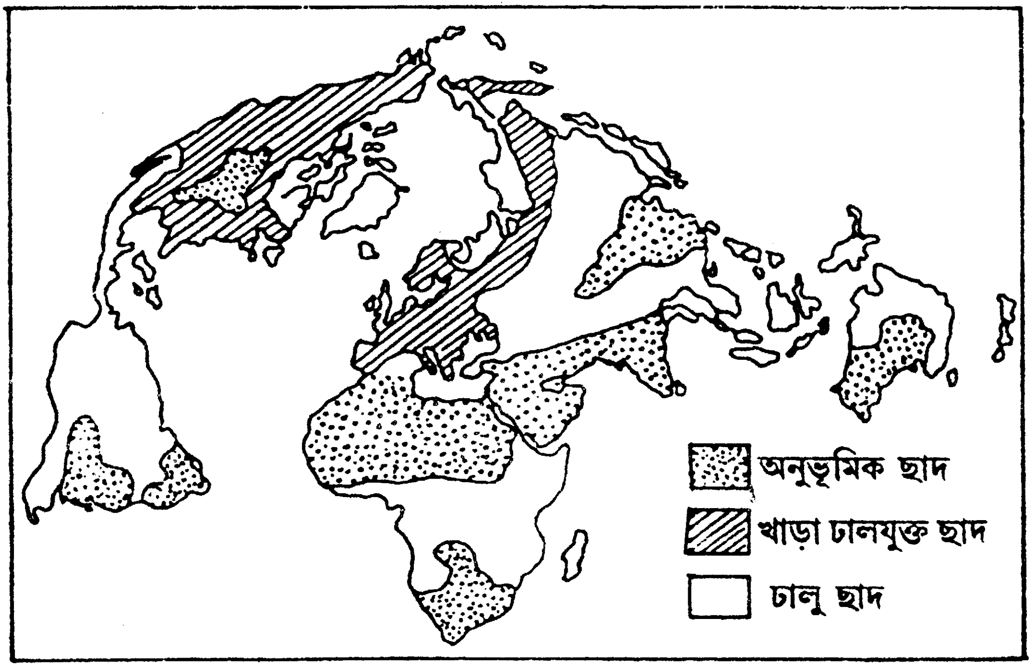

চিত্র 1.5.4 ঃ পৃথিবীর বিভিন্নাঞ্চলের বাড়ির ছাদের ধরন (Negi অবলম্বনে)

এতক্ষণ আমরা পৃথিবীর চারটি জলবায়ু অঞ্চলের ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে মানুষের জীবনযাত্রা প্রণালী (চিত্র 1.5.1) ও সেখানকার বাসগৃহ নিয়ে আলোচনা করলাম। এর থেকে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আমাদের চোখে ধরা পড়ে। তা হল পরিবেশ মানুষের বাসগৃহ নির্মাণে অনেকখানি প্রভাব ফেলেছে (চিত্র 1.5.4)। বেঁচে থাকার তাগিদে মানুষ বিভিন্ন পরিবেশে নিজেকে খাপ খাইয়ে ও সেখানকার সমস্ত প্রতিকূলতাকে উপেক্ষা করে বাস করে চলেছে। প্রকৃতির নিষ্করুণ হাত থেকে বাঁচার জন্য একমাত্র প্রবেশ দ্বারা ছাড়া গৃহে আলো বাতাস চলাচলের অন্য কোন ব্যবস্থা নেই, যেমন মরু ও মেরু উভয় অঞ্চলেই। আবার অনুকূল জলবায়ু অঞ্চলে বাড়িতে আলো বাতাস চলাচলের জন্য ব্যবস্থা রাখা হয়। তেমনিভাবে স্যাঁতসেঁতে মাটি বা জন্তু জানোয়ারের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মাটি থেকে উঁচু করে মাচা তৈরি করে কিংবা গাছের ডালে

বাড়ি বানানো হয়। প্রকৃতি প্রদত্ত বস্তুকে সে তার বাড়ি তৈরির উপকরণ হিসেবে কাজে লাগিয়েছে। কোথাও গৃহ নির্মাণের মধ্য দিয়ে তার শিল্প নৈপুণ্য, সৌন্দর্য চেতনা ফুটে উঠেছে। আবার কোথায় তার একান্ত অভাব। উন্নত দেশগুলোতে সভ্যতার ছোঁয়া বাড়ি তৈরির ওপর ছাপ ফেলেছে। অনুন্নত দরিদ্র পরিবেশে গড়ে ওঠা বসত গৃহ নিতান্তই সাদামাটা ও সেখানকার পরিবেশও স্বাস্থ্যসম্মত নয়।

গৃহনির্মাণের বাহ্যিক গঠন ও গৃহনির্মাণের উপকরণের ভিত্তিতে পৃথিবীর বসতসমূহকে মোটামুটি চারভাগে ভাগ করা যায় (চিত্র 1.5.5) ঃ—

পাথরের বাড়ি ঃ

উত্তর আমেরিকা এবং ইউরোপের উত্তর দিক ছাড়া গোটা আল্পস্-হিমালয় পার্বত্য অঞ্চলকে আমরা এর অন্তর্ভুক্ত করতে পারি। পৃথিবীর এই অঞ্চলে বাড়ি তৈরির প্রধান উপাদান হল পাথর। গ্রানাইট, শ্লেট, সিস্ট্ বাড়ি তৈরিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়। এছাড়া বাড়ি তৈরিতে চুনাপাথরের চল আছে। জলবায়ু ও স্থানীয় অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বাড়ি তৈরিতে কিছুটা পার্থক্য ঘটে। আল্পস্-হিমালয় অঞ্চলের বাড়িগুলোর ঢালু ছাদ শ্লেট পাথরের তৈরি (চিত্র I. 5.6)। যেখানে শ্লেট পাথর পাওয়া যায় না, সেখানে বড় বড় পাথরের টুকরাগুলোকে যতদূর সম্ভব সরু সরু করে কেটে ছাদ তৈরির কাজে লাগানো হয়। আল্পস্-হিমালয় অঞ্চলে বাড়ির ছাদ দু'দিকে ঢালু হয়। অন্যত্র গৃহের চাল খড় বা টালির তৈরি হয়। পশ্চিমী দেশগুলো ছাড়া অন্যত্র গৃহে বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা থাকে না বললেই চলে।

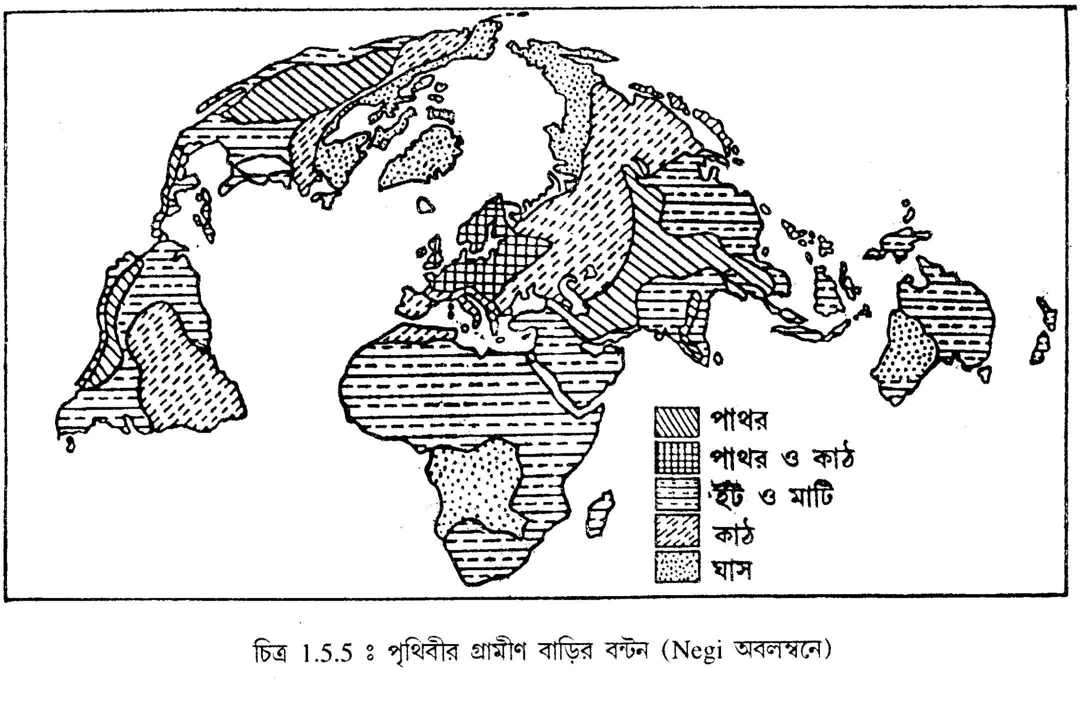

চিত্র 1.5.5 ঃ পৃথিবীর গ্রামীণ বাড়ির বন্টন (Negi অবলম্বনে)

কাদা বা ইটের তৈরি বাড়ি ঃ

ভারতবর্ষের উত্তরের সমভূমি, চীন, দক্ষিণ-পশ্চিম ইউরোপ, দক্ষিণ আমেরিকার পূর্বাংশ ও উত্তর আমেরিকার মধ্যাংশের এক বিস্তীর্ণ এলাকায় কাদা ও ইঁট দিয়ে বাড়ি তৈরি করা হয়। ভারতবর্ষ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মাটির তৈরি বাড়ি এক অতি পরিচিত দৃশ্য। দক্ষিণ আমেরিকাতেও এই বাড়ি যথেষ্ট দেখা যায়। পৃথিবীর মরু অঞ্চলেও মাটির বাড়ির চল আছে। কিছু কিছু মাটি আছে (যেমন বীরভূমের লাল মাটি) যা দিয়ে বাড়ি তৈরি করলে 180 বা 200 বছরেও বাড়ির কোন ক্ষতি হয় না। কোন কোন মাটিতে কাঁকরের ভাগ বেশি থাকে। এসব মাটির বাড়িও খুব পাকাপোক্ত হয়। উত্তর ভারতে টালি ও পূর্ব ভারতে খড়ের চাল দেখা যায়। আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকায় টালির ছাদ, উত্তর আমেরিকা ও ভূমধ্যসাগরীয় দেশগুলোতে এ্যাসবেসটসের ছাদ দেখতে পাওয়া যায়।

চিত্র 1.5.6 ঃ পাথরের কুটীর (পর্তুগাল) (ভট্টাচার্য ও ভট্টাচার্য অবলম্বনে)।

কাঠের বাড়ি ঃ

যেখানে কাঠ যথেষ্ট সংখ্যায় পাওয়া যায় সেখানে কাঠ দিয়ে বাড়ি তৈরি হয়। আমরা আগেই লক্ষ্য করেছি যে সরলবর্গীয় বনাঞ্চলে অর্থাৎ উত্তর আমেরিকার ও ইউরেশিয়ার উত্তর দিকে এই ধরনের বাড়ি যথেষ্ট সংখ্যায় দেখা যায়। লম্বা লম্বা গাছের গুঁড়ি চিরে এখানে বাড়ি (Log house) তৈরি হয় (চিত্র 1.5.7) চীন-তিব্বত সীমান্তে ও পশ্চিম-হিমালয় অঞ্চলেও কাঠের বাড়ি দেখা যায়। উভয় অঞ্চলেই যুগ যুগ ধরে সুন্দর কাঠের বাড়ি তৈরিতে কাঠের ব্যাপক প্রচলন আছে। তাছাড়া এখানকার জমি অসমতল বলে কাঠের খুঁটি পুঁতে তার ওপর কাঠ বা বাঁশের

চিত্র 1.5.7 ঃ কাঠের সুন্দর কুটীর (ভট্টাচার্য ও ভট্টাচার্য অবলম্বনে)

মাচা করে ঘর তোলা হয়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অরণ্যময় দ্বীপগুলোতে কাঠের খুঁটি এমনকি গাছের ওপর মাচা করে বাড়ি তৈরি করা হয়।

3.12 প্রশ্নাবলী

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

1. গ্রামীণ বসতি গড়ে ওঠার ওপর প্রাকৃতির পরিবেশের প্রভাব বর্ণনা কর।
2. বসতির সংজ্ঞা দাও। এবং বসতির শ্রেণীবিভাগ আলোচনা কর।
3. কার্যাবলীর ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে বসতির শ্রেণীবিভাগ কর।
4. কার্যাবলী, স্থায়িত্ব এবং আয়তনের ভিত্তিতে বসতির শ্রেণীবিভাগ।
5. গ্রামবসতির বিবর্তনের ধারাটি উপস্থাপন কর।
6. গ্রামীণ বসতির প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর।
7. গ্রামবসতির আয়তন এবং আকৃতিগত বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর।
8. গ্রামীণ বসতির ওপর প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব কিরূপ?
9. গ্রামীণ বসতি বিন্যাসে ভূ-প্রকৃতির প্রভাব নিরূপণ কর।
10. গ্রামবসতির কর্মভিত্তিক শ্রেণীবিভাগ আলোচনা কর।
11. বিক্ষিপ্ত বসতি কি কি ধরনের হতে পারে? বিক্ষিপ্ত বসতি গড়ে ওঠার কারণ বিশ্লেষণ কর।
12. গ্রামীণ বসতির কায়িক গঠন (morphology) বর্ণনা কর।
13. গোষ্ঠীবদ্ধ বসতি কি কি প্রকার হতে পারে? গোষ্ঠীবদ্ধ জনবসতি গড়ে ওঠার কারণ আলোচনা কর।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

1. অবস্থান (Site) সম্বন্ধে যা জান লেখ।
2. নগর ও গ্রামীণ বসতির মধ্যে পার্থক্য আলোচনা কর।
3. জনবসতির বিবর্তন (evolution) উদাহরণসহ লেখ।
4. গ্রামবসতি ও পৌরবসতির পার্থক্য নির্দেশ কর।
5. অস্থায়ী বসতি কি ধরনের হয়?
6. ক্ষুদ্র বিক্ষিপ্ত বসতি কি ধরনের হয়?

7. শহর ও নগরের মধ্যে পার্থক্য কি?

8. অস্থায়ী থেকে স্থায়ী গ্রামবসতি কিভাবে গড়ে ওঠে?

9. উপজীবিকায় পরিবর্তনের প্রভাব কিভাবে বসতিতে প্রভাবিত করে।

10. গ্রামবসতির বৃহদায়তন কিভাবে হয়?

11. অণুকেন্দ্রিক গ্রামবসতির প্রকৃতি কিরূপ?

12. বিক্ষিপ্ত গ্রামবসতির শ্রেণীবিভাগ কর।

13. গোষ্ঠীবদ্ধ গ্রামবসতির শ্রেণীবিভাগ কর।

14. নগরীর সংজ্ঞা দাও।

15. গ্রাম ও শহরের মধ্যে প্রধান পার্থক্য কি?

16. অবস্থান অনুযায়ী জমির ব্যবহার কেমন হয়?

অতি-সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

1. 'শহর'-এর সংজ্ঞা দাও।
2. গ্রামীণ বসতির কার্যাবলীর শ্রেণীবিভাগ কর।
3. মেট্রোপোলিস।
4. গ্রামবসতির সংজ্ঞা।
5. ছড়ানো-ছিটানো বসতি।
6. বিচ্ছিন্ন একক বসতি।
7. সমোন্নতিরেখা বরাবর বসতি।
8. স্বাভাবিক বাঁধের ওপর জনবসতি।
9. শুষ্ক বিন্দু বসতি।
10. দণ্ডাকৃতি বসতি।
11. আয়তাকার বা বর্গাকৃতি গোষ্ঠীবদ্ধ বসতি।
12. বৃত্তাকার গোষ্ঠীবদ্ধ বসতি।

3.13 উত্তর

পাঠাংশ থেকে উত্তর সংগ্রহ কর।

EGR 09

Block-2

একক ১ □ পৌর বসতি (Urban Settlement)

গঠন

৪.১ প্রস্তাবনা

উদ্দেশ্য

৪.২ শহরের সংজ্ঞা

৪.২.১ বাহ্যিক সংজ্ঞা

৪.২.২ জনসংখ্যার মানদণ্ডানুযায়ী শহরের সংজ্ঞা

৪.২.৩ সমাজতাত্ত্বিক সংজ্ঞা

৪.২.৪ শহর ও গ্রাম্য এলাকা সংজ্ঞায়িত করার সমস্যা

৪.৩ শহরের উৎপত্তি ও বিকাশ

৪.৪ বিশ্ব নগরায়ণের ইতিহাস

৪.৫ প্রাচীন যুগের নগরায়ণ (প্রথম পর্ব)

৪.৫.১ পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে গড়ে ওঠা প্রাচীন বসতি

৪.৫.২ প্রাচীন নগরগুলোর প্রাকৃতিক পরিবেশ

৪.৫.৩ প্রাচীন নগরের জনসংখ্যা

৪.৫.৪ প্রাচীন নগরের বৈশিষ্ট্য

৪.৫.৫ নগর সভ্যতার প্রসার ও সংকোচন

৪.৫.৬ প্রাচীন নগর বিকাশের কারণ

৪.৬ পৌর সভ্যতার দ্বিতীয় পর্ব

৪.৭ এশিয়া ও আফ্রিকায় শহরের বিকাশ

৪.৮ নতুন বিশ্বে শহরের উৎপত্তি

৪.৯ প্রাক্-শিল্প নগর

৪.১০ শিল্প বিপ্লবের প্রভাব

৪.১১ আধুনিক নগরায়ণ

৪.১১.১ কিছু জ্ঞাতব্য বিষয়

৪.১২ আধুনিক শহর

৪.১৩ সেন্সাস ট্র্যাক, পৌরপিণ্ড; প্রামাণ্য পৌর এলাকা, মেগাসিটি মহানগর ও মেট্রোপলিটান এলাকা

৪.১৩.১ সেন্সাস ট্র্যাক

৪.১৩.২ পৌরপিণ্ড

৪.১৩.৩ প্রামাণ্য পৌর এলাকা

৪.১৩.৪ মেগাসিটি

৪.১৪ মহানগর তত্ত্ব, মহানগর এলাকা ও মহানগর অঞ্চল সম্পর্কিত ধারণা

৪.১৫ পৌর পুঞ্জ ও পৌর মহাপুঞ্জ

৪.১৬ গ্রাম্য ও পৌর উপকণ্ঠ

৪.১৭ উমল্যান্ড ও পৌর ক্ষেত্র

৪.১৮ সারাংশ

৪.১৯ সর্বশেষ প্রশ্নাবলি

৪.২০ উত্তরমালা

একক ৪ ❑ পৌর বসতি

Urban Settlement

গঠন

৪.১ প্রস্তাবনা

সভ্যতার বহির্প্রকাশ হল পৌর বা শহর বসতি। শহরের উৎপত্তি ও বিকাশের সাথে সাথে মানুষ তার প্রাচীন গণ্ডী ভেঙে নতুন এক দিগন্তের পথে এগিয়ে যায়। শহরই মানুষের জীবনকে অর্থবহ করে তোলে। পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ওপর এর প্রভাব অপরিসীম। কারণ শহরের সংস্পর্শে আশেপাশের গ্রাম্যজীবনে যথেষ্ট আলোড়ন ওঠে। তবে শহর ও নগরের সংজ্ঞা নিয়ে মতভেদ থাকলেও এটা ঠিক যে নগরের উৎপত্তি কয়েকটি বিশেষ বিশেষ অবস্থার সৃষ্টি

হওয়ার ওপর নির্ভরশীল। উদ্বৃত্ত খাদ্য নির্দিষ্ট স্থানে কেন্দ্রীভূত করবার উপায় উদ্ভাবন না হওয়া পর্যন্ত নগর গড়ে উঠতে পারে না। ঐতিহাসিকদের মতে পৃথিবীর সর্বপ্রথম নগর বিকাশ লাভ করেছিল দক্ষিণপশ্চিম এশিয়ার জর্ডন উপত্যকায় জেরিকো (Jerico) নামক স্থানে। সেখানকার একটি প্রস্রবণের অবিরাম জলধারাকে কেন্দ্র করে প্রথমে একটি মন্দির তৈরি হয় ও কালক্রমে ঐ প্রস্রবণ, মন্দির ও ফসল উৎপাদনকে কেন্দ্র করে একটি শহর বসতির সৃষ্টি হয়। বস্তুতপক্ষে কোন বস্তুকে অবলম্বন করেই একটি পৌর বসতির জন্ম হয়। শুধুমাত্র আয়তনের দিক দিয়ে নয়, কর্মধারা, যোগাযোগ ইত্যাদি নানা দিক দিয়ে শহর ও গ্রামের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

পৌর সীমানা দিয়ে নগরের অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে ব্যাখ্যা করা যায় না। নগরের উৎপত্তি, তার ক্রিয়াকলাপ, উন্নতির মান ও তার ভবিষ্যৎ গতিপ্রকৃতির কারণ খুঁজতে গেলে দেখা যাবে যে তাদের কোনটাই নগর সীমানার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় (ভট্টাচার্য ও ভট্টাচার্য, ১৯৭৭)। বরং প্রত্যেকটির মূলে নগরাতীত অন্য কোন শক্তি কাজ করছে যার প্রভাব বাইরে থেকে এসে পড়ছে।

৪.২ □ উদ্দেশ্য

বর্তমান পরিচ্ছেদে আমরা শিখব

- শহর ও নগর কী
- শহরের সংজ্ঞা কী
- কীসের ভিত্তিতে এই সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে
- আমরা কাকে গ্রাম বলব, কাকে বা শহর বলব
- শহর ও গ্রামকে সংজ্ঞায়িত করার সমস্যা কী কী
- প্রথম শহরের উৎপত্তি কোথায় হয়েছিল
- পৃথিবীতে বিভিন্ন অঞ্চলে শহরের বিকাশ কিভাবে ঘটেছে
- প্রাচীন বিশ্বের নগরগুলোর প্রাকৃতিক পরিবেশ কিরূপ ছিল
- মধ্যযুগে নগরগুলোর অবস্থা কিরূপ ছিল
- আধুনিক যুগে নগরায়ণের কারণ কি
- এসব বিষয়গুলোকে জানা দরকার যেহেতু শহরের বিকাশ থেকে তাদের সমস্যার সাথে আমরা পরিচিত হব যা ক্রমশ বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে
- বর্তমান পরিচ্ছেদের আরও উদ্দেশ্য হল শহর ও তার পারিপার্শ্বিক বিভিন্ন এলাকাকে কী কী নামে অভিহিত করা হয় তা জানা
- শহরকে বুঝতে ও তার ক্রিয়াকলাপের সাথে পরিচিত হতে এগুলো সম্পর্কে জ্ঞান থাকা আবশ্যিক।

৪.২ শহরের সংজ্ঞা (Definition of town)

শহর ও নগর দু'টো এক সুতোয় বাঁধা। শহরের উৎপত্তি ও বিকাশের সাথে সাথে মানুষ তার প্রাচীন গণ্ডী ভেঙে নতুন এক দিগন্তের পথে এগিয়ে যায়। সভ্যতার বহির্প্রকাশ হল পৌর বা শহর বসতি। Hudson-এর ভাষায় "The town is undoubtedly one of the most striking expressions of contemporary, or indeed of any civilisation". শহর-ই মানুষের জীবনকে অর্থবহ করে তোলে। পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ওপর এর প্রভাব অবিসম্বাদী। কারণ শহরের সংস্পর্শে আশেপাশের গ্রাম্য জীবনে যথেষ্ট আলোড়ন ওঠে।

শহরের বিকাশ আলোচনা করার আগে শহর কি তা আমাদের জানা দরকার। শহর কি? কোন মামুলি সংজ্ঞা দিয়ে শহরকে বিচার করা যায় না। Emrys Jones-এর ভাষায় এটা কি রাস্তা ও বাড়ির বাহ্যিক সমারোহ বা এটা কি বিনিময় ও বাণিজ্যের কেন্দ্র? অথবা এটা কি এক ধরনের সমাজ বা মনের এক অবস্থা? এর কি নির্দিষ্ট আয়তন আছে? একটি নির্দিষ্ট জনঘনত্ব? "Is it a physical conglomeration of streets and houses, or is it a centre of exchange and commerce? or is it a kind of society, or even a frane of mind ? Has it a certain size, a specific density" ? (Towns and Cities)। সংজ্ঞার এই সব অসুবিধে অগুণতি ও এই সম্বন্ধে খুব কম ঐক্যমত আছে। তবুও শহরকে কয়েকটি দিক দিয়ে সংজ্ঞায়িত করা যায়—যেমন বাহ্যিক বিচার, জনগণনা অনুযায়ী বিচার ও সামাজিক বিচার।

৪.২.১ বাহ্যিক সংজ্ঞা (Physical definition)

বাহ্যিক দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যায় যে শহরে অনেক রাস্তাঘাট ও কোন কোন ক্ষেত্রে বিরাট বিরাট আকাশচুম্বী অট্টালিকা (skyscrapper) রয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, নার্সিংহোম, আমোদ প্রমোদের জন্য বহুপ্রকার সংস্থা, পার্ক ইত্যাদি থাকে। শহরের এক এক অংশে এক এক ধরনের কর্মযজ্ঞ চলে, বিশেষ করে বড় বড় শহরে। শহরের একটি উপসর্গ হল বস্তি (slum)। এ প্রসঙ্গে বলা চলে যে কোন বড় ভারতীয় শহর বা নগরকে দূর থেকে চেনা যায় একটানা লম্বা শহরতলি বা বস্তির অস্তিত্ব থেকে। যে শহর অর্থনৈতিক দিক দিয়ে যত উন্নত, তার লোক আকর্ষণ করার ক্ষমতা তত বেশি। লোকসংখ্যা যত বাড়বে তার বস্তির সংখ্যাও তত বাড়বে। কারণ গ্রাম থেকে যারা শহরে ছুটে আসে, তাদের বেশির ভাগই দরিদ্র শ্রেণীর। শহরের মধ্যে তারা স্থান না পেয়ে বস্তিতে আশ্রয় নেয়।

৪.২.২ জনসংখ্যার মানদণ্ডানুযায়ী শহরের সংজ্ঞা (Definition of town according to size of population)

অনেক দেশেই শুধুমাত্র ন্যূনতম জনসংখ্যাকে শহর বসতির সংজ্ঞা হিসেবে ব্যবহার করা হয়। যেমন ডেনমার্কে কোন বসতির জনসংখ্যা 250 হলে তাকে পৌর বা শহর বসতি বলা হয়। সুইডেন ও ফিনল্যান্ডেও ঐ একই মানের (জনসংখ্যা) বসতিকে শহর বলা হয়ে থাকে। আইসল্যান্ডে 300, স্কটল্যান্ড, কানাডা, ভেনেজুয়েলাতে কোন বসতির জনসংখ্যা 1,000 হলে তবে তাকে শহর বলা যাবে। ফ্রান্স, পর্তুগাল ও আর্জেন্টিনাতে 2,000, যুক্তরাষ্ট্র ও থাইল্যান্ডে 2,500, গ্রীস ও স্পেনে 10,000 আর নেদারল্যান্ডে 20,000 লোকসংখ্যা বিশিষ্ট কোন জনপদকে শহর বলা হয়। জনসংখ্যার ভিত্তিতে শহরের এই সংজ্ঞা আন্তর্জাতিক তুলনার ক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্যহীন মনে হয়। কারণ অনেক ছোট বসতির মধ্যেও শহরের বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে, আবার অনেক উন্নয়নশীল দেশে বড় বসতি আছে যেখানকার বেশির ভাগ লোকই চাষবাসে নিযুক্ত। যেমন দক্ষিণ ভারতে এমন অনেক বড় গ্রাম আছে যাদের জনসংখ্যা 10,000 বা তার চেয়ে বেশি। কিন্তু ঐ গ্রামগুলোর অর্থনৈতিক বনিয়াদ হল চাষবাস। সেই তুলনায় পাশ্চাত্য দেশগুলো যাদের

কথা আগেই উল্লেখ করেছি, তাদের জনসংখ্যা অনেক কম। তাই তারা একটা নির্দিষ্ট জনসংখ্যা বিশিষ্ট বসতিকে 'শহর' আখ্যা দিয়ে থাকে। কিন্তু অসুবিধে হচ্ছে শহর বলতে আমরা ঘনবসতিপূর্ণ এলাকাকেও ধরে থাকি, যা এই সব ন্যূনতম জনসংখ্যা-বিশিষ্ট বসতি থেকে পাওয়া সম্ভব নয়। এ প্রসঙ্গে ভারতে শহরের সংজ্ঞা বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। এখানে সরকারিভাবে (i) শহর বসতিতে 5,000 জনের বেশি লোকসংখ্যা থাকতে হবে। (ii) প্রতি বর্গ কিমিতে জনঘনত্ব 386 হতে হবে। আর (iii) মোট কর্মীর 75 শতাংশের বেশি অ-কৃষি কর্মে নিযুক্ত থাকবে। শেষের-টি অর্থাৎ বসতির কর্মধারাকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মানদণ্ড বলে ধরা যেতে পারে। কারণ, শহর কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত নয়। যেমন ইস্রায়েলে কোন বসতির এক তৃতীয়াংশের বেশি লোক চাষবাসে যুক্ত থাকলে তাকে শহর বলা যাবে না। আবার কিছু দেশ শুধুমাত্র প্রশাসনিক কাজকর্মকে শহরবসতির মানদণ্ড হিসেবে ধরেছে, যেমন যুক্তরাজ্য (U.K.), জাপান, আলজিরিয়া, টিউনিসিয়া, তুরস্ক, মিশর, সিরিয়া প্রভৃতি দেশ।

৪.২.৩ সমাজতাত্ত্বিক সংজ্ঞা (Sociological definition)

এটা সাধারণভাবে স্বীকৃত যে শহর ও গ্রামের সমাজের মধ্যে পার্থক্য আছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে সমাজতত্ত্ববিদ্‌রা শহর ও নগরকে ব্যাখ্যা করেছেন তুলনামূলকভাবে বড় ও সামাজিক দিক দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন মনোভাবের বহু লোকের এক স্থায়ী বসতি হিসেবে। Wirth-এর মতে শহর ও নগরে এমন এক সামাজিক কাঠামো রয়েছে যেখানে একে অপরের নাম জানে না। পরস্পরের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক নেই, আর এর মধ্যে লুকিয়ে থাকে আত্মীয়তা ও পারিবারিক বন্ধনের শিথিলতা। এর পরিবর্তে দেখা যায় ভিন্ন গোষ্ঠীর প্রতি আনুগত্য যা মানসিক ও সামাজিক অস্থিরতার ইন্ধন জোগায়।

সমাজতত্ত্বের বিচারে পৌরায়ণ বা নগরায়ণকে ব্যাখ্যা করার যে অসুবিধে রয়েছে তা হল সমাজবিজ্ঞানের বিচারে পৌরায়ণকে 'জীবনের এক পদ্ধতি' (Way of life) হিসেবে ধরা হয়। কিন্তু শহরের বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য যেমন অট্টালিকা, রাস্তা ও তাদের বিন্যাস ইত্যাদি এই বিজ্ঞানের আওতায় আসে না। শহরের চেয়ে শহরবাসীদের বৈশিষ্ট্যের ওপর এই বিজ্ঞানে গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

শহরের সংজ্ঞার এই সব অসুবিধের দরুন সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বা U.N.O. প্রস্তাব দিয়েছে যে জনসংখ্যা দিয়ে গ্রাম ও শহরের মধ্যে পার্থক্য করা উচিত হবে না। তার চেয়ে আয়তন অনুযায়ী বসতিকে সাধারণভাবে শ্রেণীবিভাগ করা উচিত। কারণ খুব বড় নগরের কেন্দ্রবিন্দু থেকে দূরবর্তী এলাকার ক্ষুদ্রতম গ্রামীণ বসতির কাঠামোর মধ্যে এক ধারবাহিকতা (continuity) থাকে। কোন কোন লেখক এমন মন্তব্যও করেছেন যে যখনই কোন বড় নগর গড়ে উঠল, তখনি গ্রাম শব্দটা সেকেলে হয়ে দাঁড়াল, কারণ আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার দৌলতে শহর ও নগরের প্রভাব দেশের দূরবর্তী গ্রামেও বেশ অনুভব করা যায়। ধীরে ধীরে নগরের নিকটবর্তী এলাকা পৌরায়ণের দিকে এগিয়ে যায়। সে সব আমরা পরে আলোচনা করব।

শহর ও নগরের মধ্যে পার্থক্য (Difference between town & city)

এতক্ষণ আমরা শহর ও নগরের মধ্যে কোন রকম পার্থক্য উল্লেখ করিনি। অতীতেও শহর ও নগরকে আলাদা করে দেখা হত না। অতীতে যে কোন পৌরবসতিকেই নগর আখ্যা দেওয়া হত। কারণ তখন পৌর পরিষেবার কর্মধারা ও পৌরবসতির অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলো তেমনভাবে স্পষ্ট হত না।

যদিও শহর ও নগরের পৌর বৈশিষ্ট্যগুলো একই রকম, তবু তাদের মাত্রা বা মানের দিক দিয়ে কিছু কিছু পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। ভারতে কোন পৌরবসতির জনসংখ্যা এক লক্ষ অতিক্রম করলে তাকে নগর (city) আখ্যা দেওয়া হয়। যুক্তরাজ্যে (U.K.) সাধারণত ক্যাথিড্রালবিশিষ্ট (cathedral) শহরকেই নগর আখ্যা দেওয়া হয়।

যদিও সচরাচর আমরা জানি যে শহর অপেক্ষা নগর অনেক বড়, তবুও কি কি পৌর বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে শহর নগরে রূপান্তরিত হয়, তা আজও স্পষ্টভাবে নির্ধারিত হয়নি। এটা সাধারণভাবে স্বীকার করে নেওয়া হয় যে (i) আয়তনের দিক দিয়ে শহর অপেক্ষা নগর অনেক বড় হয়। শহর অপেক্ষা নগরের (ii) বৃত্তির সংখ্যা এবং (iii) পৌর জীবনের মান অনেক বেশি উন্নততর। আমরা আগেই জেনেছি যে সভ্যতার পীঠস্থান হল নগর। (iv) বহু প্রকার শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক পীঠস্থান, বৃত্তিমূলক সুযোগ, স্থপতিশৈলী নগরের অন্যতম বৈশিষ্ট্য যা শহরের ক্ষুদ্র পরিসরে গড়ে ওঠে না।

৪.২.৪ **শহর ও গ্রাম্য এলাকা সংজ্ঞায়িত করার সমস্যা** (Problems of defining urban and rural areas)

শহরের উৎপত্তি ও বিকাশ আলোচনার আগে শহর ও গ্রাম্য এলাকা সংজ্ঞায়িত করার সমস্যা সম্বন্ধে দু'চার কথা বলে নেওয়া ভালো। আমরা আগেই গ্রাম ও শহরের মধ্যে পার্থক্যগুলো নিয়ে আলোচনা করেছি। কিন্তু পার্থক্য করা সত্ত্বেও কতকগুলো সমস্যা এসে পড়ে। আর এর মূলে আছে শহর ও গ্রামীণ বসতির অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপট নিয়ে সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে পরস্পরবিরোধী মতামত। প্রথম পক্ষ অর্থাৎ রক্ষণশীল সমাজবিজ্ঞানীরা কঠোরভাবে বসতির সংজ্ঞাকে অনুসরণ করেন। কিন্তু অনেক সময় কিছু আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যের দরুন বসতির সংজ্ঞায় অসঙ্গতি চোখে পড়ে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে যদি কোন স্থানের লোকজন প্রাথমিক পর্যায়ের কোন বৃত্তিতে নিয়োজিত থাকে, তবে তাকে আমরা গ্রামীণ বসতি হিসেবে চিহ্নিত করি। তবে কখনো কখনো এই বসতির লোকজন এমন কিছু পেশা অবলম্বন করে বা এমন ধরনের ভূমি-ব্যবহার (Land use) সৃষ্টি করে যাকে কখনই গ্রামীণ বসতি বলা চলে না (বাকী, 1994)। আধুনিক দ্রুত পরিবহনের যুগে বহু লোককে গ্রাম থেকে প্রতিদিন শহরে কর্মোপলক্ষে যাতায়াত করতে হয়। ফলে শহরের প্রভাব গ্রামে পড়ে এবং গ্রামীণ জীবনের সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে পরিবর্তন আসে। Murphy যথার্থই লিখেছেন যে ইদানীং পাশ্চাত্য দেশগুলোতে (এমন কি বিকাশশীল দেশগুলোতেও) রেডিও, টেলিভিশন, দ্রুত পরিবহন মাধ্যমগুলো যে হারে গ্রামে আমদানী হচ্ছে তাতে শহরের নাগরিক কোলাহল ছাড়া গ্রামীণ জীবনে খুব একটা পার্থক্য চোখে পড়ে না। এই সদা পরিবর্তনশীল সমাজের দিকে লক্ষ রেখে রক্ষণশীলরা মন্তব্য করেছেন যে গ্রাম ও শহরের সংজ্ঞা দেওয়া মানেই হচ্ছে উভয়ের মধ্যে একটা সীমারেখা টানা যা কালের গতিতে কার্যকারিতা হারাবে।

রক্ষণশীলদের তুলনায় উদারপন্থীরা অনেক বেশি নমনীয়। এঁরা মনে করেন যে গ্রামীণ ও পৌরবসতির সংজ্ঞা নিয়ে যত দুর্বলতা থাকুক না কেন, তা বসতির চরিত্রকে বুঝতে যথেষ্ট সাহায্য করে। আর গ্রামীণ ও পৌরবসতির একটা সংজ্ঞা খাড়া না করলে কোন রকম আলোচনা করা যাবে না। বলা বাহুল্য উদারপন্থীরা সংখ্যায় অনেক বেশি এবং এঁদের দেওয়া সংজ্ঞা-ই সাধারণের মধ্যে চালু রয়েছে।

৪.৩ **শহরের উৎপত্তি ও বিকাশ** (Origin and growth of town)

এবার কি অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নগর ও শহর গড়ে ওঠে তা নিয়ে আলোচনা করা যাক। God made the country and man made the town"। এ মন্তব্য শহরের বিকাশের ক্ষেত্রে যথার্থ প্রযোজ্য।

নব প্রস্তর যুগের শেষে প্রাচীনতম শহর বসতি গড়ে উঠেছিল (চিত্র 4.1)। সেখানকার কৃষকেরা নিজেদের তৈরি লাঙ্গলের সাহায্যে বাড়তি ফসল ফলাতে সক্ষম হয়েছিল। ফসল ফলানোর পরিশ্রম থেকে মুক্তি পেয়ে কিছু

কিছু লোক হস্তশিল্প বা বাণিজ্যের মত অ-কৃষিকার্যে নিজেদের নিয়োজিত করল। এইভাবে শিল্পী, ব্যবসায়ী, কর্মচারী ও শাসকশ্রেণীর আবির্ভাব ঘটেছিল। কৃষকশ্রেণীর এক অংশের সঙ্গে তারা নিবিড় বন্ধনে বাধা পড়েছিল যা পরবর্তীকালে

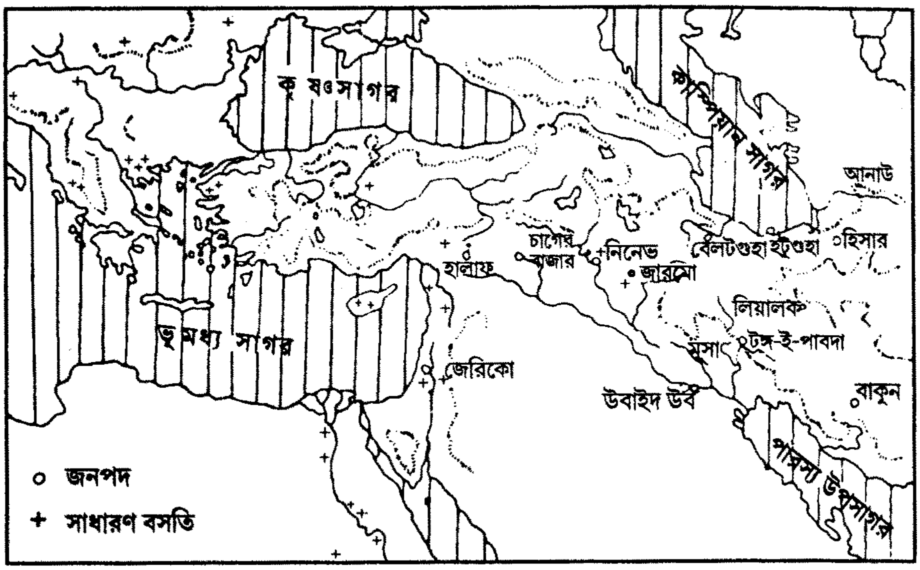

চিত্র - 4.1 নবপ্রস্তর যুগের বসতির বন্টন (ভট্টাচার্য ও ভট্টাচার্য অবলম্বন)

শহরের জন্ম দিয়েছিল। নদী উপত্যকার মত অনুকূল ভৌগোলিক পরিবেশ নির্বাচনের দিকে তাদের ঝোঁক ছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল নতুন ধরনের যোগাযোগ ব্যবস্থার সুযোগ নেওয়া। এ প্রসঙ্গে পালচালিত নৌকার কথা এসে পড়ে। অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন প্রযুক্তির বিকাশ যেমন চাকাওয়ালা মালগাড়ি, বলদে টানা লাঙ্গল, পালের নৌকা, সেচ ব্যবস্থা, ধাতব বিদ্যার অগ্রগতি সমাজে নানা ধরনের পরিবর্তন এনেছিল। ফসল উৎপাদন বেড়েছিল আর উন্নত যোগাযোগ বাড়তি খাদ্যশস্য শহরে আনার সুযোগ করে দিয়েছিল। খাদ্য ও অন্যান্য মালপত্র সংগ্রহ, বিনিময় ও পুনর্বণ্টনের উদ্দেশ্যে নতুন নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠল। শহরে বিশেষ বিশেষ পেশা চালু হল ও দূরের দেশের সাথে বাণিজ্য সম্ভব হল। এইসব শহরগুলো সাধারণত প্রতিরক্ষার খাতিরে প্রাচীর দিয়ে ঘেরা ছিল।

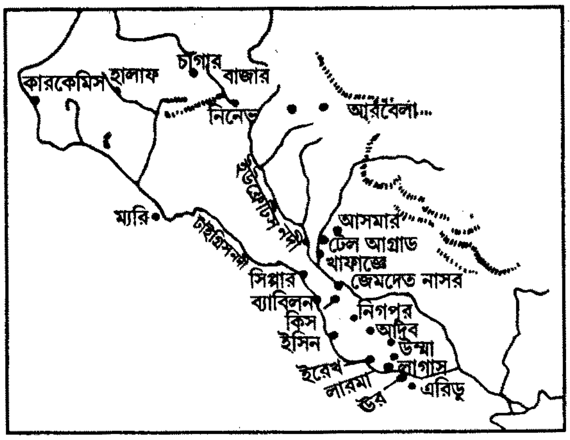

চিত্র - 4.2 টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস উপত্যকায় প্রাচীন নগর

মন্দির, পিরামিড ও প্রাসাদ এইসব শহরের মর্যাদা বাড়িয়েছিল। এই সব প্রাচীন শহরের মধ্যে সবচেয়ে বড় ছিল ব্যাবিলন। গৌরবের শীর্ষ সময়ে এই শহরের জনসংখ্যা 1,00,000-এ পৌঁছেছিল। তবে অধিকাংশ শহর ছিল খুব ছোট। খাদ্যের যোগানের জন্য আশেপাশের অঞ্চলের ওপর বহুদিনব্যাপী নির্ভরশীল এই সব শহরগুলো বড় নগরে পরিণত হতে পারেনি। মনে হয় এদের জনসংখ্যা 20,000-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। মিশর ও ব্যাবিলন সাম্রাজ্যের উত্থানের পর তাদের প্রধান নগরগুলো প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী বহুদূরের অঞ্চল থেকে জোগাড় করতে সক্ষম হয়েছিল। এইভাবে তারা তাড়াতাড়ি বেড়ে উঠেছিল। প্রাচীন সুমেরীয় সভ্যতার অন্তর্ভুক্ত এইসব শহরের মধ্যে এড়ু, ইরি, এরিডু, ইরেখ, লাগাস, উর, কিশ (চিত্র 4.2) উল্লেখযোগ্য। আরও উত্তরে ছিল ব্যাবিলন। তারও উত্তরে ছিল আসিরীয়র, আসুর ও নিনেভে। নীলনদের উপত্যকায় ছিল মেমফিস, থেবস প্রভৃতি শহর ও সিন্ধু উপত্যকায় হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো শহর। সত্যিকার শহর গড়ে ওঠার প্রাচীনতম উদাহরণ খুঁজে পাওয়া যাবে মেসোপটেমিয়ার টাইগ্রীস ও ইউফ্রেটিস উপত্যকায়, নিম্ন সিন্ধু উপত্যকায় ও মিশরের নীল উপত্যকায়। এইসব শহরগুলো আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ 35-26 সহস্রাব্দের মধ্যে গড়ে উঠেছিল।

নীচের সারণিতে প্রাচীন শহর বিকাশের বিভিন্ন পর্যায় দেখানো হল

সারণি – 1.1

প্রথম দিকে পৌরায়ণের বিভিন্ন পর্যায়

খ্রীস্টাব্দ	1200	ফরাসী দুর্গ শহর তৈরি। আল্পসের উত্তরে মধ্যযুগীয় ইউরোপে স্বতঃস্ফূর্তভাবে শহর গড়ে উঠতে আরম্ভ করল।
	1000	ভেনিস ও অন্যান্য ইতালীয় নগর-রাষ্ট্রে বাণিজ্যিক বিকাশ সম্ভব হল। মায়া সভ্যতার অন্তর্গত বিভিন্ন নগর তাদের গৌরবের শীর্ষে পৌঁছেছিল।
খ্রীস্টাব্দ	0	মধ্য আমেরিকায় মায়ানগর সমূহের উত্থান, আলেকজান্দ্রিয়া প্রতিষ্ঠা হল।
	500	রোম ও ইট্রুস্কান নগরসমূহ খ্যাতিলাভ করেছিল। গ্রীক সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠার মুখে। পশ্চিম তুর্কীস্থানে পারস্য বসতিগুলো পৌর আখ্যা পেল। প্রথম দিককার গ্রীক নগরসমূহ বিকাশের পথে।
		রোম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা হল।
	1500	চীনে বহু নগর সৃষ্টি হয়েছিল যেমন মধ্য হোয়াং-হো/উপত্যকায় আনযাং (Anyang)। লেভান (Levant) উপকূলে উগারিত (Ugarit) ও ব্যবলস্ (Byblos) ও ক্রীটে (Crete) নসস্ (Knossos) নগরগুলো সক্রিয় ছিল।
	2500	ব্যাবিলন প্রতিষ্ঠা হল। সিন্ধু উপত্যকায় মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পা সমৃদ্ধশালী নগর ছিল।
	3000	মিশরে থেবস (Thebs) ও মেমফিস (Memphis) সমৃদ্ধ নগর ছিল। মিশরের সবচেয়ে পুরনো শহরগুলো এই সময় গড়ে উঠেছিল।
	3500	এরিডু ও লাগাস-এর মত সুমেরীয় নগরগুলো উন্নতি লাভ করেছিল।
	4000	– – – –

(সূত্র Hudson, F. S., A Geography of Settlements)

৪.৪ বিশ্ব নগরায়ণের ইতিহাস (History of World Urbanization)

Majid Hussain (Human Geography)-এর ভাষায় নগরায়ণ হল নগর হবার প্রক্রিয়া। R. B. Mandal নগরায়ণকে এইভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন : "Urbanization is a process of population increase in urban areas. Wherever population does not increase, we may say that deurbanization has taken place" অর্থাৎ পৌর এলাকায় জনবৃদ্ধির প্রক্রিয়া হল নগরায়ণ। যে স্থানে জনবৃদ্ধি ঘটে না, সে স্থান নগরবিমুখ হয়। টমসনের (Thompson) ভাষায় নগরায়ণ হল সম্পূর্ণভাবে কৃষিকার্যের সাথে যুক্ত ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর মানুষের সরকারি কাজকর্ম, বাণিজ্য, শিল্প ও আনুষঙ্গিক কর্মে নিয়োজিত আরও বড় গোষ্ঠীতে উত্তরণ। Hauser এবং Duncan-র মতে নগরায়ণ হল জনসংখ্যা বণ্টনের ধাঁচের এক পরিবর্তন। এর মধ্যে রয়েছে পৌর জনসংখ্যা বৃদ্ধি, এবং পৌর স্থানের সংখ্যা ও আয়তন বৃদ্ধি ও ঐ স্থানে আরও অধিক সংখ্যক লোকের সমাগম।

সমাজতত্ত্ববিদ Louis Wirth অবশ্য একটু ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে নগরায়ণকে বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর মতে "The degree to which the contemporary world may be said to be 'urban' is not fully or accurately measured by the proportion of the total population living in cities. The influence which cities exert upon the social life of man are greater than the ratio of urban population would indicate, for the city is not only increasing the dwelling place and the workshop of modern man, but it is the initiating and controlling centre of economic, political and cultural life that has drawn into its orbit and woven diverse areas, people and activities into a cosmos".

Wirth-র মতে নগরায়ণকে তিন ভাবে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে : যথা i) মানুষের সাথে প্রকৃতির সম্পর্ক, ii) কিছু সামাজিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত উপাদান যা নগরায়ণকে বর্ণনা করতে পারে, iii) জীবনযাত্রার ধরন ও বৈশিষ্ট্য। নগরায়ণের বৈশিষ্ট্যসমূহকে Wirth নিম্নে আরও বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছেন— a) প্রাকৃতিক গঠন অর্থাৎ জনসংখ্যার প্রযুক্তিকলা, পরিবেশজনিত সুসংহত এক নিরবচ্ছিন্ন ধারা, b) সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং এক বিশেষ সামাজিক সম্পর্ক ও c) মানুষের চিন্তাধারা, ধারণা এবং ব্যক্তিত্ব যা এক বিশেষ সমষ্টিগত জীবনযাত্রার পরিচায়ক এবং যা নির্ভর করে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের এক বিশেষ প্রক্রিয়ার ওপর (দাশগুপ্ত, 1983), Johnston-র মতে "The origin of URBANISM are as problematic as its definition. পৌর উৎপত্তির কারণ হিসেবে তিনি মোটামুটিভাবে চারটি কারণের কথা বলেছেন— a) Ecological বা বাস্তব্য মডেল, b) অর্থনৈতিক মডেল, c) সাংস্কৃতিক মডেল এবং d) রাজনৈতিক-সামরিক মডেল।

Hope Tisdale Eldridge (হোপ টিস্‌ডেল এল্‌রিজ)-র মতে নগরায়ণের মূল বৈশিষ্ট্য হল i) "The multiplication of points of concentration", ii) "The increase in the size of individual concentration". তাঁর মতে উপরোক্ত কারণেই নগরসমাজে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার খুব বেশি।

পৃথিবীর নগরায়ণের ইতিহাস খুব প্রাচীন। প্রাক্‌-ঐতিহাসিক যুগে আনুমানিক এক লক্ষ বছর আগে মানুষ যখন প্রথম চাষবাস ও পশুপালন করত তখন থেকেই নগরায়ণের সূচনা হয়।

সারণি (4.2) তে নগরায়ণের গত দু'শ বছরের চিত্রটি তুলে ধরা হলো। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে এবং একবিংশ শতাব্দীর দোর গোড়ায় এসে নগরায়ণের মাত্রা দারুণভাবে বেড়েছে। অবশ্য সব মহাদেশে পৌরায়ণের হার (%) সমান নয় (সারণি 1.3)

সারণি 4.2

বিশ্ব নগরায়ণ, 1800-2050

সাল	জনসংখ্যা (মিলিয়ানে)	পৌর জনসংখ্যা (% হার)
1800	907	2.4
1900	1,610	9.2
1950	2,509	20.9
1991	5,234	43.0
1998	5,929	47.0
2025	8,039*	57.0
2050	9,366*	66.0

* অভিক্ষিপ্ত জনসংখ্যা (উৎস : U. N. Population Division, 1998-99)

সারণি 4.3

মহাদেশভিত্তিক পৌর জনতা (1991-2000) শতকরা হার ঃ

মহাদেশ	1991	2000
পৃথিবী	43.0	47.5
আফ্রিকা	34.0	38.5
ইউরোপ	75.2	76.5
এ্যাংলো আমেরিকা	78.2	80.5
ল্যাটিন আমেরিকা	66.4	68.5
এশিয়া	34.0	38.8
ওশিয়ানিয়া	70.4	72.5

উৎস : U. N. Population Division. 1998-99

সারণি (4.3) থেকে দেখা যাচ্ছে যে এ্যাংলো—আমেরিকা ও ইউরোপে এই হার খুব বেশি, যথাক্রমে 81 ও 77 শতাংশ। এর পরের স্থান ওশিয়ানিয়া (73%) ও ল্যাটিন আমেরিকার (69%)। সেই তুলনায় এশিয়া (39%) ও আফ্রিকার মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ (39%) শহরবাসী। (চিত্র 4.3)। অবশ্যই এই হার মহাদেশভিত্তিক। দেশে দেশে এই হারের যথেষ্ট পার্থক্য আছে (চিত্র 4)। উক্ত সারণি থেকে আমরা আরও দেখতে পাচ্ছি যে 2025 সাল নাগাদ পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার 57 শতাংশ হবেন শহরবাসিন্দা। আশা করা যায় ঐ সময় নাগাদ এশিয়া আফ্রিকার প্রায় 50 শতাংশ মানুষ হবেন শহরবাসী। ইউরোপ ও এ্যাংলো আমেরিকায় ঐ হার হবে যথাক্রমে 81 85 শতাংশ।

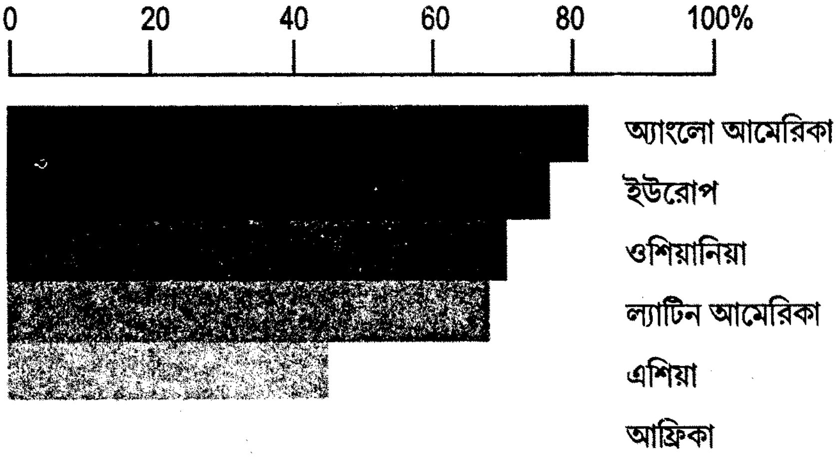

চিত্র - 4.3 মহাদেশভিত্তিক পৌর জনতার বণ্টন %

এতক্ষণ আমরা নগরায়ণের সংখ্যা ও পৃথিবীতে নগরায়ণ কিভাবে ঘটে চলেছে, তা নিয়ে আলোচনা করলাম। এখন জানতে চাওয়া খুব স্বাভাবিক যে নগরায়ণের অতীত ইতিহাস কি, পৃথিবীতে নগরায়ণ প্রথম কোন স্থানে ঘটেছিল, কিভাবে তার বিকাশ ঘটল ইত্যাদি নানান প্রশ্ন। আলোচনার সুবিধের জন্য আমরা নগরায়ণকে তিনটি পর্বে ভাগ করেছি : *প্রাচীন যুগ* (প্রথম পর্ব), *মধ্য যুগ* (দ্বিতীয় পর্ব) ও *আধুনিক যুগ* (তৃতীয় পর্ব)। নীচে নগরায়ণের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করা হল।

৪.৫ প্রাচীন যুগের নগরায়ণ (প্রথম পর্ব) (Urbanisation in the Ancient Period (First stage) :

বিভিন্ন মানবগোষ্ঠী ও তাদের ভৌগোলিক পরিবেশের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক এবং ভৌগোলিক পরিবেশ মনুষ্য সমাজ, তার ক্রিয়াকলাপ, চিন্তাধারা এবং মানসিক উৎকর্ষকে স্থান কাল নির্বিশেষে কতখানি প্রভাবিত করেছে তা প্রাচীন নগরগুলোর ইতিহাস অনুধাবন করলে জানা যায়। জীবনকে সুস্থ এবং কালের উপযোগী করে তোলার ব্যাপারে নগরের দান অপরিসীম। মানব সভ্যতার ইতিহাসে নানা আবিষ্কারের মধ্যে কৃষির পরেই নগরের স্থান। বস্তুতপক্ষে, নগরে অনেক মানুষের একসঙ্গে বসবাস এবং সভ্যতা বিকাশের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক একই ভৌগোলিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। নগরের উৎপত্তি কয়েকটি বিশেষ অবস্থা উদ্ভব হওয়ার ওপর নির্ভরশীল। উদ্বৃত্ত খাদ্য এবং তা একটি নির্দিষ্ট স্থানে কেন্দ্রীভূত করবার উপায় উদ্ভাবন না হওয়া পর্যন্ত নগর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। নগর সামাজিক ঐতিহ্যের আধার এবং ঐতিহ্য বিকীর্ণ করার দায়িত্বও নগরের।

কৃষিভিত্তিক জীবনের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য নিদর্শন হল স্থায়ী গ্রামীণ বসতির সৃষ্টি (ভট্টাচার্য ও ভট্টাচার্য, 1977)। প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার সাহায্যে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে প্রধানতঃ দুটি ফসলের (গম ও যব) উৎপাদন কৌশল আবিষ্কারের ওপর নির্ভর করে প্রথম স্থায়ী মানব বসতির জন্ম হয়। সারণি (নং 4.4) তে পৃথিবীর কয়েকটি প্রধান ঐতিহাসিক শহরের আয়তন ও জনসংখ্যা তুলে ধরা হল।

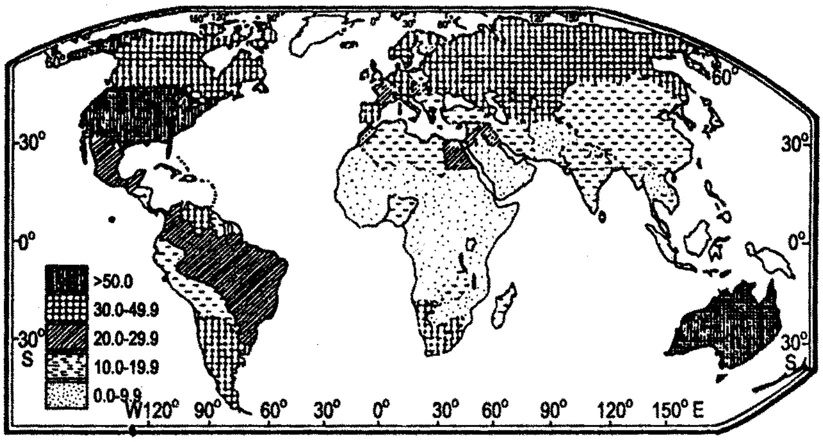

চিত্র - 4.4 পৃথিবীতে পৌর জনতার অসম বণ্টন

সারণি 4.4

কয়েকটি প্রধান ঐতিহাসিক শহরের আয়তন ও জনসংখ্যা ঃ-

শহর	আয়তন	জনসংখ্যা
ব্যাবিলন	3.2 বর্গমাইল	1,00,000 (প্রায়)
মহেঞ্জোদারো	1.0 বর্গমাইল	5,000-15,000
হরপ্পা	2.5 বর্গমাইল	5,000-15,000
ইজহার	2.5 বর্গমাইল	2,500 (প্রায়)

৪.৫.১ পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে গড়ে ওঠা প্রাচীন বসতি ঃ

a) **টাইগ্রিস-ইউফ্রেটিস অববাহিকা ঃ** (Tigris-Euphrates Basin)

দুই পাশে লবণ ও জিপসাম মিশ্রিত উর্বর পলি দিয়ে গঠিত পর্বত শ্রেণীর মধ্যভাগে অবস্থিত হল ইউফ্রেটিস এবং টাইগ্রিস নদীবেষ্টিত অঞ্চল। টাইগ্রিস নদী অববাহিকার অন্তর্গত কুর্দিল পাহাড়ের একটি শাখায় অবস্থিত কালাত জারমো (Qalat Jarmo) নামক স্থানে খাদ্য উৎপাদনকে অবলম্বন করে আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ 6500 অব্দ নাগাদ একটি গ্রামের পত্তন হয়। আশেপাশের মানুষ সহজেই এই স্থানের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে এবং ধীরে ধীরে সমবায় ভিত্তিতে সমাজ ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে কৃষি-ভিত্তিক অর্থনীতি গড়ে তোলে।

কৃষক শ্রমিকদের যৌথ প্রচেষ্টা চালু রাখার প্রয়াস এবং উদ্বৃত্ত খাদ্য অনতিকালের মধ্যে এই অঞ্চলের কিছু গ্রাম্য বসতিকে শহর বসতিতে রূপান্তরকরণে সাহায্য করে। ইরেখ, এরিডু, লাগাস, উর প্রভৃতি নগর প্রকৃতপক্ষে অপেক্ষাকৃত প্রাচীন গ্রাম থেকে সৃষ্টি হয়েছিল। পৌর জনপদ সৃষ্টি হবার সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসাবাণিজ্য আরম্ভ হয়ে যায়। বহুবিধ নগরের নানা ধরনের প্রয়োজন মেটাবার উদ্দেশ্যে নদীপথে ও পরবর্তীকালে সমুদ্রপথে অনেক সামগ্রী ঐসব স্থানে নীত হয়। খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় সহস্রাব্দে আমদানী দ্রব্যের মধ্যে তামা অথবা ব্রোঞ্জ, কাঠ ও পাথর, সোনা, রূপো,

সীসা, নীলকান্তমণি ও অন্যান্য দামী বস্তু ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এদের মধ্যে পারস্য উপসাগরের উপকূলবর্তী ওমান থেকে তামা, পারস্য ও সিরিয়া থেকে টিন, টরকে পর্বত থেকে রূপো ও সীসা, উঃ পূর্বে অবস্থিত পর্বতমালা থেকে কাঠ আসত। চিত্র (নং 4.2) লক্ষ্য করলে দেখা যাবে অধিকাংশ নগর টাইগ্রিস-ইউফ্রেটিসের নিম্ন অববাহিকায় কেন্দ্রীভূত ছিল এবং কারকেমিস থেকে আরম্ভ করে আরবলা পর্যন্ত সমস্ত নগর সমতলের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল (ভট্টাচার্য ও ভট্টাচার্য, 1977)।

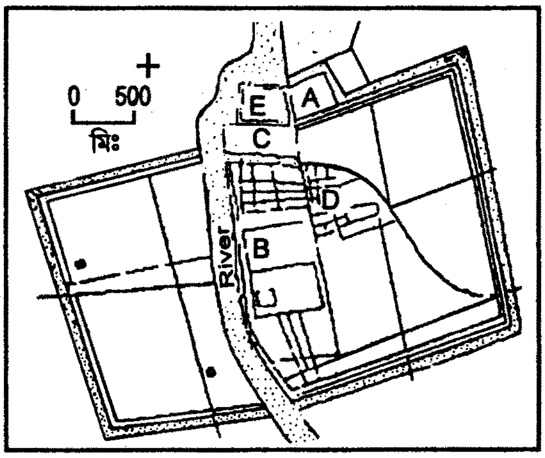

চিত্র - 4.5 600 খৃষ্ট পূর্বেকার ব্যাবিলন নগর। A. Isthar গেট,
B. মন্দির, C. ঝুলন্ত বাগান, D. পুরনো ধাঁচের রাস্তা E দুর্গ।

b) **নীল অববাহিকা** (Nile Basin) :

বেলেপাথর এবং চুনাপাথরে তৈরি পাহাড় শ্রেণীর মধ্যে অবস্থিত নীলনদ উপত্যকা অত্যন্ত সমতল। নদীটি ভূমধ্যসাগরীয় উপকূলে একটি বিরাট বদ্বীপের সৃষ্টি করেছে। ইউফ্রেটিস টাইগ্রিস ব-দ্বীপাঞ্চলের মত নীল ব-দ্বীপ প্রাচীন মানুষকে স্থায়ী বসতি স্থাপনে আকৃষ্ট করেছে বলে অনুমিত হয়। বর্তমান কায়রো নগরীর উত্তরে অবস্থিত এই ব-দ্বীপের অসংখ্য জলাভূমিতে পাপিরস নামে এক প্রকার জলজ আগাছা জন্মাত।

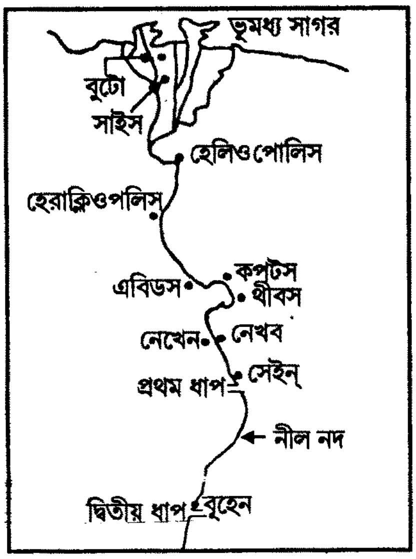

চিত্র 4.6
নীল উপত্যকায় গড়ে ওঠা নগরসমূহ

প্রতি বছর বন্যার পরে নদীখাত এবং দুই পাড়ে পলি সঞ্চয়ের ফলে মাটির উর্বরতা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ত। ফলে এই অঞ্চলে কৃষির প্রভূত উন্নতি হয়। এছাড়া, নদী উপত্যকার দুই তীরের পাহাড় থেকে ছুরি এবং কুঠার নির্মাণোপযোগী চক্‌মকি পাথর, নৌকা তৈরির জন্য পাপিরসের ব্যবহার-যোগ্যতা এবং নদীপথে কাঠ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ করার সুযোগ স্থায়ী বসতি স্থাপনে সাহায্য করে।

প্রথম বসতি কোথায় স্থাপিত হয় আজ তা বলা শক্ত, তবে আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ পঁয়ত্রিশ শতাব্দী নাগাদ নীল উপত্যকায় প্রথম নগরের উৎপত্তি ঘটে। বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত মন্দিরের বৃহৎ জমিদারীকে কেন্দ্র করে এবং বিরাট ভূ-সম্পত্তির অধিকারী ব্যক্তিবিশেষের ক্ষমতাকে আশ্রয় করে স্থানে স্থানে বিভিন্ন নগর একে একে আত্মপ্রকাশ করে (চিত্র 4.6)। মিশরীয় অর্থনীতি ছিল কৃষিনির্ভর। জনতার বড় অংশ কৃষির ওপর নির্ভরশীল ছিল। তাদের পণ্য বিনিময় ছোট বাজারে হত। তাই নীল নদ পর্য্যঙ্কের (Basin) নগর ইউফ্রেটিস-টাইগ্রিস পর্য্যঙ্কের অপেক্ষা আকারে অনেক ছোট ছিল (ভট্টাচার্য ও ভট্টাচার্য, 1977)! মিশরীয় নগরে দোকানদার, কারিগর, সরকারি কর্মচারী এবং পুরোহিত থাকা সত্ত্বেও কোন উল্লেখযোগ্য শিল্পকর্মের প্রচলন ছিল না, বা সেরকম বাণিজ্য সম্পাদিত হত না। এর ফলে নগরের লোকসংখ্যা খুবই সীমিত ছিল।

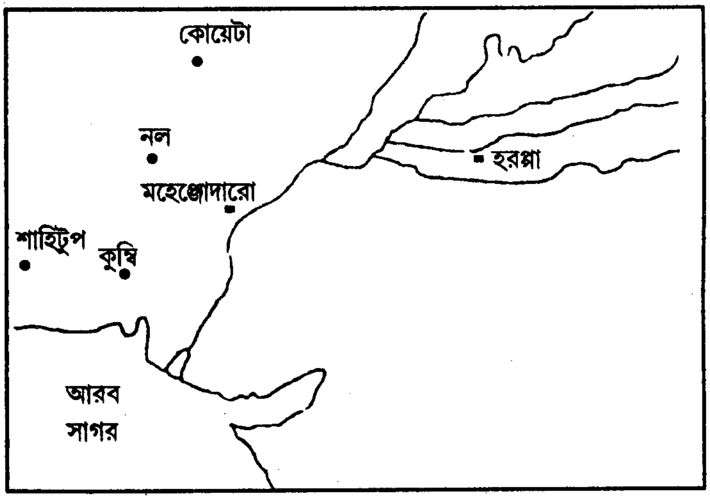

চিত্র - 4.7 সিন্ধু উপত্যকায় গড়ে ওঠা নগরসমূহ

c) **সিন্ধু অববাহিকা** (Indus Basin) :

সিন্ধু সভ্যতা কেবলমাত্র সিন্ধু উপত্যকাতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। কোয়াটার 70 মাইল দঃ পূর্বে অবস্থিত একটি বিরাট নগরীর ধ্বংসাবশেষ ইতিমধ্যে আবিষ্কৃত হয়েছে। গুজরাটের নর্মদা উপত্যকায় এবং এমনকি কচ্ছ উপকূলেও তৎকালীন অনেক পৌর বসতির অস্তিত্ব খননকার্য মারফৎ আজও আবিষ্কৃত হয়ে চলেছে। প্রথম দিকের সাধারণ গ্রাম্যবসতির ওপর পরবর্তীকালে নগরসভ্যতা গড়ে উঠেছে এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে গ্রাম্যবসতির আকস্মিক অবসান ও নগর সভ্যতার হঠাৎ আবির্ভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়। প্রকৃত অর্থে সিন্ধু অঞ্চলে জলসেচ এবং কৃষি ব্যবস্থাকে অবলম্বন করে নানা স্থানে স্থায়ী গ্রামীণ বসতি সৃষ্টি হবার কিছুকাল পরে অত্যন্ত আকস্মিকভাবে তা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং ঐ স্থানে একটি পূর্ণাঙ্গ উন্নত পৌর সভ্যতা আত্মপ্রকাশ করে (চিত্র 4.7)। সিন্ধু উপত্যকার পৌর বসতি সম্বন্ধে বিস্তারিত পরে আলোচনা করা হয়েছে।

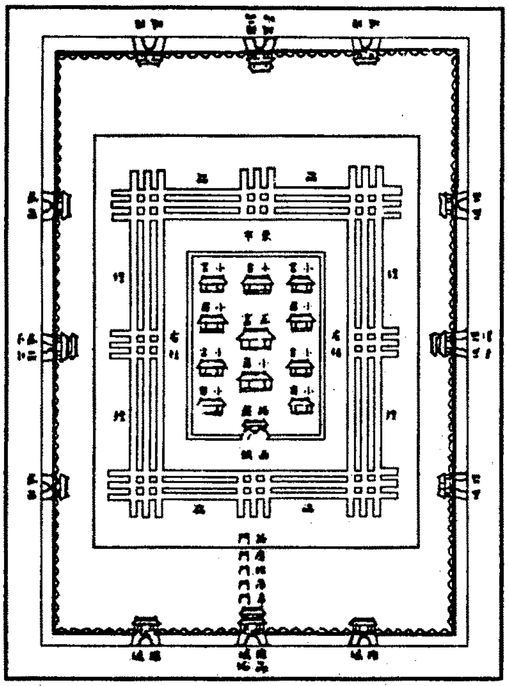

চিত্র - 4.8 প্রাচীন চীন শহরের বাহ্যিক চেহারা। চারদিকে গেটের উপস্থিতি নগরের প্রতিরক্ষার প্রশ্নটিকে তুলে ধরে।

d) হোয়াংহো অববাহিকা (Hwanho Basin) :

দূর প্রাচ্যের হোয়াংহো অববাহিকায় আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব দেড় সহস্রাব্দের কাছাকাছি সময়ে প্রাচীন নগর সভ্যতার বিকাশ ঘটে। সাঙ্ সভ্যতার অন্যতম স্মারক হিসেবে সাঙ্ নগর, চেংচো, আনিয়াং ইত্যাদি শহরগুলো উন্নত পৌর জীবনের অনেক সাক্ষ্য বহন করে। বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং হোয়াংহো নদীর জলকে খালের সাহায্যে সেচ কার্যে প্রয়োগ মারফৎ গম, যব এবং সম্ভবত ধান উৎপাদনে সাঙ্ সভ্যতা বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেছিল। প্রতিরক্ষার বিষয়টি এই সময়ের শহরের বিকাশে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। Wheatley-র এক চিত্র থেকে এটি পরিষ্কার হবে (চিত্র 4.8)।

e) মায়া সভ্যতা ঃ

খৃষ্ট জন্মের কয়েক শতাব্দী আগে উত্তর আমেরিকার দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত ইউকাটান, গুয়াটেমালা এবং মেক্সিকো নদী উপত্যকায় আর একটি নতুন সভ্যতার জন্ম হয়। এদের মধ্যে একমাত্র মায়া সভ্যতা ছাড়া অন্যান্য সভ্যতার বিশেষ পরিচয় জানা যায়নি। মায়া সভ্যতার আশ্রয়ে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নগর গড়ে ওঠে। যেমন টিকল, উকসাক্টান, চিচেন, ইটজা, মায়াপান, কোপান ও পালেন-ক্যুই। ভুট্টা এই অঞ্চলের প্রধান খাদ্য ছিল। সেচ ব্যবস্থার প্রচলন না থাকলেও নদী বাহিত উর্বর মৃত্তিকা এবং প্রচুর বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভরশীল উন্নত কৃষি ব্যবস্থা উদ্বৃত্ত ফসল উৎপাদনের মাধ্যমে নগর সৃষ্টির সহায়ক হয়।

৪.৫.২ প্রাচীন নগরগুলোর প্রাকৃতিক পরিবেশ ঃ

পশ্চিম এশিয়া, মিশর এবং সিন্ধু উপত্যকায় পৌর সভ্যতার উন্মেষকে গর্ডন চাইল্ড (Gordon Child) পৌর বিপ্লব (Urban revolution) নামে অভিহিত করেছেন। উত্তর চীন এবং মধ্য আমেরিকায় এই পৌর বিপ্লব

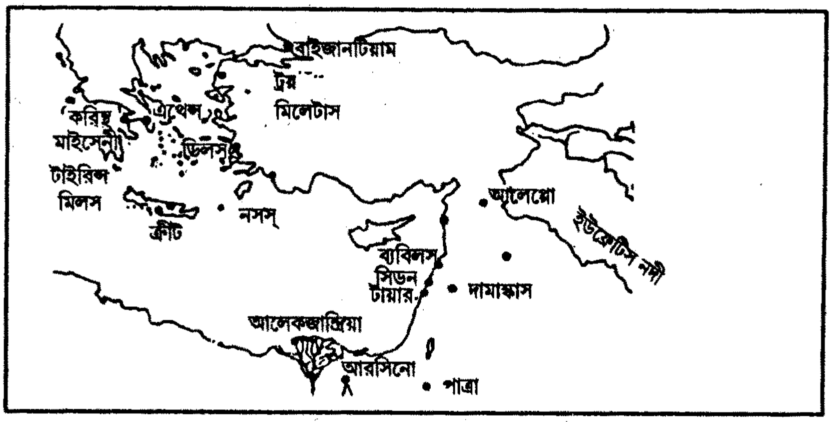

চিত্র - 4.9 ভূমধ্যসাগরীয় এলাকায় প্রাচীন নগরের বণ্টন

কিছু পরে ঘটে। আরো একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল প্রতিটি ক্ষেত্রে নগরগুলো ক্রান্তীয় মণ্ডলের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। উল্লিখিত প্রতিটি সভ্যতার জন্ম ছিল নদী উপত্যকায়। নদীগুলোর প্রকৃতিগত মিলও লক্ষ্য করার মত। উচ্চ পর্বত থেকে তুষার জলে পুষ্ট নদীগুলো ছিল চিরস্রোতস্বিনী এবং প্রতি বছর গরমে নদী তীরবর্তী অংশ বন্যা প্লাবিত হওয়ায় ও নতুন পলি জমা হওয়ায় জমির উর্বরতা বাড়ত। কৃষিকার্যের পক্ষে অনুকূল নদীর জল তৃষ্ণা নিবারণ ছাড়াও সেচ কাজে ব্যবহার হত। নদীপথ নাব্য হওয়ায় তা অনেক সময় পরিবহনের কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত। ক্রান্তীয় বলয় হল কঠিন শস্য যথা—গম, যব, ধান, ভুট্টা ইত্যাদি এবং মানুষের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় পশু যথা—গরু, ভেড়া, মোষ, ছাগল, ঘোড়া ইত্যাদির আদি জন্মভূমি। এই সমস্ত বুনো ফসল এবং পশুদের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক নিয়মকে লক্ষ্য করার ও তাদের জীবনচক্র সম্পর্কে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের সুযোগ এই অঞ্চলবাসীরা পেয়েছে। ক্রমে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও বন্য পশুর অভাব মানুষকে ফসল উৎপাদনে এবং পশুপালনে আগ্রহী করে তুলেছে। কৃষির জন্ম এবং পশুপালন হতে যে নতুন যুগের সূচনা হয় অদূর ভবিষ্যতে তা সমাজকে নতুন পথে চালিত করে এবং এই বিপ্লবাত্মক পরিবর্তনকে কেন্দ্র করে ধীরে ধীরে স্থায়ী জনপদ গড়ে ওঠে।

৪.৫.৩ প্রাচীন নগরের জনসংখ্যা ঃ

এই সমস্ত প্রাচীন নগরের কোনটাই জনসংখ্যা বা আয়তনের দিক হতে খুব বড় ছিল না। সুমেরীয় অথবা মেসোপটেমিয়ার নগরগুলোর গড় জনসংখ্যা 7,000 থেকে 20,000-র বেশি ছিল না। উর (Ur)-এর মোট আয়তন ছিল 220 একর, ইরেখের (Erech) আয়তন ছিল 2 বর্গমাইল। সিন্ধু অববাহিকায় অবস্থিত মহেঞ্জোদরোর আয়তন ছিল 1 বর্গমাইল এবং হরপ্পায় চারপাশের দেওয়ালের পরিধি ছিল মাত্র 2.5 মাইল। মিশরীয় নগর সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা না থাকলেও এল আমর্না (El Amarna)-র জনসংখ্যা 40,000-এর বেশি ছিল না।

৪.৫.৪ প্রাচীন নগরের বৈশিষ্ট্য ঃ

প্রাচীন নগরগুলোর অন্যান্য বৈশিষ্ট্যেরও উল্লেখ করা প্রয়োজন, যেমন নাগরিকদের অধিকাংশ কৃষিকার্যে রত থাকা সত্ত্বেও একটি অংশ বিশেষজ্ঞের কাজ করত। প্রত্যেক উৎপাদনকারীর কাছ থেকে উদ্বৃত্ত খাদ্য সংগ্রহ করে শস্যগোলায় মজুত রাখা হোত এবং তা শাসক ও বিশেষজ্ঞ শ্রেণীর ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত থাকত। সমাজ নানা শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল এবং রাজা ও পুরোহিত সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী ছিল। মজুত শস্যের হিসেব ও সময়ের হিসেবের চর্চা হতে ক্রমে ক্রমে পাটীগণিত, জ্যামিতি এবং জ্যোতির্বিদ্যার জন্ম হয়।

৪.৫.৫ নগর সভ্যতার প্রসার ও সংকোচন ঃ

ইউফ্রেটিস-টাইগ্রিস নদীর নিম্ন অববাহিকা হতে প্রাচীন সভ্যতা ক্রমে ক্রমে অন্তর্বর্তী অঞ্চলে, পশ্চিমে মাইনর ও সিরিয়া এবং আরো পশ্চিমে ক্রীট দ্বীপ এবং গ্রীস পর্যন্ত প্রসারলাভ করে। খ্রীষ্টপূর্ব আড়াই হাজার বছর নাগাদ ক্রীট দ্বীপে নসস্ এবং মালিয়া নগরের জন্ম হয়। এর আনুমানিক 300 বছর পর ব্যাবিলনের আবির্ভাব হয়। খ্রীষ্টপূর্ব ষোড়শ শতাব্দীতে গ্রীকদের সাহায্যে এশিয়া মাইনরে ট্রয় (Troy) এবং তাদের নিজ ভূখণ্ডে মাইসেনীর পত্তন হয়। কিন্তু কয়েক শতাব্দীর মধ্যে ক্রীট এবং গ্রীকদের প্রতিষ্ঠিত নগরগুলোর বিলুপ্তি ঘটে। সমসাময়িক অন্যান্য নগরের মধ্যে গাজা, আলেপ্পো এবং দামাস্কাসের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। নগর সভ্যতার বিস্তার এবং নগরের সংখ্যা বৃদ্ধি সত্ত্বেও শহর সৃষ্টির শুরু থেকে পরবর্তী দুই সহস্র বছর পর্যন্ত নগরের ক্ষেত্রে বিশেষ কোন উন্নতি পরিলক্ষিত হয়নি।

৪.৫.৬ প্রাচীন নগর বিকাশের কারণ ঃ

খ্রীষ্টপূর্ব ত্রয়োদশ শতাব্দী নাগাদ এশিয়া মাইনরে প্রথম লোহার ব্যবহার নগর সভ্যতায় বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন সূচিত করে। কৃষি এবং চক্রযানে লোহার ব্যবহার সমাজকে অনেক সক্রিয় এবং সমৃদ্ধশালী করে তোলে। ধাতু শিল্পের প্রসার ঘটায় নগরগুলো ক্রমশ বাণিজ্যের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে এবং বাণিজ্যের সুযোগ নগর উৎপত্তির মূল কারণ হয়ে দাঁড়ায়। পশ্চিম এশিয়া এবং মিশরের মধ্যে বহুকাল ধরে অনবরত যুদ্ধের ফলে অনেক নগর সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়। অন্যদিকে, খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চদশ শতাব্দীতে সিন্ধু সভ্যতার পতন ঘটে। যুদ্ধে কৃষি ব্যবস্থারও ক্ষতি হয়। এর ফলে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা নগর সৃষ্টির প্রতিকূল হয়ে দাঁড়ায়। এই সময় থেকে নগর সভ্যতা ধীর পদক্ষেপে নতুন অথচ অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর এবং শীতল জলবায়ু-অধ্যুষিত ভৌগোলিক পরিবেশে আত্মপ্রকাশ করতে থাকে।

৪.৬ পৌর সভ্যতার দ্বিতীয় পর্ব ঃ

এই পর্বকে আবার তিনটি উপভাগে ভাগ করা যায়। যথা (ক) **গ্রীক ও রোমান সভ্যতার যুগ (খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ থেকে চতুর্থ খ্রীষ্টাব্দ)** : পৌর সভ্যতার দ্বিতীয় পর্বের বিকাশ ঘটে খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ থেকে চতুর্থ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে গ্রীক ও রোমান সভ্যতার আমলে। লোহার যন্ত্রপাতি এবং অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহার, অক্ষরের সাহায্যে লিখন প্রথা, উন্নত ধরনের পাল চালিত সমুদ্রগামী জাহাজ, মুদ্রা প্রথা, গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা এবং উপনিবেশ স্থাপনের মারফৎ উৎপাদন বৃদ্ধি, বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি এবং রাজ্যের প্রশাসনিক ব্যবস্থার উন্নতি নগরায়ণের গতিকে দ্রুততর করে তোলে। এর ফলে অসংখ্য নগরের সৃষ্টি হয়। গ্রীকদের দ্বারা স্থাপিত স্পার্টা, করিন্থ, মেগারা, বাইজেনটিয়াম, এথেন্স্, এপোলোনিয়া, পেলা প্রভৃতি নগর উল্লেখের দাবি রাখে। ইতালিতে এই সময়ে যে যে নগরগুলো গড়ে ওঠে সেগুলো হল রোম, পিসা, পেরুলিয়া, সিরাক্যুজ, এঙ্কোনা, নিওপলিস ইত্যাদি। ঔপনিবেশিকদের প্রভাবে এই সময়ে রোমানদের দ্বারা স্থাপিত সাম্রাজ্য ও তার প্রভাব উত্তরে ইংল্যান্ড থেকে রাইন নদী ও মধ্য ইউরোপ পর্যন্ত, পূর্বে অধুনা বলকান থেকে মধ্য এশিয়ার পশ্চিম প্রান্ত, পশ্চিমে স্পেন এবং দক্ষিণে উত্তর আফ্রিকার টিউনিসিয়া, লিবিয়ার উত্তরভাগ এবং মিশর পর্যন্ত বিস্তৃত হয় (চট্টোপাধ্যায়, 2000)।

উত্তরাঞ্চলের শীতল জলবায়ু অঞ্চলে নগরায়ণের প্রসার এবং বৃহৎ নগর সৃষ্টি রোমান সভ্যতার সর্বাপেক্ষা বড় অবদান। এই সব নগরের অনেকগুলো আজও বর্তমান, যেমন, লন্ডন, ব্রাসেলস, ইউট্রেক্ট ইত্যাদি। রোমান

সাম্রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত অনেক দুর্গকে আশ্রয় করে পরবর্তীকালে কিছু বিখ্যাত নগরের আবির্ভাব ঘটে। যেমন, অ্যানট্‌ওয়ার্প, ফ্রাঙ্কফুর্ট, হামবুর্গ, ওয়ারাশ, বুদাপেস্ট ইত্যাদি।

(খ) **অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ ঃ** রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর পাঁচশো খ্রীষ্টাব্দ থেকে এক হাজার খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়ে আল্পস পর্বতের উত্তরে ইউরোপের বাকি অংশে নগর সভ্যতার বিবর্তন প্রায় থেমে থাকে। এই সময়কে "অন্ধকারাচ্ছন্নযুগ" বলে। আনুমানিক এক হাজার খ্রীষ্টাব্দ থেকে আবার ইউরোপের ঐ অংশে নগরায়ণের পক্ষে অনুকূল আবহাওয়া গড়ে উঠতে থাকে। ফলে রাজধানী ও বন্দরাশ্রয়ী নগরগুলোর সার্বিক উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। পূর্ব ইউরোপের পোল্যান্ড, রাশিয়ার তৃণভূমি অঞ্চল এবং মধ্য ও নিম্ন দানিয়ুবের প্লাবনভূমি এলাকায় অনেকগুলো নতুন নগর গড়ে ওঠে।

বহুদিন ধরে একটা মতবাদ চালু আছে যে খ্রীঃ পঞ্চম শতকে রোম সাম্রাজ্যের পতন শহর জীবনেও পতন ডেকে এনেছিল। কার্যতঃ কিছু সময়ের জন্য শিল্প ও বাণিজ্য স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলো। Perenne ইউরোপের অন্ধকার যুগকে বাজারবিহীন অর্থনীতি(An economy without market) হিসেবে দেখেছেন। অর্থনৈতিক এই মন্দার জন্য অনেক শহর জনশূন্য হয়ে পড়েছিলো, আবার অনেক শহরের জীবনযাত্রার মান নেমে গিয়েছিলো। বর্তমান গবেষকগণ অবশ্য মনে করেন যে রোমান সাম্রাজ্যের পতনকে খুব বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল।

(গ) **মধ্যযুগীয় পুনরুজ্জীবন :** মধ্যযুগে ইউরোপে নগরজীবনের পুনরুত্থান খুব ধীরে ধীরে ঘটেছিল। একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপে শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসার খুব একটা চোখে পড়ে নি। তবে প্রশাসনিক এবং বিশপ বা আর্চবিশপের ধর্মপ্রচারের কেন্দ্র হিসেবে এ সমস্ত নগর আত্মপ্রকাশ করলেও মধ্যযুগের প্রায় শেষের দিকে অর্থাৎ খ্রীষ্টিয় 1000 সালের পর এদের অধিকাংশ ব্যবসা-বাণিজ্য এবং শিল্পকর্মে মনোনিবেশ করে। দক্ষিণ ফ্রান্সে ঐ সময়ে ছোট ছোট দুর্গাকৃতি(Bastide) বসতিকে কেন্দ্র করে আর এক ধরনের নগর জন্মলাভ করে। রোমান শাসন ইউরোপে পৌরায়ণের গতিকে উদ্দীপ্ত করে।

দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বাৎসরিক মেলাকে কেন্দ্র করে ইউরোপে অনেকগুলো আন্তর্জাতিক মানের কেন্দ্র গড়ে উঠেছিলো। শহরের আয়তন বৃদ্ধির সঙ্গে শহরের সংখ্যাবৃদ্ধি ছিল এ যুগের শহর উন্নয়নের বৈশিষ্ট্য। বেশির ভাগ শহর-ই ছিলো ছোট। এর মধ্যে ফ্লান্ডার্স ও লিলেন ইংল্যান্ড থেকে আনীত পশমের ভিত্তিতে পশমবয়ন কেন্দ্র ও বাণিজ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠান রূপে খ্যাতি অর্জন করে। অন্যদিকে, ভূ-মধ্যসাগরীয় উপকূলে ভেনিস, জেনোয়া এবং ফ্রান্সের স্প্রুডোস অঞ্চলে আরোও কয়েকটি বন্দর প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের নানা রকম উৎকৃষ্ট শিল্পোৎপাদিত দ্রব্য আমদানী-রপ্তানীর প্রধান কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় ফ্ল্যান্ডার্সের লিনেন ও পশমবস্ত্র; সিরিয়া, পারস্য ও মিশরের সূক্ষ্মতর পশমবস্ত্র; জেনোয়া, ফ্লোরেন্স ও ভেনিসের উৎকৃষ্ট রেশমবস্ত্র ইত্যাদি ছাড়াও পশুলোম, চামড়া, স্বর্ণ, রৌপ্যদ্রব্য, কাঁচামাল হিসেবে পশম এবং লৌহ, গবাদি পশু, খাদ্যদ্রব্য এবং সর্বোপরি ক্রীতদাসের আদান-প্রদানের ভিত্তিতে উল্লিখিত মেলাকেন্দ্র ও ব্যবসা কেন্দ্রসমূহ আন্তর্জাতিক গুরুত্ব লাভ করেছিলো।

পৌরায়ণের দিক থেকে প্রাচীনকাল থেকে মধ্য যুগের শেষ পর্যন্ত সমগ্র ইউরোপের মধ্যে রাইনভূমি সর্বাপেক্ষা উন্নতি লাভ করেছিলো। রাইন অঞ্চলে হেসি (Hesse), ব্যাডেন (Baden) এবং আলসাস (Alsace)-এর প্রশস্ত উপত্যকা ইউরোপের একটি প্রাচীনতম বসতি অঞ্চল। রোমান আমলে এই অঞ্চল দ্রুত পৌরায়িত হয়ে ওঠে। রাইনভূমিতে অবস্থিত অনেক খ্যাতিসম্পন্ন নগর প্রকৃতপক্ষে রোমান আমল থেকে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। যেমন ন্যুস (Neuss), ড্যুরেন (Duren), কোব্লেঞ্জ (Coblenz), মেঞ্জ (Mainez), ফ্রাঙ্কফুর্ট (Frankfurt), উমস্ (Worms), ট্রাভেস (Traves), স্ট্রাসবেরী (Strasbury), ব্রাসেল (Brusle) ইত্যাদি।

রাইনভূমির মত দঃ পঃ জার্মানীতেও রোমান আমলে পৌর সভ্যতার উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটে। রাইনভূমিতে যেমন রাইন নদীর সমান্তরাল প্রধান বাণিজ্য পথের ওপর নগরগুলো গড়ে উঠেছিল, তেমনি দঃ পঃ জার্মানীর নগরগুলোও ইতালী ও উঃ পূঃ ইউরোপের মধ্যে যোগাযোগ সাধনকারী প্রধান সড়ক ও তাদের সংযোগস্থলে গড়ে ওঠে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় অস্‌বুর্গ (Augsburg), পাসাউ (Passau), সালজবার্গ (Salzburg) এবং কন্সন্টাস্ (Constance)।

তুলনামূলকভাবে মধ্য ও পূর্ব ইউরোপের অন্যান্য অংশে পৌরায়ণের প্রসার খুবই সীমাবদ্ধ ছিলো। এর প্রধান কারণ রোমান শাসন এবং পরবর্তীযুগে জার্মান প্রভাব এই অঞ্চলে বিকাশ হবার সুযোগ পায় নি। কিন্তু তৎসত্ত্বেও মধ্যযুগের শেষদিকে কৃষিকাজ ও ব্যবসা-বাণিজ্যে উন্নতির মাধ্যমে কতকগুলো বাজার কেন্দ্র, বাল্টিক উপকূলের কোন কোন নদীপথে বন্দর-নগর গড়ে ওঠে। এসব বাজার কেন্দ্রের মধ্যে ডর্টমুন্ড, হ্যানোভাকানরও ব্রান্সউইক, লিপজিজ, ড্রেসডন, বেসলেন এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

1400 খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিম-দক্ষিণ ও মধ্য ইউরোপে অনুকূল পরিবেশের জন্য অনেক শহর গড়ে উঠেছিলো। শহরের আয়তন বৃদ্ধির চেয়ে শহরের সংখ্যা বৃদ্ধি ছিল এযুগের শহর উন্নয়নের বৈশিষ্ট্য। বেশিরভাগ শহরই ছিল ছোট ও জনসংখ্যা কয়েক হাজারের বেশি ছিল না। রোগ, পয়ঃপ্রণালী, জল সরবরাহ ও আগুনের ঝুঁকিজনিত সমস্যা প্রভৃতি কারণে এ যুগে শহরের বিকাশ সম্ভব হয় নি। কিন্তু তৎকালীন যুগে নগরবাসীর সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল খাদ্য সমস্যা। পরিবহন ব্যবস্থা বিশেষ উন্নত না হওয়ায় আশপাশের অঞ্চল থেকে খাদ্যদ্রব্য আনা দুষ্কর ছিল। ষোড়শ শতাব্দীর পরবর্তীকালে অনেক নগরের কলেবর যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। উক্ত শহরগুলো রাজধানী শহর বা আঞ্চলিক ক্ষেত্র হিসেবে গড়ে উঠেছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে আমষ্টারডাম, আন্টওয়ার্প, লিসবন, রোম, সেভিল-এর লোকসংখ্যা এক লক্ষ ছাড়িয়ে গিয়েছিল। সেই সময় প্যারিসের লোকসংখ্যা 1,80,000 ; নেপল্‌স-এর 2,40,000 এবং লন্ডনের 2,50,000 হাজার ছাড়িয়ে গিয়েছিল।

এ প্রসঙ্গে এটা উল্লেখযোগ্য যে উপনিবেশ ও নতুন আবিষ্কারের দরুন নতুন বিশ্বের শহরগুলোর বাহ্যিক চেহারায় ইউরোপীয় শহরের ছাপ পড়েছিল। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে ইউরোপের প্রধান ভূখণ্ড থেকে অনেকদূরে স্পেন, পর্তুগাল, ফরাসী ও ব্রিটিশ উপনিবেশগুলোতে ইউরোপীয় ধাঁচে অনেক ছোট ছোট শহর গড়ে উঠেছিল।

অষ্টাদশ শতকে এদের সাথে যোগ হয়েছিল ব্যাবিলন, কোপেনহোগেন, মস্কো, পালেরমো (Paleromo), সেন্ট পিটার্সবার্গ, ভিয়েনা ও ওয়ারস্। এসব নগরের লোকসংখ্যা এক লক্ষ ছাড়িয়ে গিয়েছিলো।

সমীর দাশগুপ্তের মতে দ্বিতীয় নগর সভ্যতার প্রাক্কালের ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা গিয়েছিল ঃ

(1) অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য;
(2) বুর্জোয়া শ্রেণীর উদ্ভব;
(3) নগর আইন;
(4) বিশ্ববিদ্যালয়;
(5) পরিবেশ;
(6) শিল্পকলার স্তরবিন্যাস;

(1) **অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য** : অর্থনৈতিক বিকাশ এই সময়ে বাণিজ্যের ওপরই বেশি নির্ভরশীল ছিল। তাছাড়া, আর যে তিনটি উপাদান অর্থনৈতিক বিকাশকে ত্বরান্বিত করেছিল সেগুলো হল—

(i) কৃষি পদ্ধতির পুনর্বিন্যাস এবং জমিকে উর্বর করে তোলার চেষ্টা।

(ii) বিভিন্ন উৎপাদনকে কেন্দ্র করে বাণিজ্য যা বাহ্যত ক্ষুদ্র শিল্পের সূচনা করেছিল।

(iii) "বিনিময় অর্থনীতি"-র রূপান্তর এবং "মুদ্রা-অর্থনীতি"-র প্রবর্তন।

(2) **বুর্জোয়া শ্রেণীর উদ্ভব** : যতদিন পর্যন্ত বণিকগোষ্ঠী আগন্তুক হিসেবে পরিচিত ছিল এবং আইনসিদ্ধ ছিল না ততদিন তাদের "সামন্ততান্ত্রিক ধারণা"-র মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয় নি। ক্রমে ক্রমে এই বণিকগোষ্ঠী তৎকালীন সামন্ত প্রভুদের কাছ থেকে রাজনৈতিক রক্ষাকবচ দাবি করল। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এই বণিকগোষ্ঠী সমাজে এক সম্ভ্রান্ত এবং ক্ষমতাশালী মধ্যবিত্ত শ্রেণী হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায় এবং নগরসমাজের অর্থনৈতিক জগতে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে।

(3) **নগর আইন** : সামাজিক এবং রাজনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রে বুর্জোয়া শ্রেণী এরপর আইন তৈরি করতে যত্নবান হন। এই বণিকগোষ্ঠীর চাপে পড়ে তদানীন্তন নগরগুলো সামন্ততন্ত্রের অনুশাসন এবং নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত হল। এতে প্রত্যেক নগরবাসী সমাজে এক আইনসিদ্ধ প্রতিষ্ঠা লাভ করে ও কঠোর বন্দীদশা থেকে মুক্তি পায়। বণিকগোষ্ঠী যে কোন নগরে বাণিজ্য করার অধিকার ও অবাধ বাণিজ্যিক স্বাধীনতা দাবি করছিল। ধীরে ধীরে এই বণিকগোষ্ঠী জমি ও সম্পত্তির অধিকার ভোগ করা এবং বাণিজ্যিক বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য নগর আদালতের প্রবর্তন করবার জন্য আইন প্রতিষ্ঠা করতে উদ্যোগী হল। যখন নগর সমস্যা কঠিন হয়ে দাঁড়ালো তখন সৃষ্টি হল আঞ্চলিক আইনসিদ্ধ পুলিশী ব্যবস্থা। আয়কর, বাণিজ্যকর প্রভৃতির প্রবর্তন হল। এই কর নগর উন্নয়নের কাজে লাগাবার কথা বলা হল। "সিটি কাউন্সিল" (City Council) প্রচুর ক্ষমতার অধিকারী হয়ে নগর শাসনব্যবস্থার দায়িত্ব গ্রহণ করল।

(4) **বিশ্ববিদ্যালয়** : দ্বাদশ এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বেশ কিছু নগরে উচ্চশিক্ষার ব্যাপারটি ছিল অনেকটা অনিচ্ছাকৃত এক প্রয়াস। তদানীন্তন কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ছিল আধা স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানের মত, যেখানে ছাত্রছাত্রীরা আইনশাস্ত্র, ধর্মশাস্ত্র ও চিকিৎসাশাস্ত্র ইত্যাদি অধ্যয়ন করত। প্যারিসে ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে ছিল এক মধুর সম্পর্ক। বোলোগ্নাতে ছাত্ররা নিজেরাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরি করত ও সেখানে শিক্ষকদের পড়ানোর জন্য ভাড়া করত। অধ্যয়ন করা ছিল তখন সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার। অনেক বাদ্ বিসম্বাদের পর নগরসমাজ বিশ্ববিদ্যালয়কে মেনে নেয়।

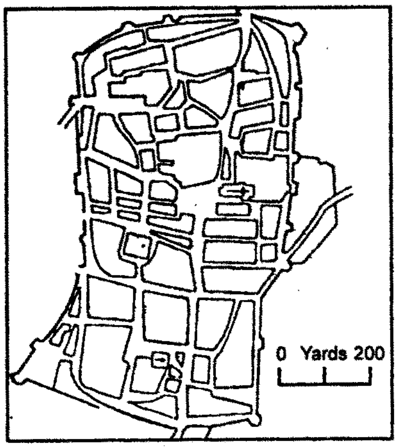

চিত্র - 4.10 মধ্যযুগের এক শহর (পূর্ব ফ্রান্সের ল্যানগ্রেস Langres)। প্রাচীন অপরিকল্পিত রাস্তা, কেন্দ্রীয় বাজার ও চার্চ এইসব শহরের বৈশিষ্ট্য।

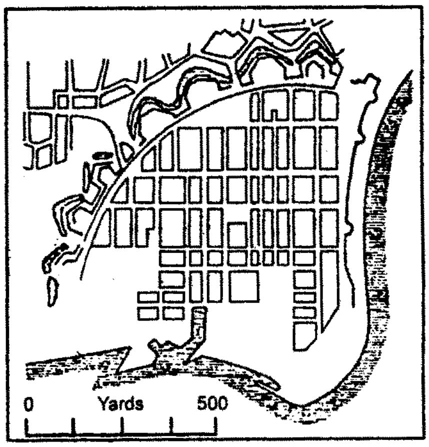

চিত্র - 4.11 ডেনমার্কের ফ্রেডারিকা (Fredarica)। শহর। রেঁনেসাসের প্রথম দিককার এই শহরে পরিকল্পনা ও ব্যাপক প্রতিরক্ষার দিকটা লক্ষণীয়।

(5) **পরিবেশজনিত গঠন** : পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত মোটামুটি সমস্ত নগরই ছিল দুর্গপ্রাকার (চিত্র 4.10 ও 4.11)। অঙ্গুরীয় গঠন ছিল নগরের প্রাকৃতিক গঠনের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য। নগরের দায়িত্ব ছিল রক্ষীবাহিনীর হাতে। ফলে নগর সম্প্রসারণের কোন সুযোগ ছিল না। জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও বস্তি এই সময় থেকেই শুরু হয়। যতদিন না পর্যন্ত কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা প্রথা চালু হয়, ততদিন পর্যন্ত এই সব নগর ছিল সামরিক শাসনাধীন এবং সেই অনুসারে প্রাকৃতিক গঠনও ছিল সামরিক কায়দায় বিন্যস্ত।

(6) **শিল্পকলার স্তরবিন্যাস** : প্রথম নগরসভ্যতার সময়কালে শিল্পকলা ছিল সাধারণ মানুষের সৃজনশীলতার এক অভিব্যক্তি। তদানীন্তন শিল্পচর্চা ছিল মূলত ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানেরই বহিঃপ্রকাশ। নাটক, স্থাপত্য, ভাস্কর্য এবং শিল্পকলা ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানেরই সুর বহন করত। কিন্তু দ্বিতীয় নগরসভ্যতার শেষভাগে শিল্পচর্চা অভিজাত শ্রেণীর মানুষের হাতে এসে পৌঁছোয়। এদের সৃজনশীলতা তখন গণসংস্কৃতির পথ ছেড়ে এক বিশেষ শ্রেণীর (অবশ্যই বুর্জোয়া শ্রেণী) জন্যই সৃষ্ট হয়।

৪.৭ এশিয়া ও আফ্রিকায় শহরের বিকাশ ঃ

পৃথিবীর কয়েকটি প্রাচীনতম শহরের জন্ম এই দুই মহাদেশে হয়েছিল। আজও এই দুই মহাদেশের বিস্তীর্ণ এলাকায় অনুকূল স্থান ছাড়া নগরের বিকাশ সম্ভবপর হয়নি। পাশ্চাত্য প্রভাবের আগে পর্যন্ত ভারত ও চীনের মত দেশে শহরবসতি বলতে গেলে বড় কৃষি বাজারকেই বোঝাত। কলকাতা, বোম্বাই (মুম্বাই), মাদ্রাজ (চেন্নাই), রেঙ্গুন, সিঙ্গাপুর ও ম্যানিলার মত বড় নগরগুলো পাশ্চাত্য বণিকরা বা প্রশাসকরা সমুদ্র বন্দর ও অন্ত্রাপোঁ (entrepot) হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছিল। এইসব শহরগুলোর কাজ ছিল ইউরোপীয় বাণিজ্যের যোগান ও বণ্টন ব্যবস্থা চালু রাখা।

বর্তমানে নানা দেশে পাশ্চাত্য ধরনের শিল্প চালু হলেও ভারত ও চীনের মতো কৃষিভিত্তিক দেশগুলোর প্রধান নগরগুলো হয় সাম্প্রতিক কালের, নয় তারা অতীতের প্রশাসনিক রাজধানী, যেমন পুরনো দিল্লী, আগ্রা, হায়দ্রাবাদ, পিকিং ও নানকিং বা ধর্মীয় স্থান যেমন বেনারস। এইসব দেশের ছোট ছোট শহর পরবর্তীকালে রেলপথের দৌলতে আরও ফুলে ফেঁপে উঠেছে। এদের বৈশিষ্ট্য অনেকটা ইউরোপের মধ্যযুগের শহরের মত। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এইসব শহর এক সময় দেওয়াল দিয়ে ঘেরা ছিল। কারিগর ও কৃষককুলের উৎপাদিত দ্রব্যের বিনিময় এই সব শহরকে টিকিয়ে রেখেছে (Hudson, 1970)

চীন বা ভারতের চেয়ে জাপান শহরায়নের দিক থেকে অনেক এগিয়ে আছে, যদিও এখানে প্রায় শতাব্দীকাল যাবৎ পাশ্চাত্য প্রভাব পড়েছে। জাপানে বাসযোগ্য এলাকা সীমিত হলেও এখানে আটটি মহানগর আছে। এখানে প্রায় 150-টি নগর আছে, যাদের লোকসংখ্যা এক লাখ বা তার কিছু বেশি। জাপানে সবচেয়ে বড় নগরগুলো শিল্প ও বাণিজ্যের কেন্দ্র। কিয়োটো, নাগোয়া ও টোকিও-র মত নগরের একটা অতীত আছে। যেমন বলা যায় কিয়োটো খ্রীঃ পূঃ 894 সালে দেশের রাজধানী ছিল। নাগোয়া ও টোকিও সামন্ততান্ত্রিক রাজ্যের প্রতিরক্ষা কেন্দ্র হিসেবে বিকাশ লাভ করেছিল। 1720 সালে টোকিও-তে দশ লক্ষের ওপর লোকসংখ্যা ছিল। সারণি 1.5 থেকে দেখা যাচ্ছে এশিয়ার অনেক দেশেই নগরায়ণের হার খুব কম। যেমন ইয়েমেন (11%), ভুটান (4%), নেপাল (4%), মায়ানমার (28%), শ্রীলঙ্কা (27%) ও বাংলাদেশ (12%)। এর কারণ হল জাপান (78%), কুয়েত (89%), সিঙ্গাপুর (100%) ও হংকং (90%)-এর তুলনায় পূর্বোক্ত দেশগুলোতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার খুব কম।

1945 সাল যাবৎ এশিয়ার বড় নগরগুলোতে জনবৃদ্ধি হয়েছে 450%। সেই তুলনায় ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকায় বৃদ্ধির হার হল মাত্র 160%। এ থেকে বলা যায় যে বর্তমান দশকগুলোতে এশিয়ার পৌর জনতার বৃদ্ধি পৃথিবীর অন্যান্য অংশের তুলনায় অনেক বেশি।

সারণি 5

এশিয়ায় পৌর বিকাশ

দেশ	জনসংখ্যার % হার		বাৎসরিক গড় বৃদ্ধির হার %	বৃহত্তম নগরে পৌর জনতার % হার
	1960	1981	1960-81	1981
ভুটান	2	4	4.4	–
বাংলাদেশ	5	12	6.5	30
নেপাল	3	6	5.0	27
আফগানিস্থান	8	16	5.8	17
মায়ানমার	19	28	3.9	23
ভারত	18	22	4.2	6
ভিয়েতনাম	15	19	3.3	21
শ্রীলঙ্কা	18	27	3.6	16
পাকিস্তান	22	29	4.3	21
চীন	18	21	4.5	–
ইয়েমেন	3	11	8.2	25
ইন্দোনেশিয়া	15	21	4.0	23
থাইল্যান্ড	13	15	3.4	69
ফিলিপাইনস্	30	37	3.7	30
পাপুয়া নিউ গিনি	3	19	8.2	25
মঙ্গোলিয়া	36	51	4.0	52
কোরিয়া ডো. রি.	40	60	4.3	12
কোরিয়া বি.	28	56	4.6	41
ইরান	34	51	5.0	28
ইরাক	43	72	5.3	55
মালয়েশিয়া	25	30	3.3	27
হংকং	89	90	2.5	100
ইস্রায়েল	77	89	3.1	18
সিঙ্গাপুর	100	100	1.5	100
সৌদি আরব	30	68	7.4	25
কুয়েত	72	89	7.5	30
ইউ. এ. আর.	40	73	16.6	–
জাপান	62	79	2.0	22

Source : World Development Report, 1984.

Population Reference Bureau-র মতে 2001 সালের মাঝামাঝি এশিয়ার পৌর জনসংখ্যা ছিল 1376 মিলিয়ান। অর্থনৈতিক বিকাশের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ বিপুল এই জনবৃদ্ধি আগামীদিনে অনেক সমস্যার সৃষ্টি করবে। এশিয়াতে 1950 সালে মহানগরের সংখ্যা ছিল 19। 1970 সালে তা বেড়ে দাঁড়াল 49 এবং 1990 সালে 85 তে। 1991 সালে চীনে মহানগরের সংখ্যা ছিল 38, ঐ সময়ে ভারতে 27-টি মহানগর ছিল।

ইউরোপের মত এশিয়ার নগরগুলোতেও গ্রাম থেকে বহু লোক চলে এসেছে। এই সব প্রব্রজনকারীদের অধিকাংশই হল অদক্ষ ও অশিক্ষিত কর্মী। তাই তারা শহরে এসে স্বল্প আয়ের অস্থায়ী কাজের ওপর নির্ভর করে ও প্রথমাবস্থায় বস্তি, এমনকি ফুটপাতে বসবাস শুরু করে।

আফ্রিকা ঃ আফ্রিকা মহাদেশে পৃথিবীর কয়েকটি প্রাচীন নগর রয়েছে। এদের মধ্যে নীল নদের উপত্যকায় অবস্থিত এ্যাফ্রোডিটোপলিস (Aphroditopolis) কায়রোর কাছে এবং আসোয়ানের কাছে হীরাকেমপলিস (Hierakempolis)-এর নাম উল্লেখ করতে হয়। আফ্রিকার অবস্থা কিছুটা এশিয়ার মত। কিন্তু এই মহাদেশে চিরদিন-ই অল্পসংখ্যক নগর রয়েছে। সাহারার দক্ষিণের পৌর বসতি সম্পর্কে অধিকাংশ লোকের কোন ধারণা ছিল না। কানো (Kano) ও বেনিন (Benin)-এর মত প্রাচীর বেষ্টিত শহর ছিল পশ্চিম আফ্রিকার স্থানীয় দেশীয় রাজ্যের রাজধানী পূর্ব উপকূলে মোগাডিসু (Mogadishu) ও জাঞ্জিবারের মধ্যস্থলে আরব বণিকেরা কয়েকটি মধ্যযুগীয় শহর প্রতিষ্ঠা করেছিল। এগুলো "দাস বন্দর" (Slave Ports) হিসেবে কুখ্যাত ছিল।

আরবদের অনুকরণ করে ইউরোপীয়রা সামরিক ছাউনি ও বন্দর তৈরি করেছিল। উদ্দেশ্য ছিল এখান থেকে নিরাপদে মহাদেশের অভ্যন্তরের সম্পদ আহরণ করা। ল্যাগোস (Lagos), আক্রা (Accra) ও মোম্বাসা (Mombasa) এইভাবেই সৃষ্টি হয়েছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ডাচ বণিকেরা কেপ টাউনকে হল্যান্ড ও দূরপ্রাচ্যের মধ্যে বাণিজ্যিক দ্রব্য সরবরাহের কেন্দ্র হিসেবে নির্বাচিত করেছিল। এর পরবর্তীকালে দেশের মধ্যে খনি ও প্রশাসন কেন্দ্র হিসেবে কয়েকটি শহর গড়ে উঠেছিল। যেমন জোহান্সবার্গ (যা পরবর্তীকালে আফ্রিকার সবচেয়ে বড় শিল্প ও আর্থিক কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে), এলিজাবেথভিল (বর্তমানে লুবুম্বাসী, কাটাঙ্গা এলাকার প্রধান কেন্দ্র), নাইরোবি (কেনিয়ার রাজধানী, কিন্তু মূলত উগাণ্ডা রেলপথের সদরদপ্তর) ও সালিসবারি (রোডেসিয়ার রাজধানী, 1890 সালে ব্রিটিশ সাউথ আফ্রিকা কোম্পানীর দপ্তর হিসেবে প্রতিষ্ঠিত)। এখন পর্যন্ত এই মহাদেশে শিল্প শহরের সংখ্যা তেমন একটা বেশি নয়। নীচের সারণিতে (4.6) পৌর বিকাশে পশ্চিম আফ্রিকার রাজধানী নগরের বিকাশে শিল্পের ভূমিকা দেখানো হল।

সারণি 4.6

পশ্চিম আফ্রিকায় রাজধানী নগরের বিকাশে শিল্পের অবদান (1990)

রাজধানী নগর	% অংশ
ডাকার (সেনেগাল)	87
নামিবিয়া	100
কোনাক্রি (গিনি)	50
ফ্রি টাউন (সিয়েরা লিওন)	75
মনরাভিয়া (লাইবেরিয়া)	100
আবিদজান (আইভরি কোস্ট)	63
আক্রা (ঘানা)	30
লাগোস (নাইজিরিয়া)	35

বর্তমানে পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশের বেশি লোক 20,000-র বেশি লোকসংখ্যা-অধ্যুষিত শহরে বাস করে। আফ্রিকাতেও বিশ হাজার জনসংখ্যার বেশি কয়েকটি শহর রয়েছে, যেমন মিশর, দক্ষিণ আফ্রিকা, আলজিরিয়া, মরক্কো, টিউনিসিয়া ও সেনেগাল প্রভৃতি রাষ্ট্রে। এই সব দেশে আফ্রিকার সবচেয়ে বড় নগর অবস্থিত রয়েছে, যেমন কায়রো, আলেকজান্দ্রিয়া, জোহান্সবার্গ, কেপ টাউন, ডারবান, আলজিয়ার্স, ক্যাসাব্ল্যাঙ্কা ও ডাকার। এই মহাদেশে শহরের সংখ্যা বাড়ছে (সারণি 4.7)। আফ্রিকার শ্বেতকায় শাসকেরা সুন্দর সুন্দর শহর তৈরি করেছে। এই সব নতুন নগরের চারপাশে, এমন কি পুরনো ইউরোপীয় নগরের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে (যেমন জোহান্সবার্গ) গ্রামবাসীরা, বিশেষ করে পুরুষেরা, এসে ভীড় করছে। ফলে বস্তির জন্ম হচ্ছে। আফ্রিকার শহরগুলো শুধু নোংরাই নয়, এখানকার পৌর পরিষেবার মান খুব নীচু।

সারণি 4.7
আফ্রিকায় পৌর বিকাশ, 1981

দেশ	জনসংখ্যার % হার		বাৎসরিক গড় বৃদ্ধির হার %	বৃহত্তম নগরে পৌর জনতার % হার
	1960	1981	1960-81	1981
চাদ	7	19	6.5	39
ইথিওপিয়া	6	14	5.5	37
মালি	11	19	4.6	24
মালাবি	4	10	7.0	19
জাইর	16	36	7.5	28
উগাণ্ডা	5	9	3.4	52
বুরুন্ডী	2	2	2.7	–
আপার ভোল্টা	5	11	6.0	41
রুয়ান্ডা	2	4	6.4	–
সোমালিয়া	17	31	5.4	34
তানজানিয়া	5	13	8.6	50
গিনি	10	20	6.0	80
বেনিন	10	15	4.1	63
সিয়েরা লিওন	13	22	4.4	47
মাদাগাস্কার	11	19	5.2	36
নাইজার	6	13	7.2	31
মোজাম্বিক	4	9	8.2	83
সুদান	10	26	7.1	31
টোগো	10	21	6.6	60
ঘানা	23	37	5.0	35
কেনিয়া	7	15	7.3	57
সেনেগাল	23	34	3.7	65
মাউরিটানিয়া	3	24	8.1	39
দঃ আফ্রিকা	47	50	3.1	13
লাইবেরিয়া	20	44	5.6	12
টিউনিসিয়া	36	53	4.0	30

দেশ	জনসংখ্যার % হার		বাৎসরিক গড় বৃদ্ধির হার %	বৃহত্তম নগরে পৌর জনতার % হার
	1960	1981	1960-81	1981
লোসোথো	2	12	16.1	–
আলজিরিয়া	30	44	5.6	12
জাম্বিয়া	23	44	6.5	35
লিবিয়া	23	54	8.1	64
মিশর	38	44	2.9	39
এ্যাঙ্গোলা	10	22	5.8	64
আইভোরি কোষ্ট	19	41	8.3	34
মরক্কো	29	41	4.6	26
নাইজিরিয়া	13	21	4.8	17
জিম্বাবোয়ে	13	24	6.3	50
ক্যামেরুন	14	36	7.4	21
কঙ্গো	30	46	4.4	56

Source : World Development Report, 1984.

৪.৮ নতুন বিশ্বে শহরের উৎপত্তি ঃ

খ্রিস্টের জন্মের আগে পর্যন্ত দুই আমেরিকায় প্রাচীনতম শহরের নিদর্শন পাওয়া যায় না। কিন্তু 300-900 খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে মধ্য আমেরিকায় মায়া ও তার সমকক্ষ সভ্যতার সন্ধান মিলেছে বেশ কয়েকটি শহরে। এদের মধ্যে গুয়েতামালার টিকল (Tikal), যুটাকান (Yutacan), জিবিলচালটান (Dzibilchaltun) ও বর্তমান মেক্সিকো নগরের কাছে টিওটিহুক্যান (Teotihuacan) শহরের নাম করতে হয়। আরও কিছুকাল পরে অর্থাৎ 1000 খ্রিষ্টাব্দে চিচেন (Chichen), ইটজা (Itza) নগরের জন্ম হয়েছিল। মায়াদের উত্তরাধিকারী টোলটেকরা (Toltec) এই সব শহর গড়েছিল। সুন্দর স্থাপত্যের জন্য এই সব নগর বিখ্যাত ছিল। ভুট্টা এই অঞ্চলের প্রধান খাদ্য ছিল। জলসেচ ব্যবস্থা না থাকলেও নদী গঠিত উর্বর পলিমাটি ও প্রচুর বৃষ্টিপাতের ওপর নির্ভরশীল এই কৃষিব্যবস্থা বাড়তি ফসল উৎপাদনে সাহায্য করেছিল। লাঙ্গল, চক্রযান বা গৃহপালিত পশু কোনটাই এই সব নগরে ছিল না। কৃষিসমৃদ্ধ এই সব নগর পুরোহিত, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, জ্যোতির্বিদ ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের ভরণপোষণে সক্ষম ছিল। পরবর্তীকালে ত্রয়োদশ শতাব্দী নাগাদ আন্দিজ অঞ্চলে সংস্কৃতিসম্পন্ন ইনকারাও নগরসভ্যতার পত্তন করেছিল। উত্তর আমেরিকায় নগরায়ণের সূত্রপাত করেছিল ইউরোপীয়রা, বিশেষ করে ফরাসী ও ইংরেজরা। দক্ষিণ আমেরিকায় স্পেনীয় ও পর্তুগালরা নগর জীবনের সূচনা করেছিল "It was Europeans, chiefly French and English in North America, Spaniards and Portuguese in South America, who introduced the idea of the city into most parts of the Americas" (Hudson, 1970)। কৃষক ও জেলেদের ছোট ছোট দলের প্রয়োজনে গড়ে ওঠা ছোট

বাজার, শহর ও সেবা কেন্দ্র (Service Centre) ছাড়া এই সব নতুন দেশে প্রধান প্রধান শহর বসতি সমুদ্র বন্দর হিসেবে গড়ে উঠেছিল। ক্রমে ক্রমে জলপথ ও রেলপথ গড়ে উঠলে দেশের অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহ করা সহজ হল। তার ভিত্তিতে গড়ে উঠল বাণিজ্য ও শিল্প কেন্দ্র। মন্ট্রিল, বোস্টন, নিউ ইয়র্ক, ফিলাডেলফিয়া, রিও-ডি জেনেরা ও বুয়েনস এয়ার্স বিখ্যাত হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে উত্তর আমেরিকার অভ্যন্তরভাগে অর্থনৈতিক বিকাশ ঘটলে বড় বড় নগরের উৎপত্তি হয়েছিল, বিশেষ করে দ্রুত বিকাশশীল যুক্তরাষ্ট্রে। এদের মধ্যে আছে চিকাগো, ড্রেটয়েট, পিটস্‌বার্গ ও সেন্ট লুইস্। দক্ষিণ আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ায় বড় বড় নগরগুলো উপকূলকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছিল। অবশ্য এর একটা ব্যতিক্রম ছিল, যেমন বগোটা।

প্রশাসনিক প্রয়োজন ওয়াশিংটন নগরের বিকাশে প্রেরণা জুগিয়েছিল। আংশিকভাবে তা ওটোয়া নগরের বিকাশে সাহায্য করেছিল। উত্তর আমেরিকার প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূল অঞ্চলে প্রচণ্ড জনসমাবেশ লস্ এঞ্জেলস্, স্যান ফ্রান্সিসকো, সিটল ও ভ্যাঙ্কুভার ইত্যাদি নগরের দ্রুত বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছিল। 1860 সালে লস্ এঞ্জেলস্-এ পাঁচ হাজার লোক বাস করতো। কিন্তু 1900 সালে এর জনসংখ্যা এক লক্ষে এবং 1932 সালে দশ লক্ষে পৌঁছেছিল। বর্তমানে লস্ এঞ্জেলস্-এর প্রায় এক কোটির মত লোকসংখ্যা এর বিরাট মহানগর (Metropolis) এলাকায় বাস করে। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে এক লক্ষের ওপর জনসংখ্যা-বিশিষ্ট দু'শটি (200) নগর আছে। এমন কি, ব্রাজিলের (দঃ আমেরিকা) মত এলাকাতে সাতটি বড় নগর আছে (নতুন রাজধানী ব্রাসিলিয়াকে ধরে)।

সারণি (নং 4.8) থেকে দেখা যাচ্ছে যে দক্ষিণ আরেরিকার কোন কোন দেশে পৌর জনসংখ্যার শতকরা হার বেশি, যেমন আর্জেন্টিনা, চিলি, উরুগুয়ে, ভেনেজুয়েলা, ব্রাজিল ও কিউবা। দক্ষিণ আমেরিকার বেশির ভাগ শহরের পৌর জনতা প্রধান প্রধান নগরে বাস করেন। লাটিন আমেরিকার 22-টি দেশের মধ্যে 16-টি দেশে অর্ধেকের বেশি মানুষ প্রধান প্রধান নগরে বাস করেন। অন্যদিকে, জামাইকা, গুয়েতামালা ও হাইতির আশী ভাগের বেশি পৌর জনতা রাজধানী নগরে বাস করেন। ল্যাটিন আমেরিকায় ব্যাঙের ছাতার মত নগরী গজিয়ে ওঠা একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। 1950-60-র দশকে20,000 ও তার বেশি জনতা-অধ্যুষিত শহরগুলো 5 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই বৃদ্ধি প্রধানত গ্রাম থেকে শহরে পরিযানের দ্বারা ঘটেছে।

সারণি 4.8

ল্যাটিন আমেরিকায় পৌর বিকাশ

দেশ	মোট জনসংখ্যার % হার		বাৎসরিক গড় বৃদ্ধির % হার নগরের জনসংখ্যার % হার		500,000-এর বেশি জনতা অধ্যুষিত জনসংখ্যার % হার	বৃহত্তর নগরে জনসংখ্যার % হার		500,000-র বেশি জনসংখ্যা বিশিষ্ট নগরের সংখ্যা
	1960	1980	1960-1970	1970-1981	1960	1981	1981	1981
হাইতি	16	28	4.0	4.7	0	56	56	1
বলিভিয়া	24	45	3.9	6.9	0	44	44	1
হন্ডুরাস	23	36	5.4	5.5	0	0	33	0
এল সালভাডোর	38	41	3.2	3.4	0	0	22	0
নিকারাগুয়া	41	54	4.0	5.0	0	47	47	1

দেশ	মোট জনসংখ্যার % হার		বাৎসরিক গড় বৃদ্ধির % হার নগরের জনসংখ্যার % হার		500,000-এর বেশি জনতা অধ্যুষিত জনসংখ্যার % হার	বৃহত্তর নগরে জনসংখ্যার % হার		500,000-র বেশি জনসংখ্যা বিশিষ্ট নগরের সংখ্যা
	1960	1980	1960-1970	1970-1981	1960	1981	1981	1981
কিউবা	55	66	2.9	1.9	38	32	38	1
গুয়েতামালা	33	39	3.8	3.9	41	36	36	1
পেরু	46	66	5.3	3.5	38	44	39	2
ইকোয়েডর	34	45	4.4	4.6	0	51	29	2
জামাইকা	34	42	2.4	2.5	0	66	66	1
ডমিনিকা রি	30	52	5.6	5.3	0	54	54	1
কলম্বিয়া	48	64	5.2	2.6	28	51	26	4
কোস্টারিকা	37	44	4.2	3.6	0	64	64	1
প্যারাগুয়ে	36	40	2.9	3.3	0	44	44	1
পানামা	41	55	4.4	3.6	0	66	66	1
ব্রাজিল	46	68	4.7	3.9	35	52	15	14
মেক্সিকো	51	67	4.7	4.2	36	48	32	7
আর্জেন্টিনা	74	83	2.0	2.0	54	60	45	5
চিলি	68	81	3.1	2.4	38	44	44	1
উরুগুয়ে	80	84	1.3	0.6	56	52	52	1
ভেনেজুয়েলা	67	84	4.7	4.2	26	44	26	4
ত্রিনিদাদ	22	22	1.8	1.4	–	–	–	–

Source : World Development Report, 1983, pp. 190-91.

৪.৯ প্রাক্-শিল্পনগর : (Pre-industrial City)

পশ্চিমী নগর সম্পর্কে এ পর্যন্ত ব্যাপক অনুসন্ধান ও আলোচনা হয়েছে। যেহেতু এই সব নগরের বিকাশ প্রধানত শিল্পোন্নয়নের সঙ্গে সম্পর্কিত, তাই এদের সাধারণতঃ শিল্প নগর (Industrial City) বলা হয়ে থাকে। অন্যদিকে আফ্রিকা, এশিয়া ও ল্যাটিন আমেরিকার শহর ও নগরগুলো সম্পর্কে গবেষণা কমই হয়েছে। একটি উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম হল Gideon Sjoberg-এর 'The Pre-Industrial City, নামে বইটি। এখানে তিনি ইউরোপ ও পৃথিবীর অন্যত্র প্রাক্-শিল্প যুগের পৌরায়ণ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে সমাজ তিনটে পর্যায়ে গড়ে ওঠে। প্রথমটি হল স্বয়ংসম্পূর্ণ, প্রাক্-অক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন লোকসমাজ যেখানে কোন শহর গড়ে ওঠেনি। এর পরে আসল বংশ-পরম্পরা কৃষি-সমাজ। সীমাবদ্ধ কারিগরী জ্ঞান ও প্রাক্-শিল্প শহর এই সমাজের বৈশিষ্ট্য। সবশেষে আসল শিল্পময় উন্নত শহরভিত্তিক সমাজ। তাই বলা চলে পাশ্চাত্য নগর প্রাক্-শিল্প নগরেরেই এক বিবর্তিত ধাপ।

এই সব নগরের জনসংখ্যা ছিল দশ হাজারেরও কম। প্রকৃতির ওপর আশ্রয় করেই গড়ে উঠেছিল তদানীন্তন নগরসভ্যতা। তা ছাড়া রাজনৈতিক স্থায়িত্ব ছিল না বললেই চলে। প্রাক্ শিল্পনির্ভর সমাজ মূলত ছিল শাসন এবং ধর্মকেন্দ্রিক। অবশ্য বাণিজ্য উপাদান গৌণ ভাবে উপস্থিতও ছিল। অভ্যন্তরীণ ভূমিব্যবস্থার গড়নের কথা আলোচনা করলে বলা যায় যে "এলিট" শ্রেণীর মানুষেরা নগরের কেন্দ্রস্থলে বসবাস করত এবং নিম্নশ্রেণীভুক্ত মানুষেরা নগরপ্রান্তে বসবাস করত। পেশাগত এবং জাতিগত বিশেষত্ব ছিল ভূমিব্যবস্থা এবং প্রয়োগনীতির মূল উপাদান। বিশেষ বিশেষ পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তিরা এক একটি অঞ্চলে বসবাস করত। সামাজিক-অর্থনৈতিক অসংহতির ফলে ভূমি ব্যবস্থাও সুসংহত ছিল না। কোন এক বিশেষ ভূমি বিভিন্ন ভাবে ব্যবহৃত হত।

প্রাক্-শিল্পনির্ভর সমাজে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন শ্রেণীর মানুষেরা (সংখ্যায় কম) কথাবার্তা, চালচলন ইত্যাদির মাধ্যমে তাদের আভিজাত্য এবং মর্যাদাবোধ প্রকাশ করতেন। প্রশাসন, ধর্ম এবং শিক্ষাব্যবস্থার চাবিকাঠি ছিল তাদেরই হাতে। অপরপক্ষে, বিপুল সংখ্যক নিম্নমর্যাদাসম্পন্ন শ্রেণীর মানুষ ছিলেন শহরবাসী এবং আর এক দল ছিলেন গ্রামের কৃষক। এই দুই শ্রেণীর মধ্যে সামাজিক, অর্থনৈতিক বৈষম্যের মাত্রা খুব বেশি পরিমাণে ছিল অর্থাৎ স্তরবিন্যাসের সূচনা তখন থেকেই হয়। নিম্নশ্রেণীর নাগরিকদের কাজ ছিল অভিজাত শ্রেণীর মানুষের হুকুম তামিল করা। অবশ্য পরিবর্তিত রাজনৈতিক পদ্ধতির মাধ্যমে মাঝে মাঝে কিছু নিম্নশ্রেণীভুক্ত মানুষ অভিজাতশ্রেণীর গণ্ডীর মধ্যে প্রবেশাধিকার পেত। বিবাহ পদ্ধতি ছিল পারিবারিক। ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের রীতি তুলনায় অনেক কম ছিল। পরিবার ছিল যৌথ এবং যৌথ পরিবার পদ্ধতি অভিজাত শ্রেণীর মানুষের মধ্যেই দেখা যেত, কারণ দরিদ্র মানুষের পক্ষে এক ছাদের তলায় পরিবারের সকলের ভরণ-পোষণ করানো সম্ভব হত না। ফলে তারা এক famile souche-এর প্রবর্তন করেছিল। এই সব দরিদ্র পরিবারের মানুষেরা Culture of Poverty-এর শিকার ছিল এবং মৃত্যুহার, অপুষ্টি ইত্যাদি ছিল তাদের নিত্যসঙ্গী (দাশগুপ্ত, 1983)।

অভিজাত পরিবারে পুরুষের প্রাধান্য ছিল বেশি। "মর্যাদাসম্পন্ন" মহিলারা সামাজিক কাজকর্ম থেকে বিরত থাকতেন। কিন্তু নিম্নশ্রেণীর পরিবারের বধূরা সংসার এবং সমাজের দায়িত্ব পালন করত। পরিবার ছিল "সমাজবদ্ধতার" মূলকেন্দ্র। প্রাক্-শিল্পনির্ভর সমাজে প্রযুক্তি এবং অর্থনৈতিক সংস্থা ছিল সরল। অভিজাত মানুষেরা বাণিজ্যিক কাজ-কর্ম, হাতের কাজ কিংবা কায়িক পরিশ্রম করতেন না। এই ধরনের পেশা সাধারণত নিম্নমর্যাদাসম্পন্ন মানুষরাই করতেন। "গিল্ড প্রথা" ছিল তখনকার অর্থনৈতিক গঠনের ভিত্তি। কারণ "Through the guilds, handicraftsmen, merchants and members of various service occupations seek to minimize competition, determine standards and prices and control the recruitment and training of personnel in their particular economic activity". বিভিন্ন ধরনের মুদ্রা একই সময়ে ব্যবহৃত হত। বিভিন্ন পদ্ধতির ওজনের প্রচলন ছিল। ভেজাল দেবার পদ্ধতি তখন উৎপন্ন দ্রব্যের গুণগত মানকে নষ্ট করে দিত। শিক্ষার প্রচলন তুলনামূলকভাবে কম থাকায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকলার উন্নতি তেমন দ্রুতগতিতে হওয়া সম্ভবপর ছিল না। ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সম্ভাবনা ছিল কম। অভিজাত শ্রেণীর মানুষ ছিল রাজনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু।

"The political apparatus tends to be strongly centralized with the chief provincial and local administrators...being personally accountable to the leader in the capital". "রাজনৈতিক আমলাতন্ত্র" ছিল তৎকালীন প্রাক্-শিল্পনির্ভর সমাজের রাজনৈতিক গড়নের মূল ভিত্তি। আমলাতন্ত্র ছিল ধর্মের প্রধান পৃষ্ঠপোষক। তদানীন্তন নাগরিকদের নিয়ন্ত্রণ করবার জন্যই আমলাতন্ত্র কিছু বিধি চালু করেছিল।

"The religious personnel and their functions and beliefs exhibit the same tripartite (elite, lower class, outcaste) division that is so apparent in other realms of activity in the pre-

industrial urban order" সবশেষে বলা যায় ফলিত এবং প্রকল্পিত বিজ্ঞানের চর্চা তৎকালীন সমাজের তুলনায় অনেক কম হত। প্রযুক্তিকলার যতটুকু প্রয়োগবিধি ছিল তা মূলত নিম্নমর্যাদা শ্রেণীর জনগণ নিয়ন্ত্রণ করত। শিক্ষিত জনগণ বিজ্ঞানের চর্চায় নিজেদের নিয়োজিত না করে ঐতিহ্যকেই বেশি মর্যাদা দিত "The elite's avoidance of practical pursuits and work with the hands has further sundered the theoretical aspects of knowledge from the practical".

প্রাক্-শিল্প শহর এমনই এক স্থায়ী বসতি যেখানে সচরাচর ঘিঞ্জি বাসগৃহ লক্ষ্য করা যায়। এগুলো কোন পরিকল্পনা ছাড়াই গড়ে উঠেছে। তাই এখানে বাড়ি, দোকান, কর্মস্থল এলোপাতাড়িভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে। বাড়িঘরদোরের উচ্চতা ও আয়তনে এক সাধারণ সমতা লক্ষ্য করা যায়। মাঝে মাঝে কোন সংস্থার বড় বড় বাড়ি বা ধর্মীয় স্থানের চুড়ো মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকে। প্রাচীর বেষ্টিত দেওয়াল বা পরিখা দিয়ে নগরটির প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করা হয় (চিত্র 4.12)। এই সব নগরের কর্ম হল বিভিন্ন পণ্যের বাণিজ্যিক আদান প্রদান।

চিত্র - 4.12 মধ্যযুগের একটি শহর, জার্মানীর নুরেমবার্গ, তুলনামূলকভাবে ঘন সন্নিবিষ্ট দেয়াল দিয়ে ঘেরা এই শহরটির বৈশিষ্ট্য হল শহরের দেয়ালের বাইরে কৃষিকাজ করা হয়।

প্রাক্-শিল্প শহরগুলো অধিকাংশই পুরনো। এদের প্রত্যেকটির জনসংখ্যা 50,000-র বেশি। ভারত ও চীনে (চিত্র 4.13) এই ধরনের শহরে পাশ্চাত্যের ছোঁয়া লেগেছে কম। তাই বলা যেতে পারে যে আধুনিক শিল্পনগরগুলোর চেয়ে মধ্যযুগীয় নগরগুলোর পরস্পরের মধ্যে একটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়। যা হোক, এই সব শহরে ধীরে ধীরে পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগছে। চিরাচরিত শহর কাঠামোতে যোগ হচ্ছে অফিস, দোকান ও বাণিজ্যকেন্দ্র। নতুন ধরনের যানবাহন চলাচলের উপযোগী আধুনিক রাস্তা তৈরি হয়েছে, যেমনটি হয়েছে দিল্লীতে। এখানে যেমন একদিকে রয়েছে পুরনো দিল্লী (Old Delhi), তেমনি অন্যদিকে আছে নতুন দিল্লী। পুরনো দিল্লীতেও পাশ্চাত্য প্রভাব পড়েছে।

৪.১০ শিল্প বিপ্লবের প্রভাব ঃ

শিল্প বিপ্লবের সাথে সাথে যে কারিগরী ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন আরম্ভ হয়েছিল, তা শহর সৃষ্টির পক্ষে ছিল সবচেয়ে শক্তিশালী উপাদান। বাষ্পচালিত ইঞ্জিন আবিষ্কারের পর যেমন বেশি পরিমাণ কয়লা উত্তোলন সম্ভব

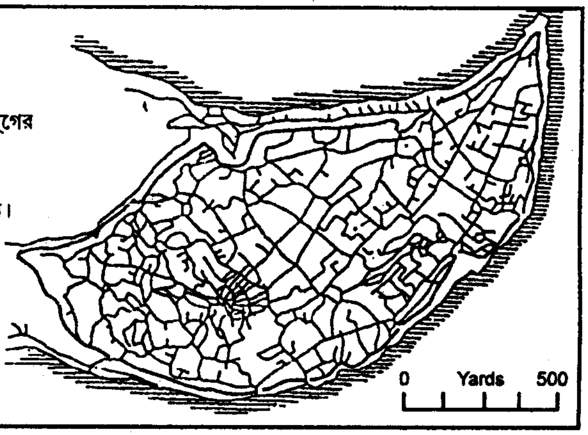

চিত্র - 4.13 প্রাকশিল্প যুগের এক প্রাচ্য শহর চং কিং। প্রাচীন অপরিকল্পিত রাস্তা, এই প্রাচীন শহরের বৈশিষ্ট্য।

হয়েছিল, তেমনি আগের চেয়ে অনেক বড় বড় শিল্প গড়ে উঠেছিল। এর সাথে সাথে চাষবাসে উন্নতির ফলে খাদ্য উৎপাদন বেড়েছিল। আর বাড়তি খাদ্য শহরের জনতার চাহিদা মেটাতে লাগল। পরবর্তীকালে অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দীতে যান্ত্রিক উন্নতির ফলে কৃষিতে অনেক কর্মী উদ্বৃত্ত হলেন। ঐ সব কর্মীরা নতুন শিল্প শহরে কাজ খুঁজতে আগ্রহী ছিলেন। পরিবহনের উন্নতি একদিকে যেমন জনসাধারণকে গতিশীল হতে উৎসাহী করল, অন্যদিকে তেমনি খাদ্যশস্য চলাচল ও শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল শহরে পৌঁছনোর সুবিধে করে দিল। এছাড়া শহরের উৎপন্ন দ্রব্য আরো দূরের বাজারে পাঠানোর সুযোগ করে দিল।

এইভাবে গোটা ঊনবিংশ শতাব্দী জুড়ে শিল্পায়ন ও শহরায়ন হাতে হাত মিলিয়ে চলতে থাকল। ব্রিটেনের বহু পুরনো শহরগুলোতে শিল্প জেঁকে বসল। আবার কয়লাখনিতে নতুন শিল্প শহর গড়ে উঠল। রাস্তার দু'পাশে শ্রমিকদের জন্য আবাসস্থল গড়ে উঠল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে আইন অনুযায়ী শ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম মানের বাসস্থান তৈরি হয়েছিল। লুই মামফোর্ডের (Lewis Mumford)-র ভাষায় দ্রুত কারিগরী অগ্রগতির যুগে সামাজিক সত্তা নগর আবিষ্কারের আওতার বাইরে থেকে গিয়েছিল। তিনি আরও মন্তব্য করেছেন যে গ্যাসের লাইন, জলের পাইপ, স্বাস্থ্যসম্মত কিছু ব্যবস্থা ছাড়া এই সব শিল্প শহর সপ্তদশ শতাব্দীর শহরের চেয়ে খুব একটা উন্নত ছিল না।

1860 সাল নাগাদ ইংল্যান্ড ও ওয়েলসের 50 শতাংশের বেশি মানুষ ছিলেন শহর বাসিন্দা। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে ঐ সংখ্যাটা বেড়ে দাঁড়াল 77 শতাংশে। একই রকম পরিবর্তন ফ্রান্স, জার্মানী ও যুক্তরাষ্ট্রেও দেখা গেল, যদিও তা যুক্তরাজ্যের (U.K.) চেয়ে কয়েক দশক পরে ঐ সব দেশে ঘটেছিল। বর্তমান শতাব্দীতেও স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া এবং আংশিকভাবে ভূমধ্যসাগরীয় ইউরোপে পৌরায়ণের ওপর শিল্পায়নের প্রভাব খুব বেশি রকম লক্ষ্য করা যায় না। আর ইদানীংকালেও পূর্ব ইউরোপের মোট জনসংখ্যার 50 শতাংশ হলেন শহরবাসী।

কারিগরী পরিবর্তনের অন্যতম ফলাফল হল এক একটি শহরের আয়তন বৃদ্ধি। শহর ও শহরতলিতে রেল, পাতাল রেল, ট্রাম, বাস ও ব্যক্তিগত গাড়ি ব্যবহারের ফলে জনসাধারণ তাদের কর্মস্থল থেকে আরও দূরে বসবাসের সুযোগ পাচ্ছে। এইভাবে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকগুলোতে অধিকাংশ পশ্চিমী নগরগুলো আগের চেয়ে জোর কদমে তাদের সীমান্ত ছাড়িয়ে আরও বিস্তৃত হল। তাই নগরের ঘনসংঘবদ্ধ নির্মীয়মাণ এলাকা (Compact built-up area) ও তার লাগোয়া গ্রামাঞ্চলের চিরাচরিত পার্থক্য ঘুচে গেল। কারণ শহরতলীতেও বড় বড় অট্টালিকা তৈরি হতে লাগল।

দেরীতে হলেও পশ্চিমবঙ্গে পৌরায়ণ বেশ জোর কদমে এগিয়ে চলেছে। আর তা সম্ভব হয়েছে দেশ বিভাগের (1947) সময় থেকে। পূর্ব পাকিস্থান (বাংলাদেশ) থেকে আসা ছিন্নমূলদের অনেকে কলকাতা শহরে আশ্রয় না

পেয়ে শহরতলীতে আশ্রয় নিয়েছে, যদিও কর্মসূত্রে তাদের অনেককেই কোলকাতা মহানগরী এলাকায় রোজ আসতে হয়। রেলপথে বৈদ্যুতিকীকরণও ডিজেল ইঞ্জিনের ব্যবহার কোলকাতা শহরতলীর এলাকা বিস্তারে খুব সাহায্য করেছে।

৪.১১ আধুনিক নগরায়ণ (Modern urbanization) ঃ

গত 180 বছরে পৌর বৃদ্ধির গতি প্রকৃতি বোঝাতে গিয়ে P. Mack লিখেছেন "If this trend continues at its present rate, more than a quarter of the world's population will be living in cities of 100,000 or more by A. D. 2000 and more than half by the year 2050."

আবিষ্কারের যুগ (Age of Discovery) থেকে বিশ্বের অর্থনৈতিক উন্নয়ন শহরের বৃদ্ধি ও কার্যকলাপের ক্ষমতার ওপর নির্ভরশীল ছিল। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে মেশিনের যুগ শুরু হওয়ায় গ্রাম্যাঞ্চলের বাস্তুহারার দল শহরাঞ্চলে জনবিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল।

আধুনিক নগরায়ণের কারণসমূহ (Causes of modern urbanization) :

(i) বিজ্ঞানের উন্নতি কৃষিক্ষেত্রে নতুন প্রযুক্তির সংযুক্তি ঘটায়।

(ii) যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে কৃষকের সংখ্যা হ্রাস পায় কিন্তু কৃষিজমির আয়তন বৃদ্ধি ঘটে।

(iii) পরিবহনের উন্নতির ফলে শিল্পোৎপাদিত দ্রব্য প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌঁছে যায়।

(iv) গ্রামের বাস্তুহারা মানুষ রোজগারের আশায় শহরে চলে আসে। এভাবে একই সঙ্গে শিল্পবিপ্লব ও বাস্তুহারাদের আগমন শহরে ঘটে।

নগরায়ণের উন্নতির আর একটি মূল কারণ হল ইউরোপের গ্রামীণ বাস্তুহারারা শহরে এসে ভিড় জমিয়েছিলো। এ সময় ইউরোপীয়রা তাদের নতুন বাণিজ্যনীতি গ্রহণ করায় নগরসমূহের সম্প্রসারণ ঘটেছিলো। সিডনী, মেলবোর্ন, কেপটাউন, নিউইয়র্ক, ক্লাসাব্লাঙ্কা, আলজিয়ার্স এ সময় সম্প্রসারিত হয়। এছাড়া, আন্তর্মহাদেশীয় বাণিজ্য নীতি গৃহীত হওয়ার ফলে আমদানী-রপ্তানীর জন্য ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বাণিজ্যকেন্দ্রগুলো গড়ে উঠেছিলো। এর ফলে লন্ডন, হামবুর্গ, আমস্টারডাম, লিভারপুল, মার্শাই ও অন্যান্য শহরগুলো সম্প্রসারিত হয়েছিল।

নীচের কারণগুলো নগরায়ণকে ত্বরান্বিত করে :

(i) যন্ত্রপাতির উন্নতি ও কয়লা ব্যবহারের ফলে শিল্পের অগ্রগতি হয়।

(ii) শিল্পের উপযোগী কাঁচামাল এবং শ্রমিকের নিরবচ্ছিন্ন যোগান।

(iii) আধুনিক পরিবহন ব্যবস্থা।

(iv) নতুন নতুন বাজার ও বাণিজ্য পথ আবিষ্কার।

(v) জন বিস্ফোরণ।

৪.১১.১ নগরায়ণ — কিছু জ্ঞাতব্য বিষয় ঃ

ইংল্যান্ড ও ওয়েলস্ ছাড়া জার্মানীর অধিকাংশ জনগণ ঊনবিংশ শতকের আগেই নগর গড়ে তুলেছিলো। তবে বুলগেরিয়ার মতো কিছু দেশ নগরায়ণে উৎসাহ দেখাত না।

দেশ/মহাদেশ	নগরের সংখ্যা		(সাল ভিত্তিক)	
	1800	1850	1900	1954
ইউরোপ (সোভিয়েত রাশিয়া বাদে)	4	10	40	72
এশিয়া	1	5	17	61
পূর্বতন সোভিয়েত রাশিয়া	0	0	1	37
আমেরিকা	0	1	16	50
আফ্রিকা	0	1	2	12
অস্ট্রেলিয়া	0	0	2	5

আফ্রিকায় নগরায়ণ সবচেয়ে শেষে শুরু হয়। কিন্তু বর্তমানে আফ্রিকার দশ লক্ষ জনসংখ্যা বিশিষ্ট 30-টির মত নগর পরিলক্ষিত হয়। এগুলোর মধ্যে নাইরোবি, লেগোস প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এখানকার দক্ষিণাঞ্চলের শ্বেতকায় (White Colour) জনগণের মধ্যে নগরায়ণের ধারা বেশি করে পরিলক্ষিত হয়।

1893 সালে পৃথিবীতে প্রায় 12টি নগর ছিল যাদের জনসংখ্যা মিলিয়ন ছুঁয়েছিল। 1973 সালে 127-টি নগর এই মিলিয়নের সীমা ছাড়িয়ে যায়। এই মিলিয়ন জনসংখ্যা-অধ্যুষিত নগরগুলোর লোকসংখ্যা 1893 সালে ছিল 15 মিলিয়ন যা 1973-এ বেড়ে গিয়ে দাঁড়ায় 230 মিলিয়নে।

বিংশ শতাব্দীর শহরগুলোর জনসংখ্যা (মিলিয়নে)

সাল	মিলিয়ান নগরের সংখ্যা
1920	20
1940	51
1960	80
1980	172

1940 খ্রীঃ পৃথিবীতে শুধুমাত্র কোলকাতা, মেক্সিকো, সাও-পাওলো প্রভৃতি কতকগুলো ক্রান্তীয় নগরেই মিলিয়ন জনসংখ্যা ছিল। কিন্তু 1980 খ্রীঃ এরূপ নগরের সংখ্যা 32 ছাড়িয়ে যায়। দ্রুতগতিতে একটি নগর বৃদ্ধির ফলে তা প্রতিবেশী নগর বা শহরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে। এরূপ সংযুক্তি থেকে পৌরপুঞ্জ এবং মহানগরের উদ্ভব ঘটে যা ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্রে দেখা যায়।

পৌর জনতার শতকরা হার

দেশ	1900	1920	1950
ফ্রান্স	41	46	53
জার্মানী	56	65	71
সুইডেন	22	30	56
স্পেন	32	38	61
বুলগেরিয়া	20	20	55

1910-1920-র দশকে যুক্তরাষ্ট্রে 1-টি মাত্র প্রধান পৌর নগর ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর উল্লেখযোগ্য নগরগুলো হল ডেট্রয়েট, নিউ অক্ল্যান্ড, বাল্টিমোর, সেন্ট লুই, পিটার্সবার্গ, সানফ্রান্সিসকো প্রভৃতি। উনবিংশ শতাব্দীতে যে সব নগরগুলো গড়ে উঠেছিলো তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—শিকাগো, বোস্টন, আটলান্টা, ডেলাস, পোর্টল্যান্ড প্রভৃতি। বিংশ শতাব্দীতে যে সব নগর আত্মপ্রকাশ করে তাদের মধ্যে গ্যারি ইন্ডিয়ানা ও টরেন্টো উল্লেখযোগ্য।

Jones তাঁর Essays on World Urbanization-এ বলেছেন আধুনিক নগরায়ণের একটি উল্লেখযোগ্য দিক হল উনবিংশ শতাব্দীতে উন্নতশীল দেশগুলোতে দ্রুত নগরায়ণ, আর তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে বিংশ শতাব্দীতে দ্রুত নগরায়ণ। শেষোক্ত দেশগুলোতে প্রতি বছরে নগরবৃদ্ধির হার হল 5 থেকে 8 শতাংশ, এখানে প্রতি 10 থেকে 15 বছরে পৌর জনসংখ্যা দ্বিগুণ হচ্ছে। নীচের সারণি 4.9 ও চিত্র (নং 4.14) থেকে ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে।

সারণি 4.9

উন্নয়নশীল অঞ্চলগুলোতে নগরায়ণের অবস্থা ঃ
20,000-র বেশি জনসংখ্যা অধ্যুষিত শহরগুলোতে (মোট জনসংখ্যার % হার)

সাল	আফ্রিকা	ল্যাটিন আমেরিকা	এশিয়া	মোট শহর
1920	4.8	14.4	5.6	6.7
1930	5.9	16.8	6.6	7.8
1940	7.2	19.3	8.6	9.7
1950	9.7	25.1	11.6	12.9
1960	13.4	32.8	14.5	16.7
1970	16.0	37.8	17.1	19.7
1980	20.0	43.1	20.6	24.2
1990	25.0	46.0	25.3	27.5
2000	28.3	53.6	28.1	32.6

Source : Mandal, 2000.

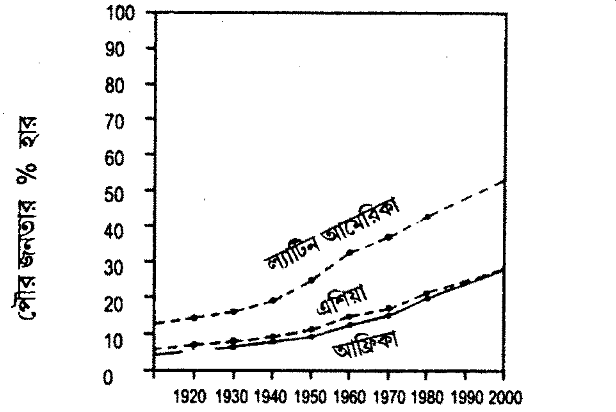

চিত্র - 4.14 তৃতীয় বিশ্বে পৌর বিকাশের ধারা। (1920-2000)

পৌরায়ণের আর এক উল্লেখযোগ্য দিক হল মিলিয়ন বা দশ লক্ষ ও তদূর্ধ জনসংখ্যা-বিশিষ্ট নগরের সংখ্যাবৃদ্ধি। 1800 সালে গোটা পৃথিবীতে মিলিয়ন নগরের অস্তিত্ব ছিল না। এই সময়ে লন্ডনের জনসংখ্যা ছিল 9,59,310। 1850 সালে পৃথিবীতে দু'টো মিলিয়ন নগর ছিল, লন্ডন ও প্যারিস। 1900 সালে মিলিয়ন নগরের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল এগারোতে : লন্ডন, প্যারিস, বার্লিন, ভিয়েনা, মস্কো, সেন্ট পিটস্‌বার্গ, নিউ ইয়র্ক, শিকাগো, ফিলাডেলফিয়া, টোকিও, কোলকাতা। লক্ষ্য করার মত যে ঐ সময় ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার বাইরে মাত্র দু'টো মিলিয়ন নগর ছিল, টোকিও ও কোলকাতা। 1920 সালে মিলিয়ন নগরের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল 20, 1940 সালে 51, 1960 সালে 80, 1970 সালে 129। এই সব নগরের মধ্যে অবশ্য শহরতলী এলাকা ও শহরের লাগোয়া নির্মীয়মাণ এলাকার লোকসংখ্যাও ধরা হয়েছে। একটু আগে আমরা লক্ষ্য করেছি যে ক্রান্তীয় অঞ্চলে পৌরবাসীর সংখ্যা বেড়ে চলেছে। শুধু তাই নয়, এখানে মিলিয়ন নগরের সংখ্যা ও পাল্লা দিয়ে বেড়ে চলেছে। উদাহরণ হিসেবে বলা চলে 1940 সালে ক্রান্তীয় অঞ্চলে মিলিয়ন নগরের সংখা ছিল মাত্র চারটি, কোলকাতা, মুম্বাই, মেক্সিকো সিটি ও সাঁও পাওলো। 1970 সালে ঐ সংখ্যা বেড়ে গিয়ে (চিত্র 4.15) দাঁড়াল 29-এ এবং আরও পরে 34-টিতে।

৪.১২ আধুনিক শহর (Modern Town) ঃ

প্রায় সারা দেশেই আয়তন ও লোকসংখ্যার দিক দিয়ে শহর বেড়ে চলেছে। ক্রান্তীয় এশিয়া ও আফ্রিকা এবং রাশিয়ার সাইবেরিয়া অংশ এ ব্যাপারে পিছিয়ে ছিল। কিন্তু তারাও এখন ও ব্যাপারে পিছিয়ে নেই। পশ্চিম ইউরোপে নগরায়ণ এক শতাব্দী আগে ঘটেছে। গেলেও সে তুলনায় এশিয়া বা আফ্রিকাতে ইদানীং ব্যাঙের ছাতার মত নতুন নতুন শহর বসতির সৃষ্টি হচ্ছে। যে সব মহাদেশের পৌরবসতির ইতিহাস বহুদিনের, সেখানকার শহরগুলোতে বহুমুখী কর্মধারা আছে। আবার কোন কোন শহর পর্যটন কেন্দ্র, আবাসিক শহর (Dormitory Town) শিক্ষা কেন্দ্র বা পেট্রোলিয়াম বন্দর (Petroleum Port) হিসাবে খ্যাতি লাভ করেছে। নতুন নতুন খনি শহর এবং সামরিক শহরও জন্ম নিচ্ছে। কর্মজীবী মানুষ আরও গতিশীল হচ্ছে। তারা শুধু গ্রাম থেকে শহরে পরিযান করছে না, এক শহর থেকে অন্য শহরেও যাচ্ছে। এখন অনেক বেশি লোক সরকারি অফিস, বাণিজ্য, পরিবহন, আমোদ প্রমোদ ও বৃত্তিমূলক ইত্যাদি তৃতীয় পর্যায়ের কর্মকাণ্ডে (Tertiary activity) অংশ নিচ্ছেন। অধিকাংশ উন্নত দেশে শহর সম্প্রসারণ এক অতি সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। আরও নতুন নতুন পৌরপুঞ্জ সৃষ্টি হচ্ছে। সম্ভবত জনসাধারণের মঙ্গলের দিকে তাকিয়ে প্রশাসন, শিল্প, বাণিজ্য, বসত ইত্যাদি স্থানগুলো আলাদা আলাদা ভাবে দানা বাঁধছে। কিন্তু এতে করে নাগরিক জীবনের বিভিন্ন উপাদানগুলো আর এক সুতোয় বাঁধা থাকছে না।

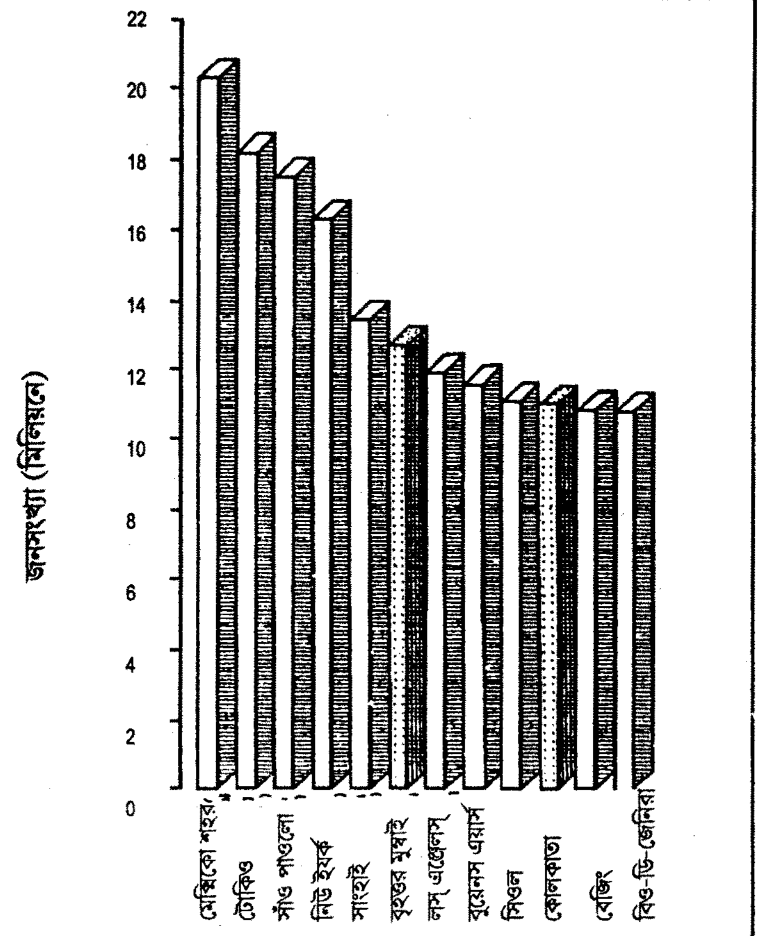

চিত্র - 4.15 পৃথিবীর বৃহত্তম পৌরপিণ্ড (10 মিলিয়ন ও তার বেশি জনসংখ্যা, 1990)

৪.১৩ সেন্সাস ট্র্যাক, পৌরপিণ্ড, প্রামাণ্য পৌর এলাকা, মেগাসিটি, মহানগর ও মেট্রোপলিটন এলাকা (Census Tract, Urban Agglomeration, Standard Urban Area, Megacity and Metropolitan Region)

৪.১৩.১ সেন্সাস ট্র্যাক (Census Tract) ঃ

A small areal unit used in collecting and reporting US data. The first tracts were defined by the US Bureau of the census for its 1920 enumeration, and were drawn so as to approximate NATURAL AREAS OR NEIGHBOURHOODS wherever possible thereby providing valuable data for analysing city district characteristics. Many census authorities report data for similar small areas (in the UK the term used is 'enumeration district') but they are generally constructed on logistical grounds (ease of administration) rather than to meet analytical purposes Census Tract.

পৃথিবীর 34-টি বৃহত্তম মেট্রোপলিস (মান অনুযায়ী)			
নগর/পৌরপিণ্ডের নাম	দেশের নাম	জনসংখ্যা (মিলিয়ন)	মান
1. মেক্সিকো সিটি	মেক্সিকো	20.2	1
2. টোকিও	জাপান	18.1	2
3. সাঁও পাওলো	ব্রাজিল	17.4	3
4. নিউ ইয়র্ক	যুক্তরাষ্ট্র	16.2	4
5. সাংহাই	চীন	13.4	5
6. বৃহত্তর মুম্বাই	ভারত	12.6	6
7. লস্ এঞ্জেলেস্	যুক্তরাষ্ট্র	11.9	7
8. বুয়েনস এয়ার্স	আর্জেন্টিনা	11.5	8
9. সিওল	কোরিয়া রিপাবলিক	11.0	9
10. কলকাতা	ভারত	10.9	10
11. বেজিং	চীন	10.8	11
12. রিও-ডি-জেনেরো	ব্রাজিল	10.7	12
13. টিয়ানজিন	চীন	9.4	13
14. জাকার্তা	ইন্দোনেশিয়া	9.3	14
15. কায়রো	মিশর	9.0	15
16. মস্কো	রাশিয়া	8.8	16
17. মেট্রো/ম্যানিলা	ফিলিপাইনস্	8.5	17
18. ওসাকা	জাপান	8.5	17
19. প্যারিস	ফ্রান্স	8.5	17
20. দিল্লী	ভারত	8.4	18
21. করাচী	পাকিস্তান	7.7	19
22. ল্যাগোস	নাইজেরিয়া	7.7	19
23. লন্ডন	যুক্তরাজ্য	7.4	20
24. ব্যাংকক	থাইল্যান্ড	7.2	21
25. চিকাগো	যুক্তরাষ্ট্র	7.0	22
26. তেহরান	ইরান	6.8	23
27. ইস্তাম্বুল	তুরস্ক	6.7	24
28. ঢাকা	বাংলাদেশ	6.6	25
29. লিমা	পেরু	6.2	26
30. হংকং	হংকং	5.4	27
31. চেন্নাই	ভারত	5.4	27
32. মিলান	ইতালি	5.3	28
33. মাদ্রিদ	স্পেন	5.2	29
34. লেনিনগ্রাড	রাশিয়া	5.1	30

N.B. : 1. ভারতের জনসংখ্যা 1991-র জনগণনা অনুযায়ী।
2. অন্যান্য নগরের তথ্য United Nations Urban Agglomeration Chart, 1990 অনুযায়ী।
3. 5 মিলিয়ন জনসংখ্যার ওপর নগর/পৌরপিন্ডকে এখানে উল্লেখ করা হয়েছে।

The Dictionary of Human Geography-র উক্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী Census Tract হলো একটি ছোট এলাকা যেখান থেকে জনগণনা পরিসংখ্যান সংগ্রহ করা হয়। 1920 সালের জনগণনায় যুক্তরাষ্ট্র সেন্সাস ব্যুরো প্রথম জনগণনা এলাকা নির্দিষ্ট করেছিলো এবং যেখানে সম্ভবপর সেখানে তা প্রাকৃতিক এলাকা বা প্রতিবেশী এলাকার ভিত্তিতে চিহ্নিত করা হয়েছিল। এতে করে নগর (ডিস্ট্রিক্ট) এলাকার সামাজিক-অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য পাওয়া গিয়েছিল। অনেক জনগণনা কর্তৃপক্ষ অনুরূপ ছোট এলাকার জন্য পরিসংখ্যান সংগ্রহ করে। যুক্তরাজ্যে (U.K.) Census Tract-কে জনগণনা জেলা (Enumeation district) বলা হয়, কিন্তু ঐ দেশে বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যের চেয়ে প্রশাসনিক সুবিধের জন্য জনগণনা জেলা চিহ্নিত করা হয়।

১.১৩.২ পৌরপিণ্ড (Urban Agglomeration) ঃ

পৌরপিণ্ড কথাটি সর্বপ্রথম 1971 সালের ভারতের জনগণনায় (চিত্র 11.1.1) ব্যবহার করা হয়। ঐ জনগণনায় 'পৌরপিণ্ড' কথাটি কেন ব্যবহার করা হল সে বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। ভারতের জনগণনার (1971) ধারণাটি নিম্নরূপ ঃ

"In several areas, fairly large railway colonies, University campuses, port areas, military camps have come up around a core city or statutory town. Though these are outside the statutory limits of a corporation, municipality or cantonment, they fall within the revenue boundary of the place by which the town itself is known. It may not be altogether realistic to treat such areas lying outside the statutory limits of a town as rural units; at the same time each such area by itself may not come up to the minimum population limit to be treated as an independent urban unit. Such areas deserve to be reckoned along with the main town and the continuous spread including such urban outgrowths would deserve to be treated as an integrated urban area which is being called 'urban agglomeration (UA) at the 1971 Census'. খুব

2001 সালের জনগণনা অনুযায়ী ভারতের পৌরপিণ্ড

পৌরপিণ্ডের নাম	পৌরপিণ্ডের নাম	পৌরপিণ্ডের নাম
বৃহত্তর মুম্বাই	নাসিক	আগ্রা
কোলকাতা	জব্বলপুর	পৌর নিগম
দিল্লী	জামশেদপুর	ভাদোদারা
চেন্নাই	আসানসোল	ভোপাল
ব্যাঙ্গালোর	ধানবাদ	কোয়েমবাটর
হায়দ্রাবাদ	এলাহাবাদ	বারাণসী
পুনে	অমৃতসর	মাদুরাই
সুরাত	বিজয়ওয়াড়া	মিরাট
লক্ষ্ণৌ	জয়পুর*	ইন্দোর
রাজকোট	লুধিয়ানা*	কানপুর
পাটনা	ফরিদাবাদ*	রাজকোট
কোচিন	*এক মিলিয়ান	
বিশাখাপত্তনম	বাসিন্দা অধ্যুষিত	

সহজ কথায় পৌরপিণ্ড হল কয়েকটি ছোট ছোট পৌর এলাকার মূল শহরের সাথে একত্রীভবন বা পিণ্ডভবন। অনেকক্ষেত্রে একটি শহর বা নগর এত তাড়াতাড়ি বাড়ে যে তার সাথে তাল রেখে পরিবহন ব্যবস্থা উন্নতি লাভ

করতে পারে না। সে ক্ষেত্রে যে সব পৌরকর্মী নগরের ভেতরে আশ্রয় লাভ করতে অসমর্থ হয়, তারা পৌর সীমানার উপকণ্ঠে বসবাস করতে আরম্ভ করে। কারণ যাতায়াতের সুযোগ সব জায়গায় থাকায় তারা কর্মস্থলের কাছাকাছি বাস করে। এইভাবে নগর সীমানার চারপাশ জুড়ে ধীরে ধীরে একটি ঘনবসতি অঞ্চল গড়ে ওঠে আর শীঘ্র তা নগরের সাথে মিলে তার এলাকা বাড়িয়ে তোলে। পৌর প্রসরণের এই ধরনের উদাহরণ সবখানে দেখা যায়। কোন স্থানে দুটি কাছাকাছি নগর এভাবে একই হারে প্রসরণের মাধ্যমে এক সময় পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়ে একটি পৌরপিণ্ড সৃষ্টি করে। ঐ অবস্থায় উভয় নগরীর ব্যক্তিগত সীমানা আলাদাভাবে চিহ্নিত করা যায় না। এই ধরনের দৃষ্টান্তকে পৌরপিণ্ড বলে। পৌরপিণ্ডের সবচেয়ে ভালো উদাহরণ হল লন্ডন। লন্ডন শহরের উৎপত্তির প্রথম দিকে ব্যবসায়ীদের এবং রাজার (King) বাসস্থান ও কর্মস্থল দুটি আলাদা অঞ্চলকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। বর্তমান লন্ডনের 'দি সিটি' (The City) অঞ্চলে ব্যবসায়ীদের এবং ওয়েস্টমিনস্টার' (Westminster) অঞ্চলে রাজা কেন্দ্র ছিল। পরবর্তী সময়ে ঐ দুটি কেন্দ্র একসাথে প্রসরণের ফলে পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়। এরপরও লন্ডনের পৌর প্রসরণ অন্যান্য অপেক্ষাকৃত ছোট শহরকে আত্মসাৎ করেছে। প্রতিটি বড় নগরীর ক্ষেত্রেই এটি সত্য। অবশ্য প্রসরণ দু'দিকে সমান নাও হতে পারে। সচরাচর বৃহত্তর পৌরবসতি অনেক আস্তে আস্তে বাড়ে। বড় নগরী কোন এক সময়ে নিজস্ব প্রসরণের দ্বারা কাছাকাছি শহর এবং গ্রামাঞ্চলকে গ্রাস করে এক বিরাট পৌরাঞ্চল গড়ে তোলে।

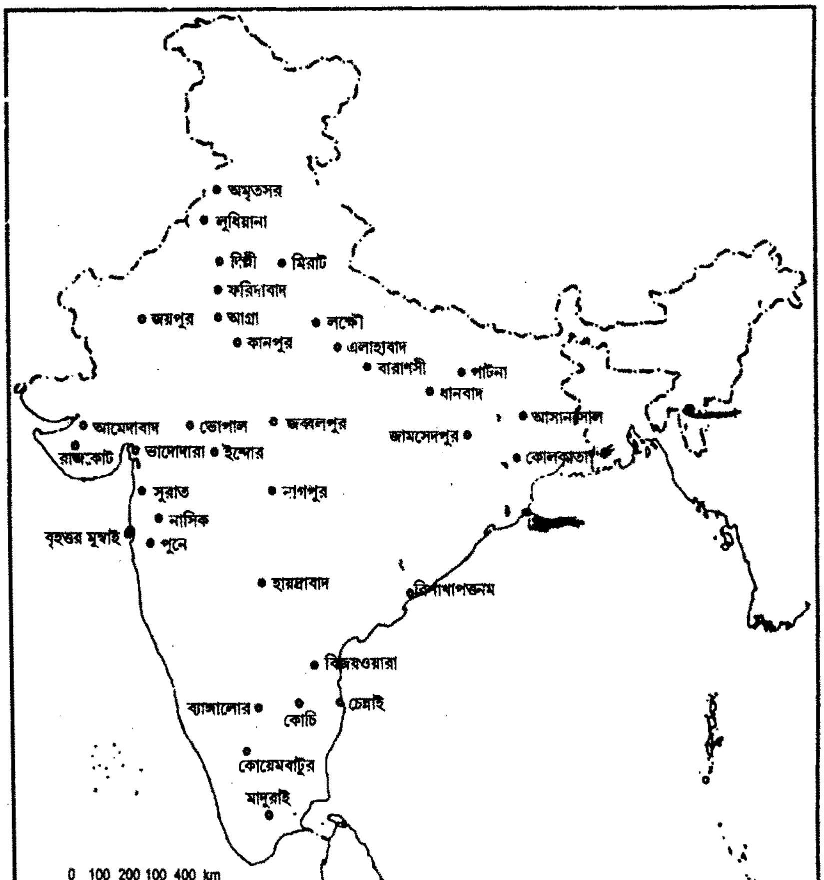

চিত্র - 4.16 ভারতের পৌরপিণ্ড (2001)

কোলকাতা মহানগরের ক্ষেত্রে এই ধরনের প্রসরণ লক্ষ্য করার মতন। উত্তর এবং দক্ষিণে কোলকাতার বিস্তৃতি অনেক উন্নতশীল বসতিকে গ্রাস করে একটি বড় পৌরপিণ্ডের সৃষ্টি করেছে।

যে সমস্ত পৌর-প্রসরণকে পৌরপিণ্ড বলে তাদের দুটি প্রধান বিশেষত্ব হল— (1) পরস্পরের সীমানা একেবারে মুছে যায় এবং পিণ্ডিভূত নগরীর বেশ কিছু লোক যে স্থানে বসবাস করে সে স্থান থেকে অন্যত্র কর্মোপলক্ষে রোজ যাতায়াত করে থাকে। (2) পিণ্ডীভূত নগরী পৌর প্রশাসনিক বিচারে একটি অখণ্ড নগর হিসেবে বিবেচিত হয়।

কোলকাতা পৌরপিণ্ড / শহর (1991)

পৌরসভা (M) পৌবনিগম (MC) / প্রজ্ঞাপিত এলাকার (NA) নাম	জেলা	লোকসংখ্যা	পুরুষ	মহিলা
1. কোলকাতা (MC)	কোলকাতা	4,399,819	2,445,328	1,954,491
2. হাওড়া (MC)	হাওড়া	950,435	528,396	422,039
3. বালি (M)	,,	184,474	106,341	78,133
4. উলুবেড়িয়া (M)	,,	155,172	82,043	73,129
5. ভাটপাড়া (M)	উত্তর ২৪ পরগনা	304,952	176,104	128,848
6. পানিহাটি (M)	,,	275,990	146,338	130,905
7. কামারহাটি (M)	,,	266,889	146,338	120,551
8. দঃ দমদম (M)	,,	232,811	122,164	110,647
9. বরাহনগর (M)	,,	224,821	120,134	104,687
10. উঃ দমদম (M)	,,	149,965	77,073	72,892
11. ব্যারাকপুর (M)	,,	133,265	70,136	63,129
12. নৈহাটী (M)	,,	132,701	73,457	59,244
13. টিটাগড় (M)	,,	114,085	67,121	46,964
14. হালিশহর (M)	,,	114,028	63,039	50,989
15. বারাসাত (M)	,,	102,660	52,922	49,738
16. উত্তর ব্যারাকপুর (M)	,,	100,606	53,166	47,440
17. কাঁচড়াপাড়া (M)	,,	100,194	51,938	48,256
18. বিধাননগর (M)	,,	100,048	51,202	48,846
19. খড়দহ (M)	,,	88,358	47,343	41,015
20. গারুলিয়া (M)	,,	80,918	43,128	37,790
21. নিউ ব্যারাকপুর (M)	,,	63,795	32,563	31,232
22. দমদম (M)	,,	40,961	23,054	47,907
23. ব্যারাকপুর ক্যান্ট	,,	19,931	10,812	9,119
24. বজবজ (M)	দক্ষিণ ২৪ পরগনা	72,951	41,583	31,368
25. হুগলী-চুঁচুড়া (M)	হুগলী	151,806	77,902	73,904
26. শ্রীরামপুর (MC)	,,	137,028	75,398	61,630
27. চন্দননগর (MC)	,,	120,378	63,388	56,990
28. রিষড়া (M)	,,	102,815	59,245	43,570
29. উত্তরপাড়া (M)	,,	101,268	53,500	47,768

কোলকাতা পৌরপিণ্ড / শহর (1991)				
পৌরসভা (M) পৌরনিগম (MC) / প্রজ্ঞাপিত এলাকার (NA) নাম	জেলা	লোকসংখ্যা	পুরুষ	মহিলা
30. চাঁপদানী (M)	,,	101,067	57,709	43,358
31. বাঁশবেড়িয়া (M)	,,	93,520	50,765	42,755
32. বৈদ্যবাটী (M)	,,	90,081	47,288	42,793
33. ভদ্রেশ্বর (M)	,,	72,474	40,633	31,841
34. কোন্নগর (M)	,,	62,200	33,237	28,963
35. কল্যাণী (NA)	নদীয়া	55,579	28,843	26,736
36. গয়েশপুর (NA)	,,	52,158	26,598	25,565

পিণ্ডভবনের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল দ্বৈত নগর (Twin Cities)। সচরাচর কোন নদীর এক পারে একটি বড় নগরের অবস্থান অপর পারেও আর একটি পৌরবসতির উৎপত্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। নদী ছোট হলে প্রথম নগরটি বিস্তৃত হতে হতে নদীর অপর পার পর্যন্ত যায়, যেমন লন্ডন, প্যারিস প্রভৃতি। কিন্তু নদী সহজে পারাপারসাধ্য না হলে সেক্ষেত্রে অপর পারে যে কোন স্থায়ী বসতিকে কেন্দ্র করে একটি স্বাধীন পৌরবসতি গড়ে ওঠে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে এই ধরনের উভয় তীরবর্তী পরস্পরের মুখোমুখি অবস্থিত নগর দুটো জন্মসূত্র এবং ক্রিয়াকলাপের দিক থেকে ঘনিষ্ঠ বন্ধনে যুক্ত থেকে একটি অভিন্ন পৌরজীবনের পরিচয় বহন করে। এ সত্ত্বেও দুটি নগরের আলাদা ভৌগোলিক সত্তা কোথাও ব্যাহত হয় না। যুক্তরাষ্ট্রে মিনিয়াপলিস-সেন্টপল এবং ভারতের কোলকাতা-হাওড়া যমজ-নগরের জ্বলন্ত উদাহরণ। কোন কোন ক্ষেত্রে এইভাবে ত্রিতয় নগরেরও জন্ম হয়। যেমন, সানফ্রান্সিসকো ওকল্যান্ড-বার্কলে।

৪.১৩.৩ প্রামাণ্য পৌর এলাকা (Standard Urban Area) ঃ

1971 সালের জনগণনায় এই কথাটি চালু করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে এটি "পৌরপুঞ্জ" ধারণার সাথে সম্পর্কিত। অবশ্য দু'য়ের মধ্যে মৌলিক তফাৎ হচ্ছে পৌরপুঞ্জ হল প্রধান শহরের লাগোয়া শহরগুচ্ছ, আর প্রামাণ্য পৌর এলাকা শুধুমাত্র শহরই নয়, এর সাথে লাগোয়া গ্রামীণ এলাকা যা ভবিষ্যতে শহর হতে পারে, "not only the built-up city but also the adjoining rural belt which is likely to be urbanized in the future" প্রামাণ্য পৌর এলাকা এই নামটা যথোপযুক্ত নয়। প্রকৃতপক্ষে এটি গ্রামীণ শহরকেন্দ্রিক এলাকা "a rural area with an urban core." (Ramachandran, 1989)। এটি শহরের ভৌগোলিক সীমানার বাইরে বিস্তৃত এলাকায় প্রসারিত, যাকে আমরা গ্রাম্যপৌর উপকণ্ঠ (rural urban fringe) বলে থাকি।

1971-র জনগণনায় প্রামাণ্য পৌর এলাকা-র যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে তা হল ঃ—

(1) মূল শহরের (core town) ন্যূনতম জনসংখ্যা 50,000 হতে হবে।

(2) লাগোয়া এলাকা গ্রামীণ ও পৌর হবে এবং এই দু'য়ের মূল শহরের সাথে সামাজিক, অর্থনৈতিক যোগাযোগ থাকবে।

(3) আরও বলা হয়েছে যে গোটা এলাকা দুই থেকে তিন দশকের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে পৌরায়িত হবে।

প্রামাণ্য পৌর এলাকা 50,000 বা তার বেশি জনসংখ্যা অধ্যুষিত শহরের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকবে।

৪.১৩.৪ মেগাসিটি (Mega City) ঃ

Majid Hussain (Human Geography) 'মেগাসিটি'-র যে সংজ্ঞা দিয়েছেন, তা হল : "A city or urban agglomeration having five million or more population. At present cities with more than 8 million of population are termed as mega-cities." উপরের সংজ্ঞা থেকে মেগাসিটির সংজ্ঞা পরিষ্কার হয়ে যায় অর্থাৎ যে সব নগর বা পৌরপুঞ্জের পাঁচ(5) মিলিয়ানের বেশি জনসংখ্যা রয়েছে, তারাই মেগাসিটি। ভারতের ক্ষেত্রে দেখা যায় এখানে চারটি (4) মেগাসিটি রয়েছে (1991-র জনগণনা) যাদের লোকসংখ্যা পাঁচ মিলিয়ানের (পঞ্চাশ লক্ষ) বেশি। এই নগরগুলো হল ঃ (1) বৃহত্তর মুম্বাই পৌরপুঞ্জ, (2) কোলকাতা পৌরপুঞ্জ, (3) দিল্লী পৌরপুঞ্জ, (4) চেন্নাই পৌরপুঞ্জ। ভারতের প্রথম শ্রেণীর নগরে বসবাসকারী জনতার প্রায় এক-চতুর্থাংশ চারটি মেগাসিটিতে বাস করে। 1991 সালের লোকগণনা অনুযায়ী ভারতের 23-টি মহানগরীতে বসবাসকারী 70.66 মিলিয়ান জনসংখ্যার 37.22 মিলিয়ান জনসংখ্যা (52.68%) এই চারটি মেগাসিটিতে বাস করে।

সারণি 4.10

মেগাসিটির সম্ভাব্য বৃদ্ধি, 1995 এবং 2015 সাল

	নগর	দেশ	জনসংখ্যা (মিলিয়ানে) (1995)	(2015)	মান
1	টোকিও	জাপান	26.96	28.89	(1)
2.	মেক্সিকো সিটি	মেক্সিকো	16.56	19.18	(7)
3.	সাঁওপাওলো	ব্রাজিল	16.53	20.32	(4)
4.	নিউ ইয়র্ক	যুক্তরাষ্ট্র	16.33	17.60	(9)
5.	মুম্বাই*	ভারত	15.14	20.22	(2)
6.	সাংহাই	চীন	13.58	17.97	(8)
7.	লস্ এঞ্জেলস্	যুক্তরাষ্ট্র	12.41	14.22	(15)
8.	কোলকাতা	ভারত	11.92	17.31	(10)
9.	বুয়েনস্ এয়ার্স	আর্জেন্টিনা	11.80	13.86	(17)
10.	সিওল	কোরিয়া	11.61	12.98	(19)
11.	বেজিং	চীন	11.30	15.57	(12)
12.	ওসাকা	জাপান	10.61	10.61	(21)
13.	লাগোস*	নাইজেরিয়া	10.29	24.61	(3)
14.	রিও-ডি-জেনিরো	ব্রাজিল	10.18	11.86	(20)
15.	দিল্লী*	ভারত	9.95	16.86	(11)
16.	করাচী*	পাকিস্তান	9.73	19.38	(6)
17.	কায়রো*	মিশর	9.69	14.42	(14)
18.	প্যারী	ফ্রান্স	9.52	9.69	(22)
19.	তিয়ানজিন	চীন	9.42	13.53	(18)
20.	মেট্রো-ম্যানিলা*	ফিলিপাইনস	9.29	14.60	(13)
21.	মস্কো	রাশিয়া	9.27	9.30	(23)
22.	জাকার্তা*	ইন্দোনেশিয়া	8.62	13.92	(16)
23.	ঢাকা	বাংলাদেশ	8.55	19.49	(5)

*2015 সাল নাগাদ 50 শতাংশের বেশি বৃদ্ধি আশা করা যায়।

পৃথিবীর 'মেগাসিটি'র (কম করে আট মিলিয়ন জনসংখ্যার বেশি) সংখ্যার দিকে তাকালে দেখা যাবে যে 1950 সালে মাত্র দুটি (নিউইয়র্ক, লন্ডন) মেগাসিটি ছিল, 1995 সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে 23-এ, আর এদের মধ্যে 17-টি হল উন্নয়নশীল দেশে অবস্থিত। 2015 সাল নাগাদ এই সংখ্যা গিয়ে দাঁড়াবে 36-এ, আর এদের মধ্যে 23-টি মেগাসিটির অবস্থান হবে এশিয়ায় (সারণি 4.10 দ্রষ্টব্য)

সারণি 4.11

মহাদেশভিত্তিক মেগাসিটি

মহাদেশ	মেগাসিটির সংখ্যা	মেগাসিটির নাম
এশিয়া	13	টোকিও, মুম্বাই, সাংহাই, কোলকাতা, সিওল, বেজিং, ওসাকা, দিল্লী, করাচী, তিয়ানজিন, মেট্রো-ম্যানিলা, জাকার্তা, ঢাকা
ল্যাটিন আমেরিকা	4	মেক্সিকো সিটি, সাঁওপাওলো, বুয়েনস এয়ার্স, রিও-ডি-জেনিরা
আফ্রিকা	1	ল্যাগোস, কায়রো
অ্যাংলো-আমেরিকা	2	নিউ ইয়র্ক, লস্ এঞ্জেলস্
ইউরোপ	2	প্যারী, লন্ডন।

নীচের সারণিতে (4.11) মহাদেশভিত্তিক মেগাসিটি দেখানো হল। এই সারণি থেকে দেখা যাচ্ছে যে 23-টি মেগাসিটির মধ্যে 13-টি এশিয়ায়, 4-টি ল্যাটিন আমেরিকায়, অথচ উন্নত মহাদেশগুলোতে সে তুলনায় মেগাসিটির সংখ্যা কম। এর একটি সম্ভাব্য কারণ হল উন্নয়নশীল দেশগুলোতে মানুষজন বড় শহর বা নগরে এসে ডেরা বাঁধেন। কারণ বড় শহরগুলোতে নানা প্রকার সুযোগ সুবিধে রয়েছে। ভারতের ক্ষেত্রে দেখা যায় গত কয়েক দশকে ছোট শহরগুলোর বৃদ্ধির হার খুব কম, অথচ বড় শহরগুলোতে জনবৃদ্ধির হার উদ্বেগজনক। কিন্তু পাশ্চাত্য দেশে সব শহরেই সুযোগ সুবিধে মেলে। আর এই সব দেশের অধিকাংশ লোক শহরবাসী।

৪.১৪ মহানগর তত্ত্ব, মহানগর এলাকা ও মহানগর অঞ্চল সম্পর্কিত ধারণা (Concept of Metropolis, Metropolitan area & Metropolitan region)

গ্রীকরা Metropolitan বলতে মূল বা আদি নগরী-কে বোঝাতেন। 'Metropolitan' কথাটির বাংলা মানে হল মহানগর। সাধারণত আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন নগরীর ক্ষেত্রে Metropolitan কথাটা ব্যবহার করা হয়। Dickinson (*City and Region*) Metropolis বলতে regional capital বা আঞ্চলিক রাজধানী বুঝিয়েছেন। আবার 1922 সালে N.S.B Gras মেট্রোপলিটন নগরের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন যে একটা নগরকে তখনই মহানগর বলা হবে যখন জেলার সব উৎপন্ন পণ্যসামগ্রী ব্যবসা ও রপ্তানীর জন্য একটা জায়গায় এসে জড়ো হবে। এখান থেকে সেগুলো বাইরে পাঠানো হবে ও বিনিময়ে পণ্য আমদানী হবে। এর জন্য যে আর্থিক লেনদেনের প্রয়োজন হবে, তারও কেন্দ্রস্থল হল এই মহানগর। এই ধরনের নগরের জনসংখ্যা আশেপাশের শহরের চেয়ে বেশ কিছু বেশি হয়। মহানগর হল নানা ধরনের আঞ্চলিক শিল্প ও বড় মাপের পাইকারী ব্যবসার একটি স্বাধীন কেন্দ্র। সর্বোপরি মহানগর হল সাংস্কৃতিক ও প্রশাসনিক কেন্দ্র। Dickinson-র মতে অতীতেও কোন কোন মহানগর ছিল

প্রশাসনিক রাজধানী ও সংস্কৃতির কেন্দ্রবিন্দু। এখানে বিশ্ববিদ্যালয়ও থাকত। "Some in the past have been political capitals and cultural centres with ancient universities" (Dickinson)। এ প্রসঙ্গে Hudson-র সংজ্ঞা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তাঁর মতে Metropolis বা মহানগর হল "The large city, dominating a number of small towns and villages"। তাঁর আলোচনার সূত্র ধরে আমরা বলতে পারি যে মহানগর শহর অনুক্রমের (hierarchy of towns) একটি পর্যায় (stage) মাত্র। এই ভিত্তিতে আবার মহানগর হল Dickinson-র regional capital বা আঞ্চলিক রাজধানী। Dickinson যথার্থই মন্তব্য করেছেন যে মহানগর সৃষ্টির মূলে আছে তার বহুবিধ কর্মধারা। তাঁর আরও বক্তব্য হল মহানগরের অর্থনীতি আধুনিক সভ্যতার এক সর্বজনীন বৈশিষ্ট্য (Metropolitan economy is a universal feature of modern civilization)। অতীতে কয়েকটি নগরই মহানগরের গৌরব অর্জন করেছিল। এখন মহানগরের অধীনস্থ বহু নগরীই স্বাধীন সত্ত্বা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। যেমন ব্রিটেনের ম্যানচেস্টার, বার্মিংহাম, গ্লাসগো-র মত নগরগুলো আর্থিক দিক দিয়ে আর লন্ডনের মুখাপেক্ষী নয়। অনুরূপভাবে, যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমের নগরগুলো আর্থিক ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে নিউ ইয়র্কের মুখাপেক্ষী নয়। তবুও একথা বলা চলে যে এই সব মহানগরীর কোনটাই লন্ডন বা নিউ ইয়র্কের সঙ্গে তুলনা করা চলে না। কারণ এরা হল আন্তর্জাতিক অর্থনীতি ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র অর্থাৎ এদের প্রভাব বলয় বহুদূর বিস্তৃত (has a very wide sphere of influence).

এবার মহানগরের দ্বিতীয় সংজ্ঞার কথায় আসা যাক। তা হল জনসংখ্যা। বলা হয়ে থাকে মহানগরের জনসংখ্যা সাধারণত 10 লক্ষ হবে। তবে জনসংখ্যার এই সীমারেখা দিয়ে মহানগরকে চিহ্নিত করা যায় না। কারণ আজকের অনেক উন্নয়নশীল দেশে সমসংখ্যক বা তার বেশি জনসংখ্যা বিশিষ্ট শহর খুঁজে পাওয়া যাবে, যাদের আন্তর্জাতিক খ্যাতি নেই। শিলিগুড়ি শহরে বর্তমানে প্রায় পাঁচ লক্ষ (4,70,275-2001 জনগণনা) লোক বসবাস করে। আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই তা দশ লক্ষে পৌছাবে। তা সত্ত্বেও এটি মহানগরের আখ্যা পাবে না, কারণ এই শহরের কর্মধারার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি নেই। আর এখানে বিদেশী বাসিন্দাও নেই। তাই Dickinson যথার্থই মন্তব্য করেছেন যে "When does a city qualify for the title of metropolis? The population aggregates employed by statisticians and others are of limited use to designate city character generally"। এই প্রসঙ্গে ভট্টাচার্য ও ভট্টাচার্য (1977) লিখেছেন যে কোন মহানগরের বৈশিষ্ট্য খুঁজতে হবে তাদের আন্তর্জাতিক কার্যাবলীর মধ্যে। অধিকাংশ আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মহানগরগুলো তাদের এক বা একাধিক কাজের জন্য আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করেছে। যেমন যুক্তরাষ্ট্রের লস্ এঞ্জেলস্ (Los Angels) সিনেমা শিল্প, ডেট্রয়েট (Detroit) মোটরগাড়ি, নিউ ইয়র্ক আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ, শিক্ষা ও বন্দর, যুক্তরাজ্যের অক্সফোর্ড শিক্ষার কেন্দ্র হিসেবে সারা বিশ্বে খ্যাতি লাভ করেছে।

মহানগরের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল তার আন্তর্জাতিক চরিত্র। বহু সংখ্যক বিদেশীর বসবাস একে আন্তর্জাতিক নগরে পরিণত করে। "Such a settlement is commonly occupied by a cosmopolitan population, following many specialised occupations" (Hudson)। দেখা গেছে যে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মহানগরগুলোর প্রায় সব ক'টি বিদেশী দূতাবাস দপ্তর। আবার প্রাচ্যের বহু রাজধানী নগর দীর্ঘদিন যাবৎ বিদেশী শাসকদের অধীনে থাকায় এই সব নগরে বহু বিদেশী বসবাস করেন। ঐ দেশগুলো স্বাধীন হবার পরও ঐ রাজধানী নগরগুলোতে বিদেশী দূতাবাস দপ্তরের দৌলতে আরও ভিনদেশী বাসিন্দার সমাগম হয়েছে, যেমন কোলকাতা, দিল্লী, মুম্বাই, রেঙ্গুন।

ভারতের মহানগর (1991)		
ক্রম নং	মহানগরীর নাম	জনসংখ্যা (1991)
1.	বৃহত্তর মুম্বাই	99,09,547
2.	দিল্লী	71,54,755
3.	চেন্নাই	53,61,468
4.	কোলকাতা	43,88,262
5.	হায়দ্রাবাদ	30,05,496
6.	আমেদাবাদ	28,72,865
7.	ব্যাঙ্গালোর	26,50,659
8.	কানপুর	19,62,750
9.	লক্ষ্ণৌ	15,92,010
10.	জয়পুর	14,54,678
11.	কোচিন	11,39,543
12.	ইন্দোর	10,86,673
13.	ভূপাল	10,63,662
14.	বিশাখাপত্তনম	10,51,918
15.	কল্যাণ	10,14,062
16.	লুধিয়ানা	10,12,062

মহানগর সম্বন্ধে সবশেষে যে কথাটি আসে তা হল বিশ্বের সবখানেই কি মহানগর সৃষ্টি হতে পারে? Hudson লিখেছেন যে কোন নির্দিষ্ট অনুকূল পরিবেশেই মহানগর সৃষ্টি হবে (developing in a particularly favourable situation)। তাই দেখা যায় একদিকে কৃষি প্রধান ভারত ও চীনে এবং অন্যদিকে শিল্পোন্নত যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জার্মানীর মত দেশেও মহানগরের সৃষ্টি হয়েছে। উভয় ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট ভিন্ন হলেও মহানগর সৃষ্টির কারণ কিন্তু অভিন্ন, অর্থাৎ আর্থিক দিক দিয়ে খুব উন্নত এই সব মহানগরে বিশাল সংখ্যক সঞ্চারমানতা, ও তাদের বিপুল জনধারণ ক্ষমতা। এই সব মহানগরের কোন কোনটি শিল্প (যেমন ডেট্রয়েট, পিটস্‌বার্গ), কোন কোনটি ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্প (হংকং Hongkong, সাংহাই Shanghai, কোলকাতা, মুম্বাই), আবার কোন কোনটি আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক কেন্দ্র (দিল্লী) হিসেবে খ্যাত। শিল্পোন্নত দেশগুলোতে বহু সংখ্যক মানুষ শিল্পকেন্দ্রগুলোতে ভীড় জমায়। আবার অনুন্নত কৃষিপ্রধান দেশে ত্রুটিপূর্ণ কৃষি ব্যবস্থা বহু সংখ্যক মানুষের ভার বহনে অক্ষম হয়। ফলে সেই সব স্থান থেকে উদ্বৃত্ত জনতা বড় বড় নগরে ভীড় জমায়। আর এইভাবেই মহানগর ফুলে ফেঁপে ওঠে। আর্থিক দিক দিয়ে গ্রামের কর্মহীন জনতা মহানগরের যেখানে সেখানে বস্তি গড়ে তোলে। পরিকল্পনার অভাবে ও এই ক্রমবর্ধমান জনতার চাপে অনেক সময় নগর জীবন নানা ভাবে বিঘ্নিত হয়। Hudson আরও এক ধাপ এগিয়ে বলেছেন, "It begins to suffer from class struggle, from the increasing difficulty of integrating its diverse cultural elements and from the growing power of its merchants and bankers." এটা ঠিক যে মহানগরে বিভিন্ন বৃত্তির সুযোগ বেশি। এখানকার সব বাসিন্দাদের আর্থিক অবস্থা এক নয়। ফলে অনেক ক্ষেত্রে এখানে ভিন্ন ভিন্ন আর্থিক গোষ্ঠীর (economic group) সৃষ্টি হয়।

আবার বিভিন্ন স্থানের মানুষ এখানে এসে বাস করে বলে এদের মধ্যে আত্মার যোগ হয় না। আর যেহেতু ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিরা মহানগরের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে আর্থিক সাহায্য করে তাই সেখানকার বিভিন্ন ক্রিয়াকর্মে তাদের একটা বড় ধরনের ভূমিকা কাজ করে।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে মেট্রোপলিটন এলাকা (area) ও অঞ্চল (region) বলতে কি বোঝায়? এই বিষয়ে কোন নির্দিষ্ট সংজ্ঞা নেই, আবার উভয়ের সীমা সম্পর্কে নির্দিষ্ট করে কিছু বলা যায় না, বিশেষ করে মেট্রোপলিটন এলাকা সম্পর্কে (যুক্তরাষ্ট্রে অবশ্য standard metropolitan area কথাটি চালু আছে)। Dickinson-র মতে যে স্থান মহানগরের ওপর নির্ভরশীল, তাই হল মহানগর এলাকা। "The area which is dependent on it, its metropolitan area"। সাধারণভাবে মহানগর এলাকা বলতে আমরা মহানগরের সাথে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত এলাকাকে বুঝি, যেখানে মহানগরীর বিভিন্ন কার্যাবলী বিকাশ লাভ করে। আর তা মহানগরীর চৌহদ্দির মধ্যেই হয়ে থাকে। তবে সব সময় এই নিয়ম খাটে না, বিশেষ করে যখন আমরা প্রাচ্যের মহানগরীগুলোর পরিকল্পনার কথা বলি। কারণ এই সব দেশে জমির ব্যবহার (land use) এত অবিন্যস্ত ও নগরের কেন্দ্রের কাছাকাছি এলাকা এত ঘিঞ্জি যে পরিকল্পনাবিদ্‌রা মহানগরের কেন্দ্রস্থল থেকে বাইরের দিকে নতুন উপনগরী গড়ে তোলার কথা ভাবেন। শুরু হয় মহানগর ছাড়িয়ে বসতি ও শিল্পের বাইরের দিকে প্রসরণ। পশ্চিমী দেশগুলোতে অবশ্য এই সমস্যাটা নেই, কারণ বিত্তবানরা নগরের বাইরের দিকে শান্ত এলাকায় বাস করার চেষ্টা করে। চিত্র 4.17-তে কোলকাতা মহানগর এলাকা ও অঞ্চল দেখানো হল। চিত্র থেকে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে কোলকাতা মহানগর এলাকা উক্ত মহানগরের আশেপাশেই সীমাবদ্ধ। এই এলাকা কোলকাতা ও হাওড়ার যৌথ পৌরপুঞ্জের সাথে তুলনীয়। বস্তুতপক্ষে, কোলকাতা ও হাওড়া মহানগর পাশাপাশি থাকায় উভয়ের মিলিত মহানগর এলাকা বিশাল। কোলকাতা মেট্রোপলিটন এলাকা উত্তর-দক্ষিণে প্রায় 85 কি.মি. বিস্তৃত। হুগলী নদীর উভয় তীরে এই এলাকা 4 কি.মি. চওড়া, দক্ষিণ দিকে অবশ্য কিছুটা বেশি চওড়া। 12.5 মিলিয়ন লোকসংখ্যা (2000) অধ্যুষিত ও 1,350 বর্গ কি.মি. বিস্তৃত কোলকাতা মেট্রোপলিটন এলাকায় 3-টি পৌর নিগম (কোলকাতা, হাওড়া, চন্দননগর), 31-টি পৌর প্রতিষ্ঠান, 2-টি প্রজ্ঞাপিত এলাকা, 165-টি পঞ্চায়েত ও 400-টি মৌজা রয়েছে। অতএব কোলকাতা মেট্রোপলিটন এলাকায় গ্রাম্য এলাকা রয়েছে। তাই কোলকাতার পৌরবৃদ্ধি সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে, "The Calcutta Metropolitan area has been often described as a cluster of villages" (Ghosh)। আগে কোলকাতা মেট্রোপলিটন এলাকাকে বলা হত কোলকাতা মেট্রোপলিটন জেলা (Calcutta Metropolitan District of C.M.D.)।

R. D. Mckenzie-র মতে মেট্রোপলিটন অঞ্চল হল প্রাথমিকভাবে এক পরিষেবা অঞ্চল (service area)। ভৌগোলিক বিচারে যতদূর পর্যন্ত মহানগর তার সক্রিয় প্রভাব বিস্তার করে, ততদূর পর্যন্ত হল মেট্রোপলিটন অঞ্চল। স্বভাবতই এটি পরিবহনের ওপর নির্ভরশীল। কারণ দ্রুতগামী পরিবহন ব্যবস্থার মাধ্যমে মহানগরের সাথে আশেপাশের অঞ্চলের এক সরাসরি ও গভীর সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে থাকে। মোটামুটিভাবে শহরতলি এলাকায় মহানগরের প্রভাব সর্বাধিক। কোলকাতা মহানগর অঞ্চলের মানচিত্র লক্ষ্য করলে (চিত্র 11.1.2) দেখা যাবে যে দ্রুতগামী বৈদ্যুতিক রেলগাড়ি এই অঞ্চলটিকে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত করেছে। Emrys Jones-র (Towns and Cities) মতে মেট্রোপলিটন অঞ্চল হল মেট্রোপলিটন নগর দ্বারা প্রভাবিত এলাকা। পরিষেবা ও পণ্যসম্ভারের মাধ্যমে এই অঞ্চলটি আশেপাশের এক বিরাট গ্রামীণ এলাকার জনতার অধিকাংশ অভাব মেটাতে পারে। ব্যবসা বাণিজ্য এলাকা ও সংবাদপত্র প্রচারের পরিধির এলাকার বিচারে এটিকে আবার পরিমাপ করতে হয়। Jones আরও লিখেছেন যে নগরের কেন্দ্রস্থলের কাছাকাছি মহানগরের প্রভাব সবচেয়ে বেশি অনুভূত হয় এবং এই স্থানেই মহানগর মানুষের জীবনের বিভিন্ন দিককে প্রভাবিত করে। মহানগরের কেন্দ্রস্থল থেকে যতদূর যাওয়া যায় ততই মহানগরের

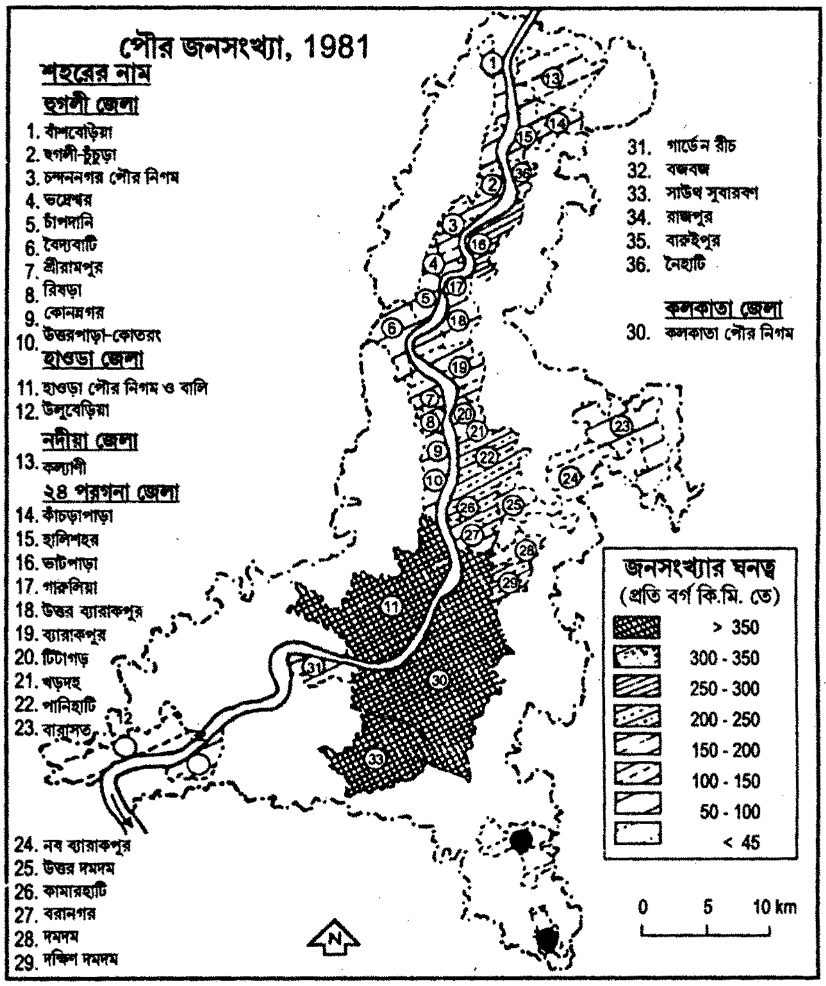

চিত্র - 4.17 কোলকাতা মেট্রোপলিটন এলাকা (উৎস —Biplab Dasgupta–Migration, Urbanization and Rural Change)

সামাজিক প্রভাব কমতে থাকে, যদিও অর্থনৈতিক প্রভাব থেকে যায়। এর বদলে আশেপাশের অন্য কোন বড় মহানগরের প্রভাব ঐ সব এলাকায় লক্ষ্য করা যায়। আর এই কারণেই কোন কোন মহানগর অঞ্চলের সীমা নির্ধারণ করা অসুবিধেজনক হয়ে পড়ে।

৪.১৫ পৌরপুঞ্জ ও পৌর মহাপুঞ্জ (Conurbation & Megalopolis)

Conurbation বা পৌরপুঞ্জ শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে দু'টি শব্দের সমন্বয়ে— 'Continuous' এবং 'Urban area'।

পৌর এলাকা :— R. L. Dwivede এর মতে "Conurbation means continuous urban development over a considerable area." P. Geddes সর্বপ্রথম 1915 সালে conurbation শব্দটি ব্যবহার করেন। একে তিনি "City region" বা "Urban Aggregates" বোঝাতে ব্যবহার করেছেন। তিনি 1915 সালে ব্রিটেনের

জনবণ্টন মানচিত্র পর্যালোচনা করতে গিয়ে লক্ষ্য করেন যে কয়েকটি ক্ষেত্রে বিভিন্ন পৌর অঞ্চল পরস্পরের সঙ্গে একত্রে যুক্ত হয়ে অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছে। এক্ষেত্রে এমন একটি বড় মাপের পৌরাঞ্চল সৃষ্টি হয়েছে যা সমসাময়িক যে কোন নগর অপেক্ষা আয়তনে ও লোকসংখ্যায় বড়। এইরূপ পৌরাকৃতিকে Geddes পৌরপুঞ্জ বা Conurbation বলেছেন।

C. B Fawcett-এর মতে "A conurbation is an area occupied by a continuous series of dwelling, factories, harbour, dock, urban parks and playing fields, etc. which are not separated from each other by rural land." নগরায়ণের একটি গুরুত্বপূর্ণ ফল হল পৌরপুঞ্জের সৃষ্টি।

Dickinson পৌরপুঞ্জকে যথার্থই ভাজা ডিমের সাথে তুলনা করেছেন, যার কুসুমটিকে নগরের কেন্দ্রবিন্দু ও সাদা অংশটিকে বিস্তীর্ণ প্রান্তভাগের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। নগরের বাইরে পৌর বিক্ষেপণের (sprawl) দ্বারা একটি নগর অপর নগরের সাথে যুক্ত হয়ে একগুচ্ছ ভাজা ডিমের আকৃতি নেয়। R. E. Dickinson অবশ্য একে 'Urban tract' বলেছেন। "The continuous urban area that stretched across the boundaries of several continuous administrative districts". City and Region-এ Dickinson পৌরপুঞ্জের একটি সুন্দর চিত্র তুলে ধরেছেন— "A single urbanised area, with a compact core and a wide periphery can be likened to the yoke and the white of a fried egg. Urban sprawl outside the cities is causing them to coalesce so as to form a cluster of fried eggs."

জিন গটম্যান (Jean Gottmann) অবশ্য পৌরপুঞ্জকে "Extended city" বা ব্যাপ্ত নগর, "Super Metropolitan Region" বা উন্নত মহানগর অঞ্চল বলেছেন J. C. Saoyne-র মতে পৌরপুঞ্জ হল : "Conurbation is an area of urban development where a number of separate towns have grown into each other and become linked by such factors as common industrial or business interest for a common centre of shopping and education"

D. Bartels-এর ধারণা অনুসারে দু'টি প্রতিবেশী নগর তার কেন্দ্র থেকে 22 কি.মি. দূরত্ব সম্পন্ন হলে অনেক সময় পৌরবৃদ্ধি একটি অপরকে স্পর্শ করে ও এইভাবে পৌরপুঞ্জের সৃষ্টি করে।

T. W. Freeman-এর মতে পৌরপুঞ্জ হল শিল্প শহরের সংঘবদ্ধতা যেখানে ঘটনাক্রমে আবাসস্থল ও বাণিজ্যিক কার্যকলাপ দেখা যেতে পারে। British Census Report ঘেঁটে Freeman আরও বলেছেন যে কোন শহর তার উপশহর ও আবাসস্থলকে নিয়ে এক সাথে সংযুক্ত হয়ে পৌরপুঞ্জ বা conurbation গঠন করতে পারে।

Conurbation জার্মানীতে 'Stadt region' নামে, যুক্তরাষ্ট্রে 'Standard Metropolitan Area' নামে এবং ভারতে 'Standard Urban Area' নামে পরিচিত। পৌরপুঞ্জ শব্দটি সেই সব শহরগুচ্ছের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যেগুলো নিজেদের উন্নতির জন্য অর্থনৈতিক দিক দিয়ে পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল কিন্তু প্রশাসনিক বা রাজনৈতিক দিক দিয়ে আলদা। পৌরপুঞ্জের কয়েকটি সুন্দর উদাহরণ হল বৃহত্তর লন্ডন, প্যারিস, টোকিও, নিউইয়র্ক, লিভারপুল, বৃহত্তর মুম্বাই, কোলকাতা এবং সাংহাই।

পৌরপুঞ্জ বিকাশের প্রক্রিয়া সমূহ (Processes of the development of conurbation) ঃ—

নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে পৌরপুঞ্জ সৃষ্টি হয়ে থাকে ঃ— (চিত্র 4.18)

i) **পুষ্টিভবন পদ্ধতি ঃ—** এই পদ্ধতিতে একটি প্রান্তবর্তী নগর পরিবর্ধনের দ্বারা ক্রমাগত প্রসারিত হয়ে পৌরপুঞ্জের সৃষ্টি করে। যেমন— লন্ডন পৌরপুঞ্জ, কোলকাতা পৌরপুঞ্জ (চিত্র 4.18, সারণি 4.12)।

ii) **পিণ্ডভবন পদ্ধতি ঃ—** এই পদ্ধতিতে প্রতিবেশী শহর ও নগরী পারস্পরিক সম্প্রসারণের ফলে শেষ পর্যন্ত পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়ে একটি অখণ্ড পৌরপুঞ্জ গঠন করে। তবে পুষ্টিভবন ও পিণ্ডভবন পদ্ধতিতে সৃষ্ট পৌরপুঞ্জও বহুকেন্দ্রিক হয়ে থাকে।

উপরোক্ত পদ্ধতিতে পৌরপুঞ্জ সৃষ্টি তখনই সম্ভব যখন পরিবহন, শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্যের ক্রমঃ বিকাশ ঘটবে।

পৌরপুঞ্জের বৈশিষ্ট্য ঃ— (Characteristics of Conurbation) :–

i) এটি একটি নির্মীয়মাণ এলাকা। তবে এর মধ্যে একফালি গ্রামীণ এলাকা থাকলেও থাকতে পারে যা কর্মসূত্রে বা অন্যান্য কারণের জন্য প্রধান এলাকার সাথে যুক্ত থাকে।

ii) পৌরপুঞ্জের মধ্যে প্রজ্ঞাপিত এলাকা (Notified Area) ও থাকতে পারে। বাজার, উচ্চশিক্ষা, কাজকর্ম, খেলাধুলা ও আমোদ প্রমোদের জন্য এই সব এলাকা পৌরপুঞ্জের সাথে সম্পর্কিত।

iii) আশেপাশের এলাকা থেকে জনসংখ্যার ঘনত্ব বেশি হওয়া এটির একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

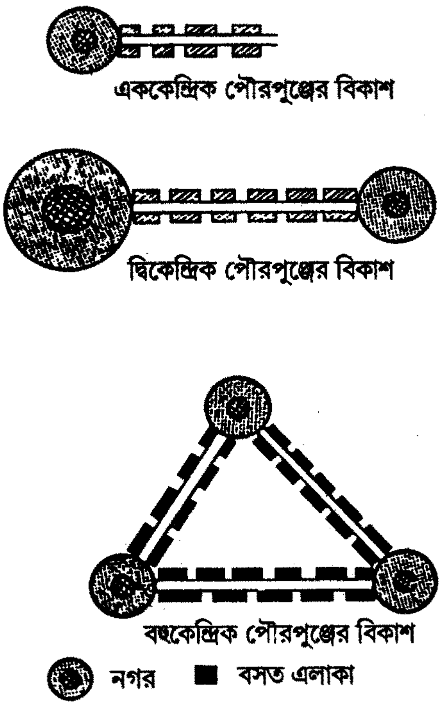

চিত্র - 4.18 তত্ত্বগত দিক দিয়ে পৌরপুঞ্জের বিকাশ

iv) এটি একটি অত্যাবশ্যকীয় পণ্যসামগ্রীর আমদানী ও রপ্তানী কেন্দ্র।

v) প্রতিটি পৌরপুঞ্জে নানা ধরনের শিল্প গড়ে ওঠে। কারণ জনসংখ্যা বেশি হওয়ায় ও মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বেশি থাকায় এখানকার উৎপাদিত দ্রব্যের বাজার আছে।

vi) পৌরপুঞ্জের বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান থাকে।

vii) সুলভ ও উন্নত পরিবহনের সুবিধের জন্য এটি পারিপার্শ্বিক এলাকার এক বিশিষ্ট হৃদকেন্দ্র হিসেবে কাজ করে।

viii) প্রত্যেকটি নগর পরস্পরের সাথে কায়িকভাবে যুক্ত হওয়া সত্ত্বেও পৌরপুঞ্জ তার রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে চলে। এ প্রসঙ্গে বলা যায় ঃ— "When a town has reached the stage of 1,00,000 population, it is known as a city and when several industrial cities coalesced both physically and economically, even if they are politically independent they are known as conurbation". (*Recent Trends and Concepts in Geography* by R. B. Mandal and V. N. P. Sinha).

পৌরপুঞ্জ বিকাশের কারণসমূহ (Causes for the development of conurbation) ঃ—

সাধারণত লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে পৃথিবীর অধিকাংশ পৌরপুঞ্জ শিল্প-কেন্দ্রিক। ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়, তবে পৌরপুঞ্জ যেভাবেই সৃষ্টি হোক না কেন, প্রতিটি পৌরপুঞ্জ সৃষ্টির পেছনে কয়েকটি কারণ কার্যকরী হয়। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল— i) **শিল্প স্থাপন ঃ**— যে কোন পৌর এলাকায় গড়ে ওঠা একটি শিল্পকে কেন্দ্র করে বসতি ঘনসন্নিবদ্ধ হয়। ফলস্বরূপ সেই এলাকায় জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং উক্ত পৌর এলাকা পৌরপুঞ্জে পরিণত হয়। যেমন হুগলী শিল্পাঞ্চল।

ii) **উন্নত পরিবহন ব্যবস্থার সুযোগ ঃ**— উন্নত পরিবহন ব্যবস্থার মাধ্যমে একটি পৌর এলাকার জনগণ সহজেই নিকটবর্তী শহরে যাতায়াত করতে পারে। অনুরূপভাবে, শহরের বাসিন্দারাও শহরের কোলাহল এড়াতে উক্ত পৌর এলাকায় বসতি স্থাপনে উৎসাহিত হয়। ফলে পৌর এলাকা ক্রমাগত বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া উন্নত পরিবহন ব্যবস্থার মাধ্যমে শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল শিল্পাঞ্চলে এবং শিল্পজাত দ্রব্য নিকটবর্তী বাজারে প্রেরণ করা সম্ভব হয়। যেমন রূঢ় অঞ্চল।

iii) **খনিজ সম্পদের প্রাচুর্যতা ঃ**— খনিজ সম্পদের উৎস অঞ্চলেও অনেক সময় পৌরপুঞ্জ গড়ে ওঠে। এক্ষেত্রে উক্ত অঞ্চল প্রতিবেশী শহরগুলো নিয়ে একটি পৌরপুঞ্জ গড়ে তোলে। উদাহরণ হল St. Etienne। তাছাড়া, খনিজ সম্পদের উত্তোলনকে কেন্দ্র করে পৌরপুঞ্জ গড়ে ওঠে। যেমন জার্মানীর দক্ষিণ অঞ্চলের বিস্তীর্ণ কয়লাখনিকে কেন্দ্র করে পৌরপুঞ্জ গড়ে উঠেছে।

iv) **জমির কম দাম ঃ**— শহরতলি এলাকায় বসতি জমির মূল্য শহরের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম হওয়ায় শহরবাসী পৌর এলাকায় বসতি স্থাপনে উৎসাহিত হয়। ফলতঃ পৌর এলাকার কলেবর ক্রমাগত বৃদ্ধি পায় এবং উক্ত এলাকা পৌরপুঞ্জে পরিণত হয়।

v) **উচ্চ শিক্ষার সুযোগ ঃ**— শহরের মধ্যে উপযুক্ত স্থানাভাবের দরুন নিকটবর্তী পৌর এলাকাগুলোতে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। এদেরকে কেন্দ্র করে উক্ত এলাকায় বসতি ঘনসন্নিবদ্ধ হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে শিলিগুড়ি শহর ক্রমশ পশ্চিম দিকে প্রসারিত হয়ে উপনিবেশ এলাকাকে গ্রাম করে আগামী দিনে একটি পৌরপুঞ্জ সৃষ্টি করবে।

vi) **স্থানীয় বাজারের উপস্থিতি ঃ**— পৌরপুঞ্জ সৃষ্টির অপর একটি শর্ত হল স্থানীয় বড় আকারের বাজারের উপস্থিতি যাকে কেন্দ্র করে কোন এলাকার জনঘনত্ব বৃদ্ধি পায় এবং উক্ত এলাকা পৌরপুঞ্জে পরিণত হয়।

vii) **যুগ্ম শহরের উপস্থিতি ঃ—** পৌরপুঞ্জের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্যরূপ দ্বৈত শহরের ক্ষেত্রে দেখতে পাওয়া যায়। পাশাপাশি অবস্থিত দুটি শহরের লোকসংখ্যা মিলিত হয়ে সহজেই পৌরপুঞ্জ গড়ে ওঠে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় St. Point ও Minneapolis - এই দুটি শহর পৌরপুঞ্জ গড়ে তুলছে। হুগলী নদীর উভয় তীরে কোলকাতা ও হাওড়া এই রকম আরেকটি যুগ্ম শহর।

viii) **নদীর তীরবর্তী অঞ্চল ঃ—** অনেক সময় বহুমুখী পৌরপুঞ্জ নদীকে আশ্রয় করে গড়ে ওঠে। এর মূল কারণগুলো হল--

a) নদী থেকে একদিকে যেমন সহজে জল পাওয়া যায়, আবার অন্যদিকে জলবিদ্যুৎ তৈরি করা যায়।

b) নদী সুলভ পরিবহন মাধ্যম হিসেবে কাজ করে।

c) নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে জমির দাম কম।

d) সর্বোপরি নদী তীরবর্তী আর্দ্র জলবায়ু শিল্প প্রসারে সহায়ক। যেমন—লন্ডন পৌরপুঞ্জ সৃষ্টির পেছনে টেমস্ নদীর বহু অবদান আছে।

ix) **সড়ক পথের সংযোগস্থল ঃ—** কোন কোন সময় সড়কপথে্ সংযোগস্থলে আবার কখনও দুটি জলপথের সংযোগস্থলে পৌরপুঞ্জ গড়ে ওঠে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় Messina এর Reggio অঞ্চল ও তার পার্শ্ববর্তী শহরতলী নিয়ে গড়ে ওঠা পৌরপুঞ্জ। উক্ত অঞ্চলে 1951 সালে প্রায় 35,000 লোকসংখ্যা ছিল।

ভারতীয় উদাহরণ—

ভারতবর্ষে অনুরূপভাবে শহরের বৃদ্ধি পশ্চিমবঙ্গে হুগলী নদীর নিম্ন অঞ্চলে লক্ষ্য করা যায়। এখানে হুগলী নদীর উভয় তীর বরাবর একটানা ঘনবসতি, রাস্তাঘাট ও কলকারখানা আছে। উত্তর-পূর্বের কল্যাণী থেকে একটানা দক্ষিণ পশ্চিম উলুবেড়িয়া পর্যন্ত প্রায় 216 বর্গ মাইল এলাকায় 88-টির বেশি মিউনিসিপ্যাল শহর আছে। (এর মধ্যে কোলকাতা ও হাওড়া এই দুটি কর্পোরেশনের জনসংখ্যা প্রায় দেড় কোটি। গড় ঘনত্ব প্রতি বর্গ মাইলে প্রায় 28,0000 জনের বেশি)। 1841 সাল নাগাদ হুগলী নদী বরাবর একটি নির্দিষ্ট রেখা বরাবর উন্নয়ন ঘটেছে। হুগলী নদীর পার্শ্ববর্তী এই পৌরপুঞ্জ-এর সঙ্গে কোলকাতা, হাওড়ার বৃদ্ধি বিশালভাবে ঘটে। এটা লক্ষ্য করা গেছে যে নদীর ডান ও বাম তীরে ভদ্রেশ্বর, রিষড়া, নৈহাটি, টিটাগড় প্রভৃতির মত শহর গড়ে উঠেছে যারা তাদের নিজস্ব সত্তা বজায় রেখেছে।

কোলকাতা পৌরপুঞ্জ গঠনের ক্ষেত্রে পুষ্টিভবন এবং পিণ্ডভবন এই দুটি পদ্ধতি ক্রিয়াশীল হয়েছে।

i) **পুষ্টিভবন পদ্ধতি ঃ—** প্রথমে কোলকাতা নগর তার আশেপাশের সমস্ত শহরগুলোকে আত্মসাৎ করেছে।

এই পদ্ধতিতে হুগলী নদীর উভয় তীরে হাওড়া ও কোলকাতা দুটি নিরবচ্ছিন্ন পৌর অঞ্চল সৃষ্টি করেছে।

ii) **পিণ্ডভবন পদ্ধতি ঃ—** উক্ত দুই নিরবিচ্ছিন্ন পৌর অঞ্চলের মধ্যবর্তী ক্ষুদ্র শহর অঞ্চলগুলোর কলেবর বৃদ্ধি পেয়ে পৌরপুঞ্জের সৃষ্টি করেছে। কেন্দ্রভবনশীলতার মাধ্যমে এই পিণ্ডভবন হয়ে থাকে।

আবার হাওড়া ও কোলকাতার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হুগলী নদীর উপর দিয়ে সড়ক ও রেল পরিবহনের উন্নত যোগাযোগ গড়ে ওঠার ফলে এই দুই পৌর অঞ্চল সেতু তৈরির মাধ্যমে একত্রিত হয়ে পিণ্ডভবন প্রক্রিয়ায় পৌরপুঞ্জ গঠন করেছে।

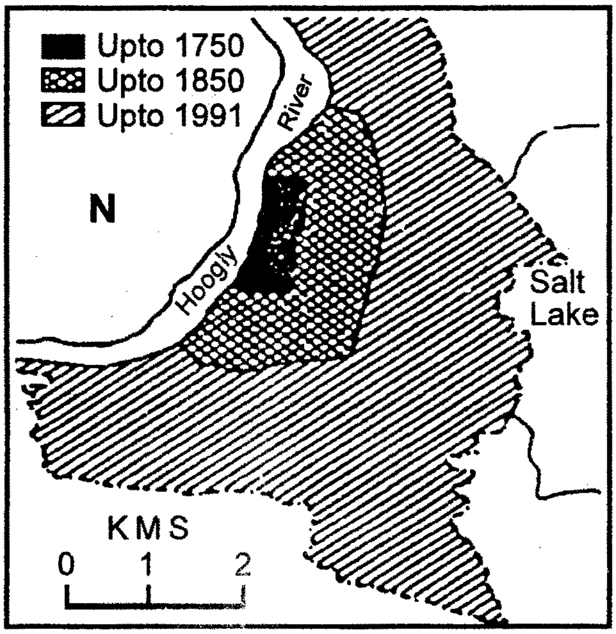

চিত্র 4.19 : কোলকাতা পৌরপুঞ্জের ক্রমবিকাশ

সারণি 4.12

কোলকাতা ও বৃহত্তর কোলকাতার জনসংখ্যা

	কোলকাতা		বৃহত্তর কোলকাতা	
সাল	জনসংখ্যা	বৃদ্ধি ঃ	জনসংখ্যা	বৃদ্ধি ঃ
1901	933,754	–	1,488,323	–
1911	1,016,445	8.86	1,718,426	15.46
1921	1,053, 334	3.63	1,850,650	7.69
1931	1,221,210	15.94	2,105,708	13.78
1941	2,167,485	79.49	3,577,789	67.91
1951	2,698,494	24.50	4,588,910	28.26
1961	2,927,289	8.48	5,736,697	25.01
1971	3,148,746	7.57	7,031,382	22.57
1981	3,291,655	4.54	9,165,650	30.35
1991	4,388,262	8.68	10,916,272	12.84

Source : R. B. Mandal, Urban Geography

সারণি 4.13

কোলকাতা পৌরপুঞ্জ সৃষ্টির মূল উপাদান হল ঃ—

1) উন্নত পরিবহন ব্যবস্থা
2) উন্নত পরিকাঠামো
3) সুগঠিত বাজার
4) কোলকাতা বন্দরের নৈকট্য
5) হুগলী নদীর সুলভ জলসম্পদ
6) খনিজ সম্পদের সহজলভ্যতা
7) সুলভ শ্রমিক
8) শিক্ষার সুযোগ সুবিধা
9) জমির কম দাম
10) মূলধনের প্রাচুর্য
11) সর্বোপরি খেলাধুলো ও আমোদ প্রমোদের সুযোগ।

পৃথিবীর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য পৌরপুঞ্জ (Conurbations in other parts of the Globe) ঃ

যুক্তরাষ্ট্র ঃ—

নিউইয়র্কের পৌরপুঞ্জ হাডসন নদীর উভয় পাশে গড়ে উঠেছে এবং নিউ জার্সি (New Jersey) পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। সেন্টপল (St. Paul) এবং মিনিয়াপোলিস (Minneapolis) দ্বি-কেন্দ্রিক পৌরপুঞ্জের সৃষ্টি করেছে। যদিও এই দুই স্থান প্রশাসনিক ও ভৌগোলিক দিক দিয়ে আলাদা, তবুও পরিবহন ব্যবস্থা, শিল্প ও পৌর উন্নয়নের ক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে সমতা লক্ষ্য করা যায়। যুক্তরাষ্ট্রে দক্ষিণ ওয়াশিংটন থেকে উত্তরে বোস্টন (960 বর্গ কি.মি.) পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য পৌরপুঞ্জের সৃষ্টি হয়েছে যা পৌরমহাপুঞ্জ সৃষ্টির জন্য দায়ী।

জাপান ঃ—

জাপানের টোকিও উপসাগরের তীরে টোকিও-ইয়াকোহামা (Tokyo-Yakohama) তীরে ওসাকা-কোবে (Osaka-Kobe) পৌরপুঞ্জের সৃষ্টি হয়েছে।

যুক্তরাজ্য ঃ—

লন্ডন মহানগরীর বহির্দেশে অবস্থিত হ্যারো-রিচমন্ড, প্রভৃতি শহর নিয়ে সৃষ্ট পৌরপুঞ্জ। এছাড়া, ওয়েস্ট ইয়র্কশায়ার (চিত্র 4.20), ম্যাঞ্চেস্টার, লিভারপুল, বার্মিংহাম, লীডস্ (Leeds), ব্রাডফোর্ড (Bradford), টাইনসাইড (Tyneside), গ্লাসগো পৌরপুঞ্জ উল্লেখযোগ্য।

রাইন নদীর তীরবর্তী রূঢ় অঞ্চল ওই দেশের একটি উল্লেখযোগ্য পৌরপুঞ্জ।

পৌরপুঞ্জ নির্ধারণের পদ্ধতি (Methods for determining Conurbation) ঃ

ভারতে পৌরপুঞ্জ নির্ধারণের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেচনা করা হয় ঃ

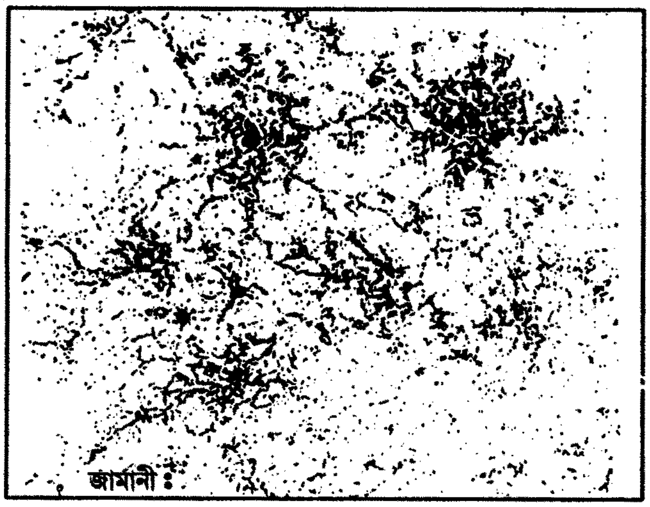

চিত্র - 4.20 ওয়েস্টইয়র্কশায়ার পৌরপুঞ্জ

i) প্রতি বর্গ কিমিতে জনঘনত্ব (Density of Population/sq.km., D.P.)

ii) নির্মীয়মাণ এলাকার শতাংশ (Percentage of built-up area, B.A.)

iii) জনসংখ্যার (হ্রাস বৃদ্ধি) পরিবর্তনের শতকরা হার (Percentage variation of population, VF

iv) পৌরপিণ্ড শহরের সংখ্যা (Number of towns in the urban agglomerations, UA)

v) চালু কারখানার সংখ্যা (No. of working factories, WF)

উপরোক্ত উপাদানগুলোর গড় করে আমরা পৌরপুঞ্জ নির্ধারণ করতে পারি—

$$C = \frac{\sum_{i=1-n}^{n} {}^{C}DP + BA + VP + UA + WF + YDP + BA + VP + UA + WF + ... + n}{\sum N}$$

যখন C = পৌরপুঞ্জ

X = কোন একটি নগর

Y = অন্যান্য নগর

N = আলোচ্য নগরসমূহের সংখ্যা।

এইভাবে যুগ্মসূচী Y (Composite index) এর বেশি গড় মানযুক্ত নগরকে পৌরপুঞ্জ হিসেবে আখ্যায়ি করা হয়।

সমালোচনা ঃ— পৌরপুঞ্জের যথার্থ মান নিয়ে অনেক বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছিল। কিছু ভৌগোলিক একে 'Cit region' বা 'Urban aggregates' শব্দটির বদলে agglomeration শব্দটি ব্যবহারে মত দিয়েছিলেন। তে Fawcett পৌরপুঞ্জের একটি সুন্দর সংজ্ঞা দিয়েছেন —

"A conurbation is an area occupied by a continuous series of dwelling, factories, harbour, dock, urban parks and playing fields etc. which are not separated from each other by rural land". তবে পৌরপুঞ্জের সবচেয়ে ভালো অভিব্যক্তি হল দ্বৈত শহরের সৃষ্টি। "The simplest form of conurbation is that of twin towns, of which classic examples are St. Paul and Minneapolis."

তাই পৌর মহাপুঞ্জ নিয়ে যতই মতভেদ থাকুক না কেন, নগর বা শহরের বৃদ্ধি বৃহত্তর আকারের পৌরপুঞ্জ সৃষ্টি করেই চলে, যা বহু আর্থ-সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি করে এবং যা শহরের বাসিন্দাদের পীড়ার কারণ হয়। সেই সাথে বিভিন্ন অপরাধমূলক কাজেরও উদ্ভব ঘটায়। পরিশেষে বলা যায় একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে অতিরিক্ত উন্নয়ন কখনই আদর্শ অবস্থা নয়।

পৌর মহাপুঞ্জ (Megalopolis)

When several conurbations and metropolises coalesce, the term megalopolis is applied for such a contiguous urban area.

– Recent Trends and Concepts in Geography (Mandal & Sinha)

পৌরপুঞ্জ বা 'Megalopolis' কথাটির উৎপত্তি ঘটেছে গ্রীক শব্দ থেকে যার অর্থ হল A very large city বা বৃহৎ নগর। অর্থাৎ এটি হল এমন এক নগর এলাকা যেখানে কতকগুলো মহানগর শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে সংযুক্ত হয়েছে। Beaujeu Garnier-এর মতে "A megalopolis is only a conurbation which has grown to gain proportions"। পৌরপুঞ্জ কথাটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন গটম্যান (Gottmann)। তিনি 1960 সালে যুক্তরাষ্ট্রের জনগণনা বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত উত্তর-পূর্ব আটলান্টিক উপকূলবর্তী বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এক বিশাল পৌরপুঞ্জ লক্ষ্য করেন যার জনঘনত্ব যুক্তরাষ্ট্রের যে কোন অঞ্চল থেকে দুই বা তিন গুণ বেশি। এমন পৌরাঞ্চলকে গটম্যান megalopolis বা পৌরমহাপুঞ্জ নামে অভিহিত করেছেন। শুধুমাত্র যুক্তরাষ্ট্রেই নয়, সমগ্র বিশ্বেই এটি একটি অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী।

সংজ্ঞা

বিভিন্ন লেখক নানাভাবে পৌরমহাপুঞ্জের অর্থ ব্যাখ্যা করেছেন। Gottmann লক্ষ্য করেন যে নিউহ্যাম্পশায়ারের দক্ষিণ থেকে ভার্জিনিয়ার উত্তর প্রান্ত পর্যন্ত প্রায় 900 কি.মি. লম্বা ও কোথাও কোথাও 160 কি.মি. চওড়া একটানা পৌর অঞ্চল গড়ে উঠেছে। এখানকার জনসংখ্যার ঘনত্ব যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য অংশের তুলনায় $\frac{2}{3}$ গুণ বেশি। Beaujeu Garnier পৌর মহাপুঞ্জকে বড় মাপের পৌরপুঞ্জ বলেছেন। আমেরিকার দার্শনিক Lewis Mumford পৌর মহাপুঞ্জকে বৃহত্তর শহরের প্রতি ঝোঁক সম্পন্ন এবং অতিরিক্ত বর্ধিত হওয়া ও অতিরিক্ত আয়তনের মহানগর বলে ব্যাখ্যা করেছেন। Petrick Geddess ও Lewis Mumford-এর মত সমাজবিজ্ঞানীরা একই অর্থে পৌরপুঞ্জকে ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু Jean Gottmann এদের থেকে ব্যতিক্রমী হয়ে একটি অন্য অর্থ প্রয়োগ করেছেন। তিনি পৌর মহাপুঞ্জ বলতে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা শহরগুলোর পিণ্ডভবনকে বুঝিয়েছেন। তিনি 38 লক্ষ জনসংখ্যা-অধ্যুষিত শহরকে পৌর মহাপুঞ্জ বলে আখ্যা দিয়েছেন। উদাহরণ হিসেবে তিনি আটলান্টিক সমুদ্র উপকূল (Atlantic Sea Board) বরাবর বৃহৎ শহরগুলো শৃঙ্খলবদ্ধকবণ ও তাদের জনসংখ্যা ও জনসংখ্যার ঘনত্বকে দেখিয়েছেন। ফিলাডেলফিয়া ও নিউইয়র্কের মধ্যে 60 মাইল এবং বোস্টন ও নিউইয়র্কের 150 দূরত্ব থাকলেও মহানগরগুলো এক লক্ষ জনসংখ্যা সমন্বিত অসংখ্য শহর দ্বারা পরস্পরের সাথে সংযুক্ত। তাই এই অঞ্চলকে তিনি পৌর মহাপুঞ্জ বলেছেন।

পৌর মহাপুঞ্জ উৎপত্তির শর্ত ঃ— পৌর মহাপুঞ্জ সৃষ্টির মূলে Gottmann নানা রকম কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে দুটি কারণের ওপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন।

i) **বহুকেন্দ্রিক উৎপত্তি ঃ—** Gottmann দেখিয়েছেন যে আটলান্টিক উপকূল অনেকগুলো রাজ্যের মধ্যে বিভক্ত হওয়ার জন্য ব্যবসাবাণিজ্যের ক্ষেত্রে বহুদিন থেকে পরস্পরের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে আসছিল, যা প্রতিটি রাজ্যের উপকূলীয় নগর বন্দরের কাজের ভেতর সংক্রামিত হয়ে তাদের উন্নতির মাত্রাকে সমানভাবে প্রভাবিত করেছিল। উন্নয়ন ও কায়িক সম্প্রসারণের ফলে ঐ সব নগর বন্দর আস্তে আস্তে পরস্পরের কাছে হতে হতে এক সময় যুক্ত হয়ে একটি অখণ্ড পৌর মহাপুঞ্জের জন্ম দিয়েছে।

ii) **অসংখ্য উপকূলীয় নগরের অর্থনৈতিক বিকাশে কব্জার ভূমিকা ঃ-**

যুক্তরাষ্ট্রের জন্ম থেকে ঐ দেশের উপকূল ভাগ দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। দেশের মহাসাগরীয় সীমানা হিসেবে একদিকে বহির্জগতের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা এবং অন্যদিকে দেশের অভ্যন্তরে বসতি স্থাপন এবং উন্নতি সাধনে প্রয়োজনমত উপকূলভাগ নিজেকে Spring Board হিসেবে ব্যবহার করবার সুযোগ ও দায়িত্ব পালন করেছে। প্রকৃতপক্ষে, বিভিন্ন সময়ে উপকূলভাগ এভাবে কখনও বর্হিবাণিজ্য, আবার কখনও অভ্যন্তরীণ উন্নতিতে সাহায্য করেছে। এভাবে বর্হিবাণিজ্যের মারফৎ অর্থনীতি চাঙ্গা করা অথবা অন্তর্দেশীয় সাম্রাজ্য বিস্তারের সাহায্যে দেশের রাজনৈতিক তথা অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে ক্রমশ শক্ত করে তোলবার কাজে উপকূলভাগ কব্জার ভূমিকা পালন করেছে। কব্জাকে প্রয়োজনমত বন্ধ ও খোলা যায়। যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব-উপকূলভাগ কব্জার মত একদিকে বন্ধ হয়ে অন্যদিকে খুলেছে। ঐ দরজার তথাকথিত 'কব্জা' চিরকাল উপকূলভাগে অবস্থিত বোষ্টন হতে ওয়াশিংটন পর্যন্ত সারিসারি নগরে স্থায়ীভাবে থেকে গেছে (ভট্টাচার্য ও ভট্টাচার্য 1977)। উপকূলভাগের এই অসামান্য ভূমিকার মূলে ছিল ভৌগোলিক অবস্থান, রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা, মূলধন ও সর্বোপরি দক্ষতা ও যোগ্যতার দিক হতে এ সমস্ত নগরসমূহের অপ্রতিদ্বন্দ্বী চরিত্র।

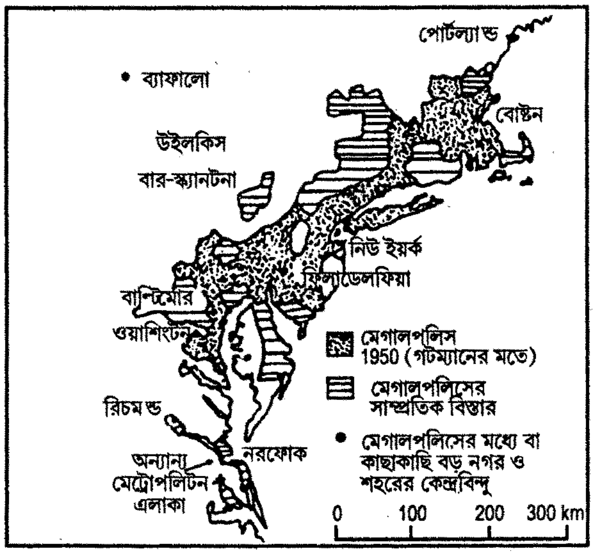

চিত্র - 11.64 যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পৌর মহাপুঞ্জ

পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে পৌর মহাপুঞ্জের বিস্তার ঃ—

1) **যুক্তরাষ্ট্র ঃ** বহুকেন্দ্র সমন্বিত পৌর মহাপুঞ্জের আবির্ভাবের সূচনা যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য কয়েকটি স্থানেও দেখা যায়। পশ্চিমে একটি বিরাট পৌরাঞ্চল লসএঞ্জেলস এবং তৎসংলগ্ন শহরতলীকে কেন্দ্র করে দ্রুত সম্প্রসারিত হচ্ছে। দক্ষিণ পূর্বদিকে এই সম্প্রসারণ ইতিমধ্যে সানবারাডিমা পর্যন্ত ব্যাপ্তি লাভ করেছে। অনতিকালের মধ্যেই উপকূলস্থ সানডিয়াগো-কে অন্তর্ভুক্ত করে আর একটি পৌর মহাপুঞ্জের সৃষ্টি করবে। মিচিগান হ্রদের প্রান্তে অবস্থিত চিকাগো মহানগরীকে কেন্দ্র করে অন্য একটি পৌর মহাপুঞ্জ ধীরে ধীরে রূপ পরিগ্রহ করছে। ওহিও রাষ্ট্রের ক্লিভল্যান্ড এবং পেনসিলভেনিয়া-পিটস্‌বাগ মহানগর দুটির মধ্যে সংযোগ সাধনের মাধ্যমে অচিরে অন্য একটি পৌর মহাপুঞ্জের সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তেমনি সেন্ট লরেন্স নদী পথ খোলার পর থেকে ওন্টারিও ও ইরি হ্রদের দক্ষিণাঞ্চলে পৌর মহাপুঞ্জ সৃষ্টির সম্ভাবনা বৃদ্ধি পেয়েছে।

2) **ইউরোপ ঃ—** ইউরোপেও এই ধরনের দৃষ্টান্ত রয়েছে। রূঢ় কয়লাখনিকে কেন্দ্র করে যে পৌরপুঞ্জের সৃষ্টি হয়েছিল বর্তমানে তা মহাপুঞ্জে পরিণত হতে চলেছে। ইংল্যান্ডে পিনাইন পর্বতের দক্ষিণপ্রান্ত ঘেঁষে পশ্চিমে ম্যাঞ্চেস্টার থেকে বার্মিংহাম হয়ে পূর্বে লীডস্ পর্যন্ত অশ্বক্ষুরাকৃতি অঞ্চল জুড়ে একটি পৌর মহাপুঞ্জ আত্মপ্রকাশ করেছে। বর্তমানে এর জনসংখ্যা প্রায় 140 লক্ষ।

3) **জাপান ঃ—** জাপানে এই ধরনের একটি পৌর মহাপুঞ্জ সৃষ্টি হয়েছে। ওসাকা উপসাগরের উপকূল ধরে ওসাকা থেকে কোবে মহানগর পর্যন্ত প্রায় 30-টি নগরের কায়িক সম্প্রসারণের ফলে পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়ে গিয়ে এই মহাপুঞ্জ গড়ে উঠেছে এবং ক্রমে এটি কিয়োটো পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে।

4) **ভারত ঃ—** ভারতেও এই রকম পৌর মহাপুঞ্জের আভাস কয়েকটি স্থানে ক্রমশ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত হল হুগলী নদীর উভয় তীরে কোলকাতা ও হাওড়াকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা পৌরপুঞ্জ। গত দু'দশকের মধ্যে শহর ও নগরের পারস্পরিক সম্প্রসারণ ও সংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমে এটি ধীরে ধীরে মহাপুঞ্জে রূপান্তরিত হচ্ছে। মুম্বাই মহানগরীও শহরতলী এবং তার নিকটবর্তী অঞ্চলে পৌর মহাপুঞ্জের সৃষ্টির আভাস লক্ষ্য করা যায়।

পৌর মহাপুঞ্জের ক্রিয়াকলাপ/অবদান ঃ—

i) পৌর মহাপুঞ্জের ক্রিয়াকলাপের মধ্যে সামুদ্রিক বন্দরের সর্বাধিক। দেশের সমুদ্রবাহিত বাণিজ্যের অধিকাংশ এখনও পৌর মহাপুঞ্জের পোতাশ্রয় মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকে।

ii) শিল্পকর্মের গতি আজ পর্যন্ত এই অঞ্চলে কোথাও কোন বাধা পায়নি। যদিও দেশের অন্যত্র শিল্প প্রসারের সাথে সাথে পৌর মহাপুঞ্জের শিল্প ক্রমাগত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এবং নৈপুণ্যময় সামগ্রী তৈরির দিকে বেশি ঝুঁকেছে।

iii) পৌর মহাপুঞ্জে গবেষণা ও দক্ষতার সুবিধে থাকায় লৌহ ইস্পাত, রাসায়নিক, ধাতব ও ভারী শিল্প গত 30 বছরের মধ্যে বহু জায়গায় গড়ে উঠেছে।

iv) শিল্পকর্ম ছাড়াও ব্যবসাবাণিজ্য এবং আর্থিক বিকাশে মহাপুঞ্জের অবদান অনস্বীকার্য।

v) সাংস্কৃতিক বিকাশেও পৌর মহাপুঞ্জের নেতৃত্ব সর্বজনস্বীকৃত। যেমন যুক্তরাষ্ট্রের খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণাগার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শ্রেষ্ঠ পাঠাগার এই অঞ্চলে গড়ে উঠেছে।

vi) জনমত গঠনের সহযোগী খবরের কাগজ পৌর মহাপুঞ্জ থেকে প্রকাশিত হয়। এছাড়া, শিল্পকলা চলচ্চিত্র মঞ্চাভিনয়, যাদুঘর এবং পৃথিবীর সর্বদেশের শ্রেষ্ঠ চিত্রকরদের সংগৃহীত চিত্রকলা, সমৃদ্ধ চিত্রশালার উপস্থিতির বিচারে মহাপুঞ্জের স্থান সর্বাগ্রে।

উপসংহার ঃ— বর্তমানকালে অনেকেই এই মত পোষণ করেন যে পৌর মহাপুঞ্জ সৃষ্টি সামাজিক নানাবিধ জটিলতার মূলে। আবার Beaujeu Garnier লিখেছেন কোন কোন স্থাপত্যবিদ্ ও ভৌগোলিক মনে করেন পৌর মহাপুঞ্জ একটি ব্যতিক্রমী ঘটনা। এঁদের মতে পৌর মহাপুঞ্জ সৃষ্টি কাম্য নয়। বস্তুতঃপক্ষে, আগামী দিনের পৌর মহাপুঞ্জকে নগরের বাড়বৃদ্ধি হিসেবে দেখা উচিত হবে না। le conbusier-এর মতে রৈখিক সরলরেখায় গড়ে ওঠা নগরই বস্তুতপক্ষে পৌর মহাপুঞ্জ। পৌর মহাপুঞ্জ কয়েকটি বিকাশ কেন্দ্রে দানা বাঁধছে। সবশেষে বলা যায় Lucion Gachon সবচেয়ে অনুকূল ও খুব জনবহুল দেশে ভবিষ্যতের পৌর মহাপুঞ্জ (The Inhabited world of tomorrow in its almost favourable and most densely populated parts) সৃষ্টির বীজ লক্ষ্য করেছেন।

৪.১৬ গ্রাম-পৌর উপকণ্ঠ (Rural-Urban Fringe)

উপকণ্ঠের সংজ্ঞা (Definition of Rural-Urban Fringe) ঃ—

আমরা আগেই জেনেছি যে পাশ্চাত্য দেশে উপকণ্ঠ ধারণাটি বেশ পুরনো। তাই উপকণ্ঠের সংজ্ঞার জন্য আমরা বিদেশী লেখকদের ধারণা এখানে তুলে ধরব এবং এদের মধ্যে ভারতের মতন দেশে কোনটি প্রযোজ্য তাও বলব। এ প্রসঙ্গে ভারতীয় লেখকদের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আমরা আলোচনা করব।

ভন থুনেন (Von Thunen, 1926)-এর ভূমি ব্যবহারের ধাঁচের (Pattern) মধ্যেই উপকণ্ঠ ধারণাটি নিহিত ছিল। কেন্দ্র থেকে দূরত্ব অনুসারে ভন থুনেন জমিকে পাঁচ ভাবে ব্যবহারের কথা বলেছেন—। 1) জনবসতি, 2) দুগ্ধ ও দোহ শিল্প (Dairy), 3) চাষ আবাদ, 4) পশুচারণ ভূমি, 5) বনভূমি বা জনহীন প্রান্তর, অর্থাৎ শহরের লাগোয়া শিল্পাঞ্চল, শিল্পাঞ্চল থেকে দূরে ফাঁকা জমিতে চাষাবাদ, তার থেকে বহু দূরে পশুচারণভূমি ও তার থেকেও দূরে বনভূমি গড়ে তোলা (চিত্র 4.21) লাভজনক।

চিত্র - 4.21 ভন থুনেন-এর মতে ভূমি ব্যবহারের মডেল

মার্কিন ভূমি অর্থনীতিবিদ G. S. Wehrwein-ই সর্বপ্রথম উপকণ্ঠ ধারণাটি স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন। তাঁর মতে উপকণ্ঠ হল The area of transition between well recognised urban landuses and the area devoted to agricultute" অর্থাৎ উপকণ্ঠ হল সুস্পষ্ট পৌর জমি ব্যবহার ও কৃষিভূমির মধ্যেকার পরিবর্তনশীল

এলাকা। এটি সর্বজনীন স্বীকৃত সংজ্ঞা এবং ভারতীয় প্রেক্ষাপটে এটি প্রযোজ্য। যা হোক, এই সংজ্ঞা খুব অস্পষ্ট এবং নগরের আশপাশের উপকণ্ঠের সীমানা নির্ধারণে খুব একটা উল্লেখযোগ্য সূচক নয়।

Blizzard and Anderson (1952) উপকণ্ঠের নিম্নোক্ত এক সংজ্ঞা দিয়েছেন। তাঁদের মতে "The rural-urban fringe is that area of mixed urban and rural landuses between the point where full city-services cease to be available and the point where agricultural landuses predominate". অর্থাৎ উপকণ্ঠ হল পৌর ও গ্রামীণ এই দুই মিশ্র জমি ব্যবহারের মধ্যবর্তী সেই এলাকা যেখানে পুরোপুরি নগর পরিষেবা পাওয়া যায় না ও কৃষি জমির প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। এই সংজ্ঞার ভিত্তিতে উপকণ্ঠের দুটি সীমানার সাথে আমরা পরিচিত হই। (এক) অন্তঃসীমানা (শহরাভিমুখী) ও (দুই) বহির্মুখী বা গ্রামীণ সীমানা। প্রথমটি নগর পরিষেবার প্রাপ্যতার ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়। ভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে অবশ্য এই ভিত্তি খুব একটা গ্রহণযোগ্য মনে হয় না। কারণ এটা খুব সত্যি কথা যে ভারতীয় শহরে নাগরিক পরিষেবা সাধারণভাবে খুব খারাপ। যেমন পাইপের মাধ্যমে পানীয় জল সরবরাহ বা পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থা এখনও অনেক ভারতীয় শহরে পর্যাপ্ত নয়, বিশেষ করে শহরের দরিদ্র বাসিন্দা-অধ্যুষিত এলাকায়। আবার শহরের বস্তি এলাকায়ও খুব কম পরিষেবা আছে। তাই বলা হচ্ছে Blizzard ও Anderson-র মানদণ্ডানুযায়ী কোন অন্তঃসীমা থাকবে না এবং প্রায় গোটা নগরই উপকণ্ঠের আওতায় আসবে। উপরোক্ত লেখকদ্বয় বহির্সীমা সম্পর্কে ভূমি ব্যবহারের ওপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাই Blizzard ও Anderson-র সংজ্ঞা ভারতীয় প্রেক্ষাপটে পুরোপুরি গ্রহণযোগ্য নয়।

ডিকিনসন (Dickinson, 1964)-র উপকণ্ঠের সংজ্ঞা অনেকটাই গ্রহণযোগ্য। তাঁর মতে "On the outer borders of the city, between the areas of rural and urban land use, there is an intermediate zone which shares the characteristics of each. This fringe is invaded by urban uses-by the extension of housing estates of building along the main arterial roads and by the location of new factories, golf courses, water-works, cemeteries and the like". নগরের সীমানার বাইরে গ্রামীণ ও পৌর ভূমি ব্যবহারের মধ্যবর্তী এলাকায় (গ্রামীণ ও পৌর) উভয়েরই সংমিশ্রণ রয়েছে। এই উপকণ্ঠ এলাকা পৌর ভূমি ব্যবহারের এক বৈশিষ্ট্য ও প্রধান রাস্তার ধার দিয়ে বাড়ির সমাবেশ ও নতুন নতুন কারখানা, গলফ্ মাঠ, জলাধার, সমাধি এবং এই ধরনের কিছু কিছু বস্তু স্থাপনের মধ্য দিয়ে আমাদের নজর কাড়ে। বহু বিদেশী লেখক যেমন H. Carter, R. B. Andrews, Rodehaver, Dewey, G. S. Wehrwein, R. R. Mayer and J. A. Beegle, Lewis Keeble, Solter, Garnier and Chabot উপকণ্ঠের নানা সংজ্ঞা দিয়েছেন, তবে এদের কোনটিই গ্রহণযোগ্য নয়।

ভারতীয় প্রেক্ষাপটে R. L. Singh-র বারাণসী শহরের উপকণ্ঠের সংজ্ঞা বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। "Rural-Urban fringe is really an extension of the city itself, actual and potential and since it is an area where most of the land uses are in flux." অর্থাৎ উপকণ্ঠ হল যথাযথই নগরের প্রসারিত অংশ, প্রকৃত ও সম্ভাব্য। এখানে বিভিন্ন ভূমি ব্যবহারের মিশ্রণ দেখা যায়।

Ramachandran-এর দেওয়া উপকণ্ঠের সংজ্ঞাটি নিম্নরূপঃ "The rural-urban fringe is an area of mixed rural and urban populations and land uses, which begins at the point where agricultural land-uses appear near the city and extends up to the point where villages have distinct urban land uses or where some persons, at least, from the village community commute to the city daily for work or other purposes." সোজা কথায় উপকণ্ঠ হল গ্রামীণ ও পৌর জনতা তথা ভূমি ব্যবহারের এক মিশ্র এলাকা যা শহরের কাছ থেকে এমন এক স্থান পর্যন্ত বিস্তৃত হয় যেখান থেকে কিছু সংখ্যক গ্রামবাসী শহরে কাজ বা অন্যান্য কারণে আসেন।

উপকণ্ঠের প্রকারভেদ ও সীমানা নির্ধারণ ঃ—

পৌরক্ষেত্রের সীমা পরিবর্তনের সাথে সাথে উপকণ্ঠেরও সীমা বদলায়। উপকণ্ঠ দু' প্রকার (চিত্র 4.22) ঃ—

ক) প্রাথমিক উপকণ্ঠ বা Primary urban fringe। এটি পৌরকেন্দ্রের নিকটবর্তী এলাকা। বিভিন্ন লেখক একে বিভিন্ন নামে অভিহিত করেছেন। যেমন Andrews এই এলাকাকে urban fringe বা উপকণ্ঠ বলেছেন, Reinemann বলেছেন outlying adjacent area (শহরের বর্হিঃস্থ লাগোয়া এলাকা), Myres and Beegle যথার্থ উপকণ্ঠ (True fringe) বলেছেন।

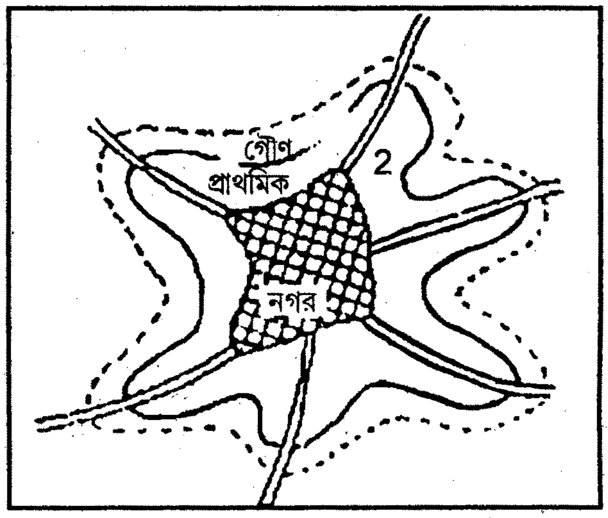

চিত্র 4.22 উপকণ্ঠের প্রকারভেদ

গৌণ পৌর উপকণ্ঠ (Secondary urban fringe) ঃ এটি প্রাথমিক উপকণ্ঠের আশেপাশে বিকাশ লাভ করে। গ্রামীণ উপকণ্ঠ (Rural fringe), **শহরতলি বলয়** (Sub-urban zone) **আংশিক বলয়** (Partial zone), **গ্রাম-পৌর উপকণ্ঠ** (Rurban fringe) এবং **বহিঃস্থ উপকণ্ঠ** (Outer fringe) নামেও অভিহিত করা হয় (Mandal, 2000)। পাটনা শহর বা বেরিলী শহরের ক্ষেত্রে এই ধরনের ভাগ সুস্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়। (চিত্র 4.23)

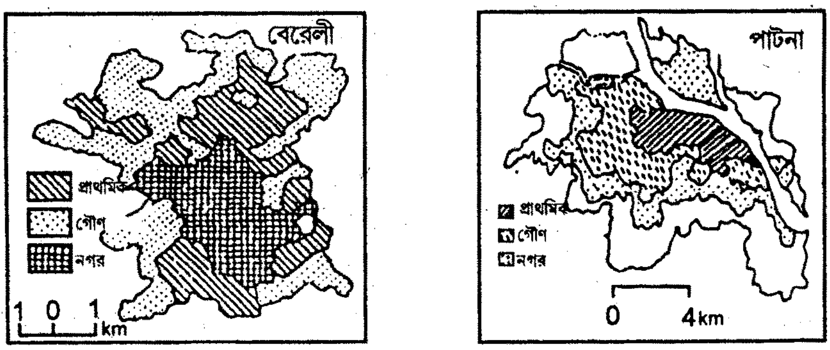

চিত্র - 4.23 বেরেলী ও পাটনার উপকণ্ঠে

Richard Andrews (1942) উপকণ্ঠকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন, যথা—

a) পৌর উপকণ্ঠ — শহরের কাছাকাছি এলাকা ও

b) **গ্রাম-পৌর উপকণ্ঠ** — গ্রামের কাছাকাছি এলাকা।

Whiteland (1967) উপকণ্ঠকে **অন্তঃস্থ উপকণ্ঠ** এলাকা (Inner Fringe area), **মধ্যবর্তী উপকণ্ঠ এলাকা** (Inner Fringe area) ও **বহিঃস্থ উপকণ্ঠ এলাকা** (Outer Fringe area) এই তিনভাগে ভাগ করেছেন।

Pryor (1968) উপকণ্ঠকে পৌর উপকণ্ঠ (Urban fringe) ও গ্রাম্য উপকণ্ঠ (Rural fringe) এই দু'ভাগে ভাগ করেছেন।

উপকণ্ঠের সীমা নির্ধারণ—

সচরাচর যে সব বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে উপকণ্ঠের সীমা নির্ধারণ করা যায়, তা হল—

a) জমি ব্যবহারের পরিবর্তন।

b) বসত এলাকার পরিবর্তন।

c) বৃত্তির ধরন।

d) বাড়ীর ধরন।

e) শিল্প ও অ-কৃষি কর্মধারার বণ্টন।

f) প্রয়োজনীয় পরিষেবার সীমাবদ্ধতা।

g) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বণ্টন।

M. M. P. Sinha (1978) গ্রাম-পৌর উপকণ্ঠের সীমা নির্ধারণে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর ওপর জোর দিয়েছেন—

- কর্মস্থলে যাতায়াতের সময়।
- পৌর আচরণ।
- জমির দাম।
- সর্বজনীন ব্যবহারের পরিষেবা (Public Utility Service)।
- অভিবাসী (Immigrant) জনসংখ্যা।
- অ-কৃষি কর্ম।
- জনসংখ্যার ঘনত্ব।
- প্রাথমিক ক্রিয়াকলাপ।
- বসত এলাকা।
- বয়স-লিঙ্গ অনুপাত।
- শিক্ষার হার ও
- কৃষিকর্ম।

উপকণ্ঠের বৈশিষ্ট্য ঃ—

উপকণ্ঠের কয়েকটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। যেমন—

শহরের কাছাকাছি অঞ্চলে শহুরে জীবিকার প্রাধান্য দেখা যায়। শহর থেকে একটু দূরে কৃষি জীবিকার প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। তবে ধনী ব্যক্তিরা এই অঞ্চলে বসবাস করেন। ব্যক্তিগত গাড়ি থাকায় তারা সহজেই শহরে পৌঁছতে পারেন। এদের অর্থনৈতিক কর্মধারা শহরকে কেন্দ্র করেই বিবর্তিত হয়।

জমি ব্যবহার ঃ— গ্রাম-শহর উপকণ্ঠে জমির একটা বড় অংশ সাধারণত শহর বাসিন্দাদের অবসর বিনোদনের স্বার্থে ব্যবহৃত হয়। এই অঞ্চলে খেলার মাঠ, পার্ক, গল্ফ-এর মাঠ ইত্যাদি তৈরি হয়।

- তেলের পাম্প, কসাইখানা, রাসায়নিক কারখানা, নাচঘর, ক্লাব, আমোদ প্রমোদের স্থান এখানে গড়ে ওঠে।
- শহরের জল সরবরাহ কেন্দ্র, জলাধার, বিমানবন্দর, সমাধিস্থল ইত্যাদি এই অঞ্চলের অনেকটা জায়গা দখল করে থাকে।
- এছাড়া উন্মুক্ত স্থান ও রিজার্ভ জমিও থাকে।

K. N. Gopi (1978) প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের উপকণ্ঠ এলাকায় ভূমি ব্যবহারের এই সব সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছেন (Process of Urban Fringe Development : A Model Centre.)

বাসস্থানের স্বতন্ত্রীকরণ ঃ— এই অঞ্চলে ধনীরাই বেশি বাস করেন। বিদেশে দেখা যায় যে শহরের গোলমাল, ধোঁয়া, আবর্জনা এড়াতে উচ্চবিত্তরা এই অঞ্চলে বসবাস করে। এছাড়া, খোদ শহরের তুলনায় জমির দাম সস্তা বলে অনেকটা জমি নিয়ে খোলামেলাভাবে তারা তাদের বাড়ির নকশা (Plan) করতে পারে।

সবুজ বলয় (Green belt) ঃ— উপকণ্ঠের কৃষিজীবী মানুষেরা নগরবাসীদের জন্য শাকসব্জি, ফলমূল, দুধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য, মুরগীর ডিম উৎপাদন করে। তবে এই ধরনের উৎপাদন সম্পূর্ণ কৃষিভিত্তিক উৎপাদনের থেকে একটু আলাদা ধরনের।

দৈনিক যাত্রী (Commuters) ঃ— উপকণ্ঠ অঞ্চল থেকে বহু সংখ্যক মানুষ কাজের সন্ধানে শহরে দৈনিক যাতায়াত করেন।

অন্যান্য বৈশিষ্ট্য ঃ— উপকণ্ঠ অঞ্চলের জমি বিভিন্ন ব্যক্তির মালিকানাধীন বলে অনেক সময় এলোমেলোভাবে (Un-planned) বসতি শুরু হয়।

- উপকণ্ঠ অঞ্চলে খুব দ্রুত উন্নয়ন (Development) লক্ষ্য করা যায়।
- দীর্ঘস্থায়ী ভিত্তিতে কৃষিকাজ করা কষ্টকর।
- পৌর সুযোগ সুবিধে কম থাকে।
- বাড়িঘর এলোমেলোভাবে গড়ে ওঠে বলে এই স্থানে পরিষেবা গড়ে তোলা কষ্টকর। খরচেরও একটা বড় ব্যাপার আছে।
- উপকণ্ঠে পৌর ও গ্রামীণ উভয় এলাকার জীবনযাত্রার মিশ্রণ দেখা যায় (Nangia, 1976)।

উপকণ্ঠ গড়ে ওঠার কারণ ঃ—

উপকণ্ঠ গড়ে ওঠার পেছনে যে যে কারণ কাজ করে, তা হল ঃ—

i) শহর বা নগরের মধ্যে স্থান সংকুলান না হওয়া।

ii) শহরের উপকণ্ঠে সস্তায় জমি পাওয়া।

iii) শহরের মধ্যে হাসপাতাল, বিমানবন্দর, জলাধার ইত্যাদি গড়ে তোলার জন্য স্থানাভাব।

iv) একটু অবস্থাপন্নদের শহরের কোলাহল এড়াতে শহরতলিতে বসবাসের ইচ্ছে।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায় কোলকাতা নগরের প্রথম অবস্থায় দমদমে বিমানবন্দর, ধাপায় জঞ্জাল ফেলবার জায়গা, টালায় জলাধার, উল্টোডাঙ্গা খালের কাছাকাছি কলকারখানা ও নোংরা, ভারী রাসায়নিক কারখানা, টালিগঞ্জে গল্ফ খেলার মাঠ গড়ে উঠেছিল। তখন টালিগঞ্জ, বেহালা, ঢাকুরিয়া, যাদবপুর, গড়িয়া প্রভৃতি ছিল কোলকাতার উপকণ্ঠ। কোলকাতার ক্রম সম্প্রসারণ ঐসব এলাকাকে উক্ত নগরের অন্তর্ভুক্ত করে ফেলেছে।

উপকণ্ঠের সমস্যা ঃ—

যুক্তরাষ্ট্রের মিচিগান রাজ্যের Flint (ফ্লিন্ট) নগরের উপকণ্ঠ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে Walter Firey (ওয়াল্টার ফিরে) নিম্নলিখিত সমস্যার কথা তুলে ধরেছেন, যার অনেকগুলো ভারতীয় প্রেক্ষাপটে খাপ খায়, যেমন—

a) উপকণ্ঠ সৃষ্টির ফলে জমি আর চাষবাসের কাজে ব্যবহৃত হয় না, অর্থাৎ চাষবাস ছাড়া অন্য কাজে লাগে।

b) জমিকে নানান কাজে ব্যবহার করা হয়। তাই জমিকে টুকরো টুকরো করা হয়। এতে কোন পূর্ব পরিকল্পনা থাকে না। অনেক সময় বেশি দাম পাবার আশায় দালালরা জমি ধরে রাখে। জমি বলতে গেলে এক রকম পড়েই থাকে।

c) এই সব অঞ্চলে কর (Tax) কম থাকে। কারণ কৃষক বা ছোটখাটো ব্যবসায়ীদের পক্ষে বেশি কর দেওয়া সম্ভব নয়। আবার যথেষ্ট করও আদায় হয় না। ফলে এই সব অঞ্চলের অধিবাসীদের নানা রকম পৌর স্বাচ্ছন্দ্য জোগানো সম্ভবপর হয় না।

d) কোন রকম পরিকল্পনা ছাড়াই বাড়িঘর তৈরি হয় বলে পরবর্তীকালে পরিকল্পনা করতে নানান অসুবিধে হয়।

উপসংহার ঃ—

পৌর সম্প্রসারণের গতি ও তার মাত্রার ওপর উপকণ্ঠের জীবনযাত্রার জটিলতা ও আনুষঙ্গিক সমস্যার মাত্রা নির্ভর করে। আমরা জানি বড় নগরের পক্ষে উপকণ্ঠের সৃষ্টি সম্ভবপর হয়। তাই যে সব দেশে বড় নগরের সংখ্যা বেশি ও পৌরায়ণের (Urbanization) মাত্রা বেশি, শুধুমাত্র সে সব ক্ষেত্রে উপকণ্ঠ সৃষ্টি হয়ে থাকে। অবশ্য সারা দেশে যদি সমান তালে নগরায়ণ চলতে থাকে, তবে পৌরায়ণের দ্রুতগতি সত্ত্বেও উপকণ্ঠ সৃষ্টি নাও হতে পারে।

আর একটি কথা এ প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার। তা হল বড় নগরীর আকর্ষণী (Pull) শক্তির ওপর নির্ভর করে উপকণ্ঠ জন্মলাভ করে। শুধু তাই নয়, আকর্ষণী শক্তির প্রচণ্ড গতিশীলতা ছাড়া উপকণ্ঠ সৃষ্টি সম্ভব নয়। যেখানে গতিশীলতা সাধারণ পর্যায়ের, সে সব ক্ষেত্রে নগর আস্তে আস্তে সম্প্রসারিত হতে থাকে। সত্যি বলতে কি, উপকণ্ঠ সৃষ্টি বড় নগরীর আকর্ষণ ক্ষমতার এক জ্বলন্ত নজীর। যে সব নগর উন্নতির চরম পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে, সেখানে উপকণ্ঠ সৃষ্টি হবে না (ভট্টাচার্য ও ভট্টাচার্য, 1977)।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতবর্ষে প্রাচীর ঘেরা নগর আশপাশের গ্রামীণ এলাকা থেকে স্বভাবতই আলাদাভাবে অবস্থান করত। নগরের বাহ্যিক সীমা দেওয়াল, পরিখা এবং অন্যান্য প্রতিরক্ষা বস্তু দিয়ে পরিষ্কারভাবে আলাদা করা থাকত। শহরে আসা ও যাওয়ার জন্য গুটিকয়েক তোরণ (Gate) ছিল। প্রাচীর ঘেরা নগরের মধ্যে বসবাসকারী পৌর বাসিন্দারা অ-কৃষি কর্মে নিয়োজিত ছিলেন। নগরের বাইরে গ্রামের বাসিন্দারা কৃষি ও পশুপালনে নিয়োজিত থাকতেন। প্রাচীর দিয়ে নগর ও গ্রামের মধ্যে একটা সুস্পষ্ট সীমারেখা ছিল। এমন কি, যেখানে দেওয়াল ছিল না, সেখানেও নগর ও শহরের মধ্যে সীমারেখা খুব স্পষ্ট ছিল।

আজকের দিনেও ছোট-বড় প্রায় সব শহরের সীমারেখা পরিষ্কারভাবে বিভক্ত। এমন কি, এই সব এলাকায় আগত কোন নবাগতের কাছে শহর ও গ্রামের ভূমি ব্যবহারের (Land use) চিত্রটা ধরা পড়ে। কিন্তু মহানগরী (Metropolitan City) ও এক লাখের চেয়ে বেশি বাসিন্দাযুক্ত-শহরের ক্ষেত্রে চিত্রটা একটু আলাদা। বড় বড় শহরের পাশে বসত এলাকার (Built-up area) বাহ্যিক বিস্তার লক্ষ্য করার মত। অধিকাংশ বিস্তার এলোমেলোভাবে কোন পরিকল্পনা ছাড়াই গড়ে উঠেছে। যা এককালে ছিল শুধুই গ্রাম, আজ তা পৌর বসত, বাণিজ্যিক এবং শিল্প তালুকে পরিণত হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে নগর গ্রাম্য এলাকার দশ, এমন কি পনেরো কি.মি. চৌহাদ্দির মধ্যে বিস্তারিত হয়েছে। যে কোন প্রধান শহরের বড় রাস্তা ধরে একটু এগোলেই রাস্তার দু'ধারে নতুন উপনিবেশ, বেশ কিছু খালি জমি, বাড়ি করার জন্যে ফেলে রাখা জমি, কয়েকটি কারখানা, বাণিজ্যিক কমপ্লেক্স চোখে পড়বে। শহর থেকে আরও দূরে গুদাম, হিমঘর, কাঠগোলা ও ইটভাটি দেখা যাবে। এসব হলো শহরের বাহ্যিক বিকাশের নমুনা। উপকণ্ঠ কথাটা সেই এলাকাকে বলা হবে, যেখানে শহর ও নগরের জমি ব্যবহারের সংমিশ্রণ দেখা যাবে। গ্যালপিন (C. J. Galpin)-এর ভাষায় ঐ এলাকাটি হল রারবার্ন (Rurban) বা গ্রাম-পৌর উপকণ্ঠ, অর্থাৎ স্থানটি না পুরোপুরি গ্রাম, আবার না পুরোপুরি শহর।

ভারতীয় উপমহাদেশে উপকণ্ঠ সৃষ্টির ইতিহাস (History of Rural-Urban Fringe in India) ঃ—

ভারতীয় নগরের আশেপাশে উপকণ্ঠ সৃষ্টির ব্যাপারটা একটু নতুন, যদিও পশ্চিমী নগরগুলোতে এই ধরনের জমি ব্যবহার বহু পুরোনো ব্যাপার। 1950-র আগে ও মহানগরের আশেপাশে উপকণ্ঠের অস্তিত্ব ছিল না। এর কারণ হল ঐ সময় নগর বৃদ্ধির হার ছিল খুব কম (Ramachandran, 1989)। জনসংখ্যার সামান্য বৃদ্ধি যদিও ঘটত, তবুও শহরের বসত এলাকার মধ্যে তার স্থান সংকুলানের ব্যবস্থা হত। প্রব্রজনের (Migration) ফলে শহরের মধ্যে বসত এলাকায় স্থান সংকুলান হল না। ফলে শহরের বাহ্যিক বিস্তার ঘটল। প্রথমে শহরের ফাঁকা জায়গায় বসত গড়ে উঠল, তারপর শহর এলাকা ছাড়িয়ে রাস্তার দু'পাশে লোকসংখ্যা বাড়তে থাকল। গরীব লোকেরা অবশ্য গ্রাম থেকেই শহরে কাজ করতে আসত ও কাজের শেষে ফিরে যেত। ব্রিটিশ যুগে অবশ্য ভবিষ্যতে সামরিক ছাউনি বা বেসরকারী আবাসস্থল (Civil Lines) ইত্যাদি গড়ে তোলার জন্য কিছু গ্রাম সম্পূর্ণভাবে আলাদা রাখা হত (Re-located)। উনবিংশ শতাব্দীতে অবশ্য শহর বা নগরের বাহ্যিক বিস্তারের প্রয়োজন ঘটে নি, কারণ শহরে জনসংখ্যা বৃদ্ধি কোন কোন বছরে কমে যেত। বিংশ শতাব্দীর শুরুতেও পৌর জনতার সংখ্যা বৃদ্ধি খুব একটা ঘটেনি। গোটা ব্রিটিশ রাজত্বকালে জনবসতির বিস্তার ঘটেছিল ক্যান্টনমেন্ট ও সিভিল লাইন্স এলাকায়। নেটিভ (দেশীয়) শহর এলাকা খুব জনাকীর্ণ ছিল।

স্বাধীনতা-উত্তর যুগে পৌর প্রেক্ষাপটের দারুণ পরিবর্তন ঘটেছিল। এই সময়ে এক লক্ষ বা তার বেশি জনসংখ্যা—অধ্যুষিত শহর দ্রুত বেড়েছিল। কোন কোন ক্ষেত্রে এক দশকের মধ্যেই জনসংখ্যা ৫০ শতাংশের বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। স্বভাবতই এত বিপুল জনসংখ্যার জন্য শহরের মধ্যে স্থানসংকুলন হওয়া সম্ভবপর ছিল না। পৌর ভূমি ব্যবহারে কোন নির্দিষ্ট পরিকল্পনা ছিল না। প্রোমোটাররা তাড়াতাড়ি লাভের জন্য চেষ্টা করত। শিল্পপতি এবং

ব্যবসায়ীরাও শহরের বাহ্যিক বিস্তারে সাহায্য করেছেন। গ্রামের গরীব লোকদের প্রলোভন দেখিয়ে তাদের জমি কিনে নেন শহরে বাবুরা। এইভাবেই চলতে থাকে শহর প্রসারের কাজ।

শহরের বাহ্যিক বিস্তারের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে থাকল উপকণ্ঠের অধিবাসীদের সামাজিক জীবনের পরিবর্তন। শিল্প, ব্যবসা, প্রশাসন ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিকাশের সাথে সাথে কিছু কিছু গ্রামীণ কর্মসংস্থান হয়। আগে গ্রামবাসীরা পুরোপুরি কৃষির ওপর নির্ভরশীল ছিল। এবার তারা একটু অন্য পেশায় নিজেদের নিয়োজিত করতে শিখলেন।

বস্তুতপক্ষে, বিগত কয়েক দশকে ভারতবর্ষে নগরের উপকণ্ঠে বাহ্যিক তথা আর্থিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে দারুণ পরিবর্তন এসেছে।

৪.১৭ উমল্যান্ড ও পৌরক্ষেত্র (Umland and Urban Field)

ভূমিকা ঃ— নগর তার পারিপার্শ্বিক অঞ্চলের সাথে নিবিড় বন্ধনে জড়িত। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক দিয়ে গ্রীক নগর রাষ্ট্র (City state) ও গ্রামাঞ্চলের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। এটা ছিল দু'পক্ষের সম্পর্ক— শহরের ব্যবসায়ী, প্রশাসক, কারিগর ও শিক্ষকরা জমি থেকে উৎপন্ন বাড়তি ফসলের ওপর নির্ভর করত, বিনিময়ে তারা এক বৃহৎ কৃষক সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষকতা করত।

গ্রীক রাষ্ট্রের আলোচনা থেকে বলা যায় অতীতে শহর ও তার আশপাশের গ্রামাঞ্চলের সঙ্গে এক নিবিড় সম্পর্ক ছিল। প্রত্যেক শহর টিকে থাকার তাগিদে তার আশেপাশের এলাকা থেকে খাদ্য জোগানোর ওপর নির্ভরশীল ছিল। অন্যদিকে, পৌরক্ষেত্রের জনগণ তাদের কাজকর্ম, আমোদ-প্রমোদ, বৃত্তিমূলক ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সুযোগ সুবিধে নেবার জন্য শহরের ওপর নির্ভর করত। তার ফলে শহর নিজের আয়তনের চেয়ে বড় এক এলাকার সংগ্রহ, বিপণন ও সাধারণ সেবা কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে। শহর হল এক প্রধান মাধ্যম যার প্রভাব তার লাগোয়া ছোট বসতি থেকে বড় বসতিতে ছড়িয়ে পড়ে।

তাই Emrys Jones (Human Geography) লিখেছেন "A town cannot live in isolation towns have always lived on the land, and in exchange for their food the people of the countryside expect the specialised services of the towns flok. The town is therefore the centre of exchange, Town and country depend on one another, and one of the geographer's tasks is to study this relationship and to define the region which is dependent on any one town."

সমস্ত সমাজবিজ্ঞানীরাই শহর কর্তৃক পরিষেবিত এলাকা অর্থাৎ যেখান থেকে শহর তার প্রয়োজন মেটায়, তা বোঝাতে সাধারণভাবে "পৌর ক্ষেত্র" কথাটি ব্যবহার করেছেন। তবে কেউ কেউ শহরগুলোকে বাণিজ্যিক বন্দরের কল্পনা করে "পশ্চাদভূমি" (Hinterland) শব্দটি ব্যবহার করেছেন। আবার কোন লেখক জার্মান শব্দ **উমল্যান্ড** (Umland) বা চতুস্পার্শ্বস্থ জমি, কেউ বা **প্রভাব বলয়** (Sphere of influence), **উপাঞ্চল এলাকা** (Tributary area), **ধারণ এলাকা** (Catchment area), **শহরাঞ্চল** (City region) বা **বিশেষ এক এলাকা** ইত্যাদি শব্দগুলো ব্যবহার করেছেন।

উমল্যান্ড ও পৌরক্ষেত্রের সংজ্ঞা (Definition of Umland & Urban Field) ঃ

ফরাসী সমাজবিজ্ঞানী Andre Allix (1914) উমল্যান্ড কথাটি প্রথম ব্যবহার করেন। এর দ্বারা তিনি

"The areas immediately around an interior city'-কে বা অন্তঃস্থ নগরের ঠিক পার্শ্বস্থ এলাকাকে বোঝাতে চেয়েছেন। তাঁর মতে উম্‌ল্যান্ডকে হিন্টারল্যান্ডের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। তবে তিনি বন্দরের পরিপ্রেক্ষিতে 'হিন্টারল্যান্ড' কথাটি প্রয়োগ করেছেন। এর পর মার্কিন ভৌগোলিক Dodge 1932 সালে 'Umland' কথাটি ব্যবহার করেন। তারও পরে 1937 সালে Whittlesey আফ্রিকার কানো (Keno) শহরের উম্‌ল্যান্ড-কে নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করেছেন "immediately tributary area extending 50 or 60 kilometres on all sides of the city" অর্থাৎ নগরের লাগোয়া প্রভাব বলয় যা নগরের উভয় পাশে 50 বা 60 কিলোমিটার বিস্তৃত হয়। ঐ একই বছরে Van cleef উম্‌ল্যান্ড কথাটি ব্যবহার করলেন। তিনি অর্থনৈতিক পরিবেশকে উম্‌ল্যান্ড ও হিন্টারল্যান্ড এই দুই ভাগে ভাগ করেছেন।

জার্মান শব্দ 'উম্‌ল্যান্ড' কথাটির উৎপত্তি খুঁজতে গিয়ে তিনি দেখলেন যে 1883 সালে প্রকাশিত জার্মান ভাষার অভিধানে এই শব্দটি রয়েছে। পরবর্তীতে আরও ইংরেজ ভূগোলবিদ উম্‌ল্যান্ড কথাটির আরো সমার্থক শব্দ খুঁজে পেয়েছেন, যেমন পৌরভূমি, নগরাঞ্চল, প্রভাব বলয়, ধারণ এলাকা। Robert Dickinson তাঁর The City Region and Regionalism বইয়েতে নগরাঞ্চল (City Region) কথাটি ব্যবহার করেছেন। ভৌগোলিকেরা এই কথাটির সমালোচনা করেছেন এই বলে যে যখন আমরা 'নগরাঞ্চল' বলি তখন তা নগরের মধ্যে অঞ্চলকে বোঝায়। অনুরূপভাবে, রাজ্য অঞ্চল (State Region) বলতে আমরা রাজ্যের মধ্যে অঞ্চলকে বুঝে থাকি। এর মানে হল 'নগরাঞ্চল' কথাটি ব্যাকরণগত দিক দিয়ে শুদ্ধ নয়, কারণ যখন আমরা নগরাঞ্চল বলি এর মানে হল যে নগর অঞ্চলের ওপর কর্তৃত্ব (dominate) করে যা ঠিক নয় (Mandal, 2000)।

A. E. Smailes 'উম্‌ল্যান্ড' বলতে পৌরক্ষেত্রকে বুঝিয়েছেন। কখনো কখনো পৌরক্ষেত্র (urban field) বলতে শহরের মধ্যেকার কৃষিক্ষেত্রকেও বোঝায় (Mandal, 2000)। বাস্তবে পৌরক্ষেত্রের মানে হল শহরের সেই ক্ষেত্র যা নগর নিজেই সৃষ্টি করে। H. L. Green ইংল্যান্ড ও ওয়েলস্-এর পরিষেবা কেন্দ্র বিশ্লেষণ করেছেন এবং তিনি 'tributary area' (উপ-এলাকা) কথাটি ব্যবহার করেছেন। Stiagendour এই ধারণাটিকে আরও পরিস্ফুট করেছেন। তিনি শহর থেকে 'উম্‌ল্যান্ডের' বলয়ের মধ্যে যে সব এলাকায় যাতায়াত করা যায় (accessible area) তাকে বুঝিয়েছেন।

Griffith Taylor (গ্রিফিথ টেলর) বলেছেন কোন শহরের উম্‌ল্যান্ড হল নগরের সঙ্গে সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে সম্পর্কিত পারিপার্শ্বিক গ্রাম্য এলাকা ('The Umland of a town is that portion of surrounding country-side which is linked culturally with the town')। ভারতবর্ষে এই কথাটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন অধ্যাপক রামলোচন সিং (R. L. Singh)। তাঁর মতে উম্‌ল্যাণ্ড হল সেই সব এলাকা যা সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক দিক দিয়ে নগরের সাথে সম্পর্কিত। ("The area in which the region and the city are culturally, economically and politically interrelated") প্রফেসর সিং-র এই সংজ্ঞা L. D. Stamp-র Glossary of Geographical Terms-এও স্থান পেয়েছে। Ujjagir Singh (Umland of Allahabad), V. Nath (The Concept of Umland and Its Delimitation), A. B. Mukherjee (Umland of Modinagar) A. K. Dutt (Umland of Jamshedpur), R. L. Dwivedi (Delimiting the Umland of Allahabad) প্রভৃতি লেখকরা উম্‌ল্যান্ড কথাটি ব্যবহার করেছেন। S. C. Bansal-এর মতে নগরাঞ্চল বা উম্‌ল্যান্ড হল মূলত সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিষেবা অঞ্চল ('City region or Umland is essentially a region of social, economic and cultural services.')। পক্ষান্তরে V. A. Janaki (The Tributary Area of Baroda) উপ-অঞ্চল (Tributary Area), Madhusudan Singh (Urban Field of Meerut), P. D. Mahadeva and D. C. Jayasankar (Concept of a City Region : An Approach with a Case Study) যথাক্রমে পৌরক্ষেত্র

(Urban Field) এবং শহরাঞ্চল (City Region) শব্দ দু'টি ব্যবহার করেছেন। Manzoor Alam নগরের প্রভাবিত এলাকাকে "Metropolitan dominance" and Metropolitan Association শব্দ দুটি ব্যবহার করেছেন। Howrah : A study in social geography-তে A. B. Chatterjee 'হিন্টারল্যান্ড' কথাটি বেছে নিয়েছেন। এর মাধ্যমে তিনি হাওড়া শহরের বাণিজ্যিক চরিত্রকে ফুটিয়ে তুলেছেন।

পৌর ক্ষেত্রের আয়তন ও আকৃতি (Size & Shape of Urban field) ঃ বাজার শহর, বাণিজ্যিক নগর ও আঞ্চলিক রাজধানীর প্রধান কাজ হল পাশের এলাকার বাসিন্দাদের জন্য পরিষেবা। এই সব "কেন্দ্রীয় স্থানে" (Central place) কৃষক ও তাদের পরিবাররা প্রায়ই তাদের বাড়তি ফসল বিক্রি করতে, কেনাকাটা করতে, আমোদ-প্রমোদ ও বৃত্তি বা পেশার আলোচনার জন্য আসে। গ্রামে বাচ্চাদের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয় থাকলেও তাদের জ্যেষ্ঠ সন্তান শহরের স্কুলে পড়াশোনা করতে পারে। 'কেন্দ্রীয় স্থান' যত বড় হবে, তার পরিষেবা এলাকাটি তত বড় হবে। সুতরাং সমপ্রকৃতি বিশিষ্ট এলাকায় প্রত্যেক বসতির সঙ্গে প্রত্যেক বসতির আড়াআড়িভাবে যুক্ত ষড়ভুজ ক্ষেত্র (Hexagonal) শহরের ওপর ভিত্তি করে বসতি পদানুক্রম (Hierarchy of settlements) গড়ার এক লক্ষণীয় প্রবণতা আছে।

শিল্প-শহর, খনি শহর ও পর্যটক কেন্দ্রের মত শহরগুলোর ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আশেপাশের গ্রামের সাথে তাদের সম্পর্ক সাধারণত কম। তাই কিছুটা পরিমাণে পরিষেবা কেন্দ্র হিসেবে কাজ করলেও তারা পুরোপুরি কেন্দ্রীয় স্থান হিসেবে গণ্য হয় না। যেমন তুলনামূলকভাবে তাদের ছোট বিপণন কেন্দ্র (Shopping centre) থাকতে পারে ও একই আয়তন বিশিষ্ট বাণিজ্যিক শহরের চেয়ে তাদের পৌর ক্ষেত্র সবসময়ে খুব একটা বড়-না-ও হতে পারে। যেহেতু শিল্প শহর যে শিল্পদ্রব্য তৈরি করে তা সাধারণত শহরের জন্য তৈরি হয় না, তেমনি বিনোদন শহরের (Resort town) খদ্দেররা শহরের সীমারেখার বাইরে বহু দূর থেকে আসে।

পৌরক্ষেত্র বা উম্‌ল্যাণ্ডের সীমা ঃ সাধারণত দেখা যায় যে একটি উম্‌ল্যান্ডের প্রান্তভাগ অপর উম্‌ল্যান্ডের সীমানার সঙ্গে মিশে যায়। আর এটা ঘটে থাকে অন্য কোন শহর কাছাকাছি থাকলে। তাই উম্‌ল্যান্ডের সঠিক সীমা নির্ধারণ করা সহজ ব্যাপার নয়। সাধারণভাবে উম্‌ল্যান্ডের সীমানা কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ কর্মধারার পরিধি অঞ্চলের মাধ্যমে নির্ধারণ করা হয়। এটা লক্ষ্য করার বিষয় হল যে বিভিন্ন কর্মধারার পরিষেবা অঞ্চলগুলো এক নয়। শহরের কেন্দ্রস্থল থেকে যতদূরে যাওয়া যায় পৌর প্রভাবও তত কমতে থাকে। এই সব বিষয়গুলোর কথা মনে রেখে শুধুমাত্র প্রাথমিক ও গৌণ উম্‌ল্যান্ডই নয়, টার্সিয়ারী উম্‌ল্যান্ডও নির্ণয় করা হয়। কখনো কখনো একক কর্মমুখী (Unifunctional) ও বহু কর্মমুখী (Composite) উম্‌ল্যান্ডের কথাও বলা হয়ে থাকে।

প্রাকৃতিক এবং সাংস্কৃতিক কারণ উম্‌ল্যান্ডের সীমানা নির্ধারণের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। পাহাড় এবং সেতুহীন (unbridged) নদী অধিকাংশ নগরের উম্‌ল্যান্ড-এর গণ্ডীকে সীমাবদ্ধ করে দেয়। আবার এর বিপরীত কোন নদীর ওপর দিয়ে বাস চলাচলের দরুন ঐ নগরের উম্‌ল্যান্ড এলাকা বহুদূর বিস্তৃত হয়। যেহেতু নগর হল সংস্কৃতি কেন্দ্র, তাই সমাজ, অর্থনীতি ও সাংস্কৃতিক কারণ উম্‌ল্যান্ডের সীমানা নির্ধারণে সাহায্য করে। যেমন বলা চলে কোন নগরের খাদ্যশস্য সরবরাহ অঞ্চল পারিপার্শ্বিক গ্রামগুলোর কৃষি ও তাদের যোগাযোগ ব্যবস্থার ওপর নির্ভর করে। কোন নগরের কেন্দ্রবিমুখ প্রবণতা সেই নগরের উম্‌ল্যান্ডের সীমা নির্ধারণ করে। এছাড়া, কারিগরী ও বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির দরুন সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে পরিবর্তন আসে। এর ফলে উম্‌ল্যান্ডের সীমাতেও রদবদল ঘটে। যেমন আগেকার দিনে নদী পরিবহনের যুগে নদীর ধারে গড়ে ওঠা শহরগুলো লম্বাকৃতি ছিল, কিন্তু রেল ও মোটর পরিবহনের দৌলতে নগরের আকৃতি ঘনসন্নিবিষ্ট রূপ পেয়েছে। কখনো কখনো পুরনো শহরের কাছাকাছি

নতুন নতুন একটি বা দুটি শহরের উৎপত্তি ঐ পুরনো শহরের উম্‌ল্যান্ডের এলাকাকে সঙ্কুচিত করে দেয়। যেমন পরিকল্পিত নগরী চণ্ডীগড় সৃষ্টির পর থেকে আশপাশের কয়েকটি শহরের উম্‌ল্যান্ডের এলাকা সঙ্কুচিত হয়েছে।

ভৌগোলিক বণ্টনের ক্ষেত্রে শহরের কেন্দ্রস্থল থেকে উম্‌ল্যাণ্ডের পরিধি পর্যন্ত তিনটি বলয় থাকে(Mandal 2000)।

1. **অন্তর্বলয়** (Inner zone)
2. **মধ্যবলয়** (Middle zone)
3. **বহির্বলয়** (Outer zone)

a) **অন্তর্বলয়** বলতে নগরের মধ্য ভাগকে বোঝায় যেখানে কেন্দ্রীয় বাণিজ্য এলাকা অবস্থিত। এটি নগরকেন্দ্র (downtown) নামেও পরিচিত।

b) **মধ্য বলয়** হল আবাসস্থল ও বাণিজ্যিক এলাকার মিশ্র বলয়। এখানে জমি ব্যবহারের আতিশয্য (intensity) লক্ষ্য করা যায় এবং জমির দাম অন্তর্বলয়ের পরিপ্রেক্ষিতে তুলনামূলক ভাবে কম।

c) **বহির্বলয়** হল মূলত গ্রাম-পৌর উপকণ্ঠ। শহর থেকে গ্রামে যে পরিবর্তন ঘটে তা এখানে লক্ষ্য করা যায়। জমির দাম কম এবং জমি ব্যবহারের প্রতিযোগিতা কম হওয়ায় এখানে জনঘনত্ব কম।

ভারতবর্ষে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল যে এখানে উম্‌ল্যান্ডের সীমানা প্রশাসনিক সীমানার সাথে সম্পূর্ণরূপে মিলে যায় না। পাশ্চাত্য দেশের ক্ষেত্রে বিশেষত ইংল্যান্ড এবং ইউরোপের অন্যান্য অংশে 1834 সালের আইনে (Act) নির্দেশিকা (guideline) দেওয়া আছে যে প্রভাব বলয়ের সাথে পৌর সীমানা সম্পূর্ণরূপে মিলে যাওয়া উচিত এবং সেই কারণে পশ্চিমী দেশে উম্‌ল্যান্ডের ধারণা ভারতের তুলনায় সম্পূর্ণরূপে বিপরীত।

পৌরক্ষেত্রের সীমানা নির্ধারণ (Delimitation of Urban field) পৌর ভূগোলবিদ্‌রা এই বিষয়ে একমত যে সমস্ত শহর ও নগরের একের বেশি পৌরক্ষেত্র থাকে। তবুও এক্ষেত্রে উল্লেখ করতে হয় যে কোন নগরের হস্‌পিটাল দ্বারা পরিষেবিত এলাকা ক্রয়কেন্দ্র বা কারিগরী কলেজের এলাকার চেয়ে বেশি হবে। তবুও অধিকাংশ গবেষকদের মতে এই বিভিন্ন এলাকা মোটামুটি মিলেমিশে এক যৌগিক পৌরক্ষেত্র তৈরি করে। ব্যক্তিগত গাড়ির ব্যাপক ব্যবহারের ফলে আশেপাশের গ্রামীণ এলাকা বা ক্ষুদ্রতর শহর থেকে লোকজনেরা কর্মোপলক্ষে বিভিন্ন শহরে যাতায়াত করে। বর্তমান দিনে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর নানা বয়সের পুরুষ মহিলাদের অনেক রকম সামাজিক কাজ থাকে। এই উপলক্ষে তারা বিভিন্ন জায়গায় যাতায়াত করে। তাই ডি. থোরপ (D Thorpe) ও অন্যান্য পৌরবিদ্‌রা মন্তব্য করেছেন যে কোন একটি পৌরক্ষেত্রের সীমানা নির্ধারণের সূচক খোঁজার চেয়ে বেশ কয়েকটি পৌরক্ষেত্রের সীমা নির্ধারণের উপায়ের ওপর সম্পূর্ণ জোর দেওয়া প্রয়োজন (Knowles & Wareing, 1976) পৌরক্ষেত্রের বিস্তার ও তার ওপর শহরের প্রভাব ব্যাখ্যা করতে ও মানচিত্রে ঐ ক্ষেত্র দেখাতে কযেকটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ সূচক(indices) বেছে নেওয়া হয়েছে। সচরাচর যে সব সূচক এই ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় তা হল—

(a) **সংবাদপত্রের প্রচার** (Newspaper circulation) **পরিধি**; (b) **সরকারি পরিবহন** (Public transport) **পরিধি**; (c) **পাইকারী ও খুচরা বিক্রির বিলিবণ্টন** (Wholesale and retail deliveries) **এলাকা**; (d) **উচ্চশিক্ষার ধারণ অঞ্চল** (Higher educational catchment area) ও (e) **দৈনিক যাত্রী অঞ্চল** (Commuter Zone)।

(a) **সংবাদপত্রের প্রচার পরিধি ঃ** সংবাদপত্রের প্রচারের পরিধির ওপর নির্ভর করে বড় শহরের পৌর ক্ষেত্র নির্ধারণ করা যায়। আমরা আগেই দেখেছি যে বড় শহর থেকে প্রকাশিত প্রভাতী সংবাদপত্রের (দৈনিক সংবাদপত্রের) পরিধি মাঝারি শহর থেকে প্রকাশিত দৈনিকের চেয়ে তুলনামূলকভাবে বেশি। যেমন শিলিগুড়ি থেকে প্রকাশিত উত্তরবঙ্গ সংবাদ কিংবা আসানসোল থেকে প্রকাশিত পশ্চিমবঙ্গ সংবাদপত্রের তুলনায় কোলকাতা থেকে প্রকাশিত যে কোন নামী সংবাদপত্রের পরিধি অনেক বেশি। বড় শহর থেকে সন্ধ্যাবেলাতেও প্রত্যেকদিন সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। মাঝারি শহর থেকেও দু-তিনটে দৈনিক সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। আবার ছোট ছোট শহর থেকে সাপ্তাহিক পত্রিকা বা দ্বি-মাসিক ও মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়, যাতে জেলার ও শহরের খবর থাকে। এই সব পত্রিকার মাধ্যমে শহর ও পৌরক্ষেত্রের অধিবাসীদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট খবর প্রচারিত হয়। সংবাদপত্রের গুরুত্ব হিসেবেও তার প্রচার নির্ভর করে। যেমন কোন জেলা থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রে সেই জেলার বিভিন্ন খবর যেমন চাকরি, জমি ক্রয়-বিক্রয়, বাড়ি বিক্রয় ইত্যাদি থাকে। তাই অধিবাসীরা ঐ পত্রিকাটিকে বেশি গুরুত্ব দেয়। তবে ঐ পত্রিকাটিকে বেশি গুরুত্ব দেয়। তবে ঐ সংবাদপত্রের প্রচার সেই জেলাতেই সীমাবদ্ধ থাকে, কিন্তু রাজ্যের রাজধানী থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রের প্রচার বাইরেও প্রসারিত হয়। আবার আঞ্চলিক ভাষায় প্রকাশিত দৈনিকের চেয়ে ইংরাজী ভাষায় প্রচারিত সংবাদপত্রের প্রচার ব্যাপক। এক্ষেত্রে ইংরেজী দৈনিক স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকার সাথে বাংলা দৈনিক আনন্দবাজার/বর্তমান/আজকালের তুলনা করা যেতে পারে। এখানে বলে নেওয়া ভালো যে দেশে শিক্ষিতের হার যত বেশি, সে দেশে সংবাদপত্রের প্রচার তত বেশি, যেমন পাশ্চাত্য দেশগুলোতে। নীচে যে সব উপায় বলা হল, তা দিয়ে কোন সংবাদপত্রের প্রভাব নিরূপণ করা যায় ঃ- (1) জেলা সংবাদ শিরোনাম থেকে। এ থেকে বোঝা যায় কোন গ্রাম থেকে ঐ সংবাদ এসেছে। এ ক্ষেত্রে সাপ্তাহিক সংবাদপত্র বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

(2) ছোট ছোট বিজ্ঞাপনের সূত্র পরীক্ষা করে (যেমন বাড়ি বিক্রি বা চাকরি খালি বিজ্ঞাপন)।

(3) প্রকাশকের কাছ থেকে সংবাদপত্রের প্রচার এলাকা জানা বা বাইরের জেলার সংবাদপত্র এজেন্টদের কাছ থেকে ঐ শহরের প্রতিদ্বন্দ্বী কোন সংবাদপত্রের সঙ্গে ঐ সমীক্ষিত সংবাদপত্রের বিক্রি তুলনা করা। যদি কোন পৌর ক্ষেত্রে কোন নির্বাচিত সংবাদপত্রের ওপর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী সংবাদপত্র থাকে তবে ঐ নির্বাচিত সংবাদপত্রের বিক্রি যদি শতকরা 50 ভাগের কম হয়, তবে যে শহরে ঐ নির্বাচিত পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে, সেই শহরকে ঐ সংবাদপত্রের প্রাথমিক প্রভাব বলয়ের বহির্সীমা হিসেবে ধরা যেতে পারে।

(b) **সরকারি পরিবহন পরিধি ঃ** স্থানীয় বাসের সময় সারণী ও দূরত্ব থেকে পৌরক্ষেত্রের সীমা নির্ধারণ করা যায়। এ ব্যাপারে পথিকৃৎ হলেন গ্রীণ (F. H. W. Green)। তিনি 1930 ও 1940-র দশকে ইংল্যান্ড, ওয়েলস্ ও উত্তর আয়ারল্যান্ডের সব শহরের বাস সার্ভিসের সময়সূচি থেকে এক মানচিত্র তৈরি করেন। ঐ সময় গ্রাম থেকে এই সব শহরে যাতায়াতের জন্য কম করে একদিন নিয়মিত বাস সার্ভিস চালু ছিল। পৌরক্ষেত্র বলতে গ্রীণ সেই এলাকা বুঝিয়েছেন যেখান থেকে কোন নির্দিষ্ট শহরে সহজে যাতায়াত করা যায়। সুতরাং গ্রামে যে সব পরিষেবা পাওয়া যাবে না, তা এই এলাকায় পাওয়া যাবে। গ্রীণের বক্তব্য মোটের ওপর সহজ এবং কয়েকটি দেশে সাফল্যের সাথে তা প্রয়োগ করা হয়েছে, বিশেষ করে স্ক্যান্ডিনেভিয়ার দেশগুলোতে। কিন্তু সমালোচকরা মনে করেন এই পদ্ধতি অর্থাৎ মানুষের যাতায়াত ব্যক্তিগত মোটর গাড়ির বহুল ব্যবহার মানুষকে বাস সার্ভিসের ওপর কম নির্ভরশীল করেছে। কোন নিকটবর্তী শহরের এলাকা থেকে লোকজন ভোরের বাস সার্ভিসে শহরে কাজে যোগ দিতে যায় বা ঐ শহরে সিনেমা, থিয়েটার বা কোন অনুষ্ঠানের পর রাতের শেষ বাস সার্ভিসে যে অঞ্চলে ফিরে যায়, তাকে ঐ শহরের পৌরক্ষেত্র বলা যেতে পারে।

আমাদের দেশে কোলকাতা বা মুম্বাই-এর মত মহানগরীতে অধিকাংশ লোক চাকরির তাগিদে ট্রেনে চেপে দূরদূরান্ত থেকে ঐ দুই স্থানে আসে। এক্ষেত্রে শহরতলির ট্রেনের সময়সূচি ও যাত্রীদের মাসিক / ত্রৈমাসিক টিকিট পরীক্ষা থেকে পৌর ক্ষেত্র নির্ণয় করা যায়।

3. **পাইকারী ও খুচরা বিক্রির বিলি বন্টন এলাকা ঃ** বড় শহরগুলো পাইকারি ও খুচরো বিক্রির গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে। ছোট শহরের চেয়ে এদের বিশেষ বিশেষ দোকান ও অনেক ডিপার্টমেন্টাল স্টোর থাকে। তবে, গ্রামে সব জিনিস পাওয়া যায় না বলে গ্রামবাসীরা ছোট শহরগুলোতে নিয়মিত কেনাকাটা করতে আসে। শহরের বাজারে যারা মালপত্র কিনতে আসে, তাদের বাড়ির ঠিকানা নিশ্চিতভাবে খুঁজে বের করা অসম্ভব। তবে এই সব শহর থেকে সাপ্তাহিক জিনিসপত্র, বিশেষ করে খাদ্যদ্রব্য যে অঞ্চলে পাঠানো হয়, সেই অঞ্চলকে ঐ শহরের পৌরক্ষেত্র হিসেবে ধরা যেতে পারে। ইদানিংকালে (i) শহরের বাইরে ক্রয় কেন্দ্র ও সুপার মার্কেট তৈরি; (ii) প্রতিদ্বন্দ্বী শহরে গাড়ি পার্ক করার বেশি সুবিধে; (iii) গ্রামাঞ্চলে ভ্রাম্যমাণ বিক্রয় গাড়ির সফর পৌরক্ষেত্র নির্ধারণে খুচরো বিক্রির ভূমিকাকে অনেকাংশে কমিয়ে দিয়েছে।

(d) **শিক্ষার ধারণ অঞ্চল ঃ** গ্রামে সাধারণত প্রাইমারী স্কুল থাকে, কিন্তু মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল, কলেজ ও কারিগরী কলেজ অধিকাংশ ক্ষেত্রে শহরে সীমাবদ্ধ থাকে। শহরের এই সব স্কুল/কলেজে যেসব অঞ্চল থেকে ছাত্রছাত্রীরা আসে, সেই সব অঞ্চলের সীমানা নির্ণয়ের মধ্য দিয়ে অনেক ক্ষেত্রে কোন শহরের পৌরক্ষেত্র নির্ধারণ করা যায়। যেমন এক সময় কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধারণ অঞ্চল বলতে বাংলা (দুই বাংলা), অসমকে বোঝাত। কিন্তু বর্তমানকালে গৌহাটি, ডিব্রুগড়, বর্ধমান, উত্তরবঙ্গ, কল্যাণী, বিদ্যাসাগর, বিশ্বভারতী ও ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ার পর কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধারণ অঞ্চলের আয়তন কমে গেছে। তবে এখানে বলে নেওয়া ভাল যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে পৌরক্ষেত্র নির্ধারণ করতে শিক্ষাকে ধরা হয় না। যেমন স্থানীয় প্রশাসন তাদের স্কুলে কেবলমাত্র ঐ এলাকায় বসবাসকারী ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি করে। ইদানীং পশ্চিমবঙ্গের মফঃস্বল শহরগুলোতে বাসিন্দার তুলনায় কলেজ কম থাকায় সেখানে স্থানীয় ছাত্রছাত্রীরা বেশি ভর্তির সুযোগ পাচ্ছে। ফলে উচ্চশিক্ষার ধারণ অঞ্চলের সীমা কমে গেছে।

(e) **দৈনিক যাত্রী অঞ্চল ঃ** যদিও ডিকিনসন (R. E. Dickinson) কাজের স্থানে যাতায়াতকে পরিষেবা কেন্দ্রের প্রভাবের পরিধি নির্ধারণ করার জন্য এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সূচক হিসেবে চিহ্নিত করেছেন, তবুও এটা যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে পারা যায় না। কারণ প্রতিটি অফিস ও কলকারখানার একটি নিজস্ব যাত্রী গমনাগমন ক্ষেত্র থাকে এবং এগুলো একটি অপরটির সাথে মেলে না। যদি কোন নির্দিষ্ট যাত্রী গমনাগমন ক্ষেত্র থাকে এবং এগুলো একটি অপরটির সাথে মেলে না। যদি কোন নির্দিষ্ট গ্রামের লোকজন কাজের জন্য প্রতিদিন শহরে আসে, তবে ঐ গ্রামকে ঐ শহরের পৌরক্ষেত্র হিসেবে গণ্য করা যুক্তিযুক্ত হবে।

অন্যান্য মানদণ্ড ঃ কোন শহর থেকে অন্যান্য অঞ্চলে "টেলিফোনের" সংখ্যা বা অনেক দেশে স্থানীয় বেতার কেন্দ্রের (Radio Station) প্রচারের পরিধি থেকে কোন শহরের পৌরক্ষেত্র নির্ধারণ করা যায়। ভারতে শহর থেকে দূরে শিক্ষিতের হার কিভাবে কমে গেছে তার ওপর ভিত্তি করে পৌরক্ষেত্র নির্ধারণ করা হয়েছে। এইভাবে বিভিন্ন সূচকের মাধ্যমে পৌর ক্ষেত্র নির্ধারণ করা যায়।

নীচে ভারতীয় প্রেক্ষাপটে কয়েকটি উম্‌ল্যান্ড নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল। ভারতে উম্‌ল্যান্ড কথাটি সর্বপ্রথম R. L. Singh (1955) ব্যবহার করেন। বারাণসী শহরের উম্‌ল্যান্ড নির্ণয় করতে গিয়ে Singh (1) সব্জি সরবরাহ, (2) দুগ্ধ সরবরাহ, (3) খাদ্যশস্য সংক্রান্ত বাণিজ্য, (4) কৃষি উৎপাদন, (5) বাস পরিষেবা ও (6) সংবাদপত্র

প্রচারের, পাঠরিধি, এই ছ'টি উপাদানের সাহায্য নিয়েছেন (চিত্র 4.24)। তিওয়ারী (Tiwari) আগ্রার পৌরক্ষেত্র নির্ণয়ে অন্যান্য পরিষেবা এলাকা ছাড়াও গরুর গাড়ি চলাচল ক্ষেত্রের ওপর জোর দিয়েছেন।

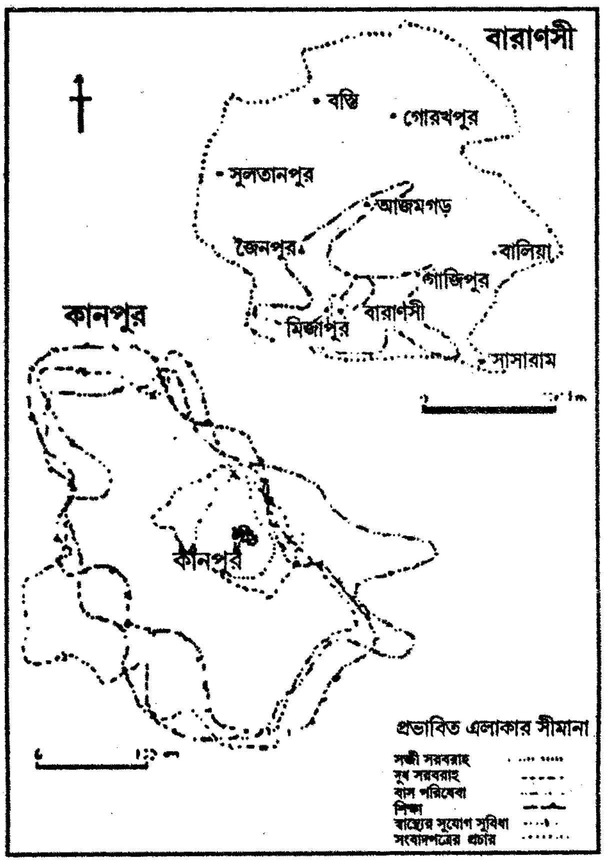

চিত্র - 4.24 বারাণসী ও কানপুরের প্রভাবিত এলাকা

1961 সালে উজাগির সিং (1) সব্জি সরবরাহ, (2) দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য সরবরাহ; (3) ইন্টারমিডিয়েট কলেজের ধারণ এলাকা; (4) দানাশস্য সরবরাহ ও (5) বাণিজ্য অঞ্চলের পরিপ্রেক্ষিতে এলাহাবাদ শহরের উম্‌ল্যান্ড নির্ণয় করেছেন। তিনি এলাহাবাদের উম্‌ল্যান্ডকে প্রাথমিক ও গৌণ এই দু'ভাগে ভাগ করেছেন।

1962 সালে এ. বি. মুখার্জী (A. B. Mukherjee) মোদিনগরের উম্‌ল্যান্ডের আলোচনায় বিভিন্ন কর্মধারা ও পরিষেবাকে তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করেছেন—(a) অর্থনৈতিক কর্মধারা পরিষেবা অঞ্চল, (b) সাংস্কৃতিক পরিষেবা অঞ্চল।

অমিয়ভূষণ চ্যাটার্জী (A. B. Chatterjee) হাওড়া শহরের পশ্চাদভূমি আলোচনা করতে গিয়ে দুধ, মাছ, ডিম প্রাণী, পোলট্রী, ফল ও সব্জি সরবরাহ ইত্যাদি বিষয়গুলোকে গণ্য করেছেন (চিত্র 4.25)। উপরোক্ত আলোচনা ছাড়াও কানপুর (Harihar Singh), কোলকাতা (Kar), হায়দ্রাবাদ-সেকেন্দ্রাবাদ (Alam), পুনে (Dixit), চণ্ডীগড়ের (Gopal Krishan) উম্‌ল্যান্ড নিয়ে ভৌগোলিকরা আলোচনা করেছেন।

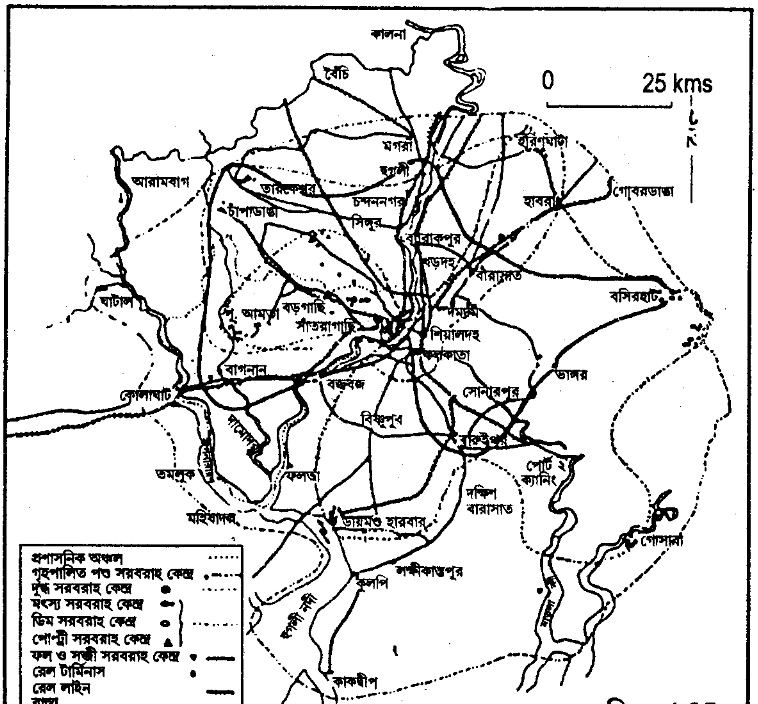

চিত্র - 4.25

এটা উল্লেখ করা যেতে পারে যে পৌরপ্রভাব বলয় বা উম্‌ল্যান্ডের সীমানা নির্ধারণে সব্জি সরবরাহ এলাকা ভৌগোলিকদের খুব বেশিমাত্রায় আকর্ষণ করেছে ও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁরা এই সূচক ব্যবহার করেছেন। কিন্তু এই বলয় এত ছোট যে প্রাথমিক উম্‌ল্যান্ডও এ দিয়ে নির্ণয় করা যায় না। একই কথা খাটে দুধ সরবরাহ অঞ্চল সম্পর্কে। খাদ্যশস্য ও অন্যান্য কৃষিপণ্য এলাকা বহুদূর বিস্তৃত হয়। তবে অসুবিধে হচ্ছে খাদ্যশস্য প্রেরণের ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ অনেক সময়ে খাদ্যশস্য প্রভাব বলয়কে বহুদূর বিস্তৃত হতে দেয় না। যেমন পশ্চিমবঙ্গ সরকার চাল চলাচলের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারী করায় (কর্ডনিং) শহরের খাদ্যশস্য প্রভাব বলয়টি সঙ্কুচিত হয়েছে। অনুরূপভাবে, বিহার ও ওড়িশা রাজ্যের সীমান্তে অবস্থিত জামশেদপুর শহরে নিষেধাজ্ঞা থাকায় ওড়িশা থেকে চাল আসে না।

প্রধানত দুটি কারণের জন্য উম্‌ল্যাণ্ডের সীমানা নির্ধারণে বাস পরিষেবা বলয় খুব একটা সন্তোষজনক ফলাফল দেয় না। (a) পাশ্চাত্য দেশের ন্যায় ভারতবর্ষে মোটর পরিবহন এখনও ততটা উন্নত হয় নি। (b) সাধারণত বাস-রাস্তা থেকে 6 থেকে 8 কি.মি. পর্যন্ত বাস পরিষেবার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

সংবাদপত্র প্রচার পরিধি ছোটখাটো এলাকার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না। কারণ এই সব স্থানে দৈনিক সংবাদপত্র প্রচারিত হয় না বললেই চলে। প্রশাসনিক ও হাসপাতাল পরিষেবা বলয়টি মধ্যম আকারের। কয়েকটি শহরের উম্‌ল্যান্ড নির্ধারণে এই বিচারে সন্তোষজনক ফলাফল পাওয়া যায়। দৈনিক যাত্রী চলাচল, শিক্ষা (ইন্টারমিডিয়েট কলেজ), খুচরা বিক্রয় (সাইকেল, রিক্সা), সিনেমা ও ব্যাঙ্ক পরিষেবা শহর ও পারিপার্শ্বিক অঞ্চলের মধ্যে গভীর সম্পর্ককে নির্দেশ করে।

সবশেষে বলতে হয় একটা শহর ক্ষেত্র থেকে অন্য শহর ক্ষেত্রকে কখনই চুলচেরা ভাবে ভাগ করা যায় না। তাই একটা পৌরক্ষেত্রের সীমার মধ্যে অন্য শহরের পৌর ক্ষেত্রের সীমা মিশে থাকতে পারে। এমন কিছু অঞ্চল

থাকে যেখানে বহু শহরের পৌরক্ষেত্র এসে মেশে, আর এটা ঘটে যেসব জায়গায় কাছাকাছি দুটো বা তিনটে শহর থাকে। এখানকার বাসিন্দারা নানা প্রকার কাজের জন্য একের বেশি শহরে নিয়মিত যায়। এক্ষেত্রে তারা কোন শহরে যাবে তা নির্ভর করে ঐ নির্দিষ্ট শহর থেকে কি ধরনের পরিষেবা পাওয়া যায় ও সেখানে যাতায়াতের তুলনামূলক সুবিধে আছে কিনা। গ্রামের এক পরিবারের কোন সদস্য হয়তো এক শহরে যায়, তার স্ত্রী আবার কেনাকাটা করতে অন্য শহরে যাতায়াত পছন্দ করে। আবার সন্তানেরা তৃতীয় কোন শহরের স্কুলে পড়াশুনা করে। নগরাঞ্চলের সেবাকেন্দ্র এক্ষেত্রে Christaller-এর ষড়ভুজ আকৃতির মডেল থেকে কিছুটা পৃথক ধরনের হয়।

তুলনামূলকভাবে কিছু শহরের পশ্চাদভূমি ক্রাইস্টেলার (Christaller)-এর ষড়ভুজ আকৃতি পায়। কোন কোন শহর প্রধান সড়কপথের দিকে বিস্তার লাভ করে, কোন কোন শহর রেল স্টেশনের কাছে প্রসার লাভ করে। অন্যান্য শহর আশেপাশের প্রতিদ্বন্দ্বী শহরের ভৌগোলিক অবস্থান দ্বারা প্রভাবিত হয়। আবার পর্বতশ্রেণী বা সমুদ্র উপকূলের মত প্রাকৃতিক বাধার দরুন কোন শহর একদিকে বাড়তে থাকে।

সবশেষে বলতে পারি যে, Oxford Dictionary of Geography-তে উম্‌ল্যান্ড-এর যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, তা নিম্নরূপ ঃ "The area served by a city. The Umland is also known as a sphere of influence, catchment area, tributary area or urban field." বস্তুতপক্ষে, উম্‌ল্যান্ড ও পৌরক্ষেত্রের মধ্যে পার্থক্য কিছু নেই, যদিও আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে উম্‌ল্যান্ড ও পৌরক্ষেত্রের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। বাস্তবক্ষেত্রে কিন্তু তা নয়, কারণ দুটিই শহরের প্রভাবিত এলাকা। সবশেষে মনে রাখতে হবে উম্‌ল্যান্ডের তুলনায় পৌরক্ষেত্র কথাটা বেশি চালু। "The latter" (urban field) "is now probably the most widely used descriptive term" (Knowles and Wareing)। তাই এবার আমরা পৌরক্ষেত্র নিয়ে আলোচনা করব।

প্রাথমিক ও গৌণ পৌরক্ষেত্র (Primary & Secondary Urban fields) : অধিকাংশ শহরে একের বেশি পৌরক্ষেত্র থাকে। দূরত্ব বাড়ার সাথে সাথে পাশের এলাকার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক কমে যায়। এসব ক্ষেত্রে অপর একটা শহর ঐ দূরবর্তী বসতিগুলোকে আরও ভালভাবে পরিষেবা করতে পারে। কোন দেশের কেন্দ্রীয় প্রশাসন, আমোদ প্রমোদ, খুব দামী বিলাসদ্রব্য ও কিছু কিছু বিশেষ ধরনের ক্রিয়াকলাপ (আর্থিক ও চিকিৎসা সহ) ইত্যাদির মাধ্যমে সেই দেশের রাজধানী তথা মহানগর তার নিজ নিজ দেশের পরিষেবা করবে, কিন্তু স্থানীয়ভাবে পরিষেবার জন্য কোন এলাকা তার পাশের শহরের ওপর নির্ভরশীল হবে। তাই কোন বড় দেশের রাজধানী মহানগরে নিঃসন্দেহে সেই দেশের প্রাথমিক ও গৌণ উভয় প্রকার পৌরক্ষেত্রই থাকবে। যেমন কোলকাতা উত্তরপূর্ব ভারতের প্রধান বাণিজ্য ও শিল্পনগরী, আবার এটি ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বন্দর। এই বন্দরের পশ্চাদভূমি পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলো, এমন কি উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত। তবে এটা ঠিক যে দূরত্ব বাড়ার সাথে সাথে উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, কান্ডালা ও বোম্বাই (মুম্বাই) বন্দরের কাছাকাছি হওয়ায় ঐসব রাজ্য কোলকাতা বন্দরের গৌণ ক্ষেত্র হিসেবে, আর পূর্ব ও উত্তর পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলো কোলকাতার মুখ্য ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত। অর্থাৎ কোন বৃহৎ দেশের রাজধানী নগর বা বাণিজ্যিক বন্দর নগরের একটি করে মুখ্য ও একটি করে গৌণ পৌরক্ষেত্র থাকে। কোলকাতার মত বোম্বাই (মুম্বাই) ও মাদ্রাজ (চেন্নাই) বন্দরের মুখ্য ও গৌণ ক্ষেত্র লক্ষ্য করবার মতো। অনুরূপভাবে, ভারতের রাজধানী হিসেবে দিল্লীর যেমন সারা দেশের ওপর প্রভাব আছে, তেমনি স্থানীয় এলাকার ওপর তার যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে।

প্রধান ক্রিয়াকলাপ ছাড়া ও অন্যান্য উপাদানের ওপরেও শহরের প্রভাব বলয়ের (Sphere of Influence) আয়তন নির্ভর করে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় কম জনঘনত্ব অঞ্চলে পরিষেবা এলাকা প্রায়ই ব্যাপক হয়, তবে

অল্পসংখ্যক লোককে পরিষেবা করা যায়। বেশি ঘনত্বপূর্ণ এলাকা সচরাচর ছোট হয়, তুলনামূলকভাবে বেশিসংখ্যক লোককে পরিষেবা করা যায়। বড় বড় নগরে তাদের সামগ্রিক পৌরক্ষেত্রের মধ্যে আরও কয়েকটি ছোট শহরের পৌরক্ষেত্র থাকে। তাই একটা ছোট মফঃস্বল শহরের আশেপাশে গ্রামবাসীদের পরিষেবার্থে সাপ্তাহিক বাজার ছাড়াও সিনেমা, মাধ্যমিক স্কুল, ব্যাঙ্ক, হাসপাতাল ও উকিলের অফিস থাকে। কিন্তু কঠিন অসুখ, উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ, বিলাসদ্রব্য কেনাকাটার জন্য আরও বড় শহরের মুখাপেক্ষী হতে হয়।

৪.১৮ সারাংশ

- শহরের অনেক রকমের সংজ্ঞা আছে — বাহ্যিক, জনসংখ্যার মানদণ্ডানুযায়ী ও সমাজতাত্ত্বিক।
- জনসংখ্যার মানে শহরের সংজ্ঞা কিন্তু সবদেশে সমান নয়।
- সত্যি বলতে কী শহর ও নগরের মধ্যে পার্থক্যনির্দেশ খুব সহজ নয়।
- নব্যপ্রস্তর যুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত শহরের বিবর্তনের মোটামুটি ইতিহাস পাওয়া গেছে।
- বিশ্ব নগরায়ণের ইতিহাস সমাজতত্ত্ববিদ্‌রা নানাভাবে বিশ্লেষণ করেছেন।
- পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের প্রাচীন বসতির মধ্যে টাইগ্রিস্-ইউফ্রেটিস্ অববাহিকা, নীল অববাহিকা, হোয়াংহো অববাহিকা ও মায়া সভ্যতা উল্লেখযোগ্য।
- প্রাচীন নগর-সভ্যতা বিকাশের ক্ষেত্রে বিভিন্ন উপাদান আছে.
- পৌর সভ্যতার দ্বিতীয় পর্ব তিনটি উপভাগে বিভক্ত — গ্রীক ও রোমান সভ্যতার যুগ, অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ ও মধ্যযুগ।
- এশিয়া ও আফ্রিকায় কয়েকটি প্রাচীনতম শহরের জন্ম হয়।
- আধুনিক শহরের বৈশিষ্ট্য ও বিকাশ আবার অন্যরকম।
- নগরায়ণের বিকাশে শিল্প বিপ্লবের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।
- জনগণনা বিষয়ে ও তার নিরিখে কতগুলি শব্দ ব্যবহার করা হয় — সেন্সাস ট্র্যাক, পৌরপিণ্ড, প্রামাণ্য পৌর এলাকা, মহানগর ও মেট্রোপলিটন এলাকা।
- মহানগর তত্ত্ব, মহানগর এলাকা ও মহানগর অঞ্চল সম্পর্কিত গবেষণা এখনকার সমাজবিজ্ঞানীদের কাছে এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।
- পৌরপুঞ্জ ও পৌরমহাপুঞ্জ শব্দ দুটি পৌর এলাকায় বিশদীকরণে বিশেষ ভাবে ব্যবহৃত হয়।
- শহরের মত উপকণ্ঠও বর্তমান নগর-সভ্যতার ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য অভিধা।
- নগর তার পারিপার্শ্বিক অঞ্চলের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত। এ প্রসঙ্গে উমল্যান্ড ও পৌরক্ষেত্র কথা দুটি বিশেষ আলোচনার অপেক্ষা রাখে।

৪.১৯ সর্বশেষ প্রশ্নাবলি

1. শহরের বিভিন্ন রকম সংজ্ঞা দিন।
2. "জনসংখ্যার মানদণ্ড অনুযায়ী শহরের সংজ্ঞা বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকম" — ব্যাখ্যা করুন।
3. "শহর ও গ্রাম্য এলাকা সংজ্ঞায়িত করা সহজ নয়" — আলোচনা করুন।
4. শহরের উৎপত্তি ও বিকাশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনা করুন।
5. নগরায়ণের সম্বন্ধে Louis Wirth-এর মত বিশ্লেষণ করুন।
6. প্রাচীন যুগের নগরায়ণের প্রথম পর্বের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দিন।
7. নীচের সভ্যতাগুলির প্রাচীনত্ব ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করুন।
   a) টাইগ্রিস-ইউফ্রেটিস অববাহিকা
   b) নীল অববাহিকা
   c) হোয়াং হো অববাহিকা
8. (i) জনসংখ্যা (ii) বৈশিষ্ট্য (iii) প্রাকৃতিক পরিবেশ (iv) প্রসার ও সংকোচন (v) বিকাশের কারণ — এই বিষয়গুলি ভিত্তি করে প্রাচীন নগর সভ্যতার উপর একটি নিবন্ধ রচনা করুন।
9. পৌর সভ্যতার দ্বিতীয় পর্বে ভাগগুলি বলুন ও তার বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।
10. "পৃথিবীর কয়েকটি প্রাচীনতম শহরের জন্ম এই দুই মহাদেশে হয়েছিল"
    (a) কোন দুই মহাদেশ?
    (b) কীভাবে এই শহরগুলির জন্ম হয়?
11. আধুনিক শহরের বিকাশ ও বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।
12. নগরায়ণের বিকাশের শিল্প বিপ্লবের প্রভাব কী?
13. সেন্সাস ট্র্যাক ও পৌরপিণ্ড বলতে কী বোঝেন?
14. মহানগর তত্ত্ব সম্বন্ধে ধারণা দিন, ভারতের মহানগরগুলির নাম করুন।
15. পৌর পুঞ্জ ও পৌর মহাপুঞ্জ বলতে কী বোঝেন?
16. ভারতীয় উদাহরণ সহ পৌরপুঞ্জ বিকাশের কারণ সমূহ ব্যাখ্যা করুন।
17. উপকণ্ঠ কী? এর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করুন।

18. a) উম্‌ল্যান্ড ও পৌরক্ষেত্র বলতে কী বোঝেন?

b) শহরের কেন্দ্রস্থল থেকে উম্‌ল্যান্ড পর্যন্ত অংশ যে কটি বলয়ে বিভক্ত তাদের প্রকৃতি আলোচনা করুন।

19. পৌরক্ষেত্রের সীমানা কীভাবে নির্ধারিত হয়? এক্ষেত্রে কী কী সূচক ব্যবহৃত হয়।

৪.২০ উত্তরমালা

১. ৪.২ পাঠ্যাংশ দেখুন

২. ৪.২.২ অংশ দেখুন

৩. ৪.২.৪ অংশ দেখুন

৪. ৪.৩ অংশ দেখুন

৫. ৪.৪ অংশ দেখুন

৬. ৪.৫ অংশ দেখুন

৭. ৪.৫.১ অংশ দেখুন

৮. ৪.৫.২ থেকে ৪.৫.৬ অংশ দেখুন

৯. ৪.৬ অংশ দেখুন

১০. ৪.৭ অংশ দেখুন

১১. ৪.৮ অংশ দেখুন

১২. ৪.১০ অংশ দেখুন

১৩. ৪.১৩ অংশ দেখুন

১৪. ৪.১৪ অংশ দেখুন

১৫ ও ১৬ ৪.১৫ অংশ দেখুন

১৭. ৪.১৬ অংশ দেখুন

১৮. ৪.১৭ অংশ দেখুন

একক 5 ❑ শহর ও নগর (Town and City)

গঠন

৫.১ প্রস্তাবনা

উদ্দেশ্য

৫.২ শহরের কায়িক গঠন সম্পর্কে মতবাদ

৫.২.১ এককেন্দ্রিক মতবাদ

৫.২.২ বৃত্তকলা মতবাদ

৫.২.৩ বহুকেন্দ্রিক মতবাদ

৫.৩ কেন্দ্রীয় স্থান তত্ত্ব

৫.৩.১ কেন্দ্রীয় স্থানের সংজ্ঞা

৫.৩.২ কেন্দ্রীয় মানদণ্ড বা নিরিখ

৫.৩.৩ কেন্দ্রীয় স্থানের বৈশিষ্ট্য

৫.৩.৪ কেন্দ্রীয় স্থান এলাকা গড়ে ওঠার পূর্ব শর্ত

৫.৪ কেন্দ্রীয় বাণিজ্য স্থান

৫.৪.১ কেন্দ্রীয় বাণিজ্য এলাকার বৈশিষ্ট্য

৫.৪.২ কেন্দ্রীয় বাণিজ্য এলাকার সীমা নির্ধারণ

৫.৪.৩ দি কোর-ফ্রেম মডেল

৫.৫ শহর ও নগরের কর্মধারা

৫.৫.১ দুর্গ ও সামরিক শহর

৫.৫.২ ধর্মীয় শহর ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র

৫.৫.৩ প্রশাসনিক শহর

৫.৫.৪ সংগ্রাহক শহর

৫.৫.৫ উৎপাদন কেন্দ্র

৫.৫.৬ স্থানান্তকরণ ও বিতরণ কেন্দ্র

৫.৫.৭ আর্থিক কেন্দ্র
৫.৫.৮ অবসরকালীন শহর
৫.৫.৯ উপনগরী ও ডরমিটারী শহর
৫.৫.১০ বহুবিধ কর্মভিত্তিক শহর
৫.৬ শহর ও নগরের শ্রেণীবিভাগ
৫.৬.১ সমাজতাত্ত্বিকের চোখে
৫.৬.২ ভৌগোলিকের চোখে
৫.৬.৩ আয়তনের ভিত্তিতে শহর ও নগরের শ্রেণীবিভাগ
৫.৭ সারাংশ
৫.৮ সর্বশেষ প্রশ্নাবলি
৫.৯ উত্তরমালা

৫.১ প্রস্তাবনা

যদি শহর এক ভৌগোলিক সত্ত্বা (Geographical entity), তবুও কায়িক গঠনের (Morphological structure) দিক দিয়ে বিভিন্ন শহরের মধ্যে তফাৎ আমাদের চোখে ধরা পড়ে। শহরের প্রাসাদ, অট্টলিকাগুলো একে অপরের থেকে আকার, আয়তন, উচ্চতা ও বিন্যাসের দিক দিয়ে আলাদা হয়। আবার বয়স ও কর্মধারার (Function) দিক দিয়েও এই হেরফের লক্ষিত হয়। শহরগুলোর জনঘনত্বের মধ্যে যেমন পার্থক্য আছে তেমনি এদের জনতার সামাজিক মর্যাদা, জাতিগত উৎপত্তির দিক দিয়ে তফাৎ লক্ষ্য করার মত।

এই শ্রেণীকরণের (Groupings) মধ্য দিয়ে একটা সামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যায়। এইভাবে এক একটা শহরাঞ্চল (Urban region) সনাক্ত করা সম্ভব হয়। সম্পূর্ণভাবে না হলেও মোটামুটিভাবে বয়স, কার্যধারার বৈশিষ্ট্য ও জনতার গতিশীলতা অনুযায়ী শহরকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। শহরের সবচেয়ে পুরনো অংশে দেখা যায় প্রাচীন অট্টালিকা। ভারতের একটু পুরনো শহরের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে সব শহরেই পুরনো কিছু অট্টালিকা ভেঙে পড়েছে, রাস্তা খুব সরু। সাধারণত এই পুরনো অংশ শহরের মাঝখানে বিরাজ করে। বিপরীতভাবে, শহরের নতুন অংশ ক্রমশঃ আরও বাইরের দিকে ছড়িয়ে পড়ে। শ্রমিক শ্রেণীর আবাসস্থল প্রায়ই কারখানার আশেপাশে গড়ে ওঠে। এইসব আবাসস্থল প্রায়ই খাল ও রেলপথের ধারে তৈরি হয়। কদাচিৎ এই সব আবাসস্থল উচ্চশ্রেণীর বসতি অঞ্চলের ধার ঘেঁষে গড়ে ওঠে। প্রধান দোকান, বাজার, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান শহরের মাঝখানে গড়ে ওঠে। এগুলো শহরের খুব সামান্য অংশ জুড়ে থাকে। স্কুল, মন্দির-মসজিদ ও সাধারণের ব্যবহার্য প্রতিষ্ঠান শহরের মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে গড়ে ওঠে।

কোন শহর বা নগর আপনা আপনি গজিয়ে ওঠে না, আবার তারা আশেপাশের এলাকা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পরগাছার মত জন্মায় না। বরং শহর ও গ্রামগুলো পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতা ও আদানপ্রদানের মাধ্যমে গড়ে ওঠে। অতীতে স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনীতিতে শহরের প্রয়োজন ছিল না, ফলে শহরের সংখ্যা ছিল নগণ্য। কিন্তু শিল্প বিপ্লবের পর আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতায় যেখানে আঞ্চলিক বিশেষীকরণ ও পরস্পরের মধ্যে অর্থনৈতিক নির্ভরতা গুরুত্ব পেয়েছে, সেখানে ভিন্ন ভিন্ন কাজ শহরের মাধ্যমে করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। কিন্তু শিল্প বিপ্লবের পর শহরের সংখ্যা বাড়তে থাকল। ভিন্ন ভিন্ন কাজ ভিন্ন ভিন্ন শহরে কেন্দ্রীভূত হল এবং এদের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠল তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। যেমন কোন নগরীতে বাণিজ্যের, কোন নগরীতে শিল্পের, কোথাও পরিবহন ব্যবস্থা, কোথাও খনিজ দ্রব্যের, কোথাও উচ্চ শিক্ষা, কোথাও প্রশাসনিক কার্য, কোথায়ও সামরিক ক্রিয়াকলাপ, আবার কোথায়ও বা অবসর বিনোদনের ব্যবস্থা, কারণ ঐ সব কর্মধারাকে কেন্দ্র করে কোন শহর বা নগর গড়ে ওঠে বা বিকাশলাভ করে।

সমাজবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন ভাবে শহর ও নগরের শ্রেণীবিভাগের চেষ্টা করেছেন। শহরও নগরের মধ্যে সাদৃশ্যের চেয়ে বৈসাদৃশ্যই বেশি চোখে পড়ে। তাদের মধ্যে বয়স, আয়তন, গঠন, জনসমষ্টির বৈশিষ্ট্য, ক্রিয়াকলাপ ইত্যাদিতে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। এত বিষয়ে পার্থক্য থাকলেও পৌরবসতির শ্রেণীবিভাগের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তাদের ক্রিয়াকলাপের ওপর। বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগের মধ্যে পদ্ধতিগত তারতম্য থাকলেও সাধারণভাবে বলা চলে যে প্রায় প্রতিটি শ্রেণীবিভাগই পৌরবসতির ক্রিয়াকলাপের ওপর ভিত্তি করে গঠিত

উদ্দেশ্য

ওপরের আলোচনার ভিত্তিতে আমরা একটা শহরকে কতকগুলো অঞ্চলে ভাগ করতে পারি। এইসব অঞ্চলে কমবেশি কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে। এই সব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এলাকা তাদের বাস্তব (Material) ও সামাজিক বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে তার সন্নিহিত অঞ্চল থেকে একটু অন্যরকম হয়ে থাকে। এইভাবে একটা শহরকে সম্ভ্রান্ত, মধ্যবিত্ত, নিম্ন আয় বিশিষ্ট অঞ্চল ছাড়া শিল্পাঞ্চল, বাণিজ্যিক, প্রশাসনিক অঞ্চলে ভাগ করা যেতে পারে। বর্তমান অনুচ্ছেদ পাঠের উদ্দেশ্য হল নিচের বিষয়গুলি সম্বন্ধে অবগত হওয়া ঃ ● কেন্দ্রীয় বাণিজ্য অঞ্চল কি তা জানা। ● কোন এক অঞ্চলে ভারী শিল্প, অন্যত্র হাল্কা শিল্প গড়ে ওঠে কেন? ● কেনই বা একস্থানে বড়লোকেরা আবার অন্যত্র গরীবরা বাস করতে বাধ্য হন? ● কেন বসতির বিন্যাসে এক বিশেষ ধারা পরিলক্ষিত হয়? ● শহরগুলোকে তাদের বৃত্তি অনুসারে শিল্প শহর, খনিজ শহর, বাণিজ্য শহর, ধর্মীয় শহর, বিশ্ববিদ্যালয় শহর, প্রশাসনিক শহর, পর্যটন শহর ইত্যাদি নানাভাগে কী ভাবে ভাগ করা যায়। ● উপরোক্ত শ্রেণীবিভাগ বিভিন্ন শ্রেণীর শহরকে একনজরে চিনে নিতে সাহায্য করে কী ভাবে এবং কী কী পন্থা অবলম্বন করলে ভবিষ্যতে ঐসব নগরের উন্নতি আরো ত্বরান্বিত হতে পারে ● যে কোন পৌরবসতি, তার আয়তন যাই হোক না কেন, অন্ততপক্ষে দুটি কাজ করে থাকে, যথা (ক) পৌর এলাকার অধিবাসীদের সেবা, (খ) পৌরবসতি সংলগ্ন এলাকার অধিবাসীদের সেবা ● কোন পৌরবসতির বহুবিধ ক্রিয়াকলাপের মধ্যে তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজটিকে শ্রেণীবিভাগের ক্ষেত্রে বেশিরকম গুরুত্ব দেওয়া হয়। এ-ও জানা যে একটি পৌরবসতির উৎপত্তির সময় যা প্রধান কার্য ছিল, তা বর্তমানে সব থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ নাও হতে পারে; গ) কোন পৌরবসতিকে ক্রিয়াকলাপ ভিত্তিক একটি শ্রেণীভুক্ত করার অর্থ এই নয় যে তার অন্য কোন ক্রিয়াকলাপ নেই। যেমন বাণিজ্যিক বা শিল্প নগরী বলতে এটা বোঝায় না যে ঐ নগরের অন্য কোন ক্রিয়াকলাপ নেই।

৫.২ শহরের কায়িক গঠন সম্পর্কে মতবাদ (Theories of Urban Morphological Structure) ঃ

এতক্ষণ আমরা শহরের বিভিন্ন স্থানে নানা ধরনের ভূমি ব্যবহার লক্ষ্য করলাম : কম আয়ের ব্যক্তিদের

আবাসস্থল, শহরের উপকণ্ঠে বিত্তশালীদের বাসস্থান, শিল্পাঞ্চল ইত্যাদি। এখানে একটা কথা মনে রাখা দরকার যে যদিও ভূমি ব্যবহারের দিক দিয়ে প্রতিটি শহরের একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য থাকে, তবুও এক শহর থেকে অন্য শহরে আলাদা ধরনের ভূমি ব্যবহার আমাদের নজরে পড়ে। আর এরই ভিত্তিতে শহরের কায়িক গঠন সম্বন্ধে কয়েকটা মতবাদ গড়ে উঠেছে। সেগুলো হল—

৫.২.১ এককেন্দ্রিক মতবাদ (Concentric theory) ঃ

সমাজতত্ত্ববিদ্ বারজেস্ (E. W. Burgess) শহরে জমি ব্যবহার সম্বন্ধে এককেন্দ্রিক বা বলয় মতবাদ প্রস্তাব করেন (চিত্র নং 5.1)। তাঁর এই মতবাদের কেন্দ্রে ছিল চিকাগো শহরের সামাজিক এলাকার বিন্যাস। পরবর্তীকালে অনেক শহরের ভূমি ব্যবহারকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তাঁর এই মতবাদ প্রয়োগ করা হয়েছে। বারজেস্ দেখেছিলেন যে চিকাগো শহর তার কেন্দ্রস্থল থেকে ক্রমশঃ বাইরের দিকে বিস্তার লাভ করছে। এইভাবে পর্যায়ক্রমে এককেন্দ্রিক বলয় তৈরি হয়েছে। এই মতবাদের ভিত্তিতে নগরের কেন্দ্রস্থলে থাকে কেন্দ্রীয় বাণিজ্য এলাকা (বলয় 1), যা চিকাগোতে Loop নামে পরিচিত। এটা বাণিজ্যিক, সামাজিক ও নাগরিক জীবনের কেন্দ্রবিন্দু। একে ঘিরে আছে এক পরিবর্তনশীল এলাকা (বলয় 2) যেখানে রয়েছে শিল্প প্রতিষ্ঠান, পুরনো বাড়ি, কম আয়ের লোকদের বস্তি। এছাড়া, এখানকার অধিবাসীদের একটা বড় অংশ হল বহিরাগত। এখানে সচরাচর ছোট ছোট বাণিজ্যিক বাড়ি ও হাল্কা ধরনের শিল্প দেখা যায়, যা কেন্দ্রীয় বাণিজ্য এলাকা (CBD) থেকে আংশিকভাবে এখানে সরে এসেছে। এই এলাকাকে ঘিরে আছে কলকারখানা ও তার কর্মচারীদের আবাসস্থল (বলয় 3)। এরা কর্মস্থলের কাছেই বাস করে, কারণ অনেক দূর থেকে কর্মস্থলে যাতায়াত করার মত আর্থিক ক্ষমতা তাদের থাকে না। নগরকেন্দ্র থেকে আরও দূরে হল চার নং বলয়। এখানে একক পরিবার বিশিষ্ট মাঝারি আয়ের ব্যক্তিরা বাস করে। এখানে ভালো ভালো বাড়ি আছে। অবশেষে, শহরের সীমানায় 5 নং বলয়, যা দৈনিক যাত্রী বলয় (Commuter zone) নামে পরিচিত। চার ও পাঁচ নং বলয়ের মাঝে রয়েছে 'সবুজ বলয়' (Green Belt) যা এই দুই বলয়কে আলাদা করেছে। এখানে এখনো গ্রাম্য পরিবেশের সন্ধান মিলবে। অবশ্য শহরের প্রভাবে গ্রামাঞ্চলের বৈশিষ্ট্য ও ক্রিয়াকর্ম পরিবর্তিত হয়ে নিকট এই এলাকাটি ভবিষ্যতে শহরতলীতে পরিণত হবে। এখান থেকে বাসিন্দারা প্রতিদিন শহরে যাতায়াত করে। এখান থেকে শহরের কেন্দ্রবিন্দুতে পৌঁছাতে 30 থেকে 60 মিনিট সময় লাগে। কেন্দ্রীয় বাণিজ্য এলাকার চেয়ে এখানে জমির দাম কম, যদিও তা ধীর গতিতে বেড়ে চলেছে। এখানে বড় বড় কারখানা তৈরির জন্য সচরাচর জমি পাওয়া যায়। উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটা বোঝা গেল যে a) কম আয়ের ব্যক্তিরা কর্মস্থলের কাছাকাছি, b) মধ্যবিত্তরা তা থেকে আরো কিছুটা দূরে অথচ কর্মস্থল থেকে কম সময়ের মধ্যে ভ্রমণযোগ্য স্থানে এবং c) ধনী ব্যক্তিরা শহরের প্রান্তভাগে বসবাস করছে। বারজেস্ এই ব্যাপারাটিকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে বিচার করেছেন। অর্থনৈতিক কারণ ছাড়াও i) ধর্ম ও ভাষা ও ii) সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের গরীবরা শহরের কোলাহলপূর্ণ ও অপেক্ষাকৃত নোংরা অঞ্চলে অনেক সময় বাস করতে বাধ্য হয়। আর এই ধরনের পরিবেশ শহরের কেন্দ্রস্থলের আশপাশে থাকায় ঐ সব ব্যক্তি এই অঞ্চলেই জড়ো হয়। অনেক ক্ষেত্রে অব্যবহার্য পুরনো বাড়ির অনেক ছোট ছোট ঘরে একসঙ্গে অনেক পরিবার অল্প ভাড়ায় দিন কাটায়। এই বিচারে দেখা যায় শহরের কেন্দ্রবিন্দু থেকে বাইরের দিকে দারিদ্র্যের হার, বিদেশীর সংখ্যা, নারী-পুরুষ অনুপাত ও অপরাধীর সংখ্যা ক্রমশ কমতে থাকে। শহরের বহির্দেশে সুস্থ জীবনযাপনের পরিবেশ অনেক বেশি থাকায় এখানে সাধারণত ধনী ব্যক্তিরা বসবাস করেন। এর আর একটি মানে হল কেন্দ্রস্থলের চেয়ে বহির্দেশীয় পৌর এলাকার মধ্যে সুস্থ জীবনযাপনের অবকাশ অনেক বেশি থাকার জন্য জীবনধারণের মান ক্রমশ উচ্চ থেকে উচ্চতর হতে থাকে, আর তার ফলে ঐ সব অঞ্চলে নগর-সভ্যতার অভিশাপজনিত বস্তিজীবন এবং তার আনুষঙ্গিক সামাজিক ক্লেদ সৃষ্টি হবার সুযোগ অপেক্ষাকৃত অনেক কম (ভট্টাচার্য ও ভট্টাচার্য, 1977)।

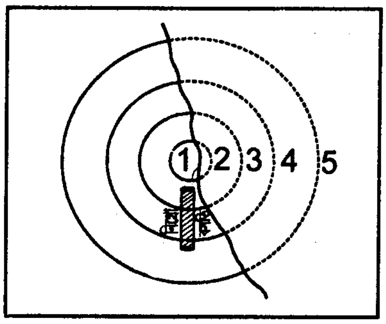

চিত্র - 5.1 এককেন্দ্রিক বলয়

বলা বাহুল্য, বারজেসের এককেন্দ্রিক মণ্ডলের মতবাদ এই পর্যন্ত যেমন অনেকের সমর্থন লাভ করেছে, তেমনি প্রচুর সমালোচনার সম্মুখীনও হয়েছে। সমালোচকদের মতে বারজেস তাঁর মতবাদের মধ্যে পৌর এলাকার কায়িক গঠন ও স্থানগত প্রসারের ক্ষেত্রে শিল্প এবং রেলপথ কর্তৃক জমি-ব্যবহারকে যথাযথ গুরুত্ব দেন নি। এছাড়া, বন্দর অঞ্চলের সাথে যুক্ত সামাজিক অব্যবস্থা, ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র থেকে বিকীর্ণিত সড়ক ধরে প্রসারিত হয়।

সবশেষে বলা চলে বারজেসের এককেন্দ্রিক মতবাদ শুধুমাত্র অ্যাংলো আমেরিকা ও ইউরোপের "পশ্চিমী" ধাঁচের নগরগুলোর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অন্যান্য মহাদেশে নগরের কেন্দ্রবিন্দুতে বড়লোকদের বাসস্থান থেকে একটু দূরে গড়ে ওঠে 'বস্তি' এলাকা (চিত্র)। কোলকাতার ক্ষেত্রে দেখা যায় এখানকার কেন্দ্রবিন্দু চৌরঙ্গী এলাকায় বাড়ির সংখ্যা কম, তবে এখানে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের বসবাস রয়েছে (চিত্র 5.2)। কিন্তু অন্যত্র বড় বড় অট্টালিকার কাছাকাছি বস্তি এলাকা গড়ে উঠেছে। শিল্পের অবস্থান সম্পর্কে বারজেস্ খুব একটা বেশি মন্তব্য করেন নি। একথা ঠিক যে শিল্পের অবস্থান খুব কম ক্ষেত্রেই একটানা এককেন্দ্রিক বলয় তৈরি করে, তবে প্রধান প্রধান রাস্তার সংযোগস্থল ও অসম ভূ-প্রকৃতির দরুন স্বভাবতই এই বলয়ের বাহ্যিক আকৃতির হেরফের হয় (Burgess, 1955)।

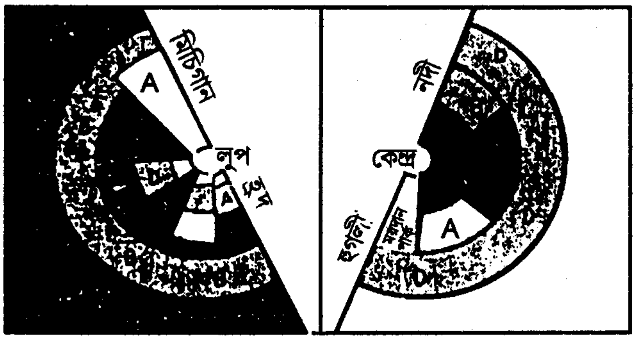

চিত্র - 5.2 চিকাগো ও কোলকাতার সামাজিক এলাকা

৫.২.২ বৃত্তকলা মতবাদ (Sector theory) ঃ

বারজেসের এককেন্দ্রিক বলয় ও বাস্তবক্ষেত্রে শহরে জমি ব্যবহারের মধ্যে একটা অমিল লক্ষ্য করা যায়। তাই নগরের কায়িক গঠন সম্পর্কে সমাজতত্ত্বিদরা নতুনভাবে চিন্তা করতে শুরু করলেন, আর এরই ফলশ্রুতি হল হোমার হাইটের (Homer Hoyt) বৃত্তকলা মতবাদ (চিত্র 5.3)। হোমার একটা নগরকে বৃত্ত হিসেবে কল্পনা করেছেন এবং বলেছেন কেন্দ্র থেকে প্রসারিত বৃত্ত দ্বারা এই নগর বৃত্তকলায় বিভক্ত হয়। এই মতানুসারে নগরে জমি ব্যবহারের ধাঁচ শহর থেকে বাইরের দিকে সড়ক পথের অবস্থান দ্বারা প্রভাবিত হয়। এই রাস্তাঘাটের বিন্যাস জমি ও বাড়ি ভাড়ার এক বৃত্তকলা সৃষ্টি করে, যা কালক্রমে নগরের জমি ব্যবহারের ধাঁচের ওপর ছাপ ফেলে। যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন

নগরের বসতি বিন্যাস থেকে হোমার লক্ষ্য করেছেন যে যদি কোন বৃত্তকলায় প্রথমে উচ্চভাড়া বিশিষ্ট বসতি অঞ্চল গড়ে ওঠে, তবে পরবর্তীকালের তৈরি বসতবাড়ি ঐ বৃত্তকলা ধরে নগরের বাইরের দিকে বিস্তার লাভ করবে। প্রমাণ হিসেবে হোমার 1900, 1915 ও 1936 সালের 6-টি নগরের উচ্চভাড়া-বিশিষ্ট অঞ্চলের অবস্থান দেখিয়েছেন। অনুরূপভাবে নিম্নভাড়া বিশিষ্ট বাসস্থান ভিন্ন দিকে প্রসারিত হতে পারে। অন্যভাবে বলা যায় যে ভূমি ব্যবহারের এই পার্থক্য নগর কেন্দ্রের দিকে একবার গড়ে উঠলে তা নগর প্রসারের সাথে সাথে চিরস্থায়ী হবে। নগরের এই কীলকসদৃশ (Wedge-like) বিস্তারের মতবাদ আগেকার এককেন্দ্রিক বলয় মতবাদের চেয়ে ভালো, কারণ এতে নগর বিস্তারের দিক ও দূরত্বকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। উচ্চভাড়া-বিশিষ্ট বসতি অঞ্চল প্রধান প্রধান সড়কপথ ধরে প্রসার লাভ করে।

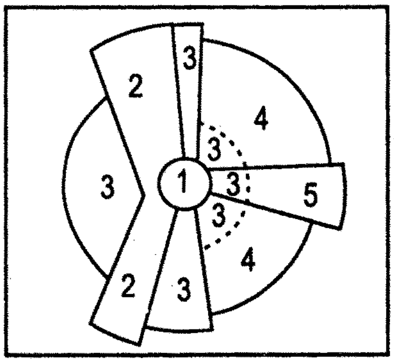

চিত্র - 5.3 হোমার হাইটের বৃত্তকলা

পি. মান (P. Mann) এককেন্দ্রিক ও বৃত্তকলা উপাদানগুলোকে এক করার চেষ্টা করেছেন। ব্রিটিশ নগরের অনুমিত (hypothetical) গঠনকে ব্যাখ্যা করতে তিনি তাঁর মডেলে (Model) চারটে বৃত্তকলা (A-D) অন্তর্ভুক্ত করেছেন (চিত্র 5.4)। তাঁর মতে এই বিভিন্ন বৃত্তকলায় এককেন্দ্রিক বিকাশ বলয় (1-4) সহাবস্থান করতে পারে।

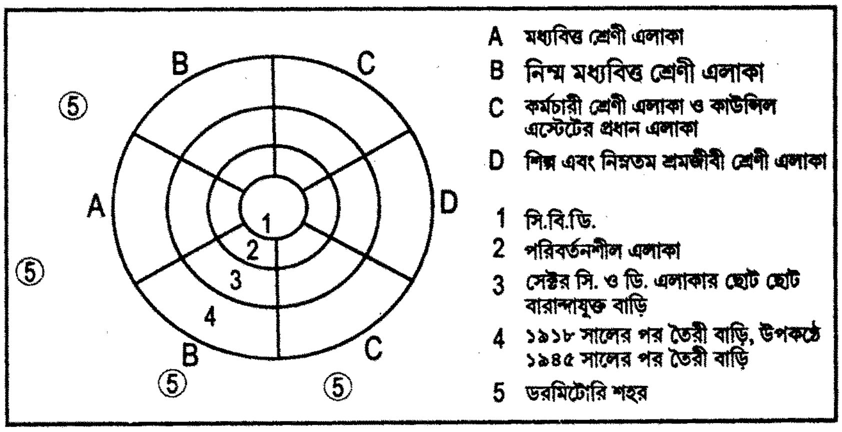

চিত্র - 5.4 (P. Mann-এর মতে) একটি অনুমিত বৃটিশ শহরের গঠন। চিত্রে এককেন্দ্রিক ও বৃত্তকলা মতবাদ যুগ্মভাবে দেখানো হয়েছে।

৫.২.৩ বহুকেন্দ্রিক মতবাদ (Multiple Nuclei Theory) :

এককেন্দ্রিক ও বৃত্তকলা মতবাদ খুব সহজে ব্যাখ্যা করা যায়, কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় শহরে জমি ব্যবহারের চরিত্রটি আরও জটিল। এই অসুবিধে দূর করতে 1945 সালে সি. ডি. হ্যারিস (C. D. Harris) ও ই. এল. উলম্যান (E. L. Ullman) বিভিন্ন ধরনের শহরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে এমন একটি মতবাদ প্রস্তাব করেছেন। এই মতবাদ

অনুযায়ী অধিকাংশ বড় নগরে ভূমি ব্যবহারের ধাঁচ একটি কেন্দ্রের বদলে অনেকগুলো ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্রকে আশ্রয় করে গড়ে ওঠে (চিত্র 5.6)। তাই একই নগরের মধ্যে শিল্প, খনি, বন্দর, রেলকেন্দ্র বা পৌর বসতি ইত্যাদি কেন্দ্রগুলো থাকতে পারে। এই বিভিন্ন প্রকার ভূমি ব্যবহার নির্ভর করবে ঐ নির্দিষ্ট শহরটির অবস্থান ও ইতিহাসের ওপর (Bergel, 1955)

এটা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে নগরের কিছু কিছু ক্রিয়াকর্ম যেমন ভারী ও ক্ষতিকারক শিল্পগুলো জলাশয় ও রেলপথের ধারে এবং ভাল বসত এলাকা থেকে একটু দূরে গড়ে উঠতে পারে। আবার পোষাকের মত হাল্কা শিল্প শহরের কেন্দ্রে গড়ে ওঠার দরুন ঐ শিল্প লাভবান হতে পারে। যে সব অঞ্চল থেকে বেশি ভাড়া পাওয়া

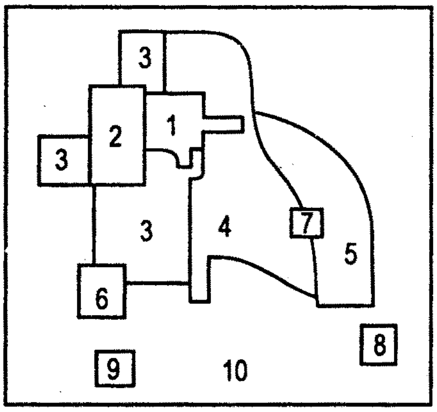

চিত্র - 5.6 হ্যারিস ও উলম্যানের বহুকেন্দ্রিক মতবাদের চিত্র

যেতে পারে, তা সাধারণত অভিজাত এলাকার জন্য পূর্ব নির্ধারিত থাকে। হ্যারিস ও উলম্যান-এর মতে ঐসব ক্রিয়াকর্ম কেন্দ্রে গড়ে উঠলে তা পাকাপোক্ত হবে এবং প্রসারের মধ্যে দিয়ে এক পৃথকভূমি ব্যবহার অঞ্চল গঠন করবে। এই সমস্ত বিভিন্ন স্বতন্ত্র কেন্দ্রের অধিবাসী, ক্রিয়াকলাপ, বাড়িঘর প্রভৃতির দিক থেকে আলাদা অঞ্চল হিসেবে গড়ে ওঠার মূলে চারটি উপাদান কাজ করে ঃ— (1) কতকগুলো ক্রিয়াকলাপ বিশেষ স্থানে আবদ্ধ থাকে, কেননা তাদের প্রত্যেকের বিশেষ ধরনের ব্যক্তিগত চাহিদা থাকে। যেমন খুচরা ব্যবসা অঞ্চল বাজারের নৈকট্য লাভের জন্য রাস্তার কাছাকাছি এলাকা খোঁজে। বন্দর এলাকা জলপথের সান্নিধ্য লাভ করে এবং শিল্পাঞ্চল আঞ্চলিক যোগযোগ ব্যবস্থার চরম সুযোগলাভে সচেষ্ট হয়। (2) কতকগুলো স্বগোত্রীয় বা সমধর্মী ক্রিয়াকলাপ একই অঞ্চলে সমাবিষ্ট হয়, কারণ পরস্পরের সান্নিধ্যে থাকলে তা বেশি ফলপ্রদ হয়। উদাহরণ হিসেবে কেন্দ্রীয় বাণিজ্য স্থানের নাম করা যেতে পারে। (3) কতকগুলো অন্য ধরনের ক্রিয়াকলাপ পরস্পরের ক্ষতিকারক, যেমন উচ্চশ্রেণীর বসতি অঞ্চল এবং শিল্পের মধ্যে একটা বিরোধ দেখা যায়। এই কারণে প্রথমটি দ্বিতীয়টিকে সব সময় এড়িয়ে চলে। এছাড়া, খুচরো ব্যবসা স্বভাবতই যানবাহনের ভিড় সৃষ্টি করে বলে পাইকারী ব্যবসা সাধারণত ঐ অঞ্চল এড়িয়ে অন্যত্র গড়ে ওঠে। (4) কতকগুলো ক্রিয়াকলাপ জমির উচ্চমূল্য বা বেশি ভাড়া দিতে না পেরে বাধ্য হয়ে কাম্য এলাকার বাইরে চলে যায় এবং কেন্দ্রস্থল ও প্রধান সড়ক থেকে দূরে অবস্থান লাভ করে। এই ধরনের কেন্দ্রের সংখ্যা বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। সাধারণত নগর আয়তনে যত বড় হবে কেন্দ্রের সংখ্যাও সেই অনুপাতে বাড়বে। যে সব অঞ্চল নগর গঠনে কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে এবং নগর এলাকার বিশেষ বিশেষ স্থানে অবস্থিত থাকে তাদের মধ্যে (ক) কেন্দ্রীয় বাণিজ্য স্থান, (খ) পাইকারী ব্যবসা এবং হাল্কা শিল্পাঞ্চল, (গ) ভারী শিল্পাঞ্চল, (ঘ) উচ্চশ্রেণীর বসতি অঞ্চল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য অপেক্ষাকৃত অপ্রধান কেন্দ্র হিসেবে সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, পার্ক, বহিঃস্থ ব্যবসা অঞ্চল, ক্ষুদ্র শিল্পাঞ্চল এবং এমন কি বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত নগর গঠন ও প্রসারের অংশ গ্রহণ করতে পারে।

যে সব নগর প্রসরণের মাধ্যমে অনেক গ্রাম ও ছোট শহরকে গ্রাস করেছে, সেখানেই হ্যারিস ও উলম্যান-এর মডেল উপযোগী বলে বিবেচিত হয়েছে। এই সব নগরের প্রত্যেকটি পৌরপিণ্ডকরণের (Urban Agglomeration) মাধ্যম হিসেবে কাজ করছে। এশিয়া ও আফ্রিকার অনেক ঔপনিবেশিক নগরে এই মডেল প্রয়োগ করা যেতে পারে। কারণ এগুলোতে ইউরোপীয় ও দেশীয় এলাকা আছে।

সমালোচনা ঃ উপরিউক্ত তিনটি ধাঁচের যে কোন একটি কোন নগরের ক্ষেত্রে যথাযথভাবে প্রয়োগ করা যায় না। কারণ প্রত্যেকটি শহরের একটি নিজস্ব কায়িক গঠন আছে। তা সত্ত্বেও এই সব মতবাদ কোন বিশেষ শহর সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পথনির্দেশিকা হিসেবে কাজ করে। কারণ শহরগুলোর গঠনে এসব মতবাদের প্রতিফলন দেখি। শহরগুলো বাইরের দিকে বিস্তারের ফলে বেড়ে ওঠে। আর এটা ঘটে থাকে রেলপথ ও রাস্তা ধরে। শিল্প, বাণিজ্য, বাসস্থান ও অন্যান্য ক্রিয়াকর্ম প্রত্যেকটিই তাদের নিজস্ব প্রয়োজনে আলাদা আলাদা একক ভূমি ব্যবহার সৃষ্টি করে।

ইদানীংকালে অনেক লেখচিত্রের (graph) মাধ্যমে শহরের সামাজিক ও বস্তুগত বিন্যাস সম্পর্কে আরও সমীক্ষা চালানো হয়েছে। যদিও আজ পর্যন্ত কোন গ্রহণযোগ্য মডেল ফলপ্রসূ হয় নি, তবে এটা দেখা গেছে যে কোন শহরের কেন্দ্র থেকে সময়-দূরত্ব এবং জমির দাম, রাস্তায় যানবাহনের সংখ্যা, জনসংখ্যা ও বাড়ির ঘনত্ব, বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত জমির অনুপাত, বাড়ির উচ্চতার পরিবর্তন ইত্যাদি সম্পর্কে অধিকাংশ মাত্রিক (quantitative) গবেষণা বারজেল, হইট, হ্যারিস ও উলম্যানের মতবাদগুলো সমর্থন করেছে।

এককেন্দ্রিক তত্ত্ব, বৃত্তকলা মতবাদ ও বহুকেন্দ্রিক মতবাদের তুলনা ঃ—

c) এককেন্দ্রিক মতবাদ (Concentric Theory)	2) বৃত্তকলা মতবাদ (Sector Theory)	বহুকেন্দ্রিক মতবাদ বা (Multiple Nuclin Theory)
i) এককেন্দ্রিক তত্ত্বের প্রবক্তা ছিলেন E. W. Burgess। তিনি 1923 সালে এই তত্ত্ব প্রবর্তন করেন।	i) শহরের কার্যকরী ভূমি ব্যবহারের দিক দিয়ে হোমার হাইয়ট 1939 সালে উল্লিখিত তত্ত্বটি প্রবর্তন করেন।	i) এই তত্ত্বটি C. D. Harris and E. L. Ullman 1945 সালে প্রবর্তন করেন।
ii) এককেন্দ্রিক তত্ত্বটি নির্দিষ্ট একটি কেন্দ্রের চারপাশে গড়ে ওঠে।	ii) বৃত্তকলা মতবাদের দিক দিয়ে কোন শহরগুলো এক একটি অক্ষ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এই অক্ষগুলো নদী ভিত্তিক, সড়কপথ ভিত্তিক, রেলপথ ভিত্তিক হতে পারে।	c) বহুকেন্দ্রিক মতবাদে শহরটি কোন জ্যামিতিক নিয়ম মেনে চলে না। এক্ষেত্রে শহরটি নানা কেন্দ্রকে আশ্রয় করে গড়ে উঠতে দেখা যায়। যেমন শিল্প, খনি, বন্দর রেলপথ ইত্যাদি।
iii) বার্জেসের মতে বড় শহরগুলো একটা কেন্দ্রের চারপাশে ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে। ফলে একটি কেন্দ্রের একাধিক বৃত্ত দেখা যায়।	iii) এক্ষেত্রে যেহেতু শহরগুলো এক একটি নির্দিষ্ট অক্ষকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে, এ কারণে ভিন্ন ভিন্ন অক্ষ ভিত্তিক শহরগুলো বৃদ্ধি পায়।	iii) বহুকেন্দ্রিক তত্ত্বে যেহেতু শহরগুলো কোন জ্যামিতিক ভাবে গড়ে ওঠে না বলে এরা যে কোনভাবে বৃদ্ধি পায়।
iv) এককেন্দ্রিক তত্ত্বে আমরা জানি যে একটি নির্দিষ্ট বৃত্ত গঠিত হয়ে থাকে কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে নদীর তীরবর্তী শহরগুলোর ক্ষেত্রে একাধিক অর্ধবৃত্ত গড়ে ওঠে। যেমন চিকাগো শহর বা কোলকাতা শহর।	iv) এই তত্ত্বের মূল ভিত্তি হল প্রতিটি শহরের অক্ষগুলো এক একটি ক্ষেত্র সৃষ্টি করে থাকে এবং ক্ষেত্রের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে।	iv) বহুকেন্দ্রিক মতবাদে কোন নির্দিষ্ট কেন্দ্র থাকে না বা অন্য কোন ক্ষেত্র বা অর্ধবৃত্ত কেন্দ্রও গড়ে ওঠে না।

৫.৩ কেন্দ্রীয় স্থান তত্ত্ব (Central Place Theory)

৫.৩.১ কেন্দ্রীয় স্থানের সংজ্ঞা ঃ

নগর ও শহরগুলো এলোমেলোভাবে পৃথিবীর বুকে গড়ে উঠেছে। আবাসনের এরূপ বণ্টনের বিষয়টি বিভিন্ন পৌরবিজ্ঞানী ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করেছেন। The term 'Central Place' was, however, first used by Mark Jefferson in 1931 for a settlement which is necessarily a focus of various activities mostly socio-economic in nature for its surrounding hinterland.যদিও 1933 খ্রীষ্টাব্দে জার্মান ভৌগোলিক Walter Christaller সর্বপ্রথম আবাসনের বণ্টনের ওপর বিশেষভাবে আলোকপাত করেন এবং Central Place Theory নামে এক তত্ত্ব উপস্থাপিত করেন। এই তত্ত্বের মূল বক্তব্য হল, একটি পৌর এলাকাকে বা কেন্দ্রীয় স্থানকে টিকিয়ে রাখার জন্য কিছু পরিমাণ উৎপাদনশীল জমির প্রয়োজন। আবার কেন্দ্রের অস্তিত্ব নির্ভর করে তার পারিপার্শ্বিক এলাকার জন্য কিছু জরুরী সেবা প্রদানের মাধ্যমে। এ প্রসঙ্গে আমরা Brian J. L. Berry এর কথা উল্লেখ করতে পারি। তাঁর মতে Central Place Theory is the theory of the location, size, nature and spacing of central place clusters and their activity এখানে কেন্দ্রীয় স্থানের ক্রিয়াকলাপগুলো হল তাই যা স্থানীয় বাজারগুলোকে সাহায্য করতে পারে। সামগ্রিকভাবে কোন অঞ্চলের বসতিসমূহের বিন্যাসে একটি বিশেষ ধারা পরিলক্ষিত হয়। "At first glance, the urban landscape may seem confusing. The pattern of settlements appears to be randomly distributed. Nonetheless, a regular pattern does exist". (Rubenstein and Bacon).

সুতরাং শিকাগোর মতো শহরের অবস্থানের পেছনের কার্যত প্রধান উপাদান হল যুক্তরাষ্ট্রের মধ্য-পশ্চিম এলাকার উৎপাদনশীলতা এবং গৌণ উপাদান হল মিচিগান হ্রদের দক্ষিণে তার অবস্থিতি। মিচিগান হ্রদ না থাকলে মধ্য-পশ্চিম যুক্তিরাষ্ট্রের জনসংখ্যা ঘন হত না। সুতরাং আদর্শগতভাবে একটি শহরকে কোন একটি নির্দিষ্ট উৎপাদনশীল এলাকার কেন্দ্রে অবস্থান করতে হবে।

কেন্দ্রীয় স্থান হল এমন এক বসতি যা আশেপাশের বসতির কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে কাজ করে। ওই সব বসতি পূর্বোক্ত কেন্দ্রীয় বসতির ওপর নির্ভরশীল। ওই সব নির্ভরশীল বসতির ওপর কেন্দ্রীয় স্থানের এক স্থায়ী প্রভাব আছে। উদাহরণ হিসেবে বলা চলে যে কোন স্থানে যেখানে বছরে মাত্র একবার মেলা বসে তা কেন্দ্রীয় স্থান নয়। কারণ এই সব বাজার সপ্তাহে একদিন জেগে ওঠে। এখানে স্থায়ী বসতি বা স্থায়ী দোকান থাকে না। গ্রাম বা ক্ষুদ্র বসতি (Hamlet) ও কেন্দ্রীয় স্থান হতে পারে। কেন্দ্রীয় স্থান গ্রামীণ এলাকাও হতে পারে আবার শহর এলাকাও হতে পারে। কিন্তু সমস্ত শহরই কেন্দ্রীয় স্থান নয়। শিল্প শহর বা খনি শহর কেন্দ্রীয় স্থান নয়, যদি না আশেপাশের বসতির পরিষেবার জন্য তাদের তৃতীয় পর্যায়ের (Tertiary) কর্মকাণ্ড থাকে। কেন্দ্রীয় স্থান হতে গেলে কোন বসতিকে আশেপাশের অঞ্চলের জন্যই প্রাত্যহিকভাবে সেবামূলক কার্য বজায় রাখতে হবে। কোন স্থান তখনই কেন্দ্রীয় স্থান বলে গণ্য হয় যখন আশেপাশের বসতি থেকে কিছু পরিষেবা বা দ্রব্যের জন্য ঐ স্থানে যাতায়াত করতে হয়। "A settlement becomes a central place when people from the surrounding area visit it for some service or goods" (Ramachandran, 1989). Om Prakash Singh কথাটিকে একটু ঘুরিয়ে বলছেন, "Central place is a place which performs services for the people living in its command area". এবার এই তত্ত্বের গভীরে প্রবেশ করা যাক।

আমরা একটু আগেই বলেছি যে অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট বসতি বা পরিষেবা কেন্দ্রগুলো পরস্পরের কাছাকাছি অবস্থিত হবে। আর বড় বসতি বা পরিষেবা কেন্দ্রগুলো তুলনামূলকভাবে দূরে অবস্থিত হবে। অর্থাৎ "There is a degree of order in the relationship between size and ranking of settlements in any region". শুধু তাই নয়, বিভিন্ন বসতির বণ্টন বা অবস্থানের পেছনে এক logic কাজ করছে। Rubenstion ও Bacon-এর ভাষায় বলতে হয় যে প্রথম দৃষ্টিতে পৌর কেন্দ্রসমূহকে বিভ্রান্তিকর মনে হতে পারে, কিন্তু সমগ্রভাবে কোন অঞ্চলের বসতিসমূহের বিন্যাসে এক বিশেষ ধারা পরিলক্ষিত হয়। "At first glance, the urban landscape may seem confusing. The pattern of settlements appears to randomly distributed. Nonetheless ...... a regular pattern does exist". (The Cultural Landscape).

এখন প্রশ্ন হল কেন্দ্রীয় স্থান কি? যে সব শহরে কেন্দ্রীয় কার্যাবলী দেখা যায় তাদের কেন্দ্রীয় স্থান হিসেবে অভিহিত করা হয়। এর পরে অবধারিতভাবেই যে প্রশ্ন চলে আসে তা হল কেন্দ্রীয় কার্যাবলী কি? কেন্দ্রীয় কার্যাবলীর মধ্যে রয়েছে খুচরো ব্যবসা, স্বাস্থ্য পরিষেবা, প্রশাসনিক পরিষেবা, স্কুল, কলেজ সারানোর (repairing) কাজ ও শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যাবলী।

কেন্দ্রীয় স্থান তত্ত্বের আর একটি মূল সূচক হল যে এই তত্ত্ব অর্থনৈতিক দিক দিয়ে কাম্য অবস্থানের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন মান ও বিশেষীকরণ পরিষেবার সাথে যুক্ত। এক্ষেত্রে সূচক হল পরিষেবা প্রদানকারী শহর ও গ্রামাঞ্চল হল পরিষেবা গ্রহীতা এটা অনেকটা মুখ্য ও গৌণ ধারণার (Basic/Non-Basic ratio) সাথে সম্পর্কিত। এই ধারণার প্রধান উদ্যোক্তা হলেন Mark Jefferson (1931)। Jefferson-ই প্রথম কেন্দ্রীয় স্থান কথাটি ব্যবহার করেন। এর দ্বারা তিনি এমন এক বসতিকে বুঝিয়েছেন যা আশপাশের অঞ্চলের (Hinterland) বিভিন্ন কার্যাবলীর (যেমন অর্থনৈতিক ও সামাজিক) কেন্দ্রবিন্দু। কেন্দ্রীয়তা (Centrality) ঃ

স্থানিক অর্থনৈতিক (Space economics) আলোচনায় কেন্দ্রীয় স্থানের গুরুত্ব নির্ণয় এক চিরন্তন সমস্যা। আজ পর্যন্ত এই সমস্যা সমাধানে যে সন্তোষজনক মডেল তৈরি করা হয়েছে তা হল ক্রিস্টেলারের (1938), আমাদের বর্তমান আলোচনায় কেন্দ্রীয় স্থান বণ্টন ব্যাপারে ক্রিস্টেলারের মডেলে নিম্নোক্ত পরিবর্তন ঘটিয়ে 2500 বা তার বেশি বাসিন্দাদের আলোচনায় নেওয়া হয়েছে। 1963 ও 1972 সালের U. S. Census of Business-এ এই বিষয়টি স্বীকার করা হয়েছে।

$$C = R + S - L\,MF$$

C = কেন্দ্রীয়তা (Centrality), R = খুচরো দোকানে মোট বিক্রী, S = পরিষেবা প্রতিষ্ঠানে মোট বিক্রী, L কোন কেন্দ্রীয় স্থানের মাঝারি আয়ের ব্যক্তিদের খুচরো ও পরিষেবা দ্রব্যাদিতে খরচের গড় শতাংশ, M = কোন কেন্দ্রীয় স্থানে মাঝারি আয় বিশিষ্ট পরিবার, F = কেন্দ্রীয় স্থানে মোট পরিবারের সংখ্যা। এই মডেলে R + কোন শহরে মোট খুচরো ও পরিষেবা কাজের এক পরিমাণ, আর LMF হল স্থানীয় খরচের এক পরিমাণ। এই দু'য়ের পার্থক্য হল কেন্দ্রীয়তা বা অতিরিক্ত স্থানীয় বাণিজ্যের আয়তনের (Volume) সূচক। অনেক কেন্দ্রীয় স্থানের কার্যাবলীর মাত্রা (Magnitude) নির্ণয় করতে এই পদ্ধতির (Procedure) ফলাফল ব্যবহার করা হয়েছিল।

৫.৩.২ কেন্দ্রীয়তার মানদণ্ড বা নিরিখ (Criteria of Centrality)

কোন জায়গাকে কেন্দ্রীয় স্থান বলে গণ্য করতে জনতার সংখ্যা কিন্তু সন্তোষজনক মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করা ঠিক হবে না। দক্ষিণ জার্মানীর কেন্দ্রীয়তা সূচক নির্ণয় করতে ক্রিস্টেলার টেলি সংযোগের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। ক্রিস্টেলারের এই পদ্ধতি সমালোচিত হয়েছে কারণ অ-কেন্দ্রীয় কাজেও টেলিফোন ব্যবহার করা হয়। এবং অধিকাংশে

নীচের দিককার কোন টেলিফোন ব্যবস্থা নেই। অনেক সময় দ্রব্য ও পরিষেবা দিয়েও কোন স্থানের কেন্দ্রীয়তা পরিমাপ করা হয়। দক্ষিণ ইংল্যান্ডে সংখ্যা দিয়ে Bracy এই পদ্ধতি প্রয়োগ করেছেন। বাস পরিষেবার সংখ্যা থেকে Green ইংল্যান্ড ও ওয়েলস-এর অনেক স্থানের কেন্দ্রীয়তা নির্ণয় করেছেন। সুইডেনের Godlund খুচরো বাণিজ্যকে কেন্দ্রীয়তার সূচক হিসাবে বেছে নিয়েছেন। তিনি কেন্দ্রীয়তার নিম্নোক্ত সূত্র দিয়েছেন—

$$\text{কেন্দ্রীয়তা} = \frac{St.100}{Pt.}$$

St-হল খুচরো ব্যবসায় নিয়োজিত ব্যক্তির সংখ্যা ও Pt. হল ঐ অঞ্চলের লোকসংখ্যা।

কাশীনাথ সিং কেন্দ্রীয়তা নির্ণয়ে আরও বাস্তবসম্মত প্রস্তাব দিয়েছেন। তাঁর সূত্রটি হল—

$$C = \frac{N.100}{P.}$$

C হল কেন্দ্রীয়তা, N হল বাণিজ্যের ওপর নির্ভরশীল জনতা এবং P হল ঐ স্থানের মোট জনসংখ্যা।

V. N. P. Sinha ছোটনাগপুর মালভূমির পৌর বসতির ক্রমানুগ (Hierarchy) আলোচনায় নিম্নোক্ত সূত্রের সাহায্যে কোন স্থানের কেন্দ্রীয়তা পরিমাপ করেছেন।

$$C = \frac{T \times 100}{P}$$

C হল কেন্দ্রীয়তা, T হল কোন কেন্দ্রের তৃতীয় পর্যায়ের পরিষেবার ওপর নির্ভরশীল জনতা এবং P হল তৃতীয় কর্মকাণ্ডের ওপর নির্ভরশীল মোট আঞ্চলিক জনসংখ্যা।

N. P. Saxena এবং R. C. Tyagi কেন্দ্রীয়তা সূচক পরিমাপ করতে নিম্নোক্ত সূত্র প্রয়োগ করেছেন—

$$C = A - \frac{P \times Ar}{Pr}$$

C হল কেন্দ্রীয়তার পরিমাপ, A হল কোন স্থানের কেন্দ্রীয় কার্যাবলীতে নিয়োজিত মোট কর্মী সংখ্যা, P হল ঐ স্থানের কেন্দ্রীয় জনসংখ্যা, Ar হল কোন অঞ্চলের কেন্দ্রীয় কার্যাবলীতে নিয়োজিত কর্মীর মোট সংখ্যা ও Pr হল অঞ্চলের লোকসংখ্যা।

যেহেতু প্রতিটি শহরের পরিষেবা ক্ষমতা (Service capacity) পরিমাপ করার উপযুক্ত মাপকাঠি নেই, তাই তাদের পরিষেবার সংখ্যা অনুযায়ী তাদের ক্রমানুগ নির্ণয় করতে হয়।

প্রতিটি শহরেই বিভিন্ন কার্যাবলী দেখা যায়। সমাজ বিজ্ঞানী Folke এই সব কার্যকে তাদের গুরুত্ব অনুযায়ী নির্দিষ্ট মান (Score value) ঠিক করেছেন ও তার ভিত্তিতে বিভিন্ন শহরের ক্রমানুগ (Hierarchy) অবস্থান ঠিক করেছেন।

এই সূত্র ধরেই প্রফেসর ভট্টাচার্য উত্তরবঙ্গের তদানীন্তন পাঁচটি জেলার পঁচিশটি শহরের কেন্দ্রীয়তা নির্ণয় করতে কয়েকটি সূচক বেছে নিয়েছেন। সূচকগুলো হল প্রশাসন, যোগাযোগ ব্যবস্থা, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবহন, আমোদ-প্রমোদ ইত্যাদি। প্রতিটি সূচকের আবার উপভাগ আছে। যেমন প্রশাসনের উপভাগগুলো হল জেলা সদর

শহর (স্কোর এক্ষেত্রে পয়েন্ট (1), মহকুমা সদর শহর (2), থানা সদর (3)। আবার যোগাযোগের উপভাগগুলো হল —মুখ্য ডাকঘর দ্বিতীয় শ্রেণীর টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন সুবিধে সমেত (4), রেডিও স্টেশন (6) ইত্যাদি। এই সূচকের ভিত্তিতে অধ্যাপক ভট্টাচার্য (1972) দেখিয়েছেন যে উত্তরবঙ্গের 25-টি শহরের মধ্যে শিলিগুড়ির স্থান সর্বাগ্রে (চিত্র 5.7)। এর পরের স্থানগুলো হল জেলা সদর শহরগুলোর — জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, ইংরেজ বাজার, কোচবিহার ইত্যাদি।

প্রায় একই রকম সূচক উত্তর বিহার সমভূমির ক্ষেত্রে Mondal (2000) প্রয়োগ করেছেন। প্রফেসর মণ্ডল অবশ্য কোন শহরে কম করে তিনটি সূচক থাকলে তবেই তাকে কেন্দ্রীয়তা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এরপর তিনি সূচকের গুরুত্বের ভিত্তিতে (Diversification weightage) বিভিন্ন বসতির প্রকারভেদ নির্ণয় করেছেন।

প্রফেসর মণ্ডল উক্ত বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে দেখিয়েছেন যে কেন্দ্রীয় স্থান সমূহ হল প্রধানত পরিষেবা কেন্দ্র আর তাদের কেন্দ্রীয়তা সূচক (Centrality index) সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে hierarchy of the services located in them". তিনি আরও উল্লেখ করেছেন যে উত্তর বিহারের ক্ষুদ্রতম কেন্দ্রীয় স্থান হল গ্রাম যেখানে এ্যালোপ্যাথিক ডাক্তার, জুনিয়ার স্কুল, পোস্ট অফিস, পাকা রাস্তার সংযোগ ইত্যাদি সুবিধাগুলো আছে।

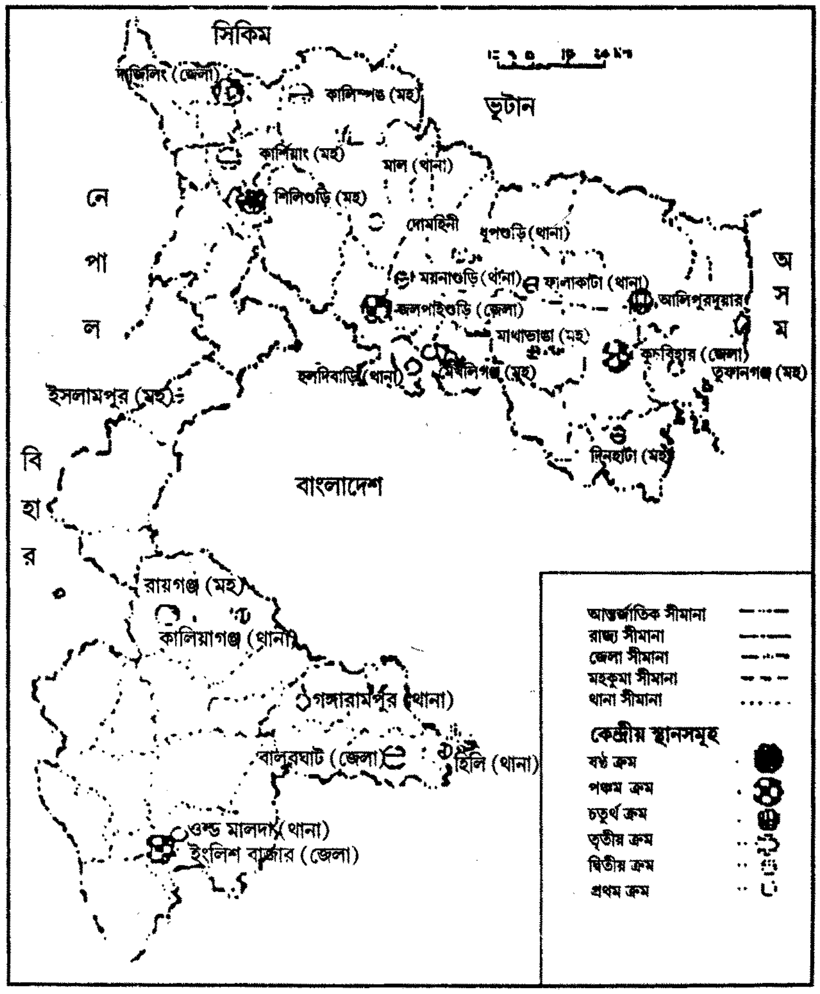

চিত্র - 5.7 কেন্দ্রীয় স্থানসমূহের মানানুক্রম

কেন্দ্রীয় স্থানতত্ত্বের মূল্য (Value of Central Place Theory)

প্রথমত, কেন্দ্রীয় স্থান নির্ণয় পদ্ধতির মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন আঞ্চলিক কেন্দ্রগুলোর তুলনামূলক বিশ্লেষণ পেতে সক্ষম হই।

দ্বিতীয়ত, এর মাধ্যমে কর্ম ও বসতির ক্রমানুগতা নির্ণীত হয় (Derived)।

তৃতীয়ত, শহর ও অঞ্চল এই দুইয়ের নির্ভরতা কতটা তা এই বিশ্লেষণের মাধ্যমে জানতে পারি।

চতুর্থত, এই তত্ত্বে দুটি কেন্দ্রের মধ্যে প্রতিযোগিতা ধারণার ওপর জোর দেওয়া হয়।

পঞ্চমত, বিভিন্ন কেন্দ্রের মধ্যে দূরত্ব থেকে আমরা পরিষেবা কেন্দ্রগুলোর বিকাশ সম্বন্ধে এক ধারণা পাই। বর্তমানে তারা তাদের বৈশিষ্ট্য কিভাবে পাল্টাচ্ছে তাও অনুধাবন করতে পারি।

ষষ্ঠত, তাত্ত্বিক গঠনের ভিত্তিতে কয়েকটি আগাম বসতির অবস্থানের ধাঁচ সম্পর্কে ইঙ্গিত দেওয়া সম্ভব হয়।

৫.৩.৩ কেন্দ্রীয় স্থানের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Central Places)

Central Place বা কেন্দ্রীয় স্থান হল বাজার বা পণ্য আদান-প্রদান বা পরিষেবাকেন্দ্র। এখানে নিকটবর্তী এলাকা থেকে লোকজন আসে। কেন্দ্রীয় স্থানের বৈশিষ্ট্যগুলোকে নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়।

সীমা ও পরিসর (Threshold and Range) ঃ

প্রত্যেক পণ্য বা পরিষেবার দুটি বৈশিষ্ট্য আছে, সেগুলো হল Threshold বা সীমা এবং Range বা পরিসর। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় একটি সুপার মার্কেটের কার্যকর ক্রেতা সংখ্যা কমপক্ষে 15,000 জন হতে পারে, পক্ষান্তরে একটি ছোট দোকানের কার্যকর ক্রেতার সংখ্যা কমপক্ষে 2,000 জন হতে পারে।

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল Range বা পরিসর। যে ন্যূনতম দূরত্ব অতিক্রম করে মানুষ পণ্য ক্রয় করে বা প্রয়োজন মিটিয়ে থাকে। যেমন কোন ব্যক্তি 1 মাইল দূরত্বের কোন দোকানে যায়। আবার 5 মাইল দূরত্বও অতিক্রম করতে পারে যদি সেখানে সুপার মার্কেট (Super Market) বা বেশি সুযোগ সুবিধে থাকে। যেমন মানুষ খেলা দেখার জন্য 100 মাইল দূরের মাঠেও যেতে পারে।

ছোট শহর ও বড় নগর (Small Towns & Large Cities)

ছোট শহরের দোকানে বা পরিষেবাকেন্দ্র ছোট হয়। ফলে কার্যকরী ক্রেতা বা পরিষেবা গ্রহণকারীর নিম্ন সীমা কম হয়। ফলে ছোট শহরে কখনই বড় বাজার বা পরিষেবা কেন্দ্র গড়ে উঠবে না, কারণ ঐ কেন্দ্রের চতুঃপার্শ্বস্থ কার্যকর ক্রেতার সংখ্যা ঐ কেন্দ্রের নিম্নসীমা অপেক্ষা কম হবে।

পক্ষান্তরে, বড় শহরে ক্রেতার সংখ্যা বেশি থাকার জন্য বড় বাজার বা পরিষেবাকেন্দ্র গড়ে ওঠে। সেখানে ক্রেতা গেলে খুব সহজেই পণ্য সামগ্রী পেয়ে যেতে পারে।

বাজার এলাকা (Market areas)

কোন বাজারের সীমা ও পরিসর নির্ণয়ের জন্য ঐ বাজারের চারপাশ দিয়ে একটি বৃত্ত অঙ্কন করা যেতে পারে। তবে ঐ সীমা নির্দিষ্ট নয়। ক্রাইস্টেলারের মতে বড় শহরের বাজারের সীমা অপেক্ষা ছোট শহরের বাজারের

সীমা ও কার্যকর ক্রেতার সংখ্যা কম দরকার হয়। এই বৃত্তের কেন্দ্রস্থলের বাজার থেকে প্রত্যেকেই জিনিসপত্র কিনবে। পক্ষান্তরে, কিছু মানুষ অন্য শহরে যাবে। কিন্তু এখানে একটি জ্যামিতিক সমস্যা থেকেই যায়। এখানে কোন সীমা বা পরিসর সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট কিছু জানা যায় না এবং প্রত্যেক বৃত্তের মাঝে একটি ফাঁকা জায়গা (Void area) থাকে।

এখানে এমন কিছু জ্যামিতিক আকার দরকার হয় যাতে কোন ফাঁক (Gap) বা অধিক্রম (Overlap) থাকে না। এক্ষেত্রে বর্গাকার ক্ষেত্রেরও তেমন সুবিধে পাওয়া যায় না। তাই বৃত্তের মতো কেন্দ্র থেকে সবদিকে সমান দূরত্বের জন্য ষড়ভুজ বা Hexagons ব্যবহার করা হয়। এই Hexagon-এর আকৃতির ওপর শহরের আকৃতি নির্ভর করে।

৫.৩.৪ কেন্দ্রীয় স্থান এলাকা গড়ে ওঠার পূর্বশর্ত (Pre-conditions for the development of central place)

Christaller-র মতে কোন এলাকাকে "কেন্দ্রীয় স্থান" বলে পদবাচ্য হতে গেলে নিম্নলিখিত পূর্বশর্ত থাকতে হবে—

i) গোটা এলাকায় একই ধরনের প্রাকৃতিক পরিবেশ থাকতে হবে অর্থাৎ ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ু, মাটি একই প্রকার থাকবে। একই রকম ভূ-প্রকৃতি থাকার ফলে সমস্ত দিকেই সহজে যাতায়াত করা যাবে।

ii) এটা ধরে নেওয়া যেতে পারে যে এখানকার নবাগত বাসিন্দারা প্রধানতঃ কৃষিজীবী হবেন। স্বভাবতই আমরা আশা করতে পারি যে এখানকার মাটি উর্বর হবে। এখানে কয়েকটি স্বয়ংসম্পূর্ণ পরিবার গোষ্ঠীবদ্ধভাবে বসবাস করবে।

iii) যেহেতু ভূ-প্রকৃতি সমতল তাই এইসব ক্ষুদ্রপল্লীগুলো সম দূরত্বে গড়ে উঠবে। ধরা যাক 4 কিমি দূরে দূরে।

iv) এছাড়া প্রস্তাবিত এলাকায় কোন প্রকার যান্ত্রিক যানবাহন থাকবে না। যদিও Christaller এই তত্ত্বটি পৌর বসতির বিন্যাসকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে উপস্থাপন করেছেন তবুও এখানে গ্রামীণ পটভূমিকাতে এর প্রয়োগ ও ব্যাখ্যার কথা মনে রাখতে হবে।

তত্ত্ব (Theory)

আদর্শ কেন্দ্রীয় স্থানের ক্ষেত্রে প্রত্যেক কেন্দ্রীয় স্থান একটি বৃত্তাকার হয়ে থাকে এবং নগরটি এই বৃত্তের কেন্দ্রে অবস্থান করে। পাশাপাশি এরূপ কতগুলো বৃত্তাকার বাণিজ্য অঞ্চলের মধ্যে কখনও কখনও কিছু অঞ্চল দেখা যায় যারা কোন অঞ্চলের মধ্যেই পড়ে না (ফাঁকা জায়গা বা Void area) অর্থাৎ যারা একাধিক বাণিজ্য অঞ্চলের প্রভাবাধীন। বৃত্তাকার বাণিজ্য অঞ্চলের ক্ষেত্রেই এ রকম ফাঁকা জায়গা দেখা যায়। Christaller এ বিষয়ে নিশ্চিত ছিলেন যে ষড়ভুজাকৃতির বাণিজ্য অঞ্চলগুলো একটি সুস্পষ্ট বাণিজ্য অঞ্চলের মাধ্যমে গোটা অঞ্চলকে অন্তর্ভুক্ত করে।

ক্রিস্টেলারের মতে আদর্শ অবস্থায় প্রতিটি সেবা কেন্দ্রের পশ্চাৎভূমি বা প্রভাব বলয়টি গোলাকৃতি থাকলে হয় এরা পরস্পর অধিক্রম (Overlap) করবে, আর নয়তো কিছু শূন্য স্থান (Vacant or unserved) থেকে যাবে এবং তা অ-সেবিত (Unserved) থাকবে। কিন্তু বাস্তবে কোন এলাকাই অসেবিত থাকে না। জ্যামিতিকভাবে তিনি

এর সমাধান দিয়েছেন। গোলাকৃতি পশ্চাদ্‌ভূমি (Hinterland)-কে তিনি সাধারণ ষড়্‌ভুজে রূপান্তর করেছেন। এর ফলে উপরোক্ত সমস্যা দূর হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে এই সমস্যা ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ বা ষড়্‌ভুজ দ্বারা সমাধান দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু বৃত্তের সর্বোত্তম বিকল্প হল ষড়্‌ভুজ। কারণ অধিক্রম সমস্যা ছাড়াও পারস্পরিক সংঘবদ্ধতা বৃত্তের গুণাবলী যেমন আয়তন, আকৃতি ষড়্‌ভুজে অনেক বেশি দেখানো সম্ভবপর।

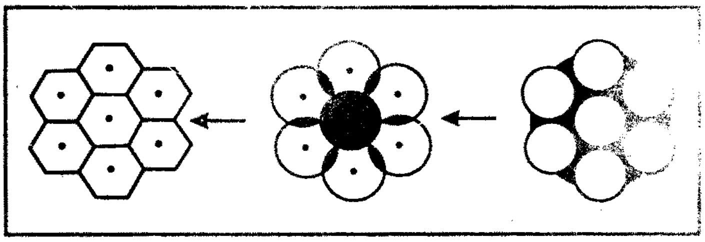

চিত্র - 5.8 বৃত্তের পরিসারিক বুনটের বিবর্তন

চিত্র - 5.9 ষড়্‌ভূজের বৈশিষ্ট্য ও বিন্যাস

এইভাবেই বিভিন্ন স্তরের সেবাকেন্দ্রের ষড়্‌ভুজ আকৃতির পশ্চাদ্‌ভূমি বা প্রভাব বলয়টি তৈরি হবে। প্রস্তাবিত এই বিন্যাসের সর্বনিম্ন পর্যায়ে থাকবে Hamlet বা পাড়া। ষড়্‌ভুজের ছটি কোণে ছ'টি ক্ষুদ্রপল্লী (Hamlet) থাকবে। লোকসংখ্যার ওপর নির্ভর করে ক্ষুদ্রপল্লীর আকৃতি বাড়বে।

এই ধরনের ক্ষুদ্রপল্লীগুলো একটি অপরটি থেকে 7 কি. মি. দূরে অবস্থিত হবে। এই ক্ষুদ্রপল্লীগুলো বাড়তি সুবিধে দিয়ে ঐ পার্শ্ববর্তী এলাকার লোকদের আকৃষ্ট করবে এবং সমগ্রভাবে আকারে বড় হয়ে পরবর্তীতে গ্রাম (Village) পর্যায়ে উন্নীত হবে। স্বভাবতই ক্ষুদ্রপল্লীর চেয়ে গ্রাম আকারে বড় হবে এবং এ ধরনের বসতি সংখ্যায়ও কম হবে অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত ছোট বসতিগুলো ষড়্‌ভুজের প্রান্তদেশের ছ'টি কোণায় অবস্থিত হবে এবং তুলনামূলকভাবে বেশি সংখ্যক সেবা ও জনসংখ্যা নিয়ে একটি গ্রাম ঐ ষড়্‌ভুজের কেন্দ্রে অবস্থিত হবে। একই ভাবে দ্বিতীয় পর্যায়ে বসতির উদ্ভব হবে এবং ঠিক একই ভাবে অপেক্ষাকৃত বেশি সুবিধে নিয়ে তৃতীয় পর্যায়ের সেবা কেন্দ্র বা শহর Town) উদ্ভব হবে এবং এভাবেই নগরও গড়ে উঠবে এবং এর ষড়্‌ভুজটি অপেক্ষাকৃত বড় হবে।

প্রভাব বলয়ের ব্যাপ্তি			
বসতির স্তর	পূর্ণ ষড়ভুজ	ষড়ভুজের অংশবিশেষ	মোট
পাড়া	1	$0 + 1$	$= 1$
গ্রাম	1	$6 \times \frac{1}{3} + 1$	$= 3$
শহর	7	$6 \times \frac{1}{3} + 7$	$= 9$
নগর	19	$6 \times \frac{1}{3} + 12 \times \frac{1}{2} + 19$	$= 27$

বৃত্তাকার কেন্দ্রীয় স্থান ঃ

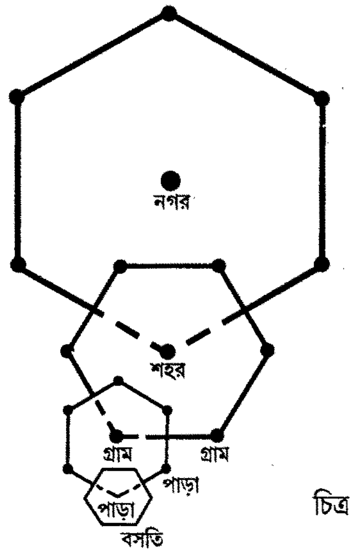

চিত্র - 5.10 ক্রিস্টলারের মডেল

উপরোক্ত সূত্র ছাড়াও ক্রিস্টেলার পরিবহনের সুবিধে-ভিত্তিক K–4 সূত্র (Transport Principle) দিয়েছেন। বাণিজ্যের জন্য রাস্তার প্রয়োজন হয়। বাণিজ্যের দিক দিয়ে যে সরাসরি পথ (Direct route) দু'টি বড় শহরের মধ্যবর্তী সবচেয়ে বেশি সংখ্যক শহরগুলোকে যোগসূত্রে বাঁধবে, তাত্ত্বিক দিক দিয়ে শহর বণ্টনের ক্ষেত্রে সেই সড়ক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করবে। তবে ঐ সড়ক-ভিত্তিক স্থানগুলো প্রত্যেকটিই সমান দূরত্বে অবস্থিত হবে। **ক্রিস্টলার**-এর মতে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটলে K–4 বিন্যাসের উদ্ভব হবে। এই হিসেবে ক্রমানুগ বা ধারাক্রম (Hierarchy) হবে 1, 4, 16, 64 ইত্যাদি। শ্রেণী বিন্যাসের ক্ষেত্রে যদি প্রশাসনিক ব্যবহার সুযোগ হয় তবে এক্ষেত্রে K-এর মান বেড়ে গিয়ে 7 হবে।

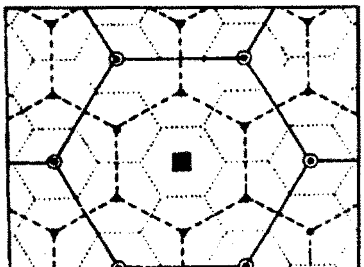

বাজার নীতি

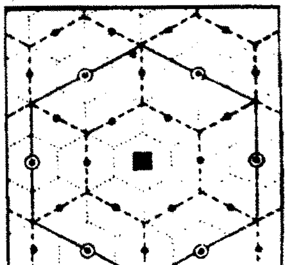

পরিবহন নীতি

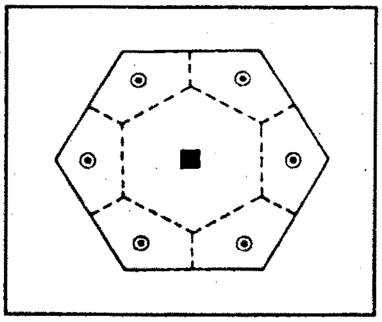

প্রশাসনিক নীতি

চিত্র - 5.11 Christaller-এর বিভিন্ন নীতি

ক্রিস্টলারের মতে ক্ষুদ্রতম কেন্দ্রগুলো (Hamlets) পরস্পরের খুব কাছে অবস্থান করে এবং এদের মধ্যে দূরত্ব প্রায় 7 কি.মি. এর মত অনুমান করা হয়। পরবর্তী স্তরে গঠিত হয় গ্রাম। কতগুলো ক্ষুদ্রপল্লী বা গঞ্জের কেন্দ্রস্থলে একটি গ্রাম গড়ে ওঠে। এই গ্রামগুলোর অধিবাসীরা তাদের পার্শ্ববর্তী ছোট ছোট গঞ্জের থেকে উন্নত জীবনযাত্রা নির্বাহ করে থাকে।

এই পদ্ধতি অনুসরণ করে তৃতীয় ধাপের সেবা প্রতিষ্ঠান বা কেন্দ্র হল শহর যা ছ'টি গ্রামের সীমারেখা দ্বারা বেষ্টিত হয়ে থাকে। দক্ষিণ পশ্চিম জার্মানীতে এইরূপ গড়ে ওঠা শহরের আয়তন, জনসংখ্যা এবং সেবা অঞ্চলগুলোর সম্পর্কে নীচে দেওয়া হল ঃ

আলোচ্য সারণি থেকে এটা পরিষ্কার হল যে প্রতিটি পরিষেবা কেন্দ্রের প্রভাব বলয়ের ব্যাপ্তি ও বসতির সংখ্যা তিনগুণ। ক্রিস্টলার এই মানকে(3 গুণ) K- বা ধ্রুবক এবং এই বৃদ্ধির হারকে K-3 বা বাণিজ্যিক সূত্র হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

বসতি	পারস্পরিক দূরত্ব (কি.মি.)	জনসংখ্যা	সেবা আয়তন (Km^2)	জনসংখ্যা
বাজার (গঞ্জ) (Marktort)	7	800	45	2700
গ্রামীণ ছোট শহর (Amtsort)	12	1,500	135	8,100
গ্রামীণ কেন্দ্র শহর (Kreesstat)	21	3,500	400	24,000
জেলা শহর (Bezirkstadt)	36	9,000	1,200	75,000
ছোট রাজ্যের রাজধানী (Gaustadt)	62	27,000	3,600	2,25,00
প্রদেশের মুখ্য রাজধানী (Provinzstadt)	108	90,000	10,800	6,75,000
আঞ্চলিক রাজধানী (Landstadt)	186	3,00,000	32,000	2,025,000

বছরের পর বছর ধরে মানুষের জীবনধারণের কৌশল এবং অর্থব্যবস্থার পরিবর্তনের সাথে তাল রেখে কেন্দ্রীয় স্থান তত্ত্বটির প্রতিটি স্তরে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। জার্মানীতে নীচের স্তরের কেন্দ্রগুলো সাধারণত শিল্পের উপযোগী দ্রব্যগুলো যোগান দেয়, অপরপক্ষে উচ্চ স্তরের কেন্দ্রগুলো সেখানে উৎপন্ন বিশেষ বিশেষ দ্রব্যাদি বাজারীকরণ করে।

স্তর অনুযায়ী দক্ষিণ পশ্চিম জার্মানীর বিভিন্ন সেবা প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্য নীচে দেখানো হল—

	একক	কার্য
1.	গঞ্জ	গ্যাসোলিন বা পেট্রোল পাম্প, চার্চ, মুদিখানা দোকান ইত্যাদি।
2.	গ্রাম	যন্ত্রপাতির দোকান থেকে সেলুন, লোহা লক্কবের দোকান, ব্যাঙ্ক ইত্যাদি।
3.	শহর	আসবাবপত্র, জামা কাপড়ের দোকান, মোটর গাড়ির দোকান, আইনের কার্যালয়, ডাক্তার, বিজ্ঞানী, বিমা অফিস ইত্যাদি।
4.	নগর	জুতো, গহনা, বিভাগীয় সংরক্ষণালয়, হাসপাতাল, হোটেল, সংবাদপত্রের অফিস, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক, ভ্রমণ ও পরিবহনের এজেন্সী ইত্যাদি।

এ প্রসঙ্গে একটি কথা উল্লেখযোগ্য যে উচ্চস্তরের কেন্দ্রগুলোতে ইহা অপেক্ষা নিম্নস্তরের সকল কাজকর্ম সংঘটিত হয়ে থাকে। কারণ ইহা একটি কেন্দ্রীয় বাজার হিসেবে কাজ করে যা পার্শ্ববর্তী ভোক্তাদের জন্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ করে থাকে।

কেন্দ্রের বিভিন্ন স্তর	দ্রব্য ও সেবার প্রকার					
মেট্রোপলিটন সেন্টার	X	X	X	X	X	X
আঞ্চলিক নগর		X	X	X	X	X
নগর			X	X	X	X
শহর				X	X	X
গ্রাম					X	X
গঞ্জ						X

বিঃ দ্রঃ— X = বিশেষ স্তরের একটি (কেন্দ্র) প্রতিষ্ঠান যা দ্রব্য উৎপন্ন করে এবং সেবা প্রদান করে।

একটি মুদি দোকান গঞ্জ অঞ্চলে বেশ সমৃদ্ধশালী হয়ে ওঠে কারণ তা প্রায় শত ভোক্তার (Consumer) উপযোগিতা মেটায়। কিন্তু একটি গয়নার দোকানকে সমৃদ্ধশালী হতে হলে একে অবশ্যই ব্যবসায়িক অঞ্চলে অবস্থিত হতে হবে এবং এক হাজার কার্যকর ক্রেতার দরকার হবে। উক্ত আলোচনা থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে কোন অঞ্চলে একটি দ্রব্যের কেন্দ্র গড়ে উঠতে বাজারের ভূমিকা প্রধান, যা বাজারের আকৃতির ওপর অনেকাংশেই নির্ভর করে থাকে।

Christaller-এর কেন্দ্রীয় স্থানতত্ত্ব জার্মানী তথা সুইডেন ও অন্যান্য দেশে যথেষ্ট সমালোচিত হয়েছে, কারণ কোন স্থানের কেন্দ্রীয়তা বোঝাতে তিনি যে সব উদাহরণ দিয়েছেন তা পর্যাপ্ত নয়।

i) যেহেতু এই তত্ত্ব মূলত সেবাভিত্তিক উপাদানগুলোর ওপর নির্ভর করে ক্রমোচ্চমানতার ধারণাটিকে পরিস্ফুট করেছে তাই যে সব অঞ্চলে প্রাকৃতিক সম্পদের ভিত্তিতে কোন শহর গড়ে ওঠে সেক্ষেত্রে এই ধারণাটা খাটে না। পর্যটন ক্ষেত্রের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

ii) এই তত্ত্বে জনসংখ্যার সমবণ্টনের কথা বলা হয়েছে কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় যে জনসংখ্যার ঘনত্ব মূলত জমির উর্বরতা, জলবায়ু ইত্যাদি ভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়। তাই অসমবণ্টিত অঞ্চলে এই তত্ত্বটি কার্যকরী হবে না।

iii) এই তত্ত্বে কেন্দ্রীয় অঞ্চলগুলোর বহুমুখী পরিবর্তনের ব্যাখ্যা দেওয়া হয় নি।

iv) এই তত্ত্বটিকে অনড়, অনমনীয় ও বিকৃতিমূলক বলে সমালোচনা করা হয়েছে। এই তত্ত্বে কোন নগরাঞ্চলের বিবর্তন পদ্ধতির কথা বলা হয় নি।

v) ষড়ভুজের বিন্যাসের জন্যও এই তত্ত্ব সমালোচিত হয়েছে।

vi) কৃষি অঞ্চলে এই তত্ত্ব বসতির বিকাশে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে কিন্তু শিল্প এলাকায় এই তত্ত্বের ব্যবহারগত দিক কম।

vii) যতদিন না জনসংখ্যা বাড়ে, ততদিন নতুন শহরের ক্ষেত্রে পুরোপুরি পরিষেবা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে পরিকল্পনা দেরী হতে পারে।

আলোচনা ঃ

কেন্দ্রীয় তত্ত্বে তিনি যে সব নীতির কথা বলেছেন তা স্থান, কাল বিশেষে পার্থক্য হয়। অবশ্য এই সব সমালোচনা গঠনমূলক, কারণ কেন্দ্রীয় স্থান তত্ত্বের মূল কথাই হল যে, এখানে ধরে নেওয়া হয় যে অন্যান্য সব উপাদানগুলো একই অবস্থায় থাকে। পরবর্তীকালে August Losch এই তত্ত্বে যথেষ্ট পরিবর্তন আনেন। Christaller যে ষড়ভুজাকৃতি বিন্যাসের ওপর জোর দিয়েছেন Losch তা সমর্থনে গাণিতিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তার উদ্দেশ্য ছিল যাতে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে Christaller-এর তত্ত্বের মতো Losch এর তত্ত্ব ততটা অনমনীয় (Rigid) নয়। প্রয়োজনানুসারে Losch-এর তত্ত্বে K-এর মান বাড়ানো কমানো যায়। একই মাপের বসতিগুলোতে সব সময়ে একই ধরনের কর্মকাণ্ড চলবে এবং বড় বসতিগুলোতে যে সব রকম কর্মকাণ্ড থাকবেই এমন কোন বাঁধাধরা নিয়মের কথা Losch বলেন নি।

৫.৪ কেন্দ্রীয় বাণিজ্য স্থান (Central Business District)

ভূমিকা ঃ— Central Business District বা কেন্দ্রীয় বাণিজ্য এলাকা চলতি ভাষায় C. B. D. নামেও উল্লেখিত হয়ে থাকে। প্রতি শহরের গঠনের ক্ষেত্রে এটি একটি অনন্য সাধারণ বৈশিষ্ট্য এবং এটি শহরের একটি অংশ। C. B. D. শহরের অতি প্রয়োজনীয় বাণিজ্যিক স্থান তথা পৌরজীবনের হৃৎপিণ্ড। কেন্দ্রীয় বাণিজ্য এলাকায় C. B. D. স্থানগত প্রতিযোগিতা পর্যাপ্ত স্থানে পৌঁছে যায়। একে Peak Land Value Intersection বা PLVI বলে।

সংজ্ঞা ঃ— কেন্দ্রীয় বাণিজ্য এলাকা (C. B. D.) হল শহরের প্রধান বাণিজ্য স্থান। শহরের প্রধান প্রধান বাণিজ্য পথ, ব্যাঙ্ক, অফিস এবং তাদের গুদাম ও বিশেষ কিছু দোকান নিয়ে হল এই C. B. D.। এই সব এলাকায় যারা কাজ করে

তারা এই স্থান ও তার লাগোয়া এলাকার জনগণকে ব্যবসা বাণিজ্যের মাধ্যমে সেবা করে। অন্যদিকে, কেন্দ্রীয় বাণিজ্য এলাকার বাইরে দোকান ও অফিস কম থাকে ও তা ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে। স্বভাবতই অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক মানুষ এর দ্বারা উপকৃত হন।

বিভিন্ন লেখকের সংজ্ঞাতে C. B. D. বা কেন্দ্রীয় বাণিজ্য এলাকার এই চরিত্রটি ধরা পড়েছে। C. B. D. বিষয়ের ওপর বিশেষজ্ঞ দুই বিদগ্ধ পণ্ডিত লিখেছেন "Central Business District is the commercial heart of the city where there is a maximum concentration of retail and service activities, highest land values and tallest buildings. It is the focus of macimum pedestrian and automobile traffic (Murphy and Vance. Jr., 1954)। যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় বাণিজ্য এলাকার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে The Cultural Landscape-র দুই লেখক মন্তব্য করেছেন, "The centre of U. S. cities is called the Central Business District (C.B.D.) defined as the area of the city where retail and office activites are concentrated". (Rubenstein and Baconh, 1983)

C.B.D. সম্পর্কে দুই ভারতীয় সমাজবিজ্ঞানী এক সুন্দর সংজ্ঞা দিয়েছেন। তাঁদের ভাষায় "The C. B. D. is the area where the residential population is the least and daytime population is high. It is also the area where the intensity of landuse is high and higher order functions are concentrated (E. Swaminathan and Raja Mohan.)"

সাধারণের ব্যবহার্য সুরম্য ইমারত, যেমন টাউন হল, কমিউনিটি হল, সাধারণ পাঠাগার, আর্ট গ্যালারী, প্রধান ডাকঘর, নামী হোটেল, সংবাদপত্রের অফিস, আমোদ-প্রমোদের জন্য থিয়েটার, সিনেমা হল এই এলাকায় গড়ে ওঠে। সে তুলনায় শহরের বাইরের সীমানায় জমি ব্যবহারের বৈচিত্র্য কম—সাদামাটা একতলা বাড়ি, কারখানা, মোটর গ্যারেজ, সাধারণ গুদাম, হোটেল, ছোট ছোট দোকান ও পুরোনো বাড়ি যা ইদানীং বিভিন্ন কাজে লাগানো হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে Johnston (1994)-এর বক্তব্য উল্লেখযোগ্য। "The nucleus of an urban area containing the main concentration of commercial land uses (Shops Offices and warehouses)". কেন্দ্রীয় বাণিজ্য এলাকার শেষ সীমানায় রেল স্টেশন, বিমান বন্দর, আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় ও ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ থাকে।

উদাহরণ (Example) ঃ—

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে কোলকাতার C.B.D. হল ডালহৌসী এলাকা। ইংরেজ আমল থেকেই এই এলাকায় (বর্তমান বি. বা. দি বাগ) C.B.D.-এর বৈশিষ্ট্যগুলো ফুটে উঠেছে। মহাকরণ, নিউ সেক্রেটারিয়েট, রাজভবন, পূর্ব রেলপথের সদর দপ্তর, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য ব্যাঙ্ক নিয়ে গঠিত এই এলাকা। এখানে বসবাসের জন্য বাড়ি নেই। এটাই হল C.B.D.-এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম বড় বাণিজ্য শহর শিলিগুড়ির C.B.D. এলাকা হল হিলকার্ট রোড, বিধান-রোড ও সেবক রোড নিয়ে গঠিত ত্রিকোণাকার জায়গা এবং এটি প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র। এখানে বসত বাড়ি খুব কমই আছে। বিশ্ববিদ্যালয়, বিমান বন্দর ও মেডিক্যাল কলেজ শিলিগুড়ি শহর থেকে 10-15 কি.মি. দূরে তৈরি হয়েছে। C.B.D.-এর অন্যান্য উদাহরণ হল মুম্বাই-র ট্যাঙ্ক রোড, ব্যাঙ্গালোরের এম. জি. রোড ইত্যাদি।

৫.৪.১ কেন্দ্রীয় বাণিজ্য এলাকার বৈশিষ্ট্য (Characteristics of C.B.D) ঃ—

C.B.D. শহরের কেন্দ্র, নগর কেন্দ্র বা শহরের বাণিজ্য অঞ্চল নামেও পরিচিত। Murphy এই এলাকার

বৈশিষ্ট্য এইভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ এর অবস্থান শহরের মাঝখানে, অন্তত যোগাযোগ ব্যবস্থার দিক দিয়ে। যেহেতু এখানে নগরের অধিকাংশ অফিস ও খুব বড় বড় খুচরো পণ্যের গোলা গড়ে ওঠে, তাই অন্যান্য অংশের তুলনায় এখানে বহুতল ইমারত তৈরি হয়। "A further feature is that the process of functional and physical growth has resulted in both the upward and the lateral growth of the buildings in the CBD." – (Dickinson, 1964)। এখানে যান চলাচল ও পথচারীর সমাবেশ বেশি দেখা যায়। নগরের অন্য এলাকার চেয়ে এখানে জমির দাম ও খাজনা দুই-ই বেশি। ব্যবসার খাতিরে কেন্দ্রীয় বাণিজ্য এলাকা গোটা শহরের, এমন কি অন্য এলাকার বহু ধরনের লোকদের এখানে টেনে আনে। গ্রামবাসীদের কাছে কেন্দ্রীয় বাণিজ্য এলাকা ও নগর দু'য়েরই অর্থ এক।

আগেকার দিনে এই এলাকায় বহু ধরনের কার্যক্রম দেখা যেত— বসতি, বাণিজ্য, প্রশাসন, এমন কি শিল্প প্রতিষ্ঠান। গত কয়েক দশকে কেন্দ্রীয় বাণিজ্য এলাকায় জমির দাম দ্রুত বাড়ায় বাড়ি ও শিল্প মালিকেরা এই এলাকা ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে। এর ফলে ঐ এলাকা এখন সম্পূর্ণরূপে অফিস ও বাণিজ্য এলাকায় পরিণত হয়েছে। "The central area is notable for the absence of residents, although large numbers may have lived here in the past" (Rubenstein & Bacon, 1983).

R. E. Murphy-র মতে কেন্দ্রীয় বাণিজ্য এলাকা শহরের সুগম্যস্থানে অবস্থিত। শহরের অন্যান্য অংশের তুলনায় এই অঞ্চলেই সরকারি বা বেসরকারি অফিস, খুচরো বিক্রয়স্থল প্রভৃতির আধিক্য চোখে পড়ে। এখানে সর্বাধিক যানবাহন, পথচারী ও বাণিজ্যের কেন্দ্রীভবন ঘটে থাকে। C.B.D. হল শহরের বিভিন্ন পৌর এলাকার এবং বিভিন্ন ধর্ম ও শ্রেণীর লোকেদের বাণিজ্যিক এলাকা।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় বাণিজ্যিক এলাকার যে বৈশিষ্ট্যগুলো ফুটে ওঠে তা হল—

i) খুচরা ব্যবসার কেন্দ্রীভবন।

ii) বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রধান বিভাগীয় কার্যালয়।

iii) এই এলাকায় উৎপাদনশীল কারখানার অভাব।

iv) জমির দাম অত্যধিক হওয়ায় এই এলাকায় বসতির আধিক্য থাকে না।

v) এই অংশে বাড়ি বা অন্যান্য দ্রুতগামী যান এবং পথচারীর আধিক্য চোখে পড়ে।

vi) এখানে খুব উচ্চ অট্টালিকা দেখা যায়।

vii) এই এলাকা জনগণকে খুচরো ব্যবসা, পাইকারী ব্যবসা, ট্রাফিক এবং ব্যাঙ্কিংয়ের পরিষেবা প্রদান করে থাকে।

৫.৪.২ কেন্দ্রীয় বাণিজ্য এলাকার সীমা নির্ধারণ (Delimitation of C.B.D.) ঃ

আমাদের মধ্যে একটা প্রচলিত ধারণা আছে যে বাড়ির উচ্চতা, সুগম্যতা (accessibility), যানবাহন ও পথচারী চলাচল, জনসংখ্যার বৈশিষ্ট্য, জমির দাম ইত্যাদি দিয়ে কেন্দ্রীয় বাণিজ্যিক এলাকার বৈশিষ্ট্যসমূহকে মাপা যায় এবং মানচিত্রের মাধ্যমে তা প্রকাশ করা যায়। তাই বলা যেতে পারে যে এই সব বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে C.B.D.-র সীমা নির্ধারণ করা অপেক্ষাকৃত সহজ। দুর্ভাগ্যবশতঃ, এই সব মানদণ্ডের একটিও সম্পূর্ণভাবে সন্তোষজনক নয়। বাস্তবে দেখা যায় যে C.B.D.-এর কেন্দ্রবিন্দুতে এই সব উপাদানগুলো বেশি মাত্রায় দেখা যায় যা কেন্দ্র থেকে

ক্রমশ বাইরের দিকে কমতে থাকে। এটা ঠিক যে C.B.D.-র শেষ অংশকে একটি সীমার বদলে অঞ্চল বলা যুক্তিযুক্ত।

C.B.D.-র সীমা নির্ধারণের সূচক সম্পর্কে বিভিন্ন ভৌগোলিক ও পৌরবিজ্ঞানীরা ভিন্ন ভিন্ন মতামত পোষণ করেছেন। Williams দোকান ভাড়ার ওপর ভিত্তি করে C.B.D.-র সীমা নির্ধারণ করেছেন। Proudfoot (1937) বার্ষিক বাণিজ্যের ওপর ভিত্তি করে C.B.D.-র সীমা নির্ধারণের চেষ্টা করেছেন। পক্ষান্তরে, Harihar Singh (1968) কানপুর শহরে সমীক্ষা চালিয়ে C.B.D.-র প্রধান কাজকর্ম যেখানে ঠিকঠাক পালিত হয় না জমির দাম কমে গেছে, তাকেC.B.D. বলতে নারাজ। জমির দাম বিভিন্ন দেশে নানা রকম হয়। তাই জমির দামের ওপর ভিত্তি করে C.B.D.-র সীমা নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। C.B.D. সম্পর্কে R. E. Murphy ও J. E. Vance Jr. প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে কেন্দ্রীয় বাণিজ্যিক এলাকার সীমা নির্ধারণে জমির দাম সম্পর্কে পরিসংখ্যান সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রযোজ্য পদ্ধতি হতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রে সাতটি নগরের ওপর সমীক্ষা চালিয়ে এঁরা C.B.D.-র কেন্দ্রবিন্দু থেকে বাইরের দিকে জমির দাম কমে যাওয়ার একটা প্রবণতা লক্ষ করেছিলেন। জমি ব্যবহারের নকশা থেকে তাঁরা প্রত্যক্ষ করেছিলেন যে C.B.D.-র কেন্দ্রবিন্দুতে অন্যান্য অংশের তুলনায় জমির দাম 5 শতাংশ বেশি। যুক্তরাষ্ট্রের বাইরের শহরগুলোতে এঁরা দেখেছেন যে জমির দামের রেখাচিত্র সচরাচর C.B.D.-র কেন্দ্রবিন্দু থেকে বাইরের দিকে কম ঢাল বিশিষ্ট হয়ে থাকে (চিত্র 5.12) তবে এই ধরনের গবেষণায় যে অসুবিধে দেখা যায় তা হল অনেক স্থানীয় কর্তৃপক্ষ সমীক্ষার জন্য জমির দাম সম্পর্কিত তথ্য গবেষকদের হাতে তুলে দিতে চান না। সম্ভবত C.B.D.-র সীমা নির্ধারণের সবচেয়ে ভাল উপায় হল জমির দামের তথ্য ও জমির ব্যবহার সম্পর্কিত মানচিত্রের পাশাপাশি আলোচনা করা। ফলতঃ, C.B.D.-র ক্রিয়াকর্মের তুলনার নগরের অন্যান্য এলাকায় ক্রিয়াকর্মের পরিবর্তন চোখে পড়বে।

চিত্র - 5.12 C. B. D. থেকে বাইরের দিকে জমির দাম কমে যাচ্ছে

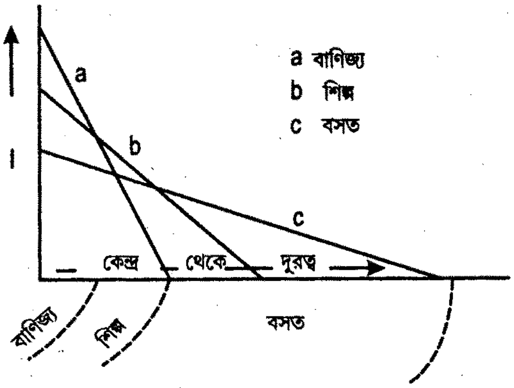

C.B.D.-র এলাকা কি অপরিবর্তনীয়? (Is C.B.D. area unchangeable ?) C.B.D. এলাকার কোন পরিবর্তন নেই এটা মনে করা ঠিক নয়। Murphy ও Vance Jr.-র মতে অর্থনৈতিক অবস্থা বদলের সাথে সাথে C.B.D. এলাকার কিছু পুনর্বিন্যাস ঘটে থাকে। C.B.D. এলাকার সম্প্রসারণ ও সঙ্কোচনকে তারা যথাক্রমে Zone of assimilation বা একত্রীকরণ এলাকা ও Zone of discard বা পরিত্যক্ত এলাকা বলেছেন (চিত্র 5.13)। তাঁদের মতে প্রথমোক্ত এলাকা হল আগামী দিনের C.B.D.। এখানে ব্যাপক পুনরোন্নয়ন ঘটে থাকে। পূর্বতন বসত এলাকায় হোটেল, দোকান, অফিস ক্রমশ গড়ে উঠতে থাকে। আর পরিত্যক্ত এলাকা হল পূর্বতন C.B.D. যেখানে কিছু সাধারণ খুচরো দোকান, গুদাম, পাইকারী ব্যবসার আড়ত ও অনেক পরিত্যক্ত বাড়ির সমারোহ দেখা যাবে। এটা বলা হয়ে থাকে যে C.B.D.-র এলাকা পরিবর্তনের সাথে সাথে বেশি দামের জমির দিকেরও পরিবর্তন ঘটে থাকে।

"A major difficulty of delimitation was that of attempting to identify a precise boundary which did not really exist : the difference between the CBD and other parts of the city is one of degree rather than of kind".–(Herberth, 1972).

৫.৪.৩ দি কোর-ফ্রেম মডেল (The Core-Frame Model)

কেন্দ্রীয় বাণিজ্য এলাকার 'Core-frame model"-এর উদ্ভাবক হলেন Horwood and Boyce (1959)। Core হল এমন এক এলাকা যেখানে i) দিনের বেলায় অধিক জনতার সমাবেশ ঘটে এবং যেখানে ভূমি নিবিড়ভাবে ব্যবহৃত (ii) যেখানে জমির দাম বেশি এবং উঁচু অট্টালিকা দেখা যায়। এই এলাকার মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়াকর্মের সমাবেশ ঘটে এবং কার্যধারা ভিত্তিক এলাকার সৃষ্টি হয়। 'The frame' হল অপেক্ষাকৃত কম উন্নত এলাকা। জমির দাম এখানে কম এবং এখানে বিভিন্ন কার্যধারা একসাথে পাশাপাশি সহাবস্থান করে।

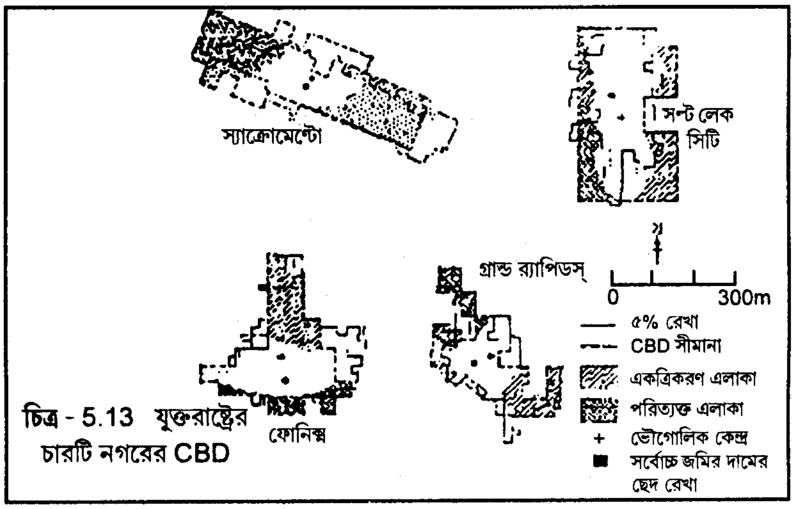

চিত্র - 5.13 যুক্তরাষ্ট্রের চারটি নগরের CBD

বর্তমানে শহরের অত্যধিক গুরুত্ব ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে C.B.D. এলাকার বিস্তার ঘটে চলেছে। As city centres expand, the C.B.D. functions may be extended into this transitional zone". এই পদ্ধতি 'Invasion-succession'নামে পরিচিত এবং এটিGriffin and Preston (1966)-এর তৈরি মডেল দ্বারা দেখানো হয়। এটি C.B.D. ও তার পারিপার্শ্বিক বর্ধিত এলাকার মধ্যে আন্তঃসম্পর্কের সূত্র দেয়।

Griffin and Preston পরিবর্তন অঞ্চলকে (Zone in transition) তিনটি এলাকায় (Sector) ভাগ করেছেন—

a) সক্রিয় একত্রীকরণ (Active assimilation) এলাকা যেখানে নতুন C.B.D.-র কাজকর্ম বিস্তার লাভ করে। যেমন গুচ্ছ বাজার (Market complex)।

b) নিষ্ক্রিয় এলাকা যেখানে C.B.D.-র বৃদ্ধি কম হয় এবং যেটির বৈশিষ্ট্য C.B.D.-র থেকে আলাদা হয়ে থাকে। যেমন গুদাম ঘর।

c) সাধারণ নিষ্ক্রিয় এলাকা যেখানে C.B.D.-র বৃদ্ধি খুব কম হয়।

সমস্যা (Problem) ঃ—

"Most C.B.Ds are in relative if not absolute decline, as their characteristic uses are increasingly decentralized to suburban and exurban locations, as with the growth of planned shopping centres and office parks close to major highway intersections–(Johnston, 1994)

কোন শহরের বিস্তারের প্রকৃতি মূলত C.B.D.-কে কেন্দ্র করেই ঘটে থাকে। শহরের যে কোন গঠনই হোক না কেন C.B.D. হল তার কেন্দ্রবিন্দু। বিভিন্ন অনুকূল পরিবেশকে কেন্দ্র করেই C.B.D.-এর প্রসার ঘটে। স্বভাবতই আনুষঙ্গিক কতগুলো সমস্যা ও C.B.D.-কে ঘিরে গড়ে ওঠে। পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি শহরেই এই ধরনের সমস্যা পরিলক্ষিত হয়। যথা ঃ—

i) **শহরে প্রবেশের ক্ষেত্রে অসুবিধে ঃ—** যানজট এই এলাকার মুখ্য বৈশিষ্ট্য। পার্কিং-এর অভাব এই এলাকায় প্রায়শই লক্ষ্য করা যায় যা স্বভাবতই জীবনযাপনের ওপর প্রত্যক্ষ প্রভাব ফেলে। "This is the bogyman of the modern city for it employes traffic congestion and lack of parking."

ii) **অত্যধিক জনসংখ্যা বৃদ্ধি ঃ—** C.B.D.-এলাকায় অত্যধিক জনসংখ্যা বৃদ্ধিজনিত চাপ এখানকার সামাজিক জীবনে দারুণ পরিবর্তন এনেছে। পরিবারের আয়তন ক্ষুদ্রতর হয়েছে, যৌথ পরিবার বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ভেঙে গিয়েছে। ফলে বেশি পরিবারের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করতে বসতির বিস্তার ঘটেছে।

iii) **অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ঃ—** ঘিঞ্জি বাড়িতে আলো বাতাসের অভাবের জন্য অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের সৃষ্টি হচ্ছে। সম্ভ্রান্ত পরিবারের পরিষেবার জন্য শ্রমজীবীদের নিয়ে C.B.D.-এর অভ্যন্তরে অস্বাস্থ্যকর বস্তি গড়ে ওঠে। তাই তার প্রভাব C.B.D.-এর প্রায় প্রতিটি বাড়িতে প্রতিফলিত হয়।

এই সব অবস্থা থেকে মুক্তি পাবার জন্য শহর ছাড়িয়ে খোলামেলা পরিবেশে বসবাস করার (যাকে ব্রিটেনে Garden City বলা হয়ে থাকে) ইচ্ছে পাশ্চাত্য দেশের পাশাপাশি ভারতে ও শহরতলি বিস্তারে সাহায্য করেছে। মূলত প্রায় প্রতিটি বড় শহরে (Garden City) গঠনের আন্দোলন উপরোক্ত সমস্যার প্রতিফলন মাত্র।

উপসংহার ঃ—

পরিশেষে বলা যায় কেন্দ্রীয় বাণিজ্য এলাকা নিশ্চল স্থান নয়। দিন দিন এর হ্রাস বৃদ্ধি ঘটছে। কোথাও C.B.D. হ্রাস পাচ্ছে আবার কোথাও C.B.D. বৃদ্ধি পাচ্ছে বা নতুন C.B.D.-এর জন্ম হচ্ছে। বর্তমানে যেখানে C.B.D. এলাকার সম্প্রসারণের জায়গা নেই সেখানে বাড়িগুলো উচ্চতায় বৃদ্ধি পেয়ে C.B.D.-এর উলম্ব সম্প্রসারণ ঘটাচ্ছে। C.B.D. এলাকার জমির দাম বেড়েই চলেছে। "The picture of the C.B.D., however, is sharp and accurate it may be, is no more than a glimpse of the moment. As such, it reflects the past in the original site conditions and changes through time, it reflects the present in its response to current economic conditions and it carries a forecast of the future." তবে C.B.D. পরিকল্পনা মাফিক গড়ে ওঠা উচিত যাতে জনগণের পরিষেবা সুষ্ঠুভাবে হতে পারে। কোলকাতা, মুম্বাই, দিল্লীর C.B.D.-তে দোকানপাট খুব আশা নিয়ে খোলে, কিন্তু কম সংখ্যক ভোক্তা বা ক্রেতার জন্য তা ফলপ্রসূ হয় না (Mandal, 2000)। পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ পদ্ধতির মধ্যেই C.B.D.-এর পরিকল্পনা নিহিত আছে।

R. E. Murphy তাঁর Central Business District, A Study in Urban Geography-তে C.B.D.-র ভূমি ব্যবহারের এক সুন্দর চিত্র তুলে ধরেছেন যা থেকে তার কার্যকলাপের কিছুটা আঁচ পাওয়া যায়।

খুচরো ব্যবসায় ব্যবহার্য জমি	পরিষেবা, অর্থ সংক্রান্ত, অফিসের জন্য জমি ব্যবহার	C.B.D. ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে জমির ব্যবহার
খাদ্য	অর্থ সংস্থান	বাসস্থান
পোষাক	পরিষেবা, বাণিজ্য	শিল্প
গৃহস্থালীর জিনিসপত্র	হেডকোয়ার্টারস অফিস	পাইকারী ব্যবসা
মোটরগাড়ি বিক্রি ও	সরকারি অফিস ও	খালি জায়গা
পরিষেবা	আদালত	সাংস্কৃতিক এলাকা
জেনারেল স্টোর	স্থানীয় বাসস্থান	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
বিবিধ		ধর্মীয় স্থান
আমোদ প্রমোদ		

৫.৫ শহর ও নগরের কর্মধারা (Functions of Towns and Cities)

বিভিন্ন বৃত্তি ও কর্মধারা নিয়ে গড়ে ওঠা শহরগুলো নিয়ে নিচে আলোচনা করা হল—

৫.৫.১ দুর্গ ও সামরিক শহর (Fort and Cantonment Town) ঃ—

ঐতিহাসিক শহর প্রতিরক্ষার কারণে সৃষ্টি হয়েছিল। এদের মধ্যে অসংখ্য রোমান শহর ছিল, যেমন চেস্টার (Chester, চিত্র 5.14), লিংকন (Lincoln), ইয়র্ক (York), মধ্যযুগে দক্ষিণ পশ্চিম ফ্রান্স, ওয়েলস ও স্কটল্যান্ডের দুর্গ শহর, যেমন এডিনবার্গ (Edinburgh), ফ্রান্সের স্ট্রাসবার্গ (Strasburgh) (শহরের নামের শেষে burgh দ্বারা দুর্গ শহর বোঝানো হচ্ছে), পূর্ব ইউরোপে জার্মান প্রশাসক ও ব্যবসায়ীদের প্রতিষ্ঠিত বসতি, উত্তর আমেরিকায় কুইবেক (Quebec) ও পিট্সবার্গের (Pittsburg) মত শহর এবং ভারতবর্ষে এ রকম অনেক দুর্গ শহরের উদাহরণ খুঁজে পাওয়া যায়, যেমন আগ্রা, গোয়ালিয়র, বিকানীর, যোধপুর, চিতোরগড় ইত্যাদি। অধিকাংশ মধ্যযুগীয় শহরে প্রতিরক্ষার খাতিরে সুরক্ষিত দেওয়াল ছিল এবং কিছু কিছু শহরে দুর্গও ছিল যাদের কেন্দ্র করে ব্যবসায়ী ও কারিগররা বসতি গড়ে ছিল। পছন্দসই স্থান ছিল খাড়া পাহাড়ের চুড়ো, যেমন এথেন্স (Athens, Greece), এডিনবার্গ (Edinburgh, U. K.) বা জয়পুরের নাহারগড় দুর্গ, আজমীরে তারাগড় পাহাড়ের ওপর তারাগড় দুর্গ। আলোয়াড় শহর একটা প্রশস্ত শঙ্কু আকৃতি পাহাড়ের ওপর অবস্থিত। একে ঘিরে আছে শৈল শ্রেণী। ভারতবর্ষের অনেক শহরে আজও প্রাচীরের নিদর্শন মেলে, যেমন জয়শলমীর শহর পাঁচ কি.মি. পাথরের দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। নদী দিয়ে ক্ষয়িত গভীর বাঁকের কেন্দ্র যেমন ডারহাম (Durham, U.K.) বিসানকন (Besancon, France), নদী গঠিত দ্বীপ যেমন প্যারিস, বার্লিন, নদীর নিরাপদ কিনারা যেমন ফ্রাঙ্কফুর্ট (Frankfurt, Germany), অ্যাবেরিস্টউথ (Aberysturyth, U. K.) প্রতিরক্ষা শহরের ভালো উদাহরণ। অতীতে বসতি হিসেবে কোন স্থানের 'গ্যাপ' বা ফাঁক জায়গা প্রায়ই পছন্দ করা হত, কারণ এর মধ্যে দিয়ে যুদ্ধের সময় সৈন্যরা যাতায়াত করত, যেমন জয়পুর ও দিল্লী। 1727 সালে সোয়াই জয় সিং অম্বর থেকে জয়পুরে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। সুবিধে ছিল এই যে দক্ষিণ ছাড়া এই শহরটির তিন দিক বন্ধুর পাহাড় দিয়ে ঘেরা।

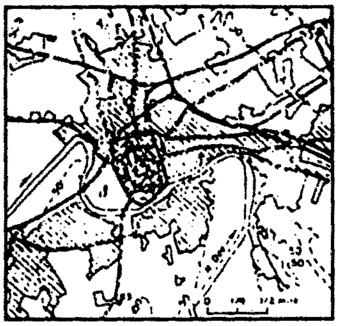

চিত্র - 5.14 চেস্টার শহর

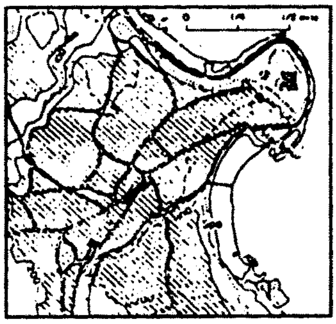

চিত্র - 5.15 স্কারবরো শহর

বর্তমানে এই সব অধিকাংশ ঐতিহাসিক সামরিক গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলোতে প্রতিরক্ষার ব্যাপারটা আর আগের মত গুরুত্বপূর্ণ নয়। এই সব টিকে থাকা দুর্গ শহর বর্তমানে বাণিজ্যের ওপর প্রধানত নির্ভরশীল, যেমন যোধপুর, বিকানীর। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই সব শহর প্রশাসন (দিল্লী), শিল্প ও পর্যটনকে (আগ্রা) কেন্দ্র করে তাদের অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। অনেক শহরের দুর্গ ধ্বংস হয়নি বা ভেঙে ফেলা হয়নি। সেগুলো বর্তমানে সাধারণত স্থানীয় সামরিক বাহিনীর আবাসস্থল বা ঐতিহাসিক যাদুঘর হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এদের আর কোন সামরিক গুরুত্ব নেই। এই সব সামরিক শহরের যেমন প্রাচীন যুগের দুর্গ শহরের সঙ্গে কোন সাদৃশ্য নেই, তেমনি বর্তমান যুগের শিল্প নগর থেকে এরা সম্পূর্ণ আলাদা।

প্রতিরক্ষা শহরে ব্যারাক, ক্যান্টনমেন্ট, সামরিক ব্যক্তিদের শিক্ষার সুবিধে, ছোট বিমানঘাঁটি ও যুদ্ধ জাহাজের জন্য পোতাশ্রয় থাকে। অনেক সামরিক ও প্রতিরক্ষা শহরে অসামরিক ও সামরিক কর্তৃপক্ষের মধ্যে ভূমি ব্যবহারের এক সুস্পষ্ট পার্থক্য আছে। তাই সামরিক ব্যারাক শহর থেকে একটু দূরে অথবা শহরের এক অংশে গড়ে ওঠে। নিরাপত্তা রক্ষা করতে এটা দরকার হয়ে পড়ে, যদিও সামরিক ছাউনিতে অনেক অসামরিক মানুষ কাজ করেন। মিরাট শহর ও তার সেনানিবাস, রুরকী শহর ও তার সেনানিবাস ও অনুরূপ অসংখ্য সামরিক ও প্রতিরক্ষা শহরে অসামরিক ছাউনি ও সামরিক আবাসস্থল পাশাপাশি গড়ে ওঠে।

বর্তমানে সামরিক ঘাঁটিকে কেন্দ্র করে ছোট ছোট শহর গড়ে উঠেছে, কিন্তু এগুলো স্বয়ংসম্পূর্ণ শহর বসতির আকার নেয় নি। এখানে সামরিক ব্যারাক ও সামরিক বাহিনীর পরিবারদের আবাসস্থল, কিছু দোকান, খেলাধুলার মাঠ, সিনেমা ও স্কুল থাকে। 1962 সালে চীন-ভারত যুদ্ধের পর থেকে শিলিগুড়ির কাছে সেভক, বাগডোগরা, ব্যাঙডুবি, শালুগাড়া ইত্যাদি স্থানে ছোট ছোট সামরিক শহর গড়ে উঠেছে। তবে অরুণাচল প্রদেশের বোমডিলা, খড়গপুরের কাছে কলাইকুণ্ডা, জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চ ইত্যাদি সামরিক শহরের গুরুত্ব অনেক বেশি।

অনুরূপভাবে, নৌঘাঁটির এক বিশেষ ধরনের সামরিক গুরুত্ব আছে। যেমন উত্তর আমেরিকার দিয়াগো (San Diego), নরফোক(Norflok), ইউরোপের পোর্টসমাউথ (Portsmouth, U. K.) ডিভোনপোর্ট(Devonport, U. K.), আরব সাগরের এডেন (Aden, Yemen), মালয়ের সিঙ্গাপুর, স্পেনের জিব্রাল্টার। নৌঘাঁটির পাশাপাশি আবার অনেক ক্ষেত্রে বাণিজ্য জাহাজ চলাচল ও বাণিজ্যিকভাবে মাছ ধরার বৃত্তি যোগ হয়েছে, যেমন বিশাখাপত্তনম। সবশেষে এটুকু বলা চলে যে যুদ্ধ বিগ্রহের ঘটনা কমে আসার সঙ্গে সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে সামরিক প্রয়োজনের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা শহরের সংখ্যা কমে আসছে।

৫.৫.২ ধর্মীয় শহর ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র (Religious Town and Cultural Centre) ঃ—

সামরিক গুরুত্বপূর্ণ শহরের মত ধর্মীয় শহরগুলো কোন বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে গড়ে উঠেছে। তবে তাদের যে বিশেষণে বিশেষিত করা হোক না কেন, তা তাদের প্রধান কর্মধারাকে বোঝাবার পক্ষে যথেষ্ট নয়, যেমন জেরুজালেম (Jerusalem, Israel চিত্র 5.16)। এটি একটি প্রাচীন শহর। ইহুদীদের কাছে এই শহরের এক ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে, আবার মুসলমানদের কাছেও এই শহরের ধর্মীয় গুরুত্ব রয়েছে। সামরিক ঘাঁটি বা পবিত্র শহরের চেয়ে বর্তমানে প্রশাসনিক, বাণিজ্যিক ও শিক্ষা এই শহরের প্রধান বৃত্তি হিসেবে গণ্য হচ্ছে। রোমান ক্যাথলিকদের কাছে পবিত্র শহর হল রোম, হিন্দুদের কাছে বেনারস, শিখদের অমৃতসর এবং খুব সাম্প্রতিককালে প্রতিষ্ঠিত মোরমোন ধর্মাবলম্বীদের সল্ট লেক সিটি (Salt Lake City, U.S.A.)। এগুলো প্রত্যেকটি ধর্মীয় কেন্দ্র, কিন্তু তাদের স্থায়ী জনসংখ্যা বর্তমানে ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও ধর্মীয় বিশ্বাস প্রচারের চেয়ে বাণিজ্য ও শিল্পের সঙ্গে বেশি যুক্ত। ইসলাম ধর্মের জন্মস্থান মক্কা সম্পূর্ণ ধর্মীয় শহর হিসেবেই থেকে গেছে। কিছুদিন আগে পর্যন্ত তিব্বতের লাসা (Lhasa) তিব্বতীয় বৌদ্ধদের ধর্মীয় শহর হিসেবে খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

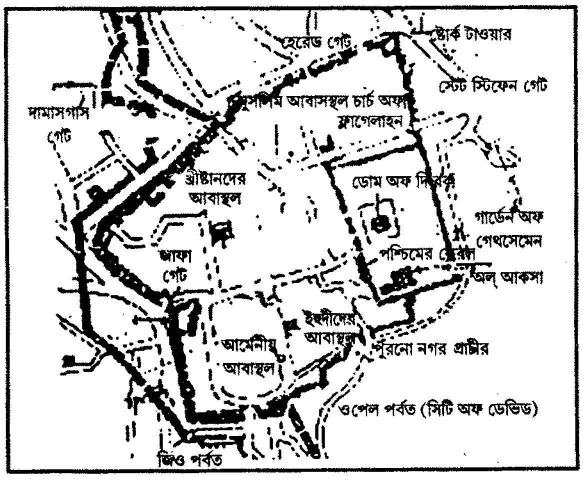

চিত্র - 5.16 জেরুজালেম শহর

অনেক ধর্মীয় কেন্দ্রের সুনাম ঐসব স্থানের প্রথম গির্জা বা সন্ন্যাসীদের সমাধিস্থল স্থাপনের মাধ্যমে ঘটেছে। যেমন ক্যান্টারবারি (Canterbury, U.K.) ও সাইটেক্স (Citeaux)। প্রথম ইংরাজ গির্জার কেন্দ্র ছাড়াও ক্যান্টারবারি তীর্থস্থান হিসেবেও অতিরিক্ত গুরুত্ব লাভ করেছিল। অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন সিংহলের ক্যাণ্ডিতে বুদ্ধদেবের একটি দাঁত সংরক্ষিত আছে। বেথলেহেম (Bethlehem) যীশুখ্রীষ্টের জন্মস্থান হিসেবে চিহ্নিত।

ধর্মীয় শহর, বিশেষ করে যেগুলো মনোরম পরিবেশে স্থাপিত হয়, সেগুলোতে অনেক ধর্মনিরপেক্ষ ভ্রমণবিলাসীরা ভিড় জমান। কিছু কিছু শহরে, বিশেষ করে মক্কা (Mecca, Saudi Arab চিত্র 5.17) লর্ডস (Lourdes, France), বেনারস, রোমে সম্ভবত পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পর্যটক ভিড় করেন। কিন্তু খুব কম গুরুত্বপূর্ণ গির্জা শহর ও ভ্রমণবিলাসীদের দ্বারা কিছু কিছু ক্ষেত্রে উপকৃত হয়। এখানে পর্যটকদের বাসস্থান, ভালো দোকান ইত্যাদির ব্যবস্থা থাকে। এই সব শহরের কিছু কিছু অধিবাসীরা ভক্তির উপকরণ যেমন ধাতু, পাথর বা কাঠের মূর্তি, পবিত্র গ্রন্থ, মোমবাতি, জপমালা বিক্রি করে। অন্যান্যরা পথনির্দেশক (Guide), তথ্য অফিসার বা ধর্মীয় শিক্ষক হিসেবে অর্থ উপার্জন করে।

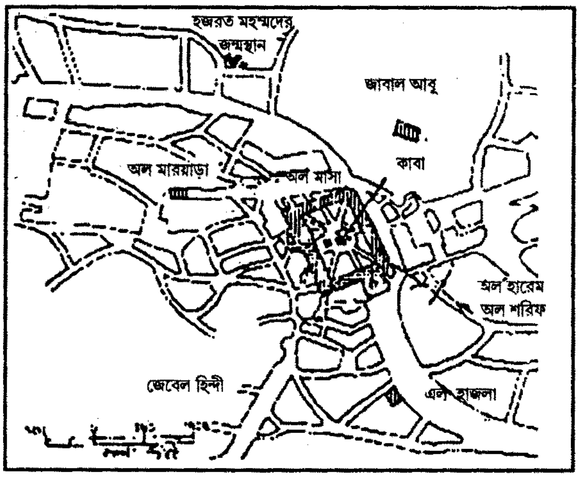

চিত্র - 5.17

৫.৫.৩ প্রশাসনিক শহর (Administrative Towns) ঃ

প্রশাসনিক শহর বলতে কেবল দেশের রাজধানীকে বোঝায় না, প্রদেশ, বিভাগ, জেলা, মহকুমা ও অন্যান্য প্রশাসনিক বিভাগকেও বোঝায়। অনেক দেশে ছোট শহর, এমন কি বড় গ্রামে (গ্রাম পঞ্চায়েত) কিছু কিছু প্রশাসনিক কাজকর্ম আছে, কিন্তু প্রশাসনিক কার্যধারার মূলবিন্দুতে রয়েছে রাজধানী। দেশের মধ্যে সবচেয়ে বড় শহর হওয়ার দরুন এবং রাজ পরিবারের আবাসস্থল হওয়ার সুবাদে লন্ডনে প্রশাসনিক কাজকর্ম কেন্দ্রীভূত হয়েছে। সাম্প্রতিককালে ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক বা সামরিক গুরুত্বপূর্ণ কিছু রাজধানী শহর গড়ে উঠেছে। এই সব নগর যেমন পাকিস্তানের ইসলামাবাদ, কানাডার অটোয়া (Ottowa, Canada) বা অস্ট্রেলিয়ার ক্যানবেরা (Canberra) দেশের প্রধান বন্দর বা শিল্প নগরীর চেয়ে ছোট হতে পারে। এগুলো চিরাচরিত রাজধানী নগরের থেকে আলাদা ধাঁচের। কারণ পরিকল্পনা অনুযায়ী সম্পূর্ণরূপে প্রশাসনিক কাজকর্মের কথা চিন্তা করে এগুলো তৈরি করা হয়েছিল। তাই এখানে নগরের অন্যান্য কার্যকলাপ খুব একটা গুরুত্ব পায় না।

প্রশাসনিক নগর (চণ্ডীগড়, চিত্র 5.18) প্রধানত সর্বসাধারণের (Public) প্রশাসনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এখানে অনেক ইমারত (building), মন্ত্রক ও কার্যালয় থাকে এবং সচরাচর রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর সদর দপ্তরও (যেমন ব্যাঙ্ক, ডাকঘর, রেলপথ) থাকে। এছাড়া, রাজধানী নগরে অন্যান্য প্রতিষ্ঠান, যেমন সমিতি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, দাতব্য প্রতিষ্ঠান ও রাজনৈতিক দলগুলোর প্রধান কার্যালয়ও থাকে। প্রশাসনিক কার্যকলাপ কেন্দ্রীভূত হওয়ার জন্য ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের প্রধান কার্যালয়গুলো রাজধানীতে রাখা সুবিধেজনক মনে করে, আর এইভাবে কার্যালয়ের

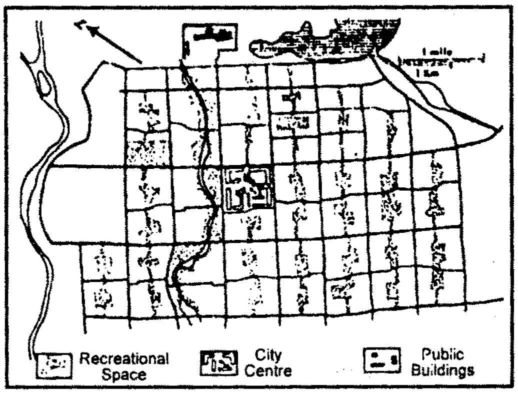

চিত্র - 5.18 প্রশাসনিক শহর চণ্ডীগড়

সংখ্যা বাড়তে থাকে। প্রশাসন ছাড়া এই সব নগরের একটি অন্যতম প্রধান কাজ হল প্রশাসনের সঙ্গে জড়িত কর্মী ও অন্যান্য কার্যালয় কর্মীদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করা। জনসাধারণের বাসগৃহ, পার্ক ও খেলাধুলোর সুবিধে কোন কোন ক্ষেত্রে রাজধানীকে পর্যটন কেন্দ্রেও পরিণত করে। বিশেষত যে সব পুরনো প্রতিষ্ঠিত রাজধানীতে রাজকীয় প্রাসাদ, মন্দির, মসজিদ, চার্চ ও অন্যান্য উল্লেখযোগ্য প্রাসাদ আছে, যেমন কোলকাতা। এখানে শতাধিক বছরের পুরনো যাদুঘর, চিড়িয়াখানা, বিশ্ববিদ্যালয়, বহু স্বনামধন্য, মনীষীদের বাসগৃহ, বহু পুরনো মন্দির, বোটানিক্যাল গার্ডেন ও দুর্গাপূজার সমারোহ পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে এই শহরের আকর্ষণ অনেকগুণ বাড়িয়েছে।

নতুন পরিকল্পিত রাজধানীতে শহরের চারপাশে মনোরম পরিবেশের ওপর জোর দেওয়া হয়। পার্ক ও উদ্যান এই সব রাজধানী শহরের প্রধান বৈশিষ্ট্য। যতদূর সম্ভব শহরকে বৈশিষ্ট্য দান করতে এখানে প্রায়শ নতুন নতুন আকর্ষণীয় অট্টালিকা তৈরি হয়। পুরনো রাজধানী সম্পর্কে এটা সব সময় সত্যি নয়।

কিন্তু পুরনো রাজধানীতে বাণিজ্য ও শিল্প ভালোভাবে দানা বাঁধে। আর এই সব শহরের আলাদা আলাদা এলাকায় প্রশাসন, শিল্প, বাণিজ্য ও প্রশাসনিক কর্মধারা গড়ে ওঠে। কিন্তু নতুন রাজধানীতে যেমন ইসলামাবাদ (Islamabad) ও ক্যানবেরাতে (Canbera) শিল্প-বিকাশকে খুব কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। তাতে শহরের বাহ্যিক চেহারা অনেক থাকে। পুরনো রাজধানীতে নগরের প্রকাণ্ড বাজার ও শ্রমিকের শহরগুলোর সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত। তাদের মধ্যে ছাপাখানা ও খবরের কাগজ প্রকাশনা উল্লেখযোগ্য। পোষাক ও হীরে জহরতের মত কিছু নামীদামী শিল্প অনেক সময় এই ধরনের শহরে দেখা যায়।

পৃথিবীতে বেশ কয়েকটি বড় প্রশাসনিক নগর রয়েছে। এদের মধ্যে কয়েকটি 'মেগা সিটি' যেমন টোকিও (2.7 মিলিয়ন), মেক্সিকো (16.6 মিলিয়ন), বুয়েনস্ এয়ারস্ (11.8 মিলিয়ন), সিওল (11.6 মিলিয়ন), বেজিং (11.3 মিলিয়ন), নিউ দিল্লী (10.2 মিলিয়ন), কায়রো (9.7 মিলিয়ন), জার্কাতা (8.6 মিলিয়ন), প্যারিস (8.5 মিলিয়ন) এবং লন্ডন (7.4 মিলিয়ন) রয়েছে।

এই বিশ্বে কয়েকটি প্রাদেশিক রাজধানীও আছে যাদের জনসংখ্যা কয়েক মিলিয়ন। ভারতবর্ষে মুম্বাই, চেন্নাই, হায়দ্রাবাদ, লক্ষ্ণৌ, জয়পুর এমন কয়েকটি প্রশাসনিক শহরের উদাহরণ। এছাড়া, অসংখ্য ছোট প্রশাসনিক শহর রয়েছে, যেমন মালদ্বীপের রাজধানী মেল (Male 10,000), ফকল্যান্ডের রাজধানী স্ট্যানলী (মাত্র 1,000 জনসংখ্যা)। ভারতবর্ষের কোহিমা (60,650) এবং ইটানগরের (20,500) মত প্রশাসনিক শহরের (প্রদেশ রাজধানী) জনসংখ্যা এক লক্ষের কম।

৫.৫.৪ সংগ্রাহক শহর (Collection Centre) ঃ

এই শ্রেণীর মধ্যে রয়েছে খনিজ শহর, মাছ ধরার বন্দর শহর ও কাষ্ঠ-শিল্পভিত্তিক শহর। এই সব শহরে কাঁচামাল সংগ্রহ করা হয় এবং ঐ কাঁচামাল কিছুটা পরিমাণে শোধন করে (Refine) বিদেশে রপ্তানী করা হয়। খনিজ শহর (Mining Town) যেমন সোনা, রূপোর মত মূল্যবান ধাতুকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠে, তেমনি শিল্পে ব্যবহৃত ধাতু যেমন লোহা, তামা, টিন, বক্সাইট বা দস্তার মত ধাতু বা নুন, পটাস, সালফার, চায়না ক্লে-র মত খনিজ পদার্থ বা কয়লা, তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের মত জ্বালানী পদার্থকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। এই সব শহর খনিবাসীদের বিভিন্ন পরিষেবায় নিয়োজিত থাকে। খনি শহর আয়তনে ছোট হতে পারে (যেমন কানাডার কিছু কিছু ছোট শহর), আবার বড়ও হতে পারে, যেমন মালয়েশিয়ার টিন সমৃদ্ধ কিন্টা (Kinta) উপত্যকার আপোহ (Ipoh) বা দক্ষিণ আফ্রিকায় সোনার খনিগুলোর মাঝে অবস্থিত জোহান্সবার্গ (Johansburg)। এই রকম শহরে কিছু শিল্প থাকে যেগুলো খনি থেকে উত্তোলিত খনিজ পদার্থের সঙ্গে সম্পর্কিত, যেমন ধাতু গলানো, পরিশোধন ইত্যাদি। আবার

খনিতে ব্যবহারোপযোগী যন্ত্রপাতি তৈরি বা খনি শ্রমিকদের বিশেষ পোষাকও এই সব শহরে তৈরি হতে পারে। কিন্তু খুব বড় বড় খনি কেন্দ্রে যেখানে জনবৃদ্ধি অন্য শিল্পগুলোকে আকর্ষণ করে তাদের মুখ্য কাজ হল খনিজদ্রব্য উত্তোলন ও তা সড়কপথ, রেলপথ, সমুদ্রপথ বা পাইপলাইনে রপ্তানি করা।

ভূগর্ভে (Underground) খনির কাজের দরুন খনি শহর সৃষ্টি হতে পারে, যেমন রানীগঞ্জ। কিছু কিছু ক্ষেত্রে যেখানে শহরের নীচু এলাকায় পর্যাপ্ত খনিজ পদার্থ ছড়ানো রয়েছে সেখানে মাটি সরিয়ে খনির কাজের জন্য বাড়িঘরদোর ভেঙে ফেলতে হয়, যেমন কানাডার থেটফোর্ড (Thetford) খনি (অ্যাসবেস্টস), অস্ট্রেলিয়ার ইয়ালোআর্ন (Yallourn)-এর কয়লা।

মাছ ধরার বন্দর (Fishing Port) ও এক ধরনের সংগ্রহ শহর। এই বন্দরগুলোতে স্টীমার ঘাঁটি থাকে। এই সব স্টীমার প্রতিদিন সমুদ্রে যায় বা ঐসব বন্দরে বড় বড় জাহাজও ভিড়তে পারে, যেগুলো দিন কয়েক বা সপ্তাহ খানেকের জন্য সমুদ্রে যায়। এই সব বন্দরের কতকগুলো সাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে। এখানে অবতরণ (Landing) ক্ষেত্র, গুদাম (Storing), পরিষ্কার করা, শুকনো করা (Drying), মোড়ক বাঁধাই (Packing), মাছ পাঠানো এবং মাছ সংরক্ষণ করার জাহাজ, সার কারখানা, খাবার তৈরির কারখানা বা কিছু কিছু ক্ষেত্রে বরফ জমানোর কারখানা আছে। বহু মৎস্য বন্দরে মাছ ধরার সঙ্গে সম্পর্কিত অনেক কাজ থাকে, যেমন নৌকা তৈরি, জাল তৈরি বা মেরামত, কাঠের পিপে তৈরি। এছাড়া মাছ ধরার সাজসরঞ্জামের কারখানা গড়ে ওঠে (Leong and Morgan, 1982)।

কাষ্ঠ কর্তন শহর (Lumbering Town) : এই সব শহর কাঠের গুঁড়ি সংগ্রহ কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে। এখান থেকে কাঠের গুঁড়ি বা তক্তা রেল বা লরী করে বা নদীতে ভাসিয়ে বড় বড় শহরে নিয়ে যাওয়া হয়। এই সব কেন্দ্রের কাজ হল কাঠ সংগ্রহ ও আংশিকভাবে তাকে ব্যবহার উপযোগী করে তোলা। এখানে অনেক বড় বড় কাঠচেরাই কল থাকে। কোন কোন স্থানে মণ্ড ও কাগজ তৈরির কারখানা থাকতে পারে। এই ধরনের শহর যদি উপকূলের ধারে গড়ে ওঠে তা হলে তাদের জাহাজঘাটাও থাকে। আর কাঠ বাইরে পাঠানোর জন্য বোঝাই করার সুবিধেও থাকবে, তা সে গুঁড়ি কাঠ হোক বা চেরাই কাঠ হোক। উদাহরণ হিসেবে বলা চলে মালয়েশিয়ার টাবাউ (Tawau) ও সান্ডাকান (Sandakan) শহর দুটো থেকে অধিকাংশ কাঠ জাপান ও অন্যান্য দেশে পাঠানো হয়। কানাডার নিউ ফাউন্ডল্যান্ডের গ্রান্ড ফলস্ (Grand Falls) ও কর্ণার ব্রুক (Corner Brook) হল কাঠকেন্দ্রিক শহর। এখানে মণ্ড ও কাগজ তৈরির কারখানা আছে। কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র, স্ক্যান্ডিনেভিয়া, বিশেষত ফিনল্যান্ড ও রাশিয়ার উত্তর দিকে যেখানে প্রচুর সরলবর্গীয় গাছ জন্মায়, সেখানে চেরাই শহর গড়ে উঠেছে। অরণ্য সম্পদে সমৃদ্ধ ক্রান্তীয় অঞ্চলের দেশ যেমন মালয়েশিয়া, ফিলিপাইন, মায়ানমার ও থাইল্যান্ডে কাঠকে কেন্দ্র করে অনেক শহর গড়ে উঠেছে। যদিও কাগজ তৈরির পক্ষে ক্রান্তীয় অঞ্চলের কাঠ অনুকূল নয়, তবুও এদের মধ্যে থেকে কিছু দামী কাঠ পাওয়া যায়, যেমন সেগুন।

আজকের দিনে অনেক কাঠ-চেরাই শহরে শুধুমাত্র কাঠ সংগ্রহ করা হয় না। গাছ পুনঃরোপণ ব্যাপারটিও এই সব শহরের কর্মধারার সাথে যুক্ত হয়েছে। কারণ বর্তমানে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করতে বনসংরক্ষণ ব্যাপারটা আরো গুরুত্ব পাচ্ছে। এই ধরনের শহরগুলোতে নার্সারী ও গবেষণা কেন্দ্র দেখা যায়।

৫.৫.৫ উৎপাদন কেন্দ্র (Production Centre) ঃ

এগুলো হল সেই সব শহর যেখানকার প্রধান কর্মধারা যন্ত্রশিল্পের সঙ্গে জড়িত। শিল্পের ধরন থেকে সেই শহরের বাহ্যিক চেহারার কিছুটা আঁচ পাওয়া যায়। যেমন লোহা ও ইস্পাত শহরের আকাশ ধোঁয়ায় ঢাকা থাকে,

তাই শহরও থাকে কালো। কিন্তু বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি তৈরি হয়, এমন শহর সুন্দর, পরিষ্কার থাকে। অনেক শিল্প শহর এখনও কয়লা খনিতে অবস্থিত। যদিও আজ শক্তির উৎস হিসেবে কয়লার ব্যবহার কমেছে তবুও বহুদিন ধরে কয়লা ব্যবহারের ফলে অনেক বাড়ি কয়লার ধোঁয়ায় কালো হয়ে গেছে। উত্তর ইংল্যান্ডের হ্যালিফক্স (Halifox) শহরের আকাশসীমা (Skyline) বলতে কারখানার চুল্লীর সারিকে বোঝায়। এই রকম পুরনো শিল্প শহরে পরস্পরের বিপরীত দিকে মুখ করা (Back to Back) ছোট ছোট আবাসস্থলগুলো কারখানার মালিকরা তাদের শ্রমিকদের জন্য বানিয়েছিল। বর্তমানে এই সব বাড়িগুলোর হাল খুব করুণ। অধিকাংশ পুরনো শিল্প শহরের চেহারাটা এই রকম। উত্তর ইংল্যান্ড, উত্তর ফ্রান্স, দক্ষিণ বেলজিয়াম ও পূর্ব উত্তর আমেরিকায় এই ধরনের অনেক শহর দেখতে পাওয়া যায়। শিল্প বিপ্লবের যুগে এই ধরনের শহরগুলো তাড়াতাড়ি বেড়ে উঠেছিল। কারণ জনস্রোত শহরে আছড়িয়ে পড়েছিল, আর তাদের বাসস্থানের প্রয়োজন মেটাতে সস্তায় তাড়াতাড়ি বাড়ি তৈরি করা হয়েছিল। এই সব অধিকাংশ ছোট ছোট বাড়ি আজকের দিনে অস্বাস্থ্যকর বলে বিবেচিত হয়। যে সব শহরে হালে শিল্পোন্নয়ন হয়েছে তারা শক্তির উৎস হিসেবে তেল, গ্যাস বা বিদ্যুৎ ব্যবহার করছে। ফলে শহর ও তার শিল্প তালুকগুলো (Industrial estate) পরিচ্ছন্ন থাকে। এখানে ভিড়ও কম থাকে। এশিয়া মহাদেশের অনেক শহর ও নগরে যেখানে শিল্পোন্নয়নে উৎসাহ দেওয়া হয়, সেখানে শ্রমিকদের থাকার জন্য কম খরচে ছোট বাড়ি তৈরি করা হচ্ছে।

সংগ্রহ কেন্দ্রের মত শিল্প শহরেও কাঁচামাল ও উৎপাদিত দ্রব্যের আনা নেওয়ার জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থার একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। আজকের দিনে কিছু কিছু শিল্প আছে যেগুলো প্রতিষ্ঠিত কোন নগর অপেক্ষা যোগাযোগ পথের ওপর গড়ে ওঠে। উদাহরণ হিসেবে বলা চলে জাপানের অন্যান্য অংশের চেয়ে টোকিও-ওসাকার মধ্যেকার পথের ধারে শিল্পোন্নয়ন বেশি হয়েছে।

শিল্প প্রতিষ্ঠান শহরে এক নির্দিষ্ট অংশে দানা বাঁধতে পারে। এটা বিশেষ করে ঘটে থাকে নতুন শিল্প তালুকের ক্ষেত্রে। অনুরূপভাবে একটা শহরে এক রকমের শিল্প থাকতে পারে। যেমন ইংল্যান্ডের বার্মিংহাম (Birmingham) বা 'কোডাক সিটি' (Kodak City) নামে পরিচিত যুক্তরাষ্ট্রের রচেস্টার (Rochester) শহর যা প্রায় সম্পূর্ণরূপে একটি শিল্পের ওপর নির্ভরশীল। শিল্প শহরগুলো প্রায়শই কোন না কোন দ্রব্য উৎপাদনে দক্ষতা লাভ করে। এই সব শহরে কয়েকটি কারখানা থাকে, যারা একই প্রকার জিনিসপত্র তৈরি করে। কোন শহর কিছু বিশেষ শিল্পের জন্য খ্যাতিলাভ করে, যেমন ইংল্যান্ডের হ্যালিফক্স, ব্যার্ডফোর্ড (Bradford) ও হাডারস্ফিল্ড (Huddersfield) পশম শিল্পের জন্যে, যুক্তরাষ্ট্রের ডেট্রয়েট (Detroit), টোলডো (Toledo) ও কানাডার উইন্ডসর (Windsor) মোটর গাড়ির জন্য। এর পেছনে কিছু কারণ কাজ করে। শিল্পের উপযোগী কাঁচামাল ঐ এলাকায় পাওয়া যেতে পারে বা একবার পাওয়ার ওপর ভিত্তি করে শহরে এক ঐতিহ্যপূর্ণ শিল্পের জন্ম হয়। আবার দেখা যায় এক শহরের শিল্প নৈপুণ্য আশেপাশের শহরে ঐ শিল্পের আনুষঙ্গিক উপকরণ তৈরিতে পথ দেখাতে পারে। মূলত এটা ল্যাঙ্কাশায়ারের ক্ষেত্রে ঘটেছিল। সেখানে তুলো থেকে সুতো কাটা (Spinning) হত কয়েকটা শহরে, আবার কাপড় বোনা হত অন্য শহরে আর শেষ পর্যায়ে কাপড় তৈরি হত। বর্তমান দিনে অনেক বড় কোম্পানী এটা লক্ষ্য করেছে যে একই ছাদের নীচে কোন দ্রব্য প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তৈরি হলে অনেক খরচ বাঁচে।

৫.৫.৬ স্থানান্তরকরণ ও বিতরণ কেন্দ্র (Transfer & Distribution Centre) ঃ

অধিকাংশ শহরে জনসংখ্যার একটা বড় অংশ ব্যবসা বাণিজ্য করে। এছাড়া আরও অনেক বৃত্তি শহরে থাকে। যে সব শহর মালপত্র স্থানান্তরন ও বণ্টনের সঙ্গে যুক্ত তাদের প্রধান বৃত্তি হল বাণিজ্য। এই শ্রেণীতে কয়েক ধরনের শহরের অস্তিত্ব চোখে পড়ে।

(ক) বাজার শহর (Market Town) : কেবলমাত্র খোলা বা ঢাকা বাজারই (Open or closed market) এই শহরগুলোর বৈশিষ্ট্য নয়। এর সঙ্গে এখানে ব্যাপক সারি সারি দোকান ও গোলা (Stores) থাকে। অনেক সময় গুদামঘর ও পাইকারী কেনাবেচার এলাকা এখানে দেখা যায়। যে সব শহরের অন্যান্য বৃত্তি থাকে তাদের তুলনায় বাজার শহরের বাণিজ্যিক এলাকা অপেক্ষাকৃত বড় থাকে। এছাড়া বাজার শহরে সচরাচর কিছু ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানী ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান থাকে।

যে সব শহর চা, কফি, রবার, পশম ও ধাতুর মত খুব প্রয়োজনীয় পণ্যদ্রব্য নিয়ে ব্যবসা করে তাদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক সারা পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে থাকে। এসব শহরে বহুবিধ আর্থিক প্রতিষ্ঠান, ব্যাঙ্ক, অফিস ও কখনো কখনো শেয়ার বাজার থাকে।

যেহেতু বাজার শহরের প্রধান আর্থিক ভিত হল বাণিজ্য, তাই যোগাযোগের সুযোগ সুবিধে এই সব শহরে মস্ত বড় ভূমিকা নেয়, যাতে এই সব দ্রব্য শহরে পৌঁছোতে পারে। ইংল্যান্ডের নরউইচ (Norwich) বা ঘানার কুমাসী (Kumasi)-র মতন শহর থেকে চারদিকে রাস্তা ও রেলপথ বেরিয়েছে।

(খ) বন্দর (Port) ঃ ব্যবসা বাণিজ্য ও মালপত্র বিতরণের দিক দিয়ে বন্দরের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে, আর এই সব সুযোগকে কাজে লাগিয়ে টোকিও, নিউইয়র্ক, লন্ডন, কোলকাতা, সাংহাই, সিঙ্গাপুর, হংকং, বুয়েনস্ এয়ার্স ও সিডনীর (Sydney) মত সমুদ্র বন্দরগুলো পৃথিবীর কয়েকটি বৃহত্তম নগরীতে পরিণত হয়েছে। হ্রদ ও নদীপথেও অনেক গুরুত্বপূর্ণ বন্দর আছে, যেমন চ্যাং জিয়াং (Chang Jiang বা Yangtze) নদীর ওপর হানকু (Hunkou), মিসিসিপির ওপর সেন্ট লুইস্ (St. Louis), ইরি হ্রদের ওপর ক্লীভল্যান্ড (Cleveland চিত্র 1.6.8)। বাণিজ্যের সুবিধে ও প্রয়োজনীয় পণ্যদ্রব্য আদান প্রদান করে বলে বন্দরগুলো হল প্রধান আর্থিক ও শিল্পকেন্দ্র। বন্দর শহরে মালপত্র বণ্টনের জন্য ডক, পোতাশ্রয়, গুদামঘর, রাস্তা, রেলপথ ইত্যাদি সুবিধে ছাড়াও দোকান, অফিস ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসহ বড় বাণিজ্যিক এলাকা থাকে। বন্দরের এলাকাকে ঘিরে সাধারণত আবাসস্থল ও শিল্পকেন্দ্র গড়ে ওঠে।

সমস্ত বন্দরের কাজের ধরন একই প্রকার নয়। কয়েকটি নির্দিষ্ট ধরনের বন্দর চিনে নিতে খুব একটা অসুবিধে হয় না। সেগুলো হল—

1. সাধারণ বন্দর (General Ports) ঃ নানা রকমের মালপত্র এই সব বন্দর দিয়ে ওঠানামা করে। তা ছাড়া যাত্রী চলাচলের সুবিধে বা মাছ ধরার কাজ এই সব বন্দরের মাধ্যমে হতে পারে। এই ধরনের বন্দর খুব ছোট হতে পারে, যেমন মালয়েশিয়ার কাচিং (Kuching) বা মালাক্কা (Malacca) বা অ্যাঙ্গোলার লোবিটো (Lobito)। আবার হামবার্গ (Hamburg) বা যুক্তরাষ্ট্রের মার্সেলিস (Marseilles)-এর মত প্রধান বন্দর হতে পারে।

2. যাত্রী বন্দর (Passenger Ports) ঃ এই সব বন্দরে কিছু সাধারণ মানের দ্রব্যসামগ্রী আমদানী রপ্তানী করা হয়। তবে যাত্রী পরিবহন ব্যাপারটা প্রধান হয়ে দাঁড়ায়। এদের জাহাজঘাটার (Dock) সুবিধে থাকে ও বড় বড় যাত্রীবাহী জাহাজ চলাচলের জন্য জলের গভীরতা বেশি থাকে। দেশের বড় বড় শহরগুলোর সঙ্গে এসব বন্দরের রেলপথ বা সড়কপথে দ্রুত যোগাযোগের জন্য ভাল ব্যবস্থা থাকে। যাত্রীবাহী বন্দর হিসেবে উত্তর আটলান্টিকে অবস্থিত সাউথ্যাম্পটন (Southampton, U.K.) ও চেরাবার্গ (Cherbaurg) এবং আন্দামানের পোর্ট ব্লেয়ারের নাম করা যেতে পারে। যে সব বন্দর ছুটির দিন (Holiday) উপভোগ করার মত পথে গড়ে ওঠে তাদের আবার ভ্রমণবিলাসীদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা থাকে। যেমন বারমুডার হ্যামিল্টন, জামাইকার কিংসটন ও মাডিরার (Medeira) ফ্যানিচল্।

3. প্যাকেট স্টেশন (Packet Station) ঃ প্রকৃতপক্ষে এগুলো ক্ষুদ্র প্রণালী বা অপ্রশস্ত সমুদ্রের দু'পাড়ে গড়ে ওঠা খেয়াঘাটা। ইংলিশ চ্যানেল, বাল্টিক সাগর ও উত্তর সাগরের ওপর এ রকম অনেক প্যাকেট স্টেশন দেখা যায়। অন্যান্য যাত্রী বন্দরের মত তাদেরও বড় বড় শহরের সড়ক ও রেলপথে ভালো যোগাযোগ থাকে। এদের মধ্যে ইংল্যাণ্ডের ডোভার (Dover), নিউ হ্যাভেন (New Haven), হারউইচ (Harwich), ফ্রান্সের কালাইস্ (Calais) ও ডিপী (Deippe), ডেনমার্কের এসবার্গ (Esbjerg), ও ডেনমার্কের হেলসিনগর (Helsingor)-এর নাম করতে হয়।

4. আউটপোর্টস (Outports) ঃ এদের প্রধান কাজ হল যে সব বড় বড় জাহাজ প্রধান বন্দরে প্রবেশ করতে পারেনা, তা সে পলি পড়ার (Siltation) জন্যে হোক বা অন্য কোন কারণেই হোক, তাদের সাহায্যকারী বন্দর হিসেবে মালপত্র আনা নেওয়া করা। এইভাবে দেখা যায় কাক্সহ্যাভেন (Cuxhaven) হামবার্গ (Hamburg)-র জার্মানীর এ্যাভনমাউথ (Avonmouth), ব্রিস্টল (Bristol, U.K.)-র আর হলদিয়া, কোলকাতা বন্দরের প্রয়োজন মেটায়। অধিকাংশ মালপত্র ভারী হওয়ার দরুন পণ্যাগার ও গুদামঘর তৈরি করতে হয়। কোন কোন ভারি পণ্যদ্রব্যকে সেখানেই শিল্পের ব্যবহারোপযোগী করে তোলা হয়, ফলে সেখানে শিল্প বিকাশ হয়। কিন্তু যেহেতু তারা প্রধান বন্দরের সাহায্যকারী বন্দর, তাই প্রধান বন্দরের চেয়ে তাদের বাণিজ্যিক ও আর্থিক উন্নতি কম (Leong and Morgan)।

5. এন্ট্রিপট (Entrepot) ঃ এদের কাজ হল এক দেশ থেকে মালপত্র আমদানী করে তা নিজের দেশের পশ্চাদভূমিতে বণ্টন না করে অন্য দেশে পুনরায় রপ্তানী করা। পৃথিবীর কয়েকটি বড় বড় বন্দর, এমন কি রটারডাম (Rotterdam, Netherland) ও সিঙ্গাপুরের মত বন্দরে বড় পণ্যাগারের সুবিধে ছাড়াও ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানী, বাণিজ্যিক কোম্পানী ইত্যাদি আর্থিক প্রতিষ্ঠান এখানে গড়ে ওঠে। এন্ট্রিপট যা চারদিক থেকে ঘেরা দেশের (Land-locked Country) বাণিজ্যিক প্রয়োজন মেটায় (যেমন রটারডাম) তা ঐ দেশের প্রধান স্থানান্তরকরণ কেন্দ্র হতে পারে। এক্ষেত্রে জাহাজের মালপত্র মহাসাগর থেকে নদী, খালপথ, ভাসমান বজরায় বা অন্য ছোট ছোট নৌকায় নিয়ে যাওয়া হয়, যেমন রটারডাম (Rotterdam)। এন্ট্রিপট প্রধান শিল্প কেন্দ্র হতে পারে। এক্ষেত্রে এক দেশ থেকে আমদানী করা মালপত্র অন্য দেশে রপ্তানী হবার আগে তাকে শিল্পের উপযোগী করে তোলা (Process) হয়, যেমন সিঙ্গাপুর ও রটারডাম উভয়েই অশোধিত পেট্রোলিয়াম আমদানী করে ও পরে পরিশোধিত পেট্রোলিয়াম দ্রব্য রপ্তানী করে। কোন বন্দরে যদি প্রচুর জাহাজের নোঙরের ব্যবস্থা থাকে, তবে সেখানে জাহাজ তৈরি, মেরামত, সামুদ্রিক পূর্তবিদ্যা (Engineering), জাহাজে জ্বালানী সরবরাহ, জল দেওয়া ও জাহাজ রাখার ব্যবস্থা রাখতে হয়।

সামুদ্রিক জোয়ার-ভিত্তিক শিল্প শহর (Tidal Water Industrial Towns) ঃ কিছু বন্দর সম্পূর্ণভাবে নির্দিষ্ট মালপত্র আমদানীর ওপর নির্ভরশীল, যেমন অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম, লোহা বা অন্যান্য ধাতব আকরিক। ঐ সব দ্রব্য সেই স্থানেই শিল্প ব্যবহারোপযোগী করে তোলা হয়। সাধারণত শিল্পভিত্তিক কাজের চেয়ে বন্দরের কাজকর্ম সব শহরে কম গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে তেল বা আকরিক কোন নির্দিষ্ট বন্দরে খালাস করা হয় না। জেটিতেই তেল শোধন করা হয়। যেমন সাউথ্যাম্পটন (Southhampton)-এর ফাউলি (Fowley, U.K.) জেটি বা কানাডার এ্যালুমিনিয়াম গলাবার কেন্দ্র কিটিমাট (Kitimat)। এই সব শহরকে যথার্থ বন্দর হিসেবে গণ্য করা যায় না।

৫.৫.৭ আর্থিক কেন্দ্র (Financial Centre) ঃ

কিছু শহরের প্রধান কাজ হল মূলধন যোগান। ব্যবসা বাণিজ্য বা মালপত্র বণ্টন এখানে কম গুরুত্ব পেয়ে থাকে। জার্মানীর ফ্রাঙ্ক ফুর্ট (Frankfurt), সুইজারল্যান্ডের জুরিখ (Zurich), নেদারল্যান্ডের আমস্টারডাম (Am-

sterdam), লেবাননের বেইরুট (Beirut), এই ধরনের শহর। অনেক নগরের কোন বিশেষ এলাকা সেই নগরের, এমন কি সারা দেশের, অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে, যেমন নিউ ইয়র্কের ওয়াল স্ট্রিট (Wall Street), মুম্বাই-এর দালাল স্ট্রিট (Dalal Street), কোলকাতা ইণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস (India Exchange Place)। এই সব শহর ও নগরে শেয়ার বাজার, নিলাম ঘর ও অসংখ্য অফিস, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, ব্যাঙ্ক ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান আছে।

৫.৫.৮ অবসরকালীন শহর (Resort Town) ঃ

এগুলো হল সেই সব শহর যা পার্শ্ববর্তী এলাকা বা দেশের লোকদের আমোদ-প্রমোদের প্রয়োজন মেটায়। উষ্ণ প্রস্রবণ, স্বাস্থ্যকর জল (Health giving water), সমুদ্রতীরে আমোদ-প্রমোদ, পর্বতারোহণ বা স্কী করা বা সংস্কৃতিমণ্ডিত প্রাচীন অট্টালিকা, চিত্তবিনোদন, খেলাধুলোর সুবিধে বা আকর্ষণীয় প্রাকৃতিক দৃশ্যকে কেন্দ্র করে এই সব শহর গড়ে ওঠে। বলতে গেলে এগুলো হল অবসরকালীন শহরের অর্থনৈতিক ভিত। তাই এদের কাছাকাছি স্থানে শহরগুলো গড়ে ওঠে।

যে সব শহর ভ্রমণবিলাসীদের প্রয়োজন মেটাতে গড়ে ওঠে তাদের কতকগুলো সাধারণ বৈশিষ্ট্য থাকে, যেমন পর্যটকদের থাকার জন্য বহু সংখ্যক হোটেল, খেলাধুলোর জন্য পোলো মাঠ, সুইমিং পুল, স্কী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, আমোদ-প্রমোদের জন্য থিয়েটার, সিনেমা, নাইট ক্লাব, নয়নাভিরাম পার্ক (যেমন মহীশূরের বৃন্দাবন গার্ডেন), শিশুদের খেলার মাঠ, কেনাকাটার জন্য জিনিস, বিশেষ ধরনের সাজসরঞ্জাম, স্কী করা বা পাহাড়ে ওঠার জন্য বিশেষ পোষাক।

অবসরকালীন শহরগুলোর আর একটা বৈশিষ্ট্য থাকে, তা হল পর্যটকদের থাকার জন্য একটা অংশ আর একদিকে স্থায়ী বাসিন্দাদের বসবাসের জায়গা। ব্যাপারটা আরও পরিষ্কারভাবে লক্ষ্য করা যায় যখন আমরা দেখি শহরের অনেক বাড়ি ও দোকান কেবলমাত্র বছরের একটা সময়েই ব্যবহার হয় ও অন্য সময়ে বন্ধ থাকে। যেমন গ্রীষ্মকালে ইউরোপের অবসরকালীন শহরগুলোতে অনেক দোকান ও বাড়ি খোলা থাকে, কিন্তু অন্য সময়ে সেগুলো বন্ধ রাখা হয়। অনুরূপভাবে, বিহারের শিমুলতলা, দেওঘর প্রভৃতি শহরে প্রবাসীদের বাড়ি আছে যা পুজোর ছুটিতে মুখরিত হয়ে ওঠে। আবার পাহাড়ি শহর দার্জিলিং, শিলং বা সিমলায় গ্রীষ্মকালে বা শরৎকালে বহু পর্যটকদের ভিড় হয়, কিন্তু শীতকালে নয়।

অবসরকালীন শহর অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে ইউরোপে বিশেষ স্থান পাচ্ছে। পৃথিবীর অন্যান্য অংশ অপেক্ষা সেখানে এই সব শহর অনেক বেড়েছে। অনেক অনুন্নত দেশও এ ব্যাপারে পিছিয়ে নেই। তাই অল্প সময়ের মধ্যে অবসরকালীন শহরের সংখ্যা পৃথিবীতে বেশ বেড়েছে। বিভিন্ন ধরনের সুবিধে ও পর্যটক আকর্ষণ করার ক্ষমতা ভবিষ্যতে হেরফের হতে পারে। তবে বর্তমানে বন্য প্রাণী চাক্ষুষ করার লোভ অন্য সব কিছুকে ছাড়িয়ে গেছে। পূর্ব আফ্রিকা ও এশিয়ার অনেক বন্যপ্রাণী কেন্দ্র এই মূলধনকে কাজে লাগিয়ে জাতীয় পার্ক তথ্য পর্যটন কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে, যদিও উক্ত মহাদেশদ্বয়ে এই ধরনের অনেক পর্যটন কেন্দ্রে আশানুরূপ উন্নতি হয়নি।

অবসরকালীন শহরগুলোর আবার একটা সহায়ক কাজ হলো অবসরপ্রাপ্ত বয়স্কদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করা। ব্রিটেনে সমুদ্র তীরে গড়ে ওঠা কিছু অবসরকালীন শহরের অনেক বাসিন্দাদের বয়স প্রায় 60 বছরের ওপর, যেমন দক্ষিণ পূর্ব উপকূলে গড়ে ওঠা ইস্টবোর্ন (Eastbourne) ও বেক্সহিল (Bexhill)।

দেরাদুনকে বলা হয় অবসরপ্রাপ্ত আধিকারিকদের (Retired Officer) শহর। শ্রীনগর, গুলবার্গ, পহেলগাঁও, শোনমার্গ (কাশ্মীর), সিমলা, ডালহৌসি, কুলু, মানালী (হিমাচল প্রদেশ), মুসৌরী, নৈনিতাল, রাণীখেত (উত্তরাঞ্চল,

পূর্বতন উত্তর প্রদেশ), মাউন্ট আবু (রাজস্থান), দার্জিলিং (পশ্চিমবঙ্গ) এরকম কিছু শহরের উদাহরণ। মরিজ (Moriz), সুইজারল্যান্ড, স্গুল (উগান্ডা), ওয়াজির (কেনিয়া), সোনাসিয়া (ওয়েলস্), আবারডিন ও ডান্ডি (স্কটল্যান্ড), সমরখন্ড, বুখারা ও খিভা (উজবেকিস্তান) বিশ্বের এরকম কয়েকটা শহর।

বসত শহর (Residential Town) ঃ কোন কোন শহরের প্রধান কাজ হল তার বাসিন্দাদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করা। এই শহরের বেশির ভাগ জায়গা জুড়ে থাকে বাসস্থান ও বাগান। সে তুলনায় বাণিজ্যিক এলাকা এখানে কম থাকে। শহরতলি ও বড় বড় নগরের সীমানায় গড়ে ওঠা ছোট ছোট শহর এই তালিকায় পড়ে, যেমন লন্ডনের দক্ষিণে গড়ে ওঠা ক্রয়ডন (Croydon) বা রিচমন্ড(Richmond)। আংশিকভাবে হলেও এই সব নতুন শহরগুলো বসত শহর-ই, যেহেতু এগুলো বড় বড় নগরের অতিরিক্ত জনসংখ্যার বাসস্থানের সুযোগ করে দিতে সৃষ্টি হয়েছিল যেমন ব্রিটেনের হার্লো (Harlow) বা কাম্বারল্যান্ড (Kumberland) বা কোলকাতার লাগোয়া সল্ট লেক সিটি। আর একটা ব্যাপার হল যে সব শহরের একটা বড় অংশে কেবল বাড়িঘরই গড়ে ওঠে না, রেল ও সড়ক পথে প্রধান নগরের সাথে যোগাযোগের ব্যবস্থা থাকে, যাতে প্রতিদিন যাত্রীরা নগরে যাতায়াত করতে পারে।

৫.৫.৯ উপনগরী এবং ডরমিটরি শহর (Satellite and Dormitory Towns) ঃ

পৌর অঞ্চলে শহরতলি হল এমন একটি জায়গা যেখানে স্থানগত সুযোগ-সুবিধের ভিত্তিতে বসতি এলাকা, শিল্প এলাকা এবং শিক্ষা কেন্দ্র বিকাশ লাভ করে। এদের 'উপনগরী বা ডরমিটরি শহর" বলে। এই রকম উপনগরী বা শহরের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে এখানকার পরিবেশ পরিষ্কার থাকে এবং বসতি এলাকা ও শিল্প এলাকা বিস্তারের জন্য প্রচুর জমি পাওয়া যায়। অনেক সময় উপনগরীতে বিভিন্ন রকমের কেন্দ্র গড়ে ওঠে, যেমন শ্রমিক বসতি, মুরগীপালন কেন্দ্র, দুগ্ধ উৎপাদন কেন্দ্র, চারা উৎপাদন এবং শস্য সরবরাহ কেন্দ্র প্রভৃতি। এই সব কেন্দ্রগুলোর সঙ্গে গ্রামীণ এলাকার যোগাযোগ থাকলেও কেন্দ্রগুলো শহরের কাছাকাছি অবস্থান করে (চিত্র 5.19)।

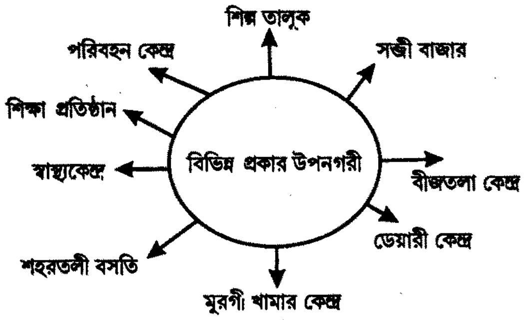

চিত্র - 5.19 বিভিন্ন প্রকার উপনগরী

ডরমিটরি শহর বিভিন্ন রকমের হতে পারে, যেমন পর্যটক স্থান, আমোদ-প্রমোদ কেন্দ্র, স্বাস্থ্যকর স্থান, প্রশাসনিক কেন্দ্র, ঐতিহাসিক কিংবা প্রত্নতাত্ত্বিক দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় স্থান প্রভৃতি।

যুক্তরাষ্ট্রের উপনগরী এবং ডরমিটরি শহরগুলো* বিশেষভাবে সক্রিয়। যুক্তরাষ্ট্রের আদমসুমারী 1910 খৃঃ থেকে আজ পর্যন্ত 140-টি মহানগরীকে চিহ্নিত করেছে যাদের উপনগরী রয়েছে। প্রশাসনিক ও মিউনিসিপ্যাল কাজকর্ম এবং তাদের নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে পৌর অঞ্চলের স্তরবিন্যাস খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়, বিশেষ করে উর্বর ভূমি সৃষ্টি করতে, গৃহ ও বাজার কেন্দ্র, শিল্প কেন্দ্র, প্রশাসনিক কেন্দ্রের মধ্যে সময়ের ব্যবধান হ্রাস করতে উপনগরীকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা হয়।

বিজু গারনিয়ার উপনগরী ও ডরমিটরী শহরের মধ্যে পার্থক্য করেন নি। তাঁর ভাষায় "The term satellite signifies only a town which gravitates towards a major centre, and is particularly applicable to the dormitory towns of the perimeter". বিজু গারনিয়ার আরো বলেছেন, "The dormitory suburb comprises localities where town–dwellers come in search of cheaper housing, a few trees, and a small garden".

V. C. Davidovitch উপনগরীর তিনটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন। সেগুলো হল (i) People living in the satellite come to work in the central town........... (ii) The central town guarantees a certain number of services, notably cultural services for the satellites : (iii) The satellites accommodate the town's population for holidays and relaxation" (বিজু গারনিয়ার থেকে উদ্ধৃত)।

সাধারণত উপনগরী এবং ডরমিটরি শহরে মধ্যবিত্ত কিংবা ধনী ব্যক্তি বসবাস করেন। কারণ এখানে নগরের তুলনায় অনেক সহজেই বাড়ি তৈরির জন্য জায়গা পাওয়া যায়। এই জন্য উপনগরীতে শিল্প শ্রমিকদের একটা বড় অংশ, পৌর অঞ্চলের স্বল্পবিত্তরা এবং ধনী মানুষেরা, যাঁরা শহরের কোলাহল থেকে দূরে থাকতে চান, তাঁরা বসবাস করেন।

ডরমিটরি বা উপনগরী বসতি হল দ্বিতীয় প্রকারের বসতি। এরা সবসময়ই নগরের কাছাকাছি অবস্থিত হয় এবং নগরের একটি অংশ হিসেবে বিবেচিত হয়। কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য উপনগরীকে অল্প সময়ের জন্য বা দীর্ঘ সময়ের জন্য গড়া যেতে পারে। অনেক সময় উপনগরী দ্বৈত শহর (Twin town) হিসেবে প্রকাশ পেতে পারে, যেমন বিহারের রোহতাস জেলার ডেহরী এবং ডালমিয়ানগর। এই দ্বৈত শহর সেতুর সাহায্যে যোগাযোগ রক্ষা করছে যেমন—গঙ্গা নদীর ওপর তৈরি সেতু পাটনা ও হাজিপুর, মোকামা ও বারউনি, বারাণসী ও মোঘলসরাই শহরের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছে।

বর্তমানে নগর বা শহরে অত্যধিক জনসমাগমের দরুন যে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে তা সমাধান করা যেতে পারে জনতার প্রবাহকে উপনগরী বা ডরমিটরি শহরের দিকে চালিত করে। অনেক ক্ষেত্রে নগরায়ণ প্রক্রিয়া উপনগরী ও ডরমিটরি শহরের সমস্যা সমাধানের উপায় হতে পারে, কারণ এই পদ্ধতিটি অস্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স ও নেদারল্যান্ডে লক্ষ্য করা গেছে।

উপনগরী ও ডরমিটরি শহরের পক্ষে যুক্তি ঃ উৎপাদন ও দূরত্ব সম্পর্কের ক্ষেত্রে ঃ

উপনগরী থেকে মহানগরীতে মানুষ ও পণ্য চলাচলের পেছনে দূরত্ব একটা বড় ভূমিকা নেয়। মহানগরীতে যাতায়াতের জন্য যে সময় নষ্ট হয় তা সংলগ্ন এলাকায় অবস্থিত শিল্প কেন্দ্রে উৎপাদন বৃদ্ধির কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে।

ভারতের উপনগরী সমূহ ঃ

বিহার রাজ্যে মোতিহারির কাছে লাউথাহা (Lauthaha) মুঙ্গেরের কাছে জামালপুর, ভাগলপুরের কাছে নাথনগর, পাটনার কাছে দানাপুর, ফাতের কাছে ফুলওয়ারিশরিফ, হাজিপুরের কাছে সোনাপুর, দ্বারভাঙ্গার কাছে

লহেরীসরাই, জামসেদপুরের কাছে ম্যাঙ্গো এবং পূর্ণিয়ার কাছে কসবা প্রভৃতি উপনগরীর উদাহরণ। অন্যান্য স্থানের মধ্যে হায়দ্রাবাদের কাছে সেকেন্দ্রাবাদ এবং দিল্লীর কাছে মালুবু, কোলকাতার কাছে বিধাননগর, কল্যাণী, শিলিগুড়ির কাছে ফুলবাড়ি, চাঁদমণি, শালুগাড়া প্রভৃতি উপনগরীর উদাহরণ। এদের মধ্যে বেশির ভাগ উপনগরী গড়ে উঠেছে i) নদীর প্রতিবন্ধকতার দরুন বা ii) প্রধান শহর থেকে একটু দূরে রেল স্টেশনের অবস্থানের জন্য যেমন (শিলিগুড়ির অদূরে নিউ জলপাইগুড়ি), iii) কোন গ্রাম বা শিল্প এলাকা ক্রমোন্নতির ফলে শহরে পরিণত হওয়ার দরুন। সাম্প্রতিককালে, নগর কেন্দ্রে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার বাড়তি চাপ আধা শহর এলাকায় বসতি স্থাপনে বাধ্য করেছে। এই রকম অবস্থাতে বসতি হিসেবে উপনগরীর গুরুত্ব খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

যুক্তরাষ্ট্রের উপনগরী সমূহ ঃ

উপনগরীর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশে কৃষি ও শিল্প উৎপাদনের এলাকাসমূহ খুবই উপযোগী। যুক্তরাষ্ট্রের উপনগরীর বিকাশের ক্ষেত্রে সেখানকার পরিবেশের দান অনস্বীকার্য। প্রায় 49 শতাংশ পৌরজনতা যুক্তরাষ্ট্রের উপনগরীতে বসবাস করেন, যা ঐ দেশের মোট জনসংখ্যার 24 শতাংশ। কোন শহরতলির বিকাশের মাত্রা নির্ভর করে তার অবস্থান তথা আবহাওয়া, নদীর অবস্থান, পার্শ্ববর্তী সীমানা, শহরের বাহ্যিক রূপ এবং তার আকৃতির ওপর।

যুক্তরাষ্ট্রের উপনগরীতে বসবাসকারী জনসংখ্যার শতকরা হার

জনসংখ্যার আয়তন	উপনগরী/ডরমিটরি শহরে জনসংখ্যার শতকরা হার
10,00,000-র বেশি	50.8
5,00,000 থেকে 10,00,000	65.1
3,000,00 থেকে 500,000	55.2
2,00,000 থেকে 3,00,000	33.2
1,50,000 থেকে 2,00,000	51.0
1,00,000 থেকে 1,50,000	42.2
50,000 থেকে 1,00,000	38.8
সব আয়তনের মোট গড়—	49.2

মহানগরীতে উপনগরীরূপে নতুন শহরের অবস্থান ঃ

মহানগরীর জনসংখ্যা হ্রাস এবং শিল্প ও বাণিজ্যিক কার্যকলাপকে বিস্তৃত করার উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে মহানগরীর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলোতে নতুন শহর স্থাপন করার কাজ শুরু হয়েছিল। ভারতে এই ধরনের শহর উপনগরী বা বৃত্ত শহর (Rign town) পরিচিত। এই শহরগুলো প্রধান নগর থেকে 30-45 কি.মি. দূরত্বের মধ্যে অবস্থিত। এই শহরগুলোর যোগাযোগ ব্যবস্থা খুবই উন্নত। এই শহরগুলোর প্রধান সুবিধে এই যে এরা মহানগরী থেকে অল্প দূরত্বে অবস্থিত, আর এরা সব রকমের সুযোগ সুবিধে ভোগ করতে থাকে। উপনগরী বা

শহরগুলির জনসংখ্যা খুব বেশি হয় না। এখানে গাড়ি চলাচলে কোন অসুবিধে সৃষ্টি হয় না আর জমির দাম মহানগরী এলাকার থেকে অনেক কম হয়।

বিগত দুই দশক ধরে এই ধরনের নতুন শহর মহানগরী এলাকার অধিবাসীদের তথা প্রব্রজনকারীদের (migrant) নজর কেড়েছে। এই ধরনের শহরের কিছু সাফল্যের উদাহরণ থাকলেও অসাফল্যের উদাহরণও রয়েছে। বর্তমান যুগে কোন মহানগরীতে যদি অত্যধিক জনতার পুনর্বণ্টন প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

৫.৫.১০ বহুবিধ কর্মভিত্তিক শহর (Town of diversified functions) :

আমরা আগেই বলেছি যে মুখ্য কর্মধারার ভিত্তিতে কোন শহরকে একটি বিশেষ আখ্যায় আখ্যায়িত করা যায়, যেমন শান্তিনিকেতন হল শিক্ষা কেন্দ্র, হলদিয়া হল বন্দর শহর ইত্যাদি। কিন্তু এমন শহর বা নগর আছে, যাদেরকে একটি বিশেষণে আখ্যায়িত করা ঠিক হবে না। যেমন কোলকাতা একাধারে প্রশাসনিক নগরী, শিক্ষা কেন্দ্র, বন্দর নগরী, বাণিজ্য নগরী। একই কথা খাটে মুম্বাই ও চেন্নাই সম্পর্কে। এই ধরনের শহরকে বহুবিধ কর্মভিত্তিক শহর বলাই যুক্তিযুক্ত।

সর্বশেষে এটুকু বলা যায় যে কোন শহরের কর্মধারা পরিবর্তিত হতে পারে। কর্মধারার পরিবর্তন অনেক সময় নতুন কর্মধারা সংযোজন করে, যেমন কোন বড় বন্দর রাজধানী নগরে বা বড় রাজধানী শহর পর্যটন কেন্দ্রে পরিণত হতে পারে, কিন্তু অনেক সময় এই পরিবর্তনের ফলে অসুবিধের সৃষ্টি হয়। এ রকম পরিবর্তন অনেক সময় অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। কোন কোন নদীতে যদি পলি জমে যায় ও বন্দরের কাজকর্ম ক্ষতিগ্রস্ত হয় বা অনেক সময় পুরনো রাজধানী নগর পরিত্যক্ত হয় ও নতুন রাজধানী শহর গড়ে ওঠে। ফলে পুরনো নগর মৃতপ্রায় শহরে পরিণত হয়। মুর্শিদাবাদ এমনি এক মৃতপ্রায় শহর। ইংরেজরা মুর্শিদাবাদ থেকে কোলকাতায় রাজধানী তুলে আনলে ঐ শহরটির পতন শুরু হয়। আবার পুরনো মালদা (Old Malda) শহরের ক্ষেত্রে দেখা গেছে ইংরাজ (ইংলিশ) বাজার (নতুন মালদা শহর)-এ প্রশাসনিক কাজকর্ম কেন্দ্রীভূত হওয়ায় ঐ পুরনো মালদা শহরের পতন শুরু হয়। রাজধানী দিল্লী শহর কয়েকবার তার স্থান পরিবর্তন করেছে, যেমন ইন্দ্রপ্রস্থ, সরজকুণ্ড, মেহেরালী, সিরি, তুঘলকাবাদ, সাহাজানবাদ, নতুন দিল্লী ইত্যাদি। অনেক সময় বন্যা বা ভূমিকম্পের মতন প্রাকৃতিক বিপর্যয় শহরের স্থান পরিবর্তন, এমন কি নতুন করে শহর পুনর্গঠনে বাধ্য করে। সাম্প্রতিককালে, বড় বড় ভূমিকম্পের পর যুক্তরাষ্ট্রের সান ফ্রান্সিসকো ও ক্যালিফোর্নিয়া, উজবেকিস্তানের তাসখণ্ড, তুর্কমেনিস্তানের আসকাবাদ ও মরক্কোর আগাডির নতুন স্থানে পুনরায় শহর গড়ে উঠেছে।

জার্মানীর সীমান্তে গড়ে ওঠা এনস্‌চেড (Enschede) এককালে নেদারল্যান্ডের প্রসিদ্ধ বয়ন শিল্প কেন্দ্র ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বয়ন শিল্প গোটা শহর থেকে মুছে যায়। বর্তমানে আন্তর্জাতিক বিষয় সম্পর্কিত ধারণার (যেমন Remote Sensing) কেন্দ্র হিসেবে এই শহর পুনরায় দ্রুত বিকাশ লাভ করছে।

৫.৬ শহর ও নগরের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Towns and Cities)

৫.৬.১ সমাজতাত্ত্বিকের চোখে

নগরের প্রকারভেদ নিয়ে সমাজতত্ত্বে বহু মতবাদ রয়েছে। কোন কোন লেখক এক জাতীয় উপাদানের ভিত্তিতে নগরের প্রকারভেদ নিয়ে আলোচনা করেছেন। কেউ বা বিভিন্ন উপাদানকে সামনে রেখে নগরের প্রকারভেদের

পর্যালোচনা করেছেন। (দাশগুপ্ত, 1983)। এদের মধ্যে সবচেয়ে সোজা শ্রেণীবিভাগ হল আয়তন-ভিত্তিক ভাগ। ম্যান্ (Mann) 1951 সালের ব্রিটেনের আদমশুমারির উপাদানের ওপর নির্ভর করে গ্রাম ও নগরের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করেছেন। **ডান্কান্ এবং রিজ** আমেরিকার নগরকে আয়তনের ওপর ভিত্তি করে এগারোটি ভাগে ভাগ করেছেন। কোন কোন গবেষক আবার শুধুমাত্র হয় কৃষ্টিজনিত, নয় সামাজিক উপাদানের ভিত্তিতে নগর সমাজের শ্রেণীবিভাগ করেছেন। **রেড্ফিল্ড এবং সিঙ্গার** কৃষ্টির ওপর নির্ভর করে—ক) "Orthogenetic" এবং খ) "Heterogenetic" নগরের কথা বলেছেন। হেবার "Partician" নগরকে "Plebian" নগর থেকে সামাজিক শ্রেণীর (যারা রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী) ওপর ভিত্তি করে আলাদা করেছেন।

হাউজার এবং স্নোর "আদিম নগর" এবং "সামন্ততান্ত্রিক নগর"-এর কথা বলেছেন। **ব্রিজ** নগরকে "**শিল্পকেন্দ্রিক**", "শাসনকেন্দ্রিক", "ঔপনিবেশিকতাকেন্দ্রিক" পর্যায়ে ভাগ করেছেন।

ল্যাম্পার্ড বলেছেন যে কোন বিশেষ শিল্পই হল নগরের প্রকারভেদের একমাত্র উপাদান। **হ্যারিস এবং উল্ম্যানের তত্ত্ব** অনুযায়ী নগরকে "মধ্যাঞ্চলবিশিষ্ট নগর", "যানবাহনকেন্দ্রিক নগর", "বিশেষ কার্যক্রম সম্বলিত নগরে" ভাগ করা যায়। **কার্ল মার্কস** নগরকে অর্থনৈতিক বনিয়াদের ভিত্তিতে— ক) সামন্ততান্ত্রিক নগর, খ) ধনতান্ত্রিক নগর এবং গ) সমাজতান্ত্রিক নগরে ভাগ করেছেন।

জোবার্গ অবশ্য বহু উপাদানের ভিত্তিতে নগরসমাজের শ্রেণীবিভাগ করেছেন। তিনি নগরসমাজকে বিস্তৃতভাবে তিনটি ভাগে (যথা (ক) "The Folk", (খ) "The feudal" এবং (গ) "The Industrial urban") ভাগ করেছেন। তবে জোবার্গ মূলত দুটি পর্যায়ের (যথা (ক) **প্রাক্-শিল্প নগর** এবং (খ) **শিল্পোত্তর নগর**-এর) কথা বলেছেন। **হাউজার** আবার শিল্পোত্তর নগরকে (ক) "The Industrial" এবং (খ) "The Metropolitan" এই দুই ভাগে ভাগ করেছেন। **ল্যুইজ ওয়ার্থ** তার তত্ত্বে নগরকে মূলত আয়তন, সীমানা, অন্য নগর থেকে দূরত্ব, অর্থনৈতিক উপাদান, গঠন এবং বয়সের মাপকাঠিতে বিচার করে এক প্রকার শ্রেণীবিভাগ করেছেন। তবে ইংল্যান্ডের **মোসার ও স্কট**, আমেরিকার **হ্যাডেন ও বোরগাট্টা** আদমসুমারীর Multifactional analysis-এর মাধ্যমে শিল্পোত্তর নগরের শ্রেণী বিভাগের এক তত্ত্ব খাড়া করেছেন।

৫.৬.২ ভৌগোলিকের চোখে

উপরোক্ত বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে নগর সাধারণতঃ প্রাকৃতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক অস্তিত্বের ওপর নির্ভরশীল এবং সেইমত নগরের শ্রেণীবিভাগ করা হয়। প্রাকৃতিক অস্তিত্বের ভিত্তিতে যাঁরা নগরের শ্রেণীবিভাগ করেছেন তাঁদের মধ্যে গ্রিফিথ টেলরের নাম বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে।

গ্রিফিথ টেলর নগরের শ্রেণীবিভাগ করতে গিয়ে নিম্নলিখিত পর্যায়গুলোর কথা বলেছেন। পর্যায়গুলোর বৈশিষ্ট্য প্রধানত ভূমির বিন্যাস এবং ব্যবহারের ওপর নির্ভরশীল। টেলরের ভাগগুলো হল—

ক) Infantile বা অপরিণত অবস্থা ঃ

এই অবস্থাতে বসবাসের অঞ্চল, বাণিজ্যিক অঞ্চল ও শিল্পাঞ্চলের মধ্যে কোন সুস্পষ্ট তফাৎ লক্ষ্য করা যায় না।

খ) Juvenile বা শৈশব অবস্থা ঃ

এই অবস্থাতে বাণিজ্যিক অঞ্চল আলাদা থাকে কিন্তু দোকান, অফিস এবং ক্ষুদ্রশিল্প এই অঞ্চলের সাথে একত্রীভূত থাকে।

গ) Early Mature বা প্রাক্‌-পরিণত অবস্থা

এই অবস্থাতে বসবাসের অঞ্চল আলাদা এক অঞ্চল হিসেবে গণ্য করা হয়। বসবাস করবার প্রবণতা এই অবস্থাতে সাধারণত সামাজিক মর্যাদার সাথে জড়িত থাকে।

ঘ) Mature বা পরিণত অবস্থা ঃ

এই অবস্থাতে শিল্পাঞ্চলের এক বিশেষত্ব থাকে এবং দেখা যায় রেলপথের লাগোয়া অঞ্চলগুলোতে কলকারখানা গড়ে ওঠে। তা ছাড়া বসবাসের অঞ্চল এবং শিল্পাঞ্চলের মধ্যে এক পার্থক্য দেখা যায়।

ম্যাকেঞ্জির তত্ত্বানুযায়ী নগরকে অর্থনৈতিক উপাদানের ভিত্তিতে চারটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়, যথা—ক) Primary Service Community বা মুখ্যবৃত্তি কেন্দ্রিক অঞ্চল, যেমন খনি অঞ্চল, কৃষি অঞ্চল, খ) Commercial Community বা বাণিজ্যকেন্দ্রিক নগর, গ) Industrial Town বা শিল্পকেন্দ্রিক নগর এবং ঘ) অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্যহীন অঞ্চল যথা প্রমোদ অঞ্চল, রাজনৈতিক অঞ্চল, সামরিক অঞ্চল ইত্যাদি।

প্যাট্রিক গেডেস কৃষ্টিজনিত ও সামাজিক উপাদানের ভিত্তিতে নগরের শ্রেণীবিভাগ করেছেন। লুইজ মাম্‌ফোর্ড সেই তত্ত্ব পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত করেছেন।

মামফোর্ড-এর পর্যায়গুলো হল (চিত্র 5.20)

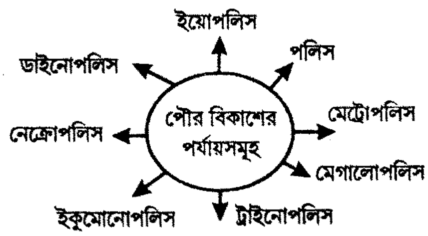

চিত্র - 5.20 লুইজ মাম্‌ফোর্ডি এর পৌর বিকাশের পর্যায়সমূহ

ক) **Eopolis (ইয়োপলিস)** বা নগর সভ্যতার প্রভাত ঃ এই সময়ে গ্রামীণ সমাজব্যবস্থার ভাঙন শুরু হয় এবং নগরসমাজের সূচনা ঘটে।

খ) **Polis (পলিস)** বা নগর ঃ এই সময়ে আধা নগরসভ্যতার বিকাশ ঘটে যেখানে নগরসমাজের বিশেষ কিছু উপাদান অর্থাৎ আধা-শ্রমবিভাজন রীতি, হস্তশিল্প, বিজ্ঞান এবং তৎসম্বলিত প্রতিষ্ঠানের প্রসার, গ্রামীণ সমাজের কিছু উপকরণ বিয়োজন যথা পরিবার-পদ্ধতি, ধর্মীয় উপাচার ইত্যাদি। এই পর্যায়ে পরিবেশ সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠানের সূচনা এবং লাগোয়া অঞ্চলের সাথে এক নিবিড় সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়।

গ) **Metropolis (মেট্রোপলিস) বা মুখ্যনগর ঃ**

এই সব অঞ্চলে যে সব উপাদান থাকে তা হল ঃ

(i) নগরসভ্যতার পূর্ণ বিকাশ;

(ii) আহার্য যোগানের নিরাপত্তা;

(iii) উদ্বাস্তুদের লক্ষ্যবস্তু;

(iv) অপরাপর অঞ্চলের সাথে বাণিজ্যিক যোগাযোগ;

(v) সাংস্কৃতিক বিনিময়;

(vi) বহু মানসিকতাসম্পন্ন ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত জনসংখ্যা;

(vii) উচ্চ পর্যায়ের শ্রম বিভাজন ধারা;

(viii) কৃষ্টির বিশিষ্টতা;

(ix) ব্যক্তিগত অস্তিত্বের প্রভাব এবং পরিবারের অস্তিত্ব তুলনায় অনেক শিথিল;

(x) প্রতীক সম্বলিত অর্থনৈতিক গড়ন;

(xi) কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা;

(xii) শ্রম বিভাজন;

ঘ) **Megalopolis (মেগালোপলিস) বা বৃহদায়তন নগর ঃ**

এই জাতীয় নগরের নিম্নলিখিত উপাদান দেখা যায়—

(a) অঞ্চলের সীমানা অনেক বিস্তৃত;

(b) সম্প্রসারণ নীতির প্রাধান্য বেশি;

(c) সামরিক কিংবা অর্থনৈতিক উপাদানের মাধ্যমে এই জাতীয় নগরের অস্তিত্ব রক্ষা করা যায়;

(d) প্রমোদ, শিক্ষা, শিল্পকলা, স্থাপত্য ইত্যাদি তুলনায় অনেক উচ্চমানের এবং অর্থনৈতিক উপাদানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত;

(e) আমলাতন্ত্রের বিকাশ এবং

(f) ছোট ছোট বহু শহরাঞ্চল এই জাতীয় নগরের অন্তর্ভুক্ত;

ঙ) **Tyranopolis : (ট্রাইরানোপলিস)**

এই জাতীয় নগরের উল্লেখযোগ্য উপাদানগুলো হল ঃ

(a) চূড়ান্ত পর্যায়ে অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণের দ্বারা এই নগর নিয়ন্ত্রিত;

(b) বাজেট, কর ইত্যাদি অর্থনৈতিক পদ্ধতির প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত;

(c) জনগণের অর্থনৈতিক গড়ন নিয়ন্ত্রণ করার জন্য রাজনীতিকে কাজে লাগানো হয়;

(d) "হোয়াইট কালার" ক্রাইমের প্রভাব, এবং

(e) সামাজিক, রাজনৈতিক জটিলতার জন্য এই জাতীয় নগরের বাসিন্দারা সংলগ্ন নগরপ্রান্তে বসবাস করে।

চ) **Nekropolis (নেক্রোপলিস) বা ভৌতিক নগর ঃ**

বিবর্তনের সূত্রানুযায়ী এই পর্যায়ের নগরকে উত্তরণের শেষ ধাপ কিংবা বিবর্তনের প্রথম ধাপ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। সেই কারণে এই পর্যায়কে গ্রামীণ সমাজের পুনরভ্যুত্থান বলা হয় (দাশগুপ্ত, 1983)।

৫.৬.২.১ পৌর বসতি বিকাশের চক্র ঃ

R. B. Mandal নগরের বিকাশকে এক চক্র হিসেবে দেখেছেন। নীচে তা নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

কোন পৌর বসতির উৎপত্তি, বিকাশ ও পর্যায় চক্রাকারে বিবর্তিত হয়। ক্ষুদ্রপল্লী বা গ্রাম হোক তৃতীয় পর্যায়ের কর্মকাণ্ডের (Tertiary activity) উপস্থিতি কোন বসতিকে পৌর বসতির রূপ দেয়। সুতরাং পরিষেবা

কেন্দ্রের আয়তন (Size of service centre) রাস্তার ধারে বসতি থেকে শুরু Ecumonopolis (বিশ্ব নগরায়ণের পর্যায়) পর্যন্ত হয়। এখানে খুব সংক্ষেপে পৌর বসতির বিবর্তন সম্পর্কিত কয়েকটি সংজ্ঞা নিয়ে আলোচনা করা হল।

রাস্তার ধারে বসতি ঃ

রাস্তার ধারে অবস্থিত বিচ্ছিন্ন বসতিতে পেট্রোল পাম্প, পানের দোকান বা চায়ের দোকান থাকে। রাস্তার ধারে গড়ে ওঠা বাড়ির মালিকরা হয় একই বাড়িতে থাকে (একতলা বাড়িতে) বা বাড়ির দোতলায় থাকে। এই ধরনের রসতি ভারত, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও ইউরোপের দেশগুলোতে বড় রাস্তার ধারে দেখা যায়। পৌর বসতি বিকাশের এটি হল প্রথম বা আদি পর্যায়।

ক্ষুদ্রপল্লী ঃ

পূর্বোক্ত বসতির তুলনায় এটি একটু বড় বসতি। কয়েকটি বাড়ি নিয়ে গড়ে ওঠা এই বসতির কিছু হল বসত বাড়ি, আর কিছু হল দোকান ঘর। এই ধরনের বসতি গড়ে ওঠার অন্যতম কারণ হল মোটেল ও ব্যবসায়ীদের স্থায়ী আবাসস্থলের উপস্থিতি।

গ্রাম ঃ

গ্রাম হল বহুসংখ্যক জনতার (150 থেকে 10,000) বসতি। এখানে বিভিন্ন ধরনের কার্যাবলী দেখা যায় : বাজার, উচ্চ বিদ্যালয়, পোস্ট অফিস, বিদ্যুৎ অফিস। এটি বিভিন্ন ধরনের স্থানীয় পরিবহন মাধ্যমের কেন্দ্রবিন্দুও বটে।

শহর ঃ

এখানে পৌর প্রতিষ্ঠান (Municipality) থাকতে পারে। আবার এটি ক্যান্টনমেন্ট কিংবা নোটিফায়েড এরিয়া হতে পারে। আবার এটি কোন প্রশাসনিক কেন্দ্রবিন্দু নাও হতে পারে। তবে এখানকার বেশির ভাগ মানুষ তৃতীয় পর্যায়ের কর্মকাণ্ডে যুক্ত থাকেন। এখানকার জনসংখ্যা 2000 থেকে 20,000 বা বেশি হতে পারে। আমরা আগেই শহর, নগর, মহানগর, মেগালোপলিস, ট্রাইনোপলিস, ইকুমোনোপলিস ও নেক্রোপলিস ইত্যাদি শব্দগুলোর সাথে পরিচিত হয়েছি। এখানে তার পুনরাবৃত্তি করা হল না। নীচের সারণির মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের পৌর বসতির বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হল।

সারণি

পৌর বসতির পদানুক্রম

ক্রমিক নং	বসতির পর্যায়	উদাহরণ	জনসংখ্যা (1991)	বৈশিষ্ট্য/অবস্থান
1.	রাস্তার ধারে	হীরমাণি গাছি হাট	20	অস্থায়ী ব্যবসা
2.	ক্ষুদ্র পল্লী	থাহি	250	মাজবাহিয়ার লাগোয়া গ্রাম
3.	গ্রাম	বাহেরী	15,000	প্রত্যহ বাজার
4.	শহর	বোসরা	35,000	মহকুমা সদর দপ্তর

ক্রমিক নং	বসতির পর্যায়	উদাহরণ	জনসংখ্যা (1991)	বৈশিষ্ট্য/অবস্থান
5.	নগর	ভাগলপুর	4,90,000	বিভাগীয় সদর দপ্তর
6.	মেট্রোপলিস	পাটনা	1,100,000	বিহারের রাজধানী
7.	পৌরপুঞ্জ	মুম্বাই	12,600,000	একগুচ্ছ লাগোয়া শহর
8.	পৌর মহাপুঞ্জ	উত্তর-পূর্ব যুক্তরাষ্ট্র	90,000,00	উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরের মধ্য আটলান্টিক উপকূল
9.	ট্রাইনোপলিস	দেশ/মহাদেশ স্তর	জাতীয় স্তর	বৃহত্তম নগরায়ণ মহাদেশ বা জাতীয় স্তর
10.	ইকুমেনোপলিস	বিশ্ব নগরায়ণ	20,000,000,000	বিশ্ব পৌর সম্প্রদায়
11.	নেক্রোপলিস	ভূতুড়ে শহর	হিরোসীমা (1945) ও বসরা (1991)	পৌর বৃদ্ধির যে কোন পর্যায়ে বিকাশলাভ করতে পারে।

সূত্র ঃ R. B. Mandal, 2000

প্রফেসার মণ্ডলের উক্ত ভাগ ছাড়াও ভূগোলবিদ্‌রা বিভিন্নভাবে শহর ও নগরের শ্রেণীবিভাগের চেষ্টা করেছেন। শহর ও নগরের মধ্যে সাদৃশ্যের চেয়ে বৈসাদৃশ্যই বেশি চোখে পড়ে। তাদের মধ্যে বয়স, আয়তন, গঠন, জনসমষ্টির বৈশিষ্ট্য, ক্রিয়াকলাপ ইত্যাদিতে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। এত বিষয়ে পার্থক্য থাকলেও পৌরবসতির শ্রেণীবিভাগের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তাদের ক্রিয়াকলাপের ওপর। লক্ষণীয় যে, বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগের মধ্যে পদ্ধতিগত তারতম্য থাকলেও সাধারণভাবে বলা চলে যে প্রায় প্রতিটি শ্রেণীবিভাগই পৌরবসতির, ক্রিয়াকলাপের ওপর ভিত্তি করে গঠিত। পৌরবসতির ক্রিয়াকলাপ বহুবিধ। যে কোন পৌরবসতি, তার আয়তন যাই হোক না কেন, অন্তত পক্ষে দুটি কাজ করে থাকে, যথা—(ক) পৌর এলাকার অধিবাসীদের সেবা; (খ) পৌর বসতি সংলগ্ন এলাকার অধিবাসীদের সেবা। যাই হোক, কোন পৌর বসতির বহুবিধ ক্রিয়াকলাপের মধ্যে তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কার্যটিকে শ্রেণীবিভাগের ক্ষেত্রে বেশি রকম গুরুত্ব দেওয়া হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে একটি পৌরবসতির উৎপত্তির সময় তার যা প্রধান কার্য ছিল, তা বর্তমানে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ নাও হতে পারে।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে কোন পৌরবসতিকে ক্রিয়াকলাপ ভিত্তিক একটি শ্রেণীভুক্ত করার অর্থ এই নয় যে তার অন্য কোন ক্রিয়াকলাপ নেই। যেমন বাণিজ্যিক বা শিল্প নগরী বলতে এটা বোঝায় না যে ঐ নগরের অন্য কোন ক্রিয়াকলাপ নেই।

৫.৬.২.২ অরোসু-র শ্রেণীবিভাগ ঃ (Classification of Aurousseau)

Aurousseau কর্মের ভিত্তিতে শহরকে শ্রেণীবিভাগ করেছেন। তিনি 28-প্রকার শহরের কথা বলেছেন। এদেরকে মোটামুটি 6 টি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, যেমন—

1. **প্রশাসন**— a) রাজধানী, b) রাজস্ব সংগ্রহ কেন্দ্র।
2. **প্রতিরক্ষা**— a) দুর্গ, b) সেনানিবাস, c) নৌঘাঁটি।
3. **সংস্কৃতি**— a) গির্জা, b) বিশ্ববিদ্যালয়, c) কারুশিল্প, d) তীর্থযাত্রী, e) ধর্ম।
4. **উৎপাদন**— a) যন্ত্রশিল্প, b) কুটির শিল্প।

5. **বিনোদন**— a) স্বাস্থ্য, b) পর্যটন, c) ছুটির/উৎসবের দিন।

6. **যোগাযোগ**—

a) **সংগ্রহ ঃ** i) খনি, ii) মৎস্য, iii) অরণ্য, iv) গুদাম।

b) **বন্টন ঃ** i) রপ্তানী, ii) আমদানী, iii) সরবরাহ।

c) **স্থানান্তর ঃ** i) বাজার, ii) প্রপাত রেখা, iii) ভারপরিবর্তন (Break of bulk), iv) ব্রীজের শুরু (Bridgehead), v) জোয়ারের সীমা, vi) নৌ-চলাচলের সীমা (Navigation head)।

৫.৬.২.৩ ম্যাকেঞ্জীর শ্রেণীবিভাগ (Classification of Mekenzic)

ম্যাকেঞ্জী (Classification of Mckenzie) পৌরবসতিগুলোকে চারটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। এই শ্রেণীবিভাগের ক্ষেত্রে তিনি প্রধানত অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। ম্যাকেঞ্জীর শ্রেণীবিভাগটি নিম্নলিখিতভাবে বর্ণনা করা যায় ঃ

(1) **প্রাথমিক কর্মধারা ভিত্তিক ঃ** এই শ্রেণীর পৌরবসতি প্রাথমিক উৎপাদন যেমন চাষবাস, পশুপালন, মাছ ধরা, কাঠ চেরাই, খনিজ দ্রব্য উত্তোলন ইত্যাদির ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। উদাহরণ হল জুনপুট, রামনগর (মেদিনীপুর)।

(2) **ব্যবসা-বাণিজ্যভিত্তিক ঃ** এই শ্রেণীর পৌরবসতিগুলো প্রাথমিক উৎপাদনের বন্টন তথা ব্যবসা বাণিজ্যকে অবলম্বন করে গড়ে ওঠে। উদাহরণ হল বাঁকুড়া, মেদিনীপুর।

(3) **শিল্পভিত্তিক ঃ** এই শ্রেণীর পৌরবসতির প্রধান কাজ হল প্রাথমিক উৎপাদনের মাধ্যমে প্রাপ্ত দ্রব্যসমূহের প্রক্রিয়াকরণ। অন্যভাবে বলা যায় যে শিল্পকে অবলম্বন করে এই শ্রেণীর শহর বা নগর গড়ে ওঠে। যথা দুর্গাপুর, রাউরকেল্লা।

(4) **অন্যান্য ঃ** এই শ্রেণীর পৌরবসতিগুলো অনুৎপাদকমূলক ক্রিয়াকলাপের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। এই অনুৎপাদকমূলক ক্রিয়াকলাপ বিভিন্ন রকমের হতে পারে। যথা রাজনৈতিক, সামরিক, শিক্ষাসংক্রান্ত, চিকিৎসামূলক, অবসর বিনোদন ইত্যাদি। যথা শান্তিনিকেতন, দার্জিলিং। এই শ্রেণীর পৌরবসতিতে এক বা একাধিক অনুৎপাদকমূলক ক্রিয়াকলাপ কেন্দ্রীভূত হয়। বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে খুব দ্রুততালে নগরায়ণের বিকাশ ঘটতে থাকে। এই বিকাশ তথা বৃদ্ধির হারকে অস্বাভাবিক বললেও অত্যুক্তি হয় না। সারা পৃথিবী জুড়ে প্রায় রাতারাতি নতুন পৌরবসতি গজিয়ে উঠতে থাকে। ফলশ্রুতি হিসেবে পৌরবসতি যেমন সংখ্যায় বাড়তে থাকে, তেমনি বাড়তে থাকে তাদের চারিত্রিক জটিলতা। পৌরবসতি এবং তৎসংলগ্ন গ্রামীণ এলাকার মধ্যে দ্রুত ভারসাম্য নষ্ট হতে থাকে। এমন কিছু পৌরবসতির সৃষ্টি হয় যাদের প্রকৃতি অজ্ঞাত ছিল। এর ফলে পৌরবসতির শ্রেণীবিভাগের ক্ষেত্রেও জটিলতা বৃদ্ধি পায়। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে কোন শ্রেণীবিভাগকেই এককভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ বলা চলে না। যাই হোক ম্যাকেঞ্জীর পর পৌর শ্রেণীবিভাগের ক্ষেত্রে যাঁরা চিন্তাভাবনা করেছেন তাদের মধ্যে কুইন (Quinn), স্মিথ (Smith), নীডলার (Kneedler) এবং হ্যারিস (Harris)-এর নাম করতে হয়। এঁরা কেউ ম্যাকেঞ্জীকৃত শ্রেণীবিভাগের মূল সূত্রকে অস্বীকার করেন নি। এঁরা শুধু প্রয়োজনবোধে উক্ত-শ্রেণীবিভাগের কিছুটা পরিবর্তন করে গ্রহণ করেছেন। এঁদের চিন্তাধারার বিশ্লেষণ নিম্নরূপ ঃ

৫.৬.২.৫ স্মিথ ও নীডলার-এর শ্রেণীবিভাগ (Classification of Smith and Kneedler) ঃ

এঁরা অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপকে পাঁচ ভাগে ভাগ করেছেন। যথা ঃ

(1) **প্রাথমিক নিষ্কর্ষী উৎপাদন** (মৎস্য শিকার, খনিজ দ্রব্য উত্তোলন)। উদাহরণ মৎস্য শিকার, জুনপুট; খনিজ তেল উৎপাদন, ডিগবয়, (b) **কাঁচামালকে অন্য সামগ্রীতে রূপান্তরকরণ** (শিল্প) ঃ উদাহরণ জামশেদপুর, জে. কে. নগর; (c) **পাইকারী ও খুচরা ব্যবসা** ঃ কোলকাতা, শিলিগুড়ি; (d) **পরিবহন** ঃ খড়গপুর; (e) **পরিপূরক কার্য** (অন্যান্য বৃত্তিমূলক কার্যাবলী), যথা—**শিক্ষাকেন্দ্র** ঃ শান্তিনিকেতন, **পর্যটনকেন্দ্র** ঃ দার্জিলিং, দীঘা প্রভৃতি।

(2) **অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ বাদে অন্যান্য ক্রিয়াকলাপ** (যথা রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষামূলক, বিনোদনমূলক ইত্যাদি) পৌরবসতিগুলোকে বৈশিষ্ট্য দান করতে পারে।

(3) একই ধরনের ক্রিয়াকলাপে নিযুক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে একই জায়গায় বসবাস করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

৫.৬.২.৬ হ্যারিসের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Harris)

1943 সালে চ্যান্সি ডি. হ্যারিস (Chancy D. Harris) শহরের যে শ্রেণীবিভাগ করেছেন (চিত্র 5.21) তার ভিত্তি হল যুক্তরাষ্ট্রের 1930 সালের লোকগণনা (Census)। তিনি 10,000-র বেশি জনসংখ্যার 984-টি শহরের নিয়োগ কাঠামো (Employment structure) নিয়ে গবেষণা করেছিলেন। এর ভিত্তিতে তিনি একটা মানদণ্ড ঠিক করেছেন, যা শহরের প্রধান কর্মধারা ঠিক করার পক্ষে এক সন্তোষজনক পদক্ষেপ। নীচে তা আলোচনা করা হল।

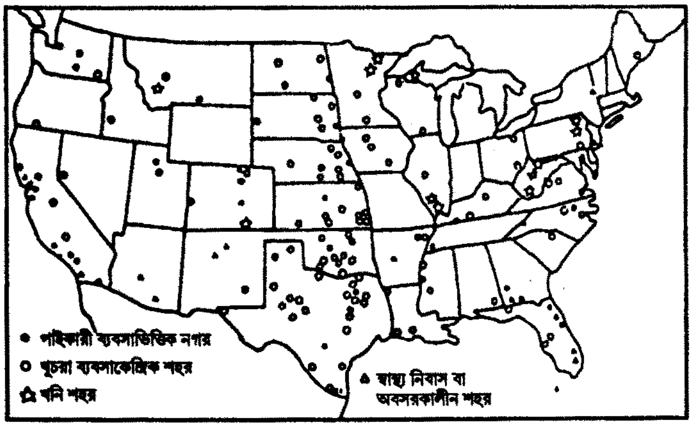

চিত্র - 5.21 হ্যারিসের শ্রেণীবিভাগ

(1) **শিল্প নগর** (Manufacturing City) ঃ এই সব নগরে কম করে 45 শতাংশ কর্মী যন্ত্রশিল্পে নিয়োজিত। যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় 45 শতাংশ শহর এই শ্রেণীতে পড়ে। 1930 সালে এই সব শহরের অধিকাংশই দেশের উত্তর-পূর্বদিকে অবস্থিত ছিল।

(2) **খুচরা ব্যবসাকেন্দ্রিক শহর** (Retail City) ঃ Harris খুচরা ব্যবসাভিত্তিক নগর বলতে সেই সব নগরকে বুঝিয়েছেন যাদের খুচরা ব্যবসায়ে নিয়োজিত কর্মী সংখ্যা নির্মাণশিল্প, খুচরা ও পাইকারী ব্যবসাতে নিযুক্ত মোট কর্মী সংখ্যার কম করে 50 শতাংশ, আর একমাত্র পাইকারী ব্যবসাতে লিপ্ত কর্মী সংখ্যার অন্ততপক্ষে 2.2 গুণ।

(3) **পাইকারী ব্যবসাভিত্তিক নগর** (Wholesaling City) ঃ হ্যারিস-এর মতে পাইকারী ব্যবসাভিত্তিক নগর হতে গেলে এই ব্যবসায়ে নিযুক্ত কর্মী সংখ্যা নির্মাণশিল্প, খুচরা ও পাইকারী ব্যবসাতে নিয়োজিত মোট কর্মীর অন্তত 20 শতাংশ ও একমাত্র খুচরা ব্যবসাতে নিয়োজিত কর্মীর 45 শতাংশ হতে হবে। হ্যারিস দেখিয়েছেন যে

যুক্তরাষ্ট্রে এই সব নগরের সংখ্যা মোট নগরের প্রায় এক চতুর্থাংশ। হ্যারিস আরো লক্ষ্য করেছেন যে এই সব নগর দেশের মধ্যে সমানভাবে ছড়িয়ে আছে। যুক্তরাষ্ট্রের পাঁচটি বৃহত্তম নগরের মধ্যে 4-টি এর অন্তর্গত। যথা নিউ ইয়র্ক (New York), চিকাগো (Chicago), বোস্টন (Boston) ও লস্ এঞ্জেলস্ (Los Angles)।

(4) **পরিবহন শহর** (Transportation Town) : হ্যারিস-এর মতে মোট কর্মীর শতকরা 11 ভাগ কর্মী পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত থাকবেন। 1930-এর লোকগণনায় 18-টি রেলপথকেন্দ্র ও 14-টি বন্দর এর অন্তর্ভুক্ত ছিল, কিন্তু অধিকাংশ বন্দরকে পাইকারী ব্যবসার কেন্দ্র হিসেবে গণ্য করা হত।

(5) **খনি শহর** (Mining town) : খনি শহর হতে গেলে সেখানকার মোট উপার্জনশীল কর্মীর 15 শতাংশেরও বেশি কর্মীকে খনি খননের সঙ্গে যুক্ত থাকতে হবে। Harris লক্ষ্য করেছেন যে যুক্তরাষ্ট্রের কেবলমাত্র 14-টি শহর এর অন্তর্ভুক্ত। এদের মধ্যে 10-টি কয়লাখনি শহর, 3-টি লোহাখনিভিত্তিক শহর, অন্যান্য একটি।

(6) **বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষাকেন্দ্রিক শহর** (University and Other Educational Centres) : এই ধরনের শহর হিসেবে গণ্য হতে গেলে মোট জনসংখ্যার কম করে এক চতুর্থাংশকে শিক্ষা-সংক্রান্ত বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত থাকতে হবে। 1930 সালে যুক্তরাষ্ট্রের 17-টি ছোট শহর এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। এদের অধিকাংশ হল রাজ্য বা প্রদেশ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্র (State University Centre)। দেশের মধ্য-পশ্চিম অংশে এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অবস্থিত।

(7) **স্বাস্থ্যনিবাস বা অবসরকালীন শহর** (Resort or Retirement town) : হ্যারিস এই ধরনের শহরের শ্রেণীবিভাগ করতে গিয়ে যথার্থ পরিসংখ্যান খুঁজে পাননি। তিনি 22-টি শহরকে এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এদের মধ্যে কয়েকটি প্রধানত গ্রীষ্মকালীন স্বাস্থ্যনিবাস, কোনটি শীতকালীন স্বাস্থ্যনিবাস। যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশে এই সব শহর ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। যুক্তরাষ্ট্রে 1930 সালে এই সব শহরের জনসংখ্যার একটা বড় অংশ গৃহস্থালী ও অন্যান্য ব্যক্তিগত কাজে লিপ্ত ছিল।

(8) **অন্যান্য শহর** (Other towns) : পরিসংখ্যানের দিক দিয়ে শ্রেণীহীন এই সব শহরের মধ্যে রয়েছে **মাছ ধরার কেন্দ্র, কাঠ কাটার কেন্দ্র** (Logging Camp), **কৃষি শহর** (Farming town), **আঞ্চলিক রাজধানী, সামরিক শহর** (Garrison town), **নৌঘাঁটি**(Naval base), **বৃত্তিমূলক কেন্দ্র** (Professional Centre) ও **আর্থিক কেন্দ্র** (Financial Centre)। 1930 সালের নিয়োগ কাঠামোর (Employment Structure) মাপকাঠিতে(Scale) যুক্তরাষ্ট্রে আলাদা কোন গীর্জা, ধর্মীয় কেন্দ্র বা দুর্গ শহর ছিল না।

উপরের শ্রেণীবিভাগ থেকে এটা লক্ষ্য করবার মত যে স্বাস্থ্যনিবাস বা অবসরকালীন শহর সম্পর্কে হ্যারিস কোনো জোরালো পরিসংখ্যান দিতে পারেন নি। তেমনিভাবে অন্যান্য শহরের শ্রেণীবিভাগের ক্ষেত্রে হ্যারিস পরিসংখ্যানের সাহায্য নেন নি। এছাড়া তীর্থকেন্দ্র, গির্জা বা দুর্গকে কেন্দ্র করে যে সব শহর আত্মপ্রকাশ করে, সে সম্পর্কে তিনি কোন আলোচনা করেন নি। হ্যারিস-কৃত শহরের শ্রেণীবিভাগের অপর একটি ত্রুটি হল এই যে তিনি শহরের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক দিকটির ওপর কোথাও বেশি গুরুত্ব দেননি। একথা ঠিক যে এই সব কাজে শহর বা নগরের খুব সামান্য সংখ্যক জনতা যুক্ত থাকে। যদিও হ্যারিস-এর শ্রেণীবিভাগ অনুযায়ী মোট 17-টি শহর হল বিশ্ববিদ্যালয় শহর, তবুও বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বের দিক দিয়ে এই সব শহর হল দ্বিতীয় শ্রেণীর শহর।

৫.৬.২.৭ নেলসনের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Nelson) :

এইচ. জে. নেলসন (H. J. Nelson) 1950 সালের আদমসুমারীকে ভিত্তি করে 10,000 ও তার বেশি জনসংখ্যাযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের ৪৯7-টি শহর ও নগরের বৃত্তির শ্রেণীবিভাগ করেছেন। হ্যারিসের মত তিনিও ন'ধরনের

শহর খুঁজে পেয়েছেন। (1) খনি (Mining), (2) শিল্প (Manufacturing), (3) পরিবহন ও যোগাযোগ (Transport and Communications), (4) পাইকারী ব্যবসা (Wholesale trade), (5) খুচরা ব্যবসা (Retail trade), (6) আর্থিক(Finance), (7) ব্যক্তিগত কর্ম (Personal service), (8) বৃত্তিমূলক(Professional) ও (9) সরকারি প্রশাসন (Public Administration) ভিত্তিক (চিত্র I.8.3)। নেলসন হ্যারিস-এর শ্রেণীবিভাগের ভিত্তিকে গ্রহণ করলেও তাকে আরো পরিমার্জনা করেছেন। প্রথমে তিনি সব ক'টি শহর বা নগরের ঐ নয় (9) ধরনের কার্যকলাপের প্রত্যেকটির শতকরা গড় হার নির্ণয় করেছেন। এরপর তার ভিত্তিতে মান হতে ব্যত্যয় (Standard deviation) নির্ণয় করেছেন। যে কোন ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রে মান হতে ব্যত্যয় 1 (এক)-এর ওপর থাকলে সেই শহর বা নগরকে ঐ শ্রেণীভুক্ত করা হয়।

তাঁর সূত্রটি নিম্নরূপ ঃ

$$\alpha = \sqrt{\frac{d^2}{N}}$$

তাঁর সূত্রানুসারে যদি বহুবিধ কার্যাবলী শহরের গড় কার্যাবলীর 20% শতাংশ হয় তবে

গড় + 1 SD = 20 + (1 × 16) = 36%

গড় + 2 SD = 20 + (2 × 16) = 52%

গড় + 3 SD = 20 + (3 × 16) = 68% হবে।

নেলসন লক্ষ্য করেছেন যে তাঁর শহরগুলোতে শতকরা 27 জন শিল্পে, প্রায় 20 ভাগ খুচরা ব্যবসা, 11 ভাগ খুচরা ব্যবসা, 11 ভাগ বৃত্তিমূলক (Service) কাজ (প্রধানত চিকিৎসা, আইন ও শিক্ষা), 7 ভাগ পরিবহন, 6 ভাগ বৃত্তিগত কাজ, 4.5 ভাগ পাইকারী ব্যবসা, 3 ভাগ আর্থিক বীমা ও 1.6 ভাগ খনিতে লিপ্ত রয়েছে। সুতরাং যদি কোন একটি শহরের কর্মীর 40 শতাংশ নির্মাণ শিল্পে ও 8 ভাগ পরিবহনের কাজ করে, তবে নেলসন-এর মতে শহরটিকে যথার্থই খুব গুরুত্বপূর্ণ শিল্প শহর ও মোটামুটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবহন শহর বলা যেতে পারে। এই পরিপ্রেক্ষিতে নিউ অরলিন্স্ (New Orleans)-কে এক নজরে পরিবহন শহর, পাইকারী ব্যবসা শহর ও আর্থিক শহর বলা চলে। তেমনি ওয়াশিংটন শুধুমাত্র রাজনৈতিক রাজধানী নয়, এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পাইকারী ব্যবসা কেন্দ্রও বটে। নেলসন-এর শ্রেণীবিভাগে দেখা যায় যে এক-তৃতীয়াংশের বেশি কর্মী শহরে বহুমুখী কাজে নিয়োজিত আছে, আর 20 শতাংশের বেশি বিশিষ্ট নির্মাণ কাজের সঙ্গে যুক্ত।

নেলসনের এই পদ্ধতি আজও জনপ্রিয়। কোন শহরের পরিকল্পনার জন্য এই পদ্ধতি খুব কার্যকর। তবে দুটো শহরের মধ্যে তুলনা করতে এই পদ্ধতি উপযুক্ত নয়। একই শহরের মধ্যে তুলনার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি কার্যকর। দ্বিতীয়ত, এই পদ্ধতির সাহায্যে কোন শহরের সমস্ত কার্যাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষীকরণ নির্ণয় করা যায় না।

৫.৬.২.৮ আলেকজান্ডারসন শ্রেণীবিভাগ (Classification of Alexandersson)

আলেকজান্ডারসন (Alexandersson) তাঁর 'The Industrial Structure of American Cities'-এর দুই ধরনের পৌর কর্মীর কথা বলেছেন ঃ

(A) যারা সরাসরি শহরের সেবায় নিয়োজিত, অর্থাৎ গৌণ কর্মী (non-basic worker)। এরা শহরের 'অবাধ ও সাবলীল স্বাচ্ছন্দ্য বিধানে'র জন্য কাজকর্ম করে থাকে (গড়ে প্রায় 40 ভাগ কর্মী যা ছোট শহরের পক্ষে বেশি।)

(B) যারা শহরের বাইরের কাজে লিপ্ত অর্থাৎ মৌলিক কর্মী (basic worker)। এদের কাজ হল শহরের বাইরের লোকদের প্রয়োজন মেটানো। আলেকজান্ডারসন-এর মতে শেষোক্ত ক্রিয়াকলাপ শহরের প্রকৃত বৈশিষ্ট্য তুলে ধরে।

সুতরাং আলেকজান্ডারসন প্রধান বৃত্তি নির্ণয় করতে গিয়ে 1950 সালে যুক্তরাষ্ট্রের ৪64-টি শহরের বিভিন্ন বৃত্তিতে (যেমন প্রশাসন, শিল্প, পরিবহন ও খুচরা ব্যবসা) ন্যূনতম শতকরা কর্মীর ওপর সমীক্ষা চালিয়েছেন। এই ন্যূনতম হার হল মোট কর্মীর 5 শতাংশ। আলেকজান্ডারসন-এর মতে এই ন্যূনতম হারের বেশি কর্মী শহরের বাইরের কাজের জন্য লিপ্ত আছে। যত বেশি কর্মী শহরের বাইরের ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে যুক্ত থাকবে, তত বেশি শহরের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাবে। এর ভিত্তিতে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন শহর ও নগরের শ্রেণীবিভাগ করেছেন। উদাহরণ হিসেবে তিনি দেখিয়েছেন যে কোন শহরের প্রায় 1.4 শতাংশ উপার্জনশীল কর্মী শহরবাসীদের সন্তোষজনক পাইকারী কাজের (Service) জন্য প্রয়োজন। যদি কোন এক শহরে ঐ মান 1.4 শতাংশের চেয়ে খুব বেশি হয়, তবে ঐ শহরকে উল্লেখযোগ্য ব্যবসাকেন্দ্র বলা চলে। শিল্পকর্মীর শ্রেণীবিভাগ করতে গিয়ে তিনি হ্যারিস ও নেলসনের চেয়ে আরও বহুদূর এগিয়েছেন। উদাহরণ হিসেবে তিনি শিল্প শহরগুলোকে প্রাথমিক ধাতব শহর (Primary metal towns), আসবাবপত্র ও কাষ্ঠশিল্প শহর (Furniture & Lumbering towns), বয়ন শিল্প শহর ও রাসায়নিক শহর ইত্যাদি ভাগে ভাগ করেছেন। তিনি সর্বসমেত 36 ধরনের শহরের শ্রেণীবিভাগ করেছেন। তাঁর সমীক্ষিত শহরগুলোর কর্মীর কিছু অংশ নির্মাণ (Construction), ছাপাখানা (Printing) ও খাদ্য তৈরির মত শিল্পে (Food processing) ও সেবামূলক কাজে নিয়োজিত রয়েছে। এছাড়া পরিবহন, খুচরা ব্যবসা, শিক্ষা, স্বাস্থ্যের মত সেবামূলক কাজের সঙ্গে কিছু লোক জড়িত আছে।

আলেকজান্ডারসন কোন শহরেই ৪0 শতাংশের বেশি উপার্জনশীল কর্মীকে শিল্পে লিপ্ত হতে দেখেন নি, তা সে শহর শিল্পক্ষেত্রে যতই উন্নত হোক না কেন। অবশ্য তাঁর আলোচিত মোট শহরের এক তৃতীয়াংশের ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে সেখানকার প্রায় 50 শতাংশ লোক শিল্পে নিযুক্ত।

৫.৬.২.৯ পাওনালের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Pownall) ঃ

এল. এল. পাওনাল (L. L. Pownall) 1950 সালে নিউজিল্যান্ডের 1,000 জনসংখ্যা বিশিষ্ট শহরগুলোর শ্রেণীবিন্যাস করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। তাঁর শ্রেণীবিভাগের সঙ্গে নেলসন-এর শ্রেণীবিভাগের খুব একটা পার্থক্য চোখে পড়ে না। প্রথমে তিনি প্রত্যেক শহরের নিয়োগ কাঠামো নিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি এটা ধরে নিয়েছেন যে প্রত্যেক শহরেই শিল্প, শহরের পরিষেবা ও পণ্যদ্রব্য বণ্টনের সঙ্গে নির্দিষ্ট সংখ্যক কর্মী জড়িত থাকে। যদি এর থেকে অস্বাভাবিক(Abnormal) বেশি কর্মী কোন ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে যুক্ত থাকে, তবে সেই ক্রিয়াকলাপ বেশ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। ঐ অস্বাভাবিক কর্মী সংখ্যা নির্ণয় করতে গিয়ে প্রথমে জাতীয় গড় (Deviation) নির্ণয় করা হয়েছে। এখন জাতীয় গড় থেকে ব্যত্যয় যদি ধনাত্মক(Positive) হয়, তবে তা দিয়ে শহরের বৃত্তি নির্ধারিত হবে। Pownall নিউজিল্যান্ডে 6-টি আলাদা আলাদা ক্রিয়াকলাপ খুঁজে পেয়েছেন ঃ (1) **শিল্প**, (2) **গৃহনির্মাণ**, (3) **প্রাথমিক পর্যায়ের শিল্প**, (4) **পরিবহন ও যাতায়াত**, (5) **বণ্টন ও আর্থিক**(6) **হোটেল ও বৃত্তিমূলক কাজ**। এছাড়া সাত নম্বরে রয়েছে **আবাসিক**(Residential) শহর।

৫.৬.২.১০ বারজেলের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Bergel) ঃ

আগে যে সব শ্রেণীবিভাগের কথা বলা হল তার কোন একটি শ্রেণীবিভাগ সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত নয়। শ্রেণীবিভাগের গতানুগতিক পদ্ধতি থেকে কিছুটা ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায় বারজেল (Bergel)-এর ক্ষেত্রে। তিনি পৌরবসতির

গুণগত বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে তাদের শ্রেণীবিভাগ করেছেন। সংখ্যাতত্ত্বের দিক দিয়ে এই শ্রেণীবিন্যাস সম্পূর্ণ নির্ভুল নয়। তবুও বলা চলে শহর ও নগরের বৈশিষ্ট্যমূলক ক্রিয়াকলাপকে ভিত্তি করে এই শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে বলে এর সামাজিক মূল্যকে অস্বীকার করার উপায় নেই। গুণগত বিচারের দিক দিয়ে একই শহর বা নগরকে বহু কর্মমুখী শহর (Multifunctional town) বলা যেতে পারে। যেমন কোলকাতাকে বন্দর-নগর বলা যায়। আবার আর্থিক কেন্দ্র বললেও ভুল হবে না।

৫.৬.২.১১ ভট্টাচার্য ও ভট্টাচার্যের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Bhattacharyya and Bhattacharyya) ঃ

ভট্টাচার্য ও ভট্টাচার্য (1977) বারজেলের শ্রেণীবিভাগকে অনুসরণ করে ভারতীয় শহর ও নগরকে সাতটি ভাগে ভাগ করেছেন ঃ

(1) **অর্থনৈতিক কেন্দ্র** (Economic Centre), (2) **রাজনৈতিক কেন্দ্র** (Political Centre), (3) **সাংস্কৃতিক কেন্দ্র** (Cultural Centre), (4) **বিনোদনমূলক কেন্দ্র** (Recreational Centre), (5) **আবাসন নগর** (Residential City), (6) **প্রতীকমূলক নগর** (Symbolic City) ও (7) **বহুবিধ কর্মমুখী নগর** (Diversified City)।

আবার অর্থনৈতিক কেন্দ্রের সাতটি উপবিভাগ রয়েছে, যেমন— (A) **প্রাথমিক (নিষ্কর্ষী) উৎপাদনমূলক কেন্দ্র** (Centre of Primary extractive production), (B) **শিল্পকেন্দ্র** (Manufacturing Centre), (C) **বাণিজ্য কেন্দ্র** (Trade Centre), (D) **পরিবহন কেন্দ্র** (Transportation Centre), (E) **অর্থনৈতিক সেবা কেন্দ্র** (Economic Service Centre)।

(A) **প্রাথমিক (নিষ্কর্ষী) উৎপাদন কেন্দ্র** হিসেবে ভট্টাচার্য ও ভট্টাচার্য তিন ধরনের শহরের সন্ধান পেয়েছেন ঃ (i) মৎস শিকার (কুইলন, এর্নাকুলম), (ii) খনি খনন (ঝরিয়া, গিরিডি), (iii) তৈল খনন (ডিগবয়, নাহারকটিয়া)। অনুরূপভাবে (B) **শিল্পকেন্দ্র** হিসেবে তাঁরা (i) বৃহৎ শিল্প (জামশেদপুর, দুর্গাপুর), (ii) মাঝারি শিল্প (টিটাগড়, ভাটপাড়া), (iii) **ছোট শিল্প** (লক্ষ্ণৌ, বারাণসী), (C) **স্থানীয় বাণিজ্য** (প্রায় সমস্ত শহর ও ছোট নগর); (D) **পরিবহন কেন্দ্র** হিসেবে, (i) বন্দর (কোলকাতা, মুম্বাই) (ii) অন্তর্দেশীয় (আসানসোল, শিলিগুড়ি), (E) অর্থনৈতিক সেবাকেন্দ্র হিসেবে (i) আর্থিক সেবা (কোলকাতা, মুম্বাই), (ii) **বীমা** (কোলকাতা মুম্বাই), (iii) বহুবিধ যেমন বাজার গবেষণা, বিজ্ঞাপনের কার্য, হিসাব নিরীক্ষা ইত্যাদি কেন্দ্রের কথা বলেছেন।

(2) রাজনৈতিক কেন্দ্রকে তারা প্রধানত দু'টো ভাগে ভাগ করেছেন, (A) অসামরিক রাজনৈতিক কেন্দ্র (Civil Political Centre)।

(B) সামরিক কেন্দ্র (Military Centre)।

অসামরিক রাজনৈতিক কেন্দ্রের 4টি উপ-বিভাগ রয়েছে— (i) আন্তর্জাতিক (নয়াদিল্লী), (ii) জাতীয় রাজনীতিক (কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক রাজধানী) (iii) আঞ্চলিক রাজনীতিক (প্রাদেশিক রাজধানী), (iv) স্থানীয় প্রশাসনিক কেন্দ্র (সাধারণত জেলা শহর)।

সামরিক কেন্দ্রকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে ঃ (i) দুর্গ (চিতোর, গোয়ালিয়র) ও (ii) সামরিক ঘাঁটি ও শিক্ষা কেন্দ্র (পুনে, দেরাদুন)।

(3) ভট্টাচার্য ও ভট্টাচার্যের মতে সাংস্কৃতিক কেন্দ্র দু'ধরনের— (A) ধর্মীয় কেন্দ্র ও (B) ধর্মনিরপেক্ষ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র।

প্রথমটিকে তাঁরা আরও তিনভাগে ভাগ করেছেন— (i) ধর্মীয় সরকারি কেন্দ্র, (ii) তীর্থকেন্দ্র (বারাণসী, অমৃতসর), (iii) স্মারক কেন্দ্র (Memorial Centre) যথা মথুরা, বৃন্দাবন।

এঁদের মতে ধর্মনিরপেক্ষ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র চার ধরনের ঃ (i) উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা কেন্দ্র (কোলকাতা, মুম্বাই, দিল্লী), (ii) অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক-সৃষ্টিকেন্দ্র (কোলকাতা, মুম্বাই), (iii) যাদুঘর কেন্দ্র (নালন্দা, রাজগীর), (iv) প্রাচীন স্মৃতি ও মন্দির কেন্দ্র (Shrine & Temple Cities) যথা মহাবলিপুরম, পুরী।

(4) **বিনোদনমূলক কেন্দ্র** দু'ধরনের। এক, আরোগ্য কেন্দ্র (পুরী, গোপালপুর), দুই, অবসর বিনোদন কেন্দ্র (প্রায় সমস্ত শৈলাবাস)।

(5) **আবাসন কেন্দ্র** দু'ধরনের— (i) আবাসিক শহরতলি (কোলকাতার উপকণ্ঠে দমদম, বরাহনগর), (ii) অবসর কেন্দ্রিক কেন্দ্র (Retirement Cities)।

(6) **প্রতীকমূলক নগর** (Symbolic Cities)-এই ধরনের পৌরবসতি বিশেষ কোন দেশকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। পন্ডিচেরীর 'অরোভিল' এই রকম এক প্রতীকমূলক কেন্দ্র।

(7) **বহুবিধ ক্রিয়াকলাপ নগর** (Diversified Cities)– বৈশিষ্ট্যহীন অথচ বিভিন্ন রকমের ক্রিয়াকলাপের সাথে যুক্ত পৌরবসতি, যেমন পাটনা।

৫.৬.২.১২ ভারতবর্ষে **V.L.S. Prakash Rao** প্রতিগমন (Regression) পদ্ধতির ভিত্তিতে মহীশূর (কর্ণাটক) রাজ্যের শহরগুলোর শ্রেণীবিভাগ করেছেন। এই পদ্ধতিতে তিনি একটি বিশেষ কর্মধারাতে নিযুক্ত জনসংখ্যার শতকরা হারকে জনসংখ্যার আয়তনের সাথে সমন্বয় ঘটিয়েছেন (Correlate)। মহীশূর (বর্তমান কর্ণাটক) রাজ্যের ক্ষেত্রে তিনি দেখিয়েছেন যে শহরের কাজকর্ম যত বেশি বিশেষীকরণ হচ্ছে, শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকের শতকরা হার সেই অনুপাতে কমছে। সোজা কথায়, তিনি জনসংখ্যার আয়তনের সাথে একটি বিশেষ কর্মধারায় নিযুক্ত জনতার শতকরা হারের সমন্বয় ঘটিয়েছেন। Prakash Rao-র মতে Nelson-র মান থেকে ব্যত্যয় পদ্ধতি সেখানেই ব্যবহার করা যেতে পারে যেখানকার শহরের জনসংখ্যা একই রকম (সংখ্যা), কিন্তু মহীশূরের মতন রাজ্য যেখানে শহরের জনসংখ্যা 10,000 থেকে শুরু হয়ে 2,00,000-র বেশি রয়েছে, সেখানে এই পদ্ধতি কার্যকরী হয় না।

অন্যান্য ভারতীয় ভৌগোলিক যারা ভারতীয় শহর ও নগরের শ্রেণীবিভাগ করেছেন তারা হলেন কাশীনাথ সিং ও অমৃতলাল। মান হইতে ব্যত্যয় পদ্ধতিতে কাশীনাথ সিং উত্তর প্রদেশের শহর ও নগরের শ্রেণীবিভাগ করেছেন। ব্রিটিশ P.E.P. পদ্ধতির মাধ্যমে অমৃতলাল ভারতীয় নগরের শ্রেণীবিভাগ করেছেন।

বরোদা বিশ্ববিদ্যালয়ের V. Janaki প্রধানত শহরের বৃদ্ধির ওপর ভিত্তি করে কেরালা রাজ্যের শহর ও নগরের শ্রেণীবিভাগ করেছেন। এই রাজ্যের শহর ও নগরগুলোকে তিনি পাঁচটি ভাগে ভাগ করেছেন ঃ (A) প্রশাসনিক, (B) বাণিজ্যিক, (C) কৃষি সংগ্রহ ও বণ্টন কেন্দ্র, (D) মন্দির শহর, (E) আবাদী শহর।

মহামায়া মুখার্জী বিহারের শহরগুলোর কর্মভিত্তিক শ্রেণীবিভাগ করতে গিয়ে উদ্বৃত্ত শ্রমিকের ভিত্তিতে শহরগুলোর অর্থনৈতিক ধাঁচ বিশ্লেষণের এক পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। তাঁর মতে যদি কোন স্থানে এক বিশেষ কর্মকাণ্ডে ঐ অঞ্চলের গড়ের চেয়ে বেশি শ্রমিক থাকে তবে তা ঐ স্থানের বেশি শ্রমিক নির্দেশ করবে।

তাঁর শ্রেণীবিভাগের সূচকের সূত্রটি নিম্নরূপ ঃ

$$FI = FI \frac{ei - \frac{ef\ Ei}{Et}}{ef - \frac{Ei}{Et}} \times \left(\frac{ei}{ef} \times 100\right)$$

FI হল কার্যের সূচক, ei স্থানীয় কার্যে নিয়োগ, ef স্থানীয় মোট পরিমাণ, Ei রাজ্যের কার্যে নিয়োগ ও Et হল রাজ্যের মোট নিয়োগ।

বিশেষীকরণ সূচক নির্ণয় করতে সমস্ত কার্যসূচক যোগ করা হল এবং 40-র ব্যবধানে Arithmatic Progression-এ শ্রেণীবিভাগ করা হল।

A. Ramesh নেলসনের পদ্ধতি অনুসরণ করে কর্মের ভিত্তির তামিলনাড়ুর শহরগুলোর শ্রেণীবিভাগ করেছেন।

P. S. Tiwari পৌর কার্যাবলীর বহুচলক (Multivariate) বিশ্লেষণের ভিত্তিতে মধ্যপ্রদেশের শহরগুলোর শ্রেণীবিভাগ করেছেন। কার্যাবলীর বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে তিনি পৌর বসতিগুলোকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করেছেন এবং তাদের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করেছেন।

1961 সালের বৃত্তির কাঠামোর (Occupational Structure) ভিত্তিতে V.N.P. Sinha ছোটনাগপুর মালভূমির শহরগুলোর শ্রেণীবিভাগ করেছেন। তাঁর কার্যাবলীর সূচক নিম্নরূপ ঃ

$$F.I. = \left(\frac{Nw \times 10}{TW} \quad \frac{PW \times 100}{TN}\right)^2$$

এখানে Nw হল শহরগুলোর একটি নির্দিষ্ট কার্যে শ্রমিকের সংখ্যা, TW অঞ্চলের বিশেষ পৌর কার্যে মোট শ্রমিক, PW শহরের সমস্ত কাজে শ্রমিকের সংখ্যা ও TN হল শহরের পৌর শ্রমিকের মোট সংখ্যা। V. N. P. Sinha নিম্নোক্ত সূত্র প্রয়োগ করে বিশেষীকরণ সূচক নির্ণয় করেছেন ঃ

$$\text{বিশেষীকরণ সূচক} = \frac{FIA + FIMI + FIH + FIM + FIC + FITC + FIT + FIO}{8\ (\text{কার্যাবলীর সংখ্যা})}$$

FI-A, M, H, M, C, Tc, T ও O যথাক্রমে কৃষি, খনি, কুটির শিল্প, যন্ত্রশিল্প, নির্মাণ, ব্যবসা-বাণিজ্য, পরিবহন ও অন্যান্য কার্যসূচক মান নির্দেশ করে।

৫.৬.৩ আয়তনের ভিত্তিতে শহর ও নগরের শ্রেণীবিভাগ (Classification of towns according to size) ঃ

শহরকে জনসংখ্যার ভিত্তিতে ছোট শহর, মাঝারি শহর, নগর ও মেট্রোপলিস্-এই চার ভাগে ভাগ করা যায়। কোন পৌর এলাকায় জনসংখ্যার আয়তন এবং প্রতি বর্গ কিমি-তে জনঘনত্বের ভিত্তিতে এই শ্রেণীবিভাগ করা হয়।

50,000-র কম জনসংখ্যা-অধ্যুষিত পৌরবসতি হল ছোট শহর, 50,000 থেকে99,999 পর্যন্ত জনসংখ্যার শহরকে আমরা মাঝারি শহর বলব, 1,00,000-র বেশি নগর এবং 1,000,000 মহানগর।

শহরের শ্রেণীবিভাগ	জনসংখ্যা	উদাহরণ
ছোট শহর	50,000-র কম	মিরাট
মাঝারি শহর	50,000-99,999	পাটনা
নগর	1,00,000	ব্যাঙ্গালোর
মহানগর	1,000,000	কোলকাতা

ভারতীয় জনগণনা বিভাগের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Cities by Census Organisation) ঃ ভারতের জনগণনা বিভাগ জনসংখ্যার আয়তনের ভিত্তিতে ভারতের শহরগুলোকে ছয় ভাগে ভাগ করেছে। যথা

শহরের শ্রেণীবিভাগ	জনসংখ্যা
প্রথম শ্রেণীর শহর (Class I Town)	এক লক্ষ ও তার বেশি জনসংখ্যা
দ্বিতীয় শ্রেণীর শহর (Class II Town)	50,00-99,999
তৃতীয় শ্রেণীর শহর (Class III Town)	20,000-49,999
চতুর্থ শ্রেণীর শহর (Class IV Town)	10,000-19,999
পঞ্চম শ্রেণীর শহর (Class V Town)	5,000-9,999
ষষ্ঠ শ্রেণীর শহর (Class VI Town)	5,000-র কম জনসংখ্যা।

নগরকেও তাদের জনসংখ্যার ভিত্তিতে ভাগ করা যায়। 1991 সালের জনগণনায় এরকমটি করা হয়েছে (i) সবার ওপরে রয়েছে মেট্রোপলিটন বা মহানগর ঃ 1,000,000 ও তার বেশি জনসংখ্যা-অধ্যুষিত মহানগর। একে আবার তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। নীচের সারণি দ্রষ্টব্য। (ii) সবার নীচে রয়েছে নগর। জনসংখ্যার ভিত্তিতে বিভিন্ন মানের নগরকে আমরা এইভাবে আখ্যায়িত করতে পারি ঃ (a) দু' লক্ষ লোকের কম ছোট নগর, (b) তিন লক্ষের কম মাঝারি নগর, (c) পাঁচ লক্ষের কম মধ্যম মাঝারি নগর, (d) 10 লক্ষের কম উপ-মহানগর।

সারণি

জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রথম শ্রেণীর নগর / পৌরপিণ্ডের বণ্টন* (1991)

জনসংখ্যার আয়তন	নগর/পৌর	জনসংখ্যা পিণ্ডের সংখ্যা	প্রথম শ্রেণীর নগর পৌরপিণ্ডের জনসংখ্যার শতকরা হার
মোট প্রথম শ্রেণীর শহর	300	139,730,050	100.00
2,00,000-র কম	167	22,939,086	16.42
2,00,000-2,99,999	40	9,606,814	6.88
3,00,000-4,99,999	40	15,586,157	11.15
5,00,000-9,99,999	30	20,936,734	14.98
1,000,000 ও তার বেশি	23	70,661,257	50.57

জনসংখ্যার আয়তন	নগর/পৌর পিণ্ডের সংখ্যা	জনসংখ্যা	প্রথম শ্রেণীর নগর পৌরপিণ্ডের জনসংখ্যার শতকরা হার
(i) 1,000,000-1,999,999	14	17,175,849	12.29
(ii) 2,000,000-4999,999	5	16,260,762	11.64
(iii) 5,000,000 ও বেশি	4	37,224,646	26.64

*জম্মু ও কাশ্মীর বাদে

উৎস : Census of India, 1991, Paper 2 of 1991. Provisional Population Totals : Rural - Urban Distribution, P.35.

৫.৭ সারাংশ

এই একটি পাঠে আমরা কী কী জানলাম সেগুলো একটু মনে করে নিই আসুন ঃ

- শহরের কায়িক গঠন সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ — এককেন্দ্রিক মতবাদ, বৃত্তকলা মতবাদ ও বহু কেন্দ্রিক মতবাদ।
- কেন্দ্রীয় স্থানের সংজ্ঞা, কেন্দ্রীয় মানদণ্ড বা নিরিখ এবং এ বিষয়কে গডলান্ডের সূত্র; কেন্দ্রীয় ঋণের বৈশিষ্ট্য সমূহ যেমন : সীমা ও পরিসর, ছোট শহর ও বড় নগর, বাজার এলাকা ইত্যাদি। কী শর্তে কেন্দ্রীয় স্থান গড়ে ওঠে। এই প্রসঙ্গে বিভিন্ন মডেলের আলোচনাও আমরা করেছি।
- কেন্দ্রীয় বাণিজ্য এলাকাকে C.B.D ও বলা হয়। শহরের প্রধান বাণিজ্য স্থানকে এই নামে অভিহিত করা হয়। ভারতীয় বিজ্ঞানীরা এর সুন্দর সংজ্ঞা দিয়েছেন। বিভিন্ন কতগুলি সূচকের সাহায্যে এই এলাকার সীমা নির্ধারণ করা যায়। এই এলাকা অপরিবর্তনীয় নয়।
- হরউড ও বয়েস্-এর 'দি কোর-ফ্রেম মডেল' C.B.D-র এলাকা বিস্তারের তাত্ত্বিক আলোচনা করেছে।
- ঐতিহাসিক দুর্গ ও সামরিক শহর প্রতিরক্ষার কারণে সৃষ্টি হয়েছিল। চেস্টার, লিংকন, ইয়র্ক, স্কারবরো প্রভৃতি এই দলে পড়ে।
- ধর্মীয় বিশ্বাস ও বিশেষ ধরনের সাংস্কৃতিক কর্মসূচীকে ভিত্তি করে ধর্মীয় ও সংস্কৃতিক শহর গড়ে ওঠে। লাসা, জেরুজালেম, ক্যান্টারবেরি এ ধরনের শহর।
- প্রশাসনিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ শহরই প্রশাসনিক শহর। তবে এতে যে শুধু দেশের রাজধানীকেই বোঝায়, তা প্রদেশ, বিভাগ, জেলা, মহকুমা ও অন্যান্য প্রশাসনিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিভাগও বোঝায়। বর্তমানে প্রশাসন পঞ্চায়েত স্তরে পরিব্যাপ্ত হওয়ায় অনেক ছোট শহরও এই ভাগে পড়ে।
- কাঁচামাল সংগ্রহ ভিত্তিক শহরকে বলে সংগ্রাহক শহর। দেশের অর্থনীতির পক্ষে এদের গুরুত্ব খুব বেশি।
- উৎপাদন কেন্দ্র বিভিন্ন শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।
- উৎপাদিত শিল্পের স্থানান্তকরণ ও বিতরণের কেন্দ্র হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায় — বাজার শহর ও বন্দর।
- সমাজতাত্ত্বিক ও ভৌগোলিকের চোখে শহর ও নগরের শ্রেণীবিভাগ এক বিশেষ মাত্রা পায়।

  B.B. Mandal, অরোসু, ম্যাকেঞ্জী, স্মিথ ও নীড্লার, হ্যারিস, নেলস, আলেকজান্ডারসন, পাওনাল, বারজেস,

ভট্টাচার্য ও ভট্টাচার্য, ডি-এল্-প্রকাশ রাও প্রমুখ ভৌগোলিকরা নিজের নিজের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে শহরের শ্রেণীবিভাগ করেছেন।

৫.৮ সর্বশেষ প্রশ্নাবলি

1. শহরের কায়িক গঠন সম্পর্কিত মতবাদগুলি কী কী? বিভিন্ন মতবাদের পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি দিন।
2. শহরের কায়িক গঠন সম্পর্কে মান-এর সমন্বয় প্রয়াস ব্যাখ্যা করুন।
3. কেন্দ্রীয় স্থান এলাকা গড়ে ওঠার পূর্ব শর্তগুলি আলোচনা করুন।
4. কেন্দ্রীয় স্থান এলাকা গড়ে ওঠার ক্রিস্টলারের তত্ত্ব চিত্র সহ আলোচনা করুন।
5. কেন্দ্রীয় বাণিজ্য এলাকা বলতে কী বোঝেন? ভারতীয় বিজ্ঞানীরা কীভাবে এর সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন? উদাহরণ দিয়ে বোঝান।
6. কেন্দ্রীয় বাণিজ্য এলাকার বৈশিষ্ট্য সমূহ আলোচনা করুন। কীভাবে এর সীমা নির্দেশ করা যায়?
7. C. B. D.-র এলাকা কী অপরিবর্তনীয়? আলোচনা করুন।
8. কোর ফ্রেম মডেল বলতে কী বোঝেন? এর উদ্ভাবক কে? এর লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যই বা কী?
9. দুর্গ ও সামরিক শহর কী ভাবে গড়ে ওঠে? কয়েকটি এরূপ শহরের উদাহরণ দিন।
10. লাসা ও জেরুসালেম কোন্ গোত্রের শহর? এই ধরনের শহর সম্বন্ধে কী জানেন?
11. "প্রশাসনিক শহর বলতে শুধু দেশের রাজধানীকেই বোঝায় না।" — ব্যাখ্যা করুন। ভারতবর্ষ ও পৃথিবীর কয়েকটি প্রশাসনিক শহরের নাম ও বৈশিষ্ট্য লিখুন।
12. সংগ্রাহক শহর বলতে কী বোঝেন? বিভিন্ন ধরনের সংগ্রাহক শহরের বিবরণ দিন।
13. উৎপাদন কেন্দ্র কী? এই ধরনের শহরের বৈশিষ্ট্যগুলি বিবৃত করুন।
14. 'স্থানান্তরকরণ ও বিতরণ কেন্দ্র' শ্রেণীভুক্ত শহরগুলি উপশ্রেণীর নাম করুন ও তাদের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।
15. বিভিন্ন ধরনের বন্দর সম্বন্ধে ধারণা দিন।
16. একই শহর বিভিন্ন শ্রেণীর শহরের প্রতিনিধিত্ব করে — এরূপ একটি উদাহরণ দিন ও বিভিন্ন ভূমিকা বুঝিয়ে বলুন।
17. টীকা লিখুন ঃ আর্থিক কেন্দ্র, অবসরকালীন শহর, ও কর্মভিত্তিক শহর।
18. উপনগরী ও ডরমিটরি শহর — এদের মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কি? ভারতবর্ষ ও যুক্তরাষ্ট্র উপনগরী সমূহের ধারণা দিন।
19. বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে শহর ও নগরের শ্রেণীবিভাগ আলোচনা করুন।
20. 'পৌর বসতি বিকাশ চক্র' — ধারণাটি কার? সংক্ষেপে এই চক্র আলোচনা করুন।
21. অরোসু কোন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে শহরের আলোচনা করেছেন? এই শ্রেণীবিভাগের একটি ধারণা দিন।
22. টীকা লিখুন : ম্যাকেঞ্জির শ্রেণীবিভাগ, স্মিথ্ ও নিড্লার-এর শ্রেণীবিভাগ; হ্যারিসের শ্রেণীবিভাগ;

আলেকজান্ডারসনের শ্রেণীবিভাগ; পাওনালের শ্রেণীবিভাগ; বার্জেলের শ্রেণীবিভাগ।

23. নেলসনের শহর শ্রেণীবিভাগ সূত্রটি বিবৃত ও ব্যাখ্যা করুন।

24. ভট্টাচার্য ও ভট্টাচার্যের শহরের শ্রেণীবিভাগগুলি আলোচনা করুন।

25. শহরের শ্রেণীবিভাগের ক্ষেত্রে ভারতীয়দের অবদান আলোচনা করুন।

৫.৯ উত্তরমালা

১. ৫.২ অংশ দেখুন।
২. ৫.২.২ অংশ দেখুন।
৩. ৫.৩.৪ অংশ দেখুন।
৪. ৫.৩.৪ অংশ দেখুন।
৫. ৫.৪ অংশ দেখুন।
৬. ৫.৪.১ ও ৫.৪.২ দেখুন।
৭. ৫.৪.২ অংশ দেখুন।
৮. ৫.৪.৩ অংশ দেখুন।
৯. ৫.৫.১ অংশ দেখুন।
১০. ৫.৫.২ অংশ দেখুন।
১১. ৫.৫.৩ অংশ দেখুন।
১২. ৫.৫.৪ অংশ দেখুন।
১৩. ৫.৫.৫ অংশ দেখুন।
১৪. ৫.৫.৬ অংশ দেখুন।
১৫. ৫.৫.৬ অংশ দেখুন।
১৬. উপরের অংশগুলি থেকে নিজে চেষ্টা করুন।
যেমন, দার্জিলিংকে ধরতে পারেন।
১৭. ৫.৫.৭, ৫.৫.৮ ও ৫.৫.১০ অংশ দেখুন।
১৮. ৫.৫.৯ অংশ দেখুন।
১৯. ৫.৬ অংশ দেখুন।
২০. ৫.৬.২.১ অংশ দেখুন।
২১. ৫.৬.২.২ অংশ দেখুন।
২২. ৫.৬ অংশের সংশ্লিষ্ট অংশগুলি দেখুন।
২৩. ৫.৬.২.৭ অংশ দেখুন
২৪. ৫.৬.২.১১ ও ৫.৬.২.১২ অংশ দেখুন।

একক ৬ ❑ সামাজিক সত্তা হিসেবে নগর (City as a Social Organism) শহর ও নগরের সমস্যা ও সমাধান (Problems of Towns and Cities and Remedies thereof)

গঠন

৬.১ প্রস্তাবনা

উদ্দেশ্য

৬.২ সমাজের সংস্কৃতি, অর্থনীতি, কারিগরী ও আচরণের প্রতিফলন হিসেবে নগর

৬.২.১ অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে শহর

৬.২.২ কারিগরী প্রেক্ষাপটে শহর

৬.২.৩ সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে শহর

৬.২.৪ সমাজের প্রতিফলক রূপে শহর

৬.২.৫ মহানগরীতে লোকসমাজ

৬.২.৬ সামাজিক সত্ত্বা বা অস্তিত্ব হিসেবে নগরের সূচক সমূহ

৬.৩ নানাবিধ পৌর সমস্যা

৬.৩.১ পৌরসংকট

৬.৩.২ পৌরবিক্ষেপণ

৬.৩.৩ বাসস্থানের সমস্যা

৬.৩.৪ কর্মস্থলে দীর্ঘ যাতায়াতের সমস্যা

৬.৩.৫ নগরকেন্দ্র ও চতুষ্পার্শ্বস্থ পার্থক্য

৬.৩.৬ দারিদ্র ও পৌর দুর্গতি

৬.৩.৭ স্বাস্থ্য সমস্যা

৬.৩.৮ অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংকট

৬.৩.৯ কর্মের সমস্যা

৬.৩.১০ সামাজিক সমস্যা

৬.৩.১১ গ্রামীণ জনতার শহরে আগমন

৬.৩.১২ একই পৌর নীতির প্রণয়ন

৬.৩.১৩ আনুষঙ্গিক সুবিধার ব্যবস্থা

৬.৩.১৪ শহরতলির সমস্যা

৬.৩.১৫ ঐতিহাসিক বস্তু রক্ষণাবেক্ষণের সমস্যা

৬.৩.১৬ পরিবেশ সমস্যা

৬.৩.১৭ কিশোর অপরাধ

৬.৪ নগর পরিকল্পনা

৬.৪.১ পরিকল্পনার তাৎপর্য

৬.৪.২ পরিকল্পনার সামাজিক দিক ও আইন

৬.৫ সারাংশ

৬.৬ সর্বশেষ প্রশ্নাবলি

৬.৭ উত্তরমালা

৬.৮ গ্রন্থ নির্দেশিকা

৬.১ প্রস্তাবনা

মানুষের শরীরে যেমন বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ রয়েছে এবং এক এক অঙ্গের যেমন এক এক ধরনের কাজ, তেমনি শহর বা নগরের ভাবমূর্তি প্রকাশ পায় তার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের মধ্যে। শুধুমাত্র একটি পৌর বসতি হিসেবে নয়, সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পৌর বসতির অস্তিত্বের প্রকাশ পায় তার বিভিন্ন কর্মধারার মাধ্যমে। পৌরবাসীদের পরিষেবা, আশপাশের গ্রামবাসীদের বিভিন্ন পরিষেবা, নগরের বাড়বৃদ্ধির জন্য অর্থের সংস্থান করা এ সবই শহর বা নগরের সাধারণ ক্রিয়াকর্মের মধ্যে পড়ে। শহর বা নগরের গুরুত্বপূর্ণ ক্রিয়াকলাপ হল ব্যবসা বাণিজ্য শিল্পকর্ম (চিত্র 1.5.3) ইত্যাদি। শহরের ক্রিয়াকলাপ কি কি দিক দিয়ে নগর জীবনের ওপর প্রভাব ফেলে, তার কয়েকটি নিয়ে এখানে আলোচনা করা হ'ল। শহর বৃদ্ধির সাথে সাথে কিছু কিছু সমস্যার সৃষ্টি হয়। এই সব সমস্যার বেশিরভাগই জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে জড়িত, আবার কিছু কিছু সমস্যা আছে যা শহরের বাহ্যিক বৃদ্ধির ফলে ঘটে থাকে।

শহরের বৃদ্ধি দু'ভাগে ঘটে থাকে। (এক) স্বাভাবিক বৃদ্ধি, (দুই) গ্রাম্য জনতার শহরাভিমুখী অভিযান। গ্রাম্য সম্পদের তুলনায় অত্যধিক জনসংখ্যার চাপ, শহরে জীবিকার্জনের সুযোগ, শহরের চাকচিক্য ও তার প্রতি মোহ, নিরাপত্তা, শিক্ষা ও অন্যান্য সুবিধা গ্রাম্য জনতাকে শহরাভিমুখী করে তুলেছে। শহরাভিমুখী এই স্রোত গত ১৫০ বছরে এত প্রবল হয়েছে যে শহর ও গ্রামের জনবণ্টনে বিরাট পার্থক্য ঘটেছে। শিল্পোন্নত দেশগুলোতে শহরের দিকে গ্রামীণ জনতার পরিযান ঘটলেও বর্তমানে উন্নত দেশগুলোতে পৌরায়ণের গতি স্বাভাবিক বৃদ্ধির ওপর নির্ভরশীল।

সেই তুলনায় ঢাকার পৌরায়ণের হার বছরে ১৬ শতাংশ, লিমা ও কিনসাসায় প্রায় ১২ শতাংশ। এই দ্রুত পৌরায়ণের হার বেশ কিছু সমস্যার সৃষ্টি করেছে।

উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে আপনার যে সব বিষয় জানবেন সেগুলো হল ঃ

- অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে শহর,
- সমাজের প্রতিফলকরূপে শহর,
- মহানগরীতে লোকসমাজ,
- সামাজিক সত্ত্বা হিসাবে নগরের সূচক সমূহ,
- তৃতীয় বিশ্বের শহরগুলোর সমস্যা,
- অপরিকল্পিত শহর বৃদ্ধি কী ঋণের সমস্যা সৃষ্টি করে,
- এ সব সমস্যার সমাধান কীভাবে করা হয়।

৬.২ সমাজের সংস্কৃতি, অর্থনীতি, কারিগরী ও আচরণের প্রতিফলক হিসেবে নগর (City as a reflection of culture, economy, technology and behaviour of the society)

৬.২.১ অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে শহর ঃ

অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটের শহরের আলোচনায় প্রথমেই এসে পড়ে শহর কি? শহর হল অকৃষি এলাকা। শহর বা নগর আবার বিনিময় কেন্দ্রও বটে। শহর বা নগর কখনই পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সৃষ্টি হতে পারে না। কারণ শহরবাসীদের খাদ্যের জন্য আশেপাশের কৃষি এলাকার (গ্রামের) ওপর নির্ভর করতে হবে। শহরবাসীদের প্রয়োজনীয় বিভিন্ন প্রকার খাদ্যসামগ্রী যা শহরে উৎপাদিত হয় না তা এই গ্রামীণ এলাকা থেকেই আসে। পক্ষান্তরে উচ্চশিক্ষা, চিকিৎসা, আমোদপ্রমোদ ইত্যাদির জন্য গ্রামবাসীদের শহরের মুখাপেক্ষী হতে হয়। "Cities do not grow up of themselves. Countrysides set them up to do tasks that must be performed in central places" (Jefferson). কোন নগরী একা একা বাঁচতে পারে না। এটি অন্য এলাকাকে পরিষেবা করে থাকে, যা নগরের বাজার অঞ্চল (Market region) সৃষ্টি করে থাকে। পরিবর্তে ঐ অঞ্চল নগরকে পরিষেবা করে থাকে। বস্তুতপক্ষে, নগর ও তার অঞ্চলের মধ্যে দৃঢ়তম বন্ধন হল আর্থিক সংযোগ। কারণ নগরের আর্থিক জীবন তার অঞ্চলের আর্থিক জীবনের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

শহরের অর্থ উপার্জনের একটি অংশ শহরবাসীদের পরিষেবার (রাস্তাঘাট পরিষ্কার, আলোর ব্যবস্থা, প্রাথমিক শিক্ষা, সাধারণ চিকিৎসা ইত্যাদি) জন্য ব্যয়িত হয়। অপরদিকে, শহরের উন্নয়নের জন্য আর্থিক সংস্থান করা শহরের একটি অতি অবশ্য কর্তব্য। সত্যি বলতে কি, এটি শহরের আর্থিক ভিত।

Jefferson-এর মতে যেহেতু এটি শহরে অর্থ আনয়নের চেষ্টা করে তাই এটি হল আর্থিক ভিত। তাই একে মৌলিক বা basic কর্মধারা, আর শহরবাসীদের পরিষেবাকে বলা হয় গৌণ বা non-basic কর্মধারা। মৌলিক কর্মধারা হল "Those activities which bring into the community purchasing power from outside". (Ratcliff, 1949).

এখন প্রশ্ন হল শহরের আর্থিক ভিত্তির উৎস কি কি? ব্যবসা বাণিজ্য, শিল্প, পর্যটন (যদি থাকে)। এগুলো থেকে শহরের আর্থিক আয়ের পথ প্রশস্ত হয়। আর এ জন্য প্রথমেই প্রয়োজন হয় পরিবহন ব্যবস্থার। কারণ উন্নত পরিবহন ব্যবস্থায় শিল্পজাত দ্রব্য বা ব্যবস্থা বাণিজ্যের দ্রব্যাদি বাইরে পাঠানো বা আনয়ন সম্ভবপর হয়। এইভাবে দ্রব্য বিনিময়ের মাধ্যমে স্থায়ী বাজার গড়ে ওঠে, যা অল্পকালের মধ্যে পৌরবসতিতে রূপান্তরিত হয়। যেহেতু শহর হল অ-কৃষি এলাকা তাই এখানে ব্যবসা বাণিজ্যে প্রভাব বেশি। যে শহরের ব্যবসা বাণিজ্যের প্রভাব এবং তাতে নিয়োজিত মানুষের সংখ্যা যত বেশি, সেই শহর বা নগরের তত বিকাশ ঘটবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে দেশীয় অপেক্ষা মহাদেশীয়, আবার মহাদেশীয় অপেক্ষা অন্তর্মহাদেশীয় ব্যবসা বাণিজ্যের প্রভাব নগরের উন্নতিতে বেশি গুরুত্ব পায়। অতীতেও মহাদেশীয় বাণিজ্য বড় বড় পৌরবসতি সৃষ্টিতে সাহায্য করেছে (ভট্টাচার্য ও ভট্টাচার্য, 1977)। পৌরবসতির উৎপত্তির ক্ষেত্রে পরিবহন যুগ যুগ ধরে প্রভাব বিস্তার করে আসছে। অতীতে দেখা গেছে স্থলপথের সংযোগস্থলে কিংবা নদীর ধারে পৌরবসতি সৃষ্টি হয়েছে। পূর্বে জলপথই ছিল পরিবহনের একমাত্র অবলম্বন। আজও দেখা যায় জলপথে আন্তর্মহাদেশীয় বাণিজ্যকে কেন্দ্র করে সমুদ্র বা নদীবন্দরের তীরে গড়ে ওঠা পৌরবসতির নগর ও মহানগরে রূপান্তরিত হয়েছে। (ভট্টাচার্য ও ভট্টাচার্য, 1977)। যেমন যুক্তরাষ্ট্রের উপকূলে সৃষ্টি পৌরমহাপুঞ্জ।

৬.২.২ কারিগরী প্রেক্ষাপটে শহর ঃ

পৌরায়ণের ওপর কারিগরী প্রভাব যথেষ্ট। কারিগরী বিদ্যার প্রকাশ দেখা যায় শিল্পায়নের মাধ্যমে। যে সব দেশ শিল্পায়নে যত বেশি উন্নত, সেই সব দেশ পৌরায়ণের দিক থেকে তত এগিয়ে। শিল্পোন্নত যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের পৌরায়ণের চিত্র এ কথাই প্রমাণিত করে। পক্ষান্তরে ভারত, আফ্রিকা, এশিয়া ও দক্ষিণ আমেরিকার অনেক অগ্রসর দেশেই পৌরায়ণের মাত্রা খুব কম। স্বাধীনতার আগে এদেশে ভারী শিল্প ছিল হাতে গোনা। স্বাধীনতার প্রায় 50 বছর পরেও এদেশে পৌরায়ণের হার মাত্র 27 শতাংশ।

শিল্পভিত্তিক ক্রিয়াকলাপ দু'ধরনের হয়ে থাকে ঃ শিল্প ও খনিকে কেন্দ্র করে। শহর গড়ে ওঠার সময় মুদ্রণশিল্প, বেকারীশিল্প, খাদ্যশিল্প, মেরামতি শিল্প গড়ে ওঠে। শহরের বাড় বাড়ন্তের সাথে সাথে ও বাইরের অঞ্চলের চাহিদা বাড়ার সাথে সাথে শিল্পক্ষেত্রে বৈচিত্র্য আসে। শিল্পের বৈচিত্র্য ও জটিলতা অনেকাংশে দেশের বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী দক্ষতার ওপর নির্ভর করে। যেমন পেট্রো-কেমিক্যাল শিল্পের মত জটিল শিল্প আধুনিক সভ্যতার দান। একটি ভারী শিল্প বহুবিধ আনুষঙ্গিক শিল্পের জন্ম দেয় ও একটি শিল্পাঞ্চল সৃষ্টি করে। যেমন দুর্গাপুরে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পকে কেন্দ্র করে আনুষঙ্গিক বহু শিল্পের সৃষ্টি হয়েছে। যে সব স্থানে বড় মাপের শিল্প গড়ে ওঠে, সেখানেই পৌরবসতি গড়ে ওঠে।

খনিকে কেন্দ্র করেও শহরের উৎপত্তি হতে দেখা যায়। ঝরিয়া, রাণীগঞ্জ, বোকারো, গিরিডি ইত্যাদি কয়লাখনি, দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গের হীরার খনি, রাশিয়ার বাকু, গজনীর খনির তেল, জার্মানীর এসেন কয়লার খনি, যুক্তরাজ্যের ম্যানচেস্টার, শেফিল্ড, লীডস, ডারহাম কয়লাখনিকে কেন্দ্র করে পৌরবসতি গড়ে উঠেছে। অনেক ক্ষেত্রে খনিজ পদার্থ উত্তোলন জটিলাকার ধারণ করে। যে দেশ কারিগরী বিদ্যায় যত উন্নত সেখানে খনি উত্তোলন তত সহজ ও ব্যাপক হয়। যেমন কয়লাকে কেন্দ্র করে অনেক সময় বহুবিধ ভারি শিল্প তৈরি হয়। যেহেতু কয়লা ও

আকরিক লোহা ওজনে ভারি, শিল্পে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয় এবং পরিবহনের খরচ অনেক বেশি তাই এই সব কাঁচামাল খনি অঞ্চলে নানা প্রকার শিল্পকে আকর্ষণ করে থাকে ও ওইসব স্থানে পৌরায়ণ দ্রুত করে তোলে ()।

৬.২.৩ সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে শহর ঃ

শহর হল আধুনিক সভ্যতার পীঠস্থান। এখানে শিল্প, সংস্কৃতি, জ্ঞান-বিজ্ঞান, ধর্মচর্চা, চিত্রকলা, শিল্পের সমাবেশ ঘটে। এসব সাংস্কৃতিক উপাদানগুলো ছাড়া কোন শহরকে ভাবা যায় না। যে শহর যত বড়, তার সাংস্কৃতিক ভিত্তি তত সুদৃঢ়। আমরা আগেই জেনেছি যে শহর হল অ-কৃষি এলাকা। শহর গড়ে উঠতে গেলে প্রথমেই প্রয়োজন উদ্বৃত্ত খাদ্যের একস্থানে সংগ্রহ হবার মত অবস্থা। সমাজ এই অবস্থায় না পৌঁছালে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার সুযোগ হয় না। নগর সামাজিক ঐতিহ্যের আধার। তাই দেখা যায় আদিম, স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনীতি ব্যবস্থায় বা অপ্রতুল সম্পদ এলাকায় নগরের সংখ্যা খুব কম, বা সেগুলো আয়তনে ছোট।

শহরের শৈশব অবস্থায় মানুষের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় সমস্যাগুলোর সমাধান প্রাধান্য পায়। ধীরে ধীরে মানুষের সাংস্কৃতিক চাহিদা মেটাতে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ, প্রেক্ষাগৃহ, কমিউনিটি হল, স্টেডিয়াম হাসপাতাল গড়ে ওঠে। শিলিগুড়ি ও কোলকাতা শহরের বিবর্তনে আমরা দেখছিলাম যে শহর সৃষ্টির প্রথমাবস্থায় মানুষ তার রোজকার সমস্যা নিয়েই ব্যতিব্যস্ত থেকেছে। কিন্তু পারিপার্শ্বিক অবস্থা ক্রমশ অনুকূল হয়ে ওঠায় মানুষ চিত্ত বিনোদন করার কথা চিন্তা করতে পেরেছে। আয়তন ও জনসংখ্যায় শহর যত বাড়বে, মানুষের সুকোমল বৃত্তিগুলোর তত বিকাশ ঘটবে। আমরা আগেই জেনেছি যে শহর যত বড় হবে তার সাংস্কৃতিক বিনোদনের উপকরণও তত বেশি হবে। তাই দেখা যায় কোলকাতা মহানগরে চিড়িয়াখানা, যাদুঘর, তারামণ্ডল, নন্দন, অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস, জাতীয় গ্রন্থাগার, নিক্কো পার্ক, সায়েন্স সিটি, ঢাকুরিয়া সরোবর, সুভাষ সরোবরের মত চিত্ত বিকাশের বহুবিধ উপকরণ রয়েছে। এককালে, এমন কি ষাটের দশকেও কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাব বলয় ছিল বহুদূরব্যাপী বিস্তৃত। বিশ্বের অন্যতম সেরা বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে এক সময় বিদেশ থেকে বহু ছাত্র এখানে পড়তে আসত। একই কথা প্রযোজ্য কোলকাতার সুপ্রাচীন চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কোলকাতা মেডিক্যাল কলেজ সম্বন্ধে।

এবার শহরে সংস্কৃতির অন্যতম উপকরণ ধর্ম প্রসঙ্গে আসা যাক। ল্যাটিন আমেরিকার কোন কোন স্থানে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার কম। এখানে সামাজিক ও ধর্মীয় কেন্দ্র হিসাবে নির্দিষ্ট দূরত্বে বসতি বিকাশ লাভ করেছে। রবিবার হচ্ছে এই বসতিগুলোর ব্যস্ততম দিন। এই দিন আশেপাশের লোকজন গির্জায় জড়ো হয়ে ছুটির দিনের আমোদপ্রমোদে মেতে ওঠে। এই সব শহরগুলোকে 'সাণ্ডে টাউন' (Sunday Town) ও বলে (Harris and Ullman)। এ প্রসঙ্গে বেনারস, গয়া, এলাহাবাদ, হরিদ্বার, তিরুপতি, বৃন্দাবন, পুরী, মথুরা, নবদ্বীপ, জম্মু, আজমীর, মাদুরাই প্রভৃতি শহরের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে, যেখানে তীর্থযাত্রীর সংখ্যা কোনকালেই নগণ্য নয়। ধর্মের পাশাপাশি সংস্কৃত চর্চা এদের মধ্যে অনেকগুলো শহরকে বিশিষ্টতা দান করেছে। যেমন পুরী, বেনারস, নবদ্বীপ, বৃন্দাবন। বেনারসে একটি সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় ও একটি হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। পুরী ও নবদ্বীপে সংস্কৃত চর্চা হয়। ধর্মীয় স্থানগুলোর একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য থাকে। তা হল তীর্থযাত্রীরা ধর্মস্থানে মনস্কামনা উপলক্ষে নানারকম পুজোপচার দেব-দেবীকে নিবেদন করে। সাধারণত ঐ সব প্রয়োজনীয় দ্রব্যকে কেন্দ্র করে নানা প্রকার শিল্পকলা ও ব্যবসা বাণিজ্যের সৃষ্টি হয়, যেমন পুরীতে কটকি বস্ত্র, এপলিক শিল্প (কাপড়ের ওপর সূক্ষ্ম কাজ), বেনারসে তামা-পিতলের বাসন, বস্ত্রবয়ন। তা ছাড়া, তীর্থ বা ভ্রমণের উদ্দেশ্যে ঐসব শহরে যারা আসে, তাদের থাকা, খাওয়ার জন্য ধর্মশালা, হোটেল ইত্যাদি গড়ে ওঠে। ব্যবসা বাণিজ্য ধর্মীয় শহরগুলোকে এক নতুন পরিচয় দেয়। যেহেতু তীর্থস্থানগুলো পুরনো, তাই এই সব শহরগুলো ঘিঞ্জি । বাড়িগুলো গায়ে গায়ে তৈরি হয়েছে। সেগুলোতে আলো

বাতাস ঢোকে না, রাস্তাগুলো খুব সরু। ফলে এই সব শহরে যানজট এক নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। ধর্মীয় শহরগুলোর আর একটি বৈশিষ্ট্য হল যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পুরনো শহরের পাশেই নতুন শহর গড়ে উঠতে দেখা যায়। এগুলোতে বসবাসের উপযোগী পরিবেশ রয়েছে।

৬.২.৪ সমাজের প্রতিফলকরূপে শহর (City as Behaviour of the Society) :

শহর সমাজের প্রতিফলক। এখানে বিভিন্ন আর্থিক সঙ্গতির লোক বাস করে এবং সেই সেই হেতু তাদের আচার আচরণের পার্থক্য থাকা স্বাভাবিক। আর এসব প্রতিফলিত হয় তাদের আবাসস্থলের স্থান নির্ণয়, বিলাসবহুল জীবন যাপনের মধ্য দিয়ে। শহরে বসবাসের ক্ষেত্রে আরও দু'একটি বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে, যেমন একই ধর্মীয় গোষ্ঠীর লোকদের, বিশেষ করে সংখ্যালঘুদের একত্রে বসবাস বা একটি বিশেষ ধর্ম বা বর্ণের প্রতি সংখ্যাগরিষ্ঠ বাসিন্দাদের হীন চোখে দেখা কিংবা অসম লিঙ্গ-অনুপাত যা সমাজ বিজ্ঞানীদের এক আলোচিত বিষয়।

প্রথমে আসা যাক বাসস্থানের কথায়। "The residential mosaic of the city is brought about by the intersection of a large number of vested interests, most of them selfish and to do with the social and economic welfare of the individual, as he perceives it rather than to overall welfare of society. The operation of social process produces social classes." (Herbert & Johnston : Spatial Processes and Form, Vol.1)। উপরোক্ত উক্তিটি যুক্তরাষ্ট্রের বাসস্থান সম্পর্কে করা হয়েছে। এখানে সমাজের স্বার্থের চেয়ে ব্যক্তিস্বার্থ প্রাধান্য প্রায় বলে সামাজিক শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। তবে পাশ্চাত্যের অনেক শহরের বাসস্থানের গঠনের ক্ষেত্রে একটা বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। তা হল "A visitor to any city in the English-speaking world will soon discover, as he moves through its streets that its residential districts vary in their character" (Herbert & Johnston)। পাশ্চাত্য দেশের যে কোন শহরে রাস্তা দিয়ে হাঁটলে কোন আগন্তুক লক্ষ্য করবেন যে সেই শহরের বসবাসের এলাকাগুলোর বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। কোন কোন পার্থক্য খুব বাহ্যিক, যেমন বাড়ির ধরন, বাড়ির ঘনত্ব, হালফ্যাশানের বাড়ি ও সাধারণের ব্যবহার্য স্থান। কোন কোন স্থানে রয়েছে দোকানের সারি, কোথাও বা গাড়ি পার্ক করার ব্যবস্থা। শহরের মধ্যে এক এক এলাকার বাসিন্দারা এক এক ভাষায় কথা বলেন। কোথাও শিশুরা রাস্তাতেই খেলাধুলা করে, কোথাও বা পার্কে। কোথাও শিশুদের মায়েরা পায়ে হেঁটে কাছের বাজারে যায়, আবার কোথাও তারা গাড়ি করে বাজারে যায়। মানুষের ভিন্ন ভিন্ন আচরণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে Herbert & Johnston লক্ষ্য করেছেন যে পৌর এলাকা হল সমাজের প্রতিফলিত আয়না (Urban landscape is a mirror reflecting the society which maintains it)। পৌর এলাকায় ভূমি ব্যবহারের যে পার্থক্য গড়ে ওঠে তা আমরা আগেই বারজেসের এককেন্দ্র মণ্ডল বা হোমার হায়টের বৃত্তকলা মতবাদ থেকে জেনেছি। পৌর এলাকায় এই জমি ব্যবহারের

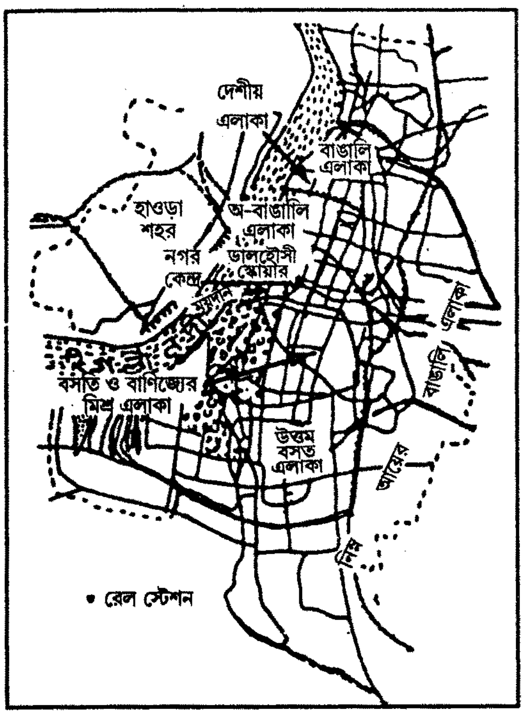

চিত্র - 6.1 কলকাতার সামাজিক এলাকা

পেছনে কারণ আছে। প্রায় প্রতিটি শহরের কেন্দ্রস্থলে কতকগুলো রাস্তা মেশে। ফলে সেখানে ব্যাঙ্ক, বীমা বা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের সদর বা আঞ্চলিক দপ্তর, হাল্কা শিল্প, বড় বড় হোটেল ইত্যাদি গড়ে ওঠে। এই স্থানে জমির দাম খুব বেশি হওয়াতে হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বড় বা মাঝারি ধরনের শিল্প গড়ে উঠতে পারে না। আবার বড়লোক, মধ্যবিত্ত বা গরীব শ্রেণীর মানুষেরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে পরস্পর থেকে আলাদা আলাদাভাবে বাস করে। এই তিন আর্থিক গোষ্ঠীর বাসস্থানের বাহ্যিক রূপের পার্থক্যও চোখে পড়ার মত। প্রত্যেক পৌরবসতিতে এ সবের পেছনে আর্থিক ও সামাজিক কারণ কাজ করে। শহরে সবচেয়ে ভালো জায়গায় বড়লোকেরা ও খারাপ জায়গায় গরীব লোকেরা বাস করে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয় যে দূর থেকে কোন ভারতীয় শহরকে চেনা যায় তার পুচ্ছ (tail) থেকে। শহরে প্রবেশের মুখে বহুদূরব্যাপী রাস্তার দু'পাশে গড়ে ওঠা লম্বা বস্তির সারি শহরে আগত যে কোন নবাগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। পাশ্চাত্য দেশে অবশ্য এর ভিন্ন চিত্র লক্ষ্য করা যায়। সেখানে শহরতলি এলাকায় বড় লোকদের আবাসস্থল গড়ে ওঠে। কারণ তারা ধোঁয়া, আবর্জনা, গোলমাল ইত্যাদি এড়াতে ও নির্জনতা উপভোগ করতে শহরতলী এলাকা পছন্দ করে। এদের অধিকাংশের ব্যক্তিগত গাড়ি থাকায় তারা অল্প সময়ের মধ্যেই শহরের কেন্দ্রস্থলে হাজির হতে পারে। পাশ্চাত্য দেশে এই কারণে শহরতলি এলাকায় জমির দাম প্রচণ্ড। আমাদের দেশে আবার শহরের মধ্যে জমির দাম সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে। তাই তারা শহরের কেন্দ্রস্থল থেকে দূরে সরে যেতে বাধ্য হয়। এছাড়া শহরের কেন্দ্রস্থলের (C.B.D.) কাছাকাছি এলাকায় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা বাস করে। কোলকাতার সামাজিক এলাকার এক মানচিত্রে (চিত্র 6.1) Berry (1986) দেখিয়েছেন যে ময়দানের দক্ষিণে রয়েছে সম্ভ্রান্ত এলাকা এবং পূর্বদিকের মিশ্র বসতি ও বাণিজ্যিক এলাকা। দিল্লী ও মুম্বাই-এর আর্থ সামাজিক মানচিত্র (6.2) থেকে আমরা একই বৈশিষ্ট্য দেখতে পাচ্ছি। অবশ্য মুম্বাই-এর C. B. D. থেকে দূরে কয়েকটি উচ্চ শ্রেণীর আবাসস্থল গড়ে উঠেছে।

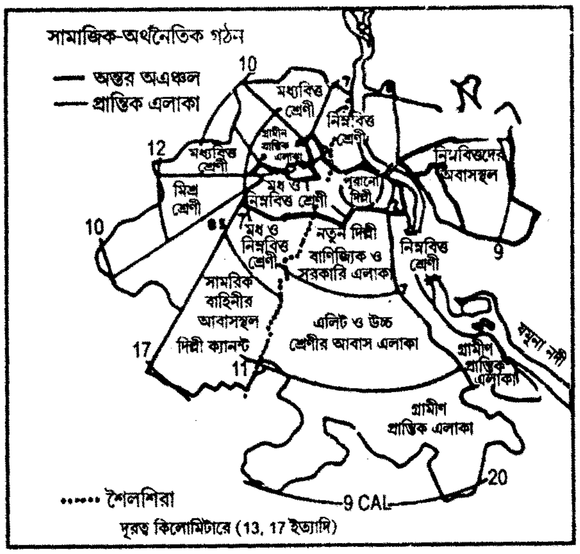

চিত্র - 6.2 দিল্লী সামাজিক-অর্থনৈতিক এলাকা

শুধু আর্থিক কারণের জন্য নয় জাতি, ধর্ম ও ভাষাকে কেন্দ্র করেও পৌরবসতির মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চল সৃষ্টি হতে দেখা যায়। কয়েকটি ক্ষেত্র ছাড়া প্রায় সর্বত্রই কি গ্রামে, কি শহরে ধর্মের দিক থেকে সংখ্যালঘু ব্যক্তিরা একস্থানে কেন্দ্রীভূত হয়ে বসবাস করে। এই জাতি, ধর্ম, ভাষাকে কেন্দ্র করে একটি পৌরবসতির মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের জন্ম হয়, যেমন কুয়ালামপুর (চিত্র 6.3)। কোলকাতার বিবর্তন আলোচনায় আমরা দেখেছিলাম যে অতীতে

কোলকাতার এক এক অ ঞ্চলে এক এক বৃত্তির লোকেরা বাস করত ও সেই এলাকাটি তাদের বৃত্তি অনুযায়ী নামাঙ্কিত হয়েছে, যেমন আহিরীটোলা, শাঁখারীটোলা, মুচিপাড়া ইত্যাদি। Biswas, Chatterjee & Chaube (1967)-র আলোচনা থেকে আমরা কোলকাতা মহানগরে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, জৈন, শিখ ও বুদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের এক এক স্থানে বসবাস প্রবণতা লক্ষ্য করি (6.4)। এঁদের বিশ্লেষণ থেকে আমরা আরও দেখতে পাচ্ছি যে এখানকার ভাষাগত গোষ্ঠীর মানচিত্রও কম চিত্তাকর্ষক নয়। উক্ত লেখকরা আরও দেখিয়েছেন যে এর পেছনে যেমন গোষ্ঠীগত প্রীতি কাজ করছে, তেমনি একটি বৃত্তিতে নিয়োজিত থাকার প্রবণতাও রয়েছে। ঐ সব ভিন্ন ভিন্ন ভাষাভাষী ও ধর্মের মানুষেরা বিশেষ বৃত্তিকে অবলম্বন করে ওই সব স্থানের বাসিন্দা হয়েছে। এঁরা দেখিয়েছেন

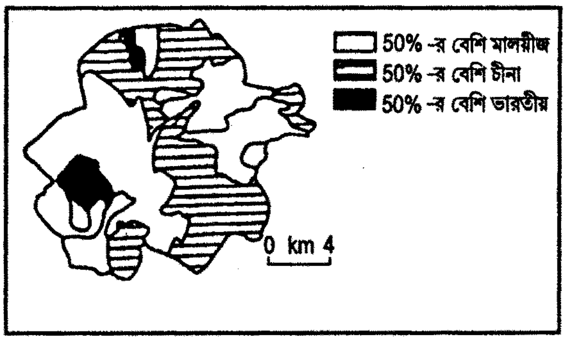

চিত্র - 6.3 কুয়ালালামপুরে জাতিগত অঞ্চল

মুলমান সম্প্রদায় i) ওয়াটারলু স্ট্রিট চিৎপুর রোড এলাকা, ii) রাজাবাজার এলাকা, iii) আমতলা, এন্টালী, পার্ক সার্কাস, কড়েয়া এলাকায় পাইকারী ও খুচরা ব্যবসা, কাগজ কাটা, বই বাঁধানো, পেপার বোর্ড, বাক্স বাঁধানো, পোষাক তৈরির কাজে লিপ্ত আছে। জৈন সম্প্রদায়ের বৃত্তি হল ব্যবসা এবং এরা বড়বাজার এলাকায় বসবাস করছে। এর বিপরীতে রয়েছে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা যারা কোলকাতার মোট জনসংখ্যার মাত্র 0.3 শতাংশ। এদের বেশির ভাগই হল চীনা ভাষাভাষী। এরা চীনা বাজার এলাকায় (চিৎপুর রোড সংলগ্ন এলাকা) বাস করে (চিত্র 6.5)। শুধু কোলকাতাই নয়, পৃথিবীর সব নগরেই সংখ্যালঘুরা এক একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে বসবাস করে। যুক্তরাষ্ট্রে নিগ্রো অঞ্চল ও ইউরোপের অনেক শহরের মধ্যে গড়ে ওঠা 'ইহুদী অঞ্চল' এই রকম অঞ্চল। আর এর পেছনে আছে, "Such territorial behaviour can be a consequence of segregation to fulfil one or more of a number of functions, such as group defence, intergroup avoidance and cultural protection" (Herbert & Johnston)। এর ফলে যে স্থানিক পার্থক্য গড়ে ওঠে, তা অনেক প্রাক্-শিল্পীয় সমাজের বর্ণ ব্যবস্থার সাথে তুলনীয় "Which is often akin to the caste system of certain pre-industrial cities" (Herbert & Johnston)।

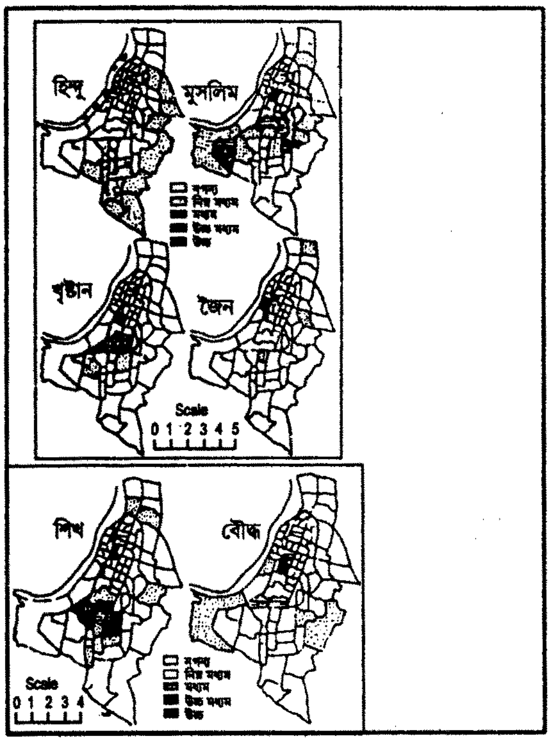

চিত্র - 6.4 কলকাতার বিভিন্ন ভাষাভাষী অঞ্চল

বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যে জাতিগত ও সাংস্কৃতিক পার্থক্য যত বেশি হবে, শহরের মধ্যে ঐ সব গোষ্ঠীর আলাদাভাবে বাস করার প্রবণতা তত বেশি হবে। বিদেশীরা নির্দিষ্ট এলাকায় বাস করতে চায়। শহরের সামাজিক জীবনে এটা অতি সাধারণ ব্যাপার। অনেক ইউরোপীয় দেশে 'ইহুদী অঞ্চল' হল একটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। এই

ধরনের অঞ্চল গড়ে ওঠার পেছনে যে কারণটি কাজ করে, তা হল এরা সমাজের একটা বড় অংশের কাছে অনাদৃত থাকে। আর এরাও সমজের সাথে নিজেদের খাপ খাওয়াতে অনীহা প্রকাশ করে। আজকের অনেক নগরে জাতিগত পৃথকীকরণের (racial differentiation) সবচেয়ে বড় প্রকাশ হল বর্ণবিদ্বেষ। যেমন যুক্তরাষ্ট্রের অনেক শহরের মধ্যে অন্তত 'কৃষ্ণ এলাকা' (Black belt)। আগে এই সব স্থানে বিত্তবান শ্বেতকায়রা বাস করত। কিন্তু আরও সুন্দর পরিবেশে বসবাসের জন্য তারা শহরতলির দিকে চলে গেছে। তাদের পরিত্যক্ত স্থানে নিগ্রোরা বাস করে। যুক্তরাষ্ট্রে বাড়ি পাল্টানো এক অতি সাধারণ ব্যাপার। কয়েক বছর পর পর বিত্তবানরা হাল ফ্যাসানের নতুন নতুন বাড়িতে উঠে যায়। ব্যাঙ্ক থেকে বাড়ি ও গাড়ি কেনার জন্য ব্যবস্থা করা হয়।

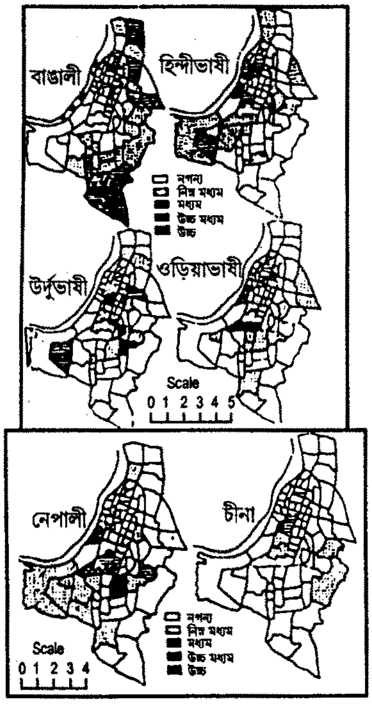

চিত্র - 6.5 কলকাতার বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের (প্রাধান্য অনুসারে) অঞ্চল

শহরবাসীদের সামাজিক বৈশিষ্ট্যের আর একটি দিক হল ভাষাগত দূরত্ব ও মেলামেশার সুযোগের অভাব। বিভিন্ন স্থানের, এমন কি বিভিন্ন প্রদেশের বহু ভাষার লোক শহরে বসবাস করে। বহুদিন ধরে একস্থানে বসবাস করলেও প্রত্যেক ভাষাগোষ্ঠীর মানুষ তাদের স্বীয় ভাষা বজায় রাখার চেষ্টা করে। যেমন কানাডায় বসবাসকারী ইংরেজ ও ফরাসীরা বা দক্ষিণ আফ্রিকায় ইংরেজ ও বুয়র্সরা। মহিলাদের ক্ষেত্রে তাদের জীবদ্দশাতেও ভাষার খুব একটা পরিবর্তন হয় না। কারণ বেশির ভাগ সময়ে তাদের বাড়িতেই থাকতে হয়। পুরুষরা বাড়ির বাইরে মেলামেশা করে বলে অন্য ভাষা শিখে যায় (Beaujeu-Garnier)।

শহরের সামাজিক সমস্যার আর একটি দিক হল নারী-পুরুষ অনুপাতের পার্থক্য। পুরুষেরা কাজের উদ্দেশ্যে শহরে একা একা চলে আসে। দেশের বাড়িতে স্ত্রী, বাচ্চা, বুড়ো মা, বাবাকে রেখে আসতে বাধ্য হয়। ফলে শহরে নারীর সংখ্যা কমে যায়। মহিলাদের অভাবে পুরুষদের মধ্যে কু-অভ্যাসের জন্ম হয়। যে শহর যত নতুন হবে, সেখানে নারী-পুরুষের সমাহারের তত পার্থক্য হবে। কারণ নতুন শহরের প্রথমাবস্থায় মানুষের বসবাসের সুযোগ সুবিধেগুলো কম থাকে। ফলে অনেকেই পরিবারকে বাড়িতে রেখে আসে। বিজু গারনিয়ারের মতে শহরের গুরুত্ব যত বেশি হবে, জীবনযাত্রার মানও তত উন্নত হবে। নারীর সংখ্যাও তত কম হবে। উদাহরণ হিসেবে তিনি লিখেছেন যে 1931 সালে ভারতবর্ষে পঞ্চাশ হাজার থেকে এক লক্ষ অধিবাসী-অধ্যুষিত শহরে 100 জন নারী পিছু পুরুষের সংখ্যা ছিল 120 জন, আর পাঁচ লক্ষ বাসিন্দার শহরগুলোতে 161 জন। 1951 সালে কোলকাতায় 100 জন নারী পিছু পুরুষের সংখ্যা ছিল 175 জন, হাওড়ায় 163 জন, আমেদাবাদে 130 জন। এছাড়া সমস্ত বড় বাণিজ্যিক ও শিল্প শহরে একই ধরনের বৈষম্য লক্ষ্য করা গেছে। পাশ্চাত্য দেশে অবশ্য নারী ও পুরুষ একসাথে গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে আসে, ফলে লিঙ্গ অনুপাতে হেরফের হয় না।

৬.২.৫ মহানগরীতে লোকসমাজ (Community in the Metropolis) ঃ

টরেন্টো (Toronto) মহানগরীর Crestwood Heights নামে এক শহরতলিতে বসবাসকারী উচ্চবিত্ত শ্রেণীকে নিয়ে সীলি (Seeley), সিম্ (Sim) এবং লুজলে (Loosley) সমীক্ষা করেছিলেন। লোকসমাজের ধারণার কার্যকারিতা কিছু পরিমাণে লোকসমাজের অস্তিত্বমানতা সম্বন্ধে এই সমীক্ষায় কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যেতে পারে।

শহরতলীর এই অঞ্চলের প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষরা প্রধানত স্বতন্ত্র পেশাজীবী, ব্যবসায়ী এবং উচ্চপদস্থ প্রশাসক বা এক্সিকিউটিভ্। এঁরা দিনের একটা নির্দিষ্ট সময় মহানগরীতে অফিস কাছারিতে যান। দিনের শেষে ঘরে ফিরে আসেন। এভাবে জীবনের প্রধান ক্রিয়াকলাপের একটা অংশ (কাজ) শহরতলীর ভৌগোলিক সীমানার বাইরে অনুষ্ঠিত হচ্ছে, তাই পর্যবেক্ষণের বিষয়বস্তুও বাইরে থেকে যাচ্ছে। ঐ শহরতলীকে সমীক্ষকরা 'লোকসমাজ' আখ্যায় ভূষিত করেছিলেন এবং 'লোকসমাজের' সংজ্ঞা সংক্ষেপে দিয়েছেন।

তাঁদের মতে বৃহত্তর নগরীর সীমানার মধ্যে একটা স্বতন্ত্র মিউনিসিপ্যালিটি উক্ত শহরতলিতে থাকলেও, এই শহরতলি কোন কিছুর একটা দ্যোতনা প্রকাশ করছে (ঘোষ দস্তিদার) লোকসমাজ হিসেবে এই শহরতলির অস্তিত্ব রয়েছে, কারণ এর সদস্যরা পারস্পরিক সম্পর্কে আবদ্ধ। তাদের সুষ্ঠু প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যেই তারা পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছে। এই সব প্রতিষ্ঠানগুলো হল পরিবার, স্কুল, চার্চ, কমিউনিটি সেন্টার, ক্লাব, সংঘ, গ্রীষ্মাবাস এবং অন্যান্য প্রান্তীয় প্রতিষ্ঠান ও পরিষেবা। এই সব সম্পর্ক জালের বিকাশ ঘটে ইঁট, কাঠ, পাথর নির্মিত গৃহ এবং দেওয়াল বা বেড়া দিয়ে ঘেরা সুসজ্জিত বাগানের বস্তুগত কাঠামো (setting)-এর মধ্যে।

সমীক্ষকরা মনে করেন, দৃঢ় আঞ্চলিক সনাক্তকরণ (strong local identification) করার জন্য কাজ (work) একমাত্র উপাদান নয়। তাদের পর্যবেক্ষিত শহরতলীতে তারা এমন একটা শক্ত উপাদান তৈরি করেছেন, যা সেখানকার লোকেদের পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত হতে সাহায্য করে। সেখানকার লোকসমাজ সন্তান লালন-পালন কাজের জন্য প্রধানতঃ পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত। এই লালন-পালনের ব্যাপারটা আছে বলেই অধিবাসীদের লোকসমাজে অংশগ্রহণ করতে হয়। এটা এমনই একটা ব্যাপার, যার সাথে পুরুষত্ব ও নারীত্বের আদর্শসমূহ জড়িয়ে আছে এবং কিভাবে এই আদর্শগুলো সন্তানদের মধ্যেও ছড়িয়ে দেওয়া যায়, সে বিষয়ের সঙ্গে জড়িত আদর্শসমূহও লালন-পালনের ব্যাপারের মধ্যেই পড়ে।

উক্ত সমীক্ষকরা আরও মনে করেন যে উক্ত শহরতলীর পিতারা মহানগরীতে কাজের সময় কাটাবার জন্য পরিবারের কার্যাবলী থেকে দিবাভাগে বিচ্ছিন্ন থাকলেও আসলে পরিবার ও বন্ধুবান্ধবের থেকে বিচ্ছিন্ন থাকেন না। কারণ কর্মস্থলে থেকেও তাঁরা টেলিফোনে সবার সঙ্গে কথাবার্তা বলে সংযোগ রক্ষা করতে পারেন এবং দুপুরে খাওয়ার ফাঁকে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে গল্পগুজবে মত্ত হতে পারেন।

অতএব, এই শহরতলী একটি বাসস্থানগত লোকসমাজ, যেখানে প্রাপ্তবয়স্ক সদস্যরা সন্তান উৎপাদন ও পালন কার্যের সঙ্গে কোন না কোনভাবে জড়িত থাকে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রাপ্তবয়স্ক জনগণকে এমন একটি জায়গায় এনে ফেলে যে, তারা নির্দিষ্ট বর্গের অন্তর্ভুক্ত হয়। রেডফিল্ড বা ম্যাক্আইভার-এর প্রদত্ত জনসমাজের অভিধা গ্রহণ করলে এই শহরতলিকে শুধু একটা কারণে লোকসমাজ বলা যায় না। সেটা হল, এর প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষেরা তাদের গোটা জীবনটা এখানে (এই শহরতলির সীমার মধ্যে) কাটায় না। আবার, এখানকার স্ত্রীলোক ও শিশুরা সম্পূর্ণ জীবন শহরতলিতেই কাটায়, এ কথা আপাতভাবে মনে হলেও প্রকৃত পক্ষে তারাও সমগ্র জীবন এখানে কাটায় না।

মনে রাখা দরকার, নগরের বা শহরের সামাজিক সম্পর্ক উপলব্ধির জন্য 'লোকসমাজ'-এর অভিধা অপরিহার্য নয়। সমাজবিজ্ঞানীরা মহানগরী বিশ্লেষণ করে জনসংখ্যার প্রকার ও সামাজিক সম্পর্কের প্রকার বিন্যাস করেছেন, যা সাধারণত 'মানবিক পরিবেশবিদ্যা' (human ecology) নামে পরিচিত। নগরকে ব্যবহারের প্রধান প্রধান ধাঁচের (যেমন শিল্প এলাকা, বাসস্থান এলাকা, বাণিজ্য এলাকা ইত্যাদি) নিরিখে, অথবা প্রতিটি এলাকার জনসংখ্যার সামাজিক গঠনের (যেমন শ্রেণী অনুসারে : মধ্যবিত্ত, নিম্ন-মধ্যবিত্ত, শ্রমিকশ্রেণী) নিরিখে, বাসগৃহের প্রকারের (যেমন নিজেদের

বাড়ি, ভাড়া-বাড়ি, পাকা বাড়ি, বস্তি-বাড়ি) নিরিখে নৃকুল-গোষ্ঠী অঞ্চলের (কালো চামড়া, উপজাতি ইত্যাদি) নিরিখে এরূপ সমীক্ষাতে নগরের বিভিন্ন এলাকার শ্রেণীবিভাগ করা হয়।

Chombart de Lauwe ও তার সহকর্মীরা প্যারিসনগরীকে প্রশাসনিক ক্ষেত্র বা বিভিন্ন সমাজের নিরিখে বিভক্ত না করে, প্যারিসের জনসংখ্যা ও সামাজিক ক্ষেত্রগুলোকে সুস্পষ্টভাবে বিভক্ত করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। সমীক্ষকরা প্যারিসের জনসংখ্যার প্রায় সবাইকেই এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এমনকি, যারা প্যারিসে সৌন্দর্যের টানে এখানে ভ্রমণ করতে আসেন বা যারা রোজকার কাজের জন্য বাইরে থেকে প্রতিদিন প্যারিসে যাতায়াত করেন তাদেরকেও প্যারিসের জনসংখ্যার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বলতে গেলে, পর্যবেক্ষকরা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের মানুষদেরও নগরীর জনতা হিসেবে ধরেছেন। তাঁদের মতামত হল, সামাজিকভাবে প্যারিসে বহু কেন্দ্র (ব্যবসা, কলা, শিল্প, বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতির কেন্দ্রসমূহ) আছে। বিভিন্ন মানদণ্ড অবলম্বন করে এই মহানগরীকে 7-টি কেন্দ্রভূত অঞ্চলে (Concentric Zone) বিভক্ত করা হয়েছে। এই বিভাজনের ভিত্তি হল জনবসতির ঘনত্ব, কাজের ক্ষেত্রে পৌঁছতে প্রয়োজনীয় সময় এবং আবাস অঞ্চল ও কর্মক্ষেত্রের মধ্যে সম্পর্ক ইত্যাদি।

এইভাবে অঞ্চলগুলোর (zone) সীমানা নির্ধারণ করার পর পর্যবেক্ষকরা প্যারিস এবং প্যারিসের ভিতরের সামাজিক এলাকাসমূহ ভাগ করেছেন। এ ধরনের সামাজিক এলাকা কোন একটা কেন্দ্রীভূত অঞ্চলের মধ্যে আবদ্ধ নয়। দুটো বা তিনটে কেন্দ্রীভূত অঞ্চল জুড়ে আছে এই রকম এক একটি সামাজিক এলাকা' (Social area), যেমন প্যারিসকে বুর্জোয়া পশ্চিম ও প্রোলেতারিয় পূর্ব এলাকায় ভাগ করা হয়েছে। এরপর তাঁরা প্রভাবশালী কেন্দ্রীভূত ধাঁচের অনিয়মিতি (irregularities) সম্বন্ধে মন্তব্য পেশ করেছেন। এই সব কেন্দ্রীভূত ধাঁচের স্বতন্ত্র শহর-এর অন্তর্ভুক্তি এবং বিভিন্ন প্রতিবেশী পল্লী গজিয়ে ওঠায় নানা প্রকার গোলমালের সূত্রপাত ঘটেছে।

প্যারিসের এইরূপ সমীক্ষা পরিবেশবিদ্যাগত সমীক্ষা ছাড়া কিছু নয়। এর মাধ্যমে ঐ নগরের জীবন সম্পর্কে আমরা অনেক কিছু জানতে পারি। এখানে লোকসমাজের নিরিখে সমীক্ষা চালানো হয় নি। আমরা প্রাপ্ত তথ্য থেকে এটুক বলতে পারি যে প্যারিস মহানগরীতে অসংখ্য 'ছাপিয়ে যাওয়া' ও 'পারস্পরিকভাবে অনুপ্রবেশকারী লোকসমাজ' আছে।

৬.২.৬ সামাজিক সত্তা বা অস্তিত্ব হিসেবে নগরের সূচকসমূহ (Indicators of city as a social organism) ঃ

নগর ও সভ্যতা এক সুতোয় গাঁথা। নগর সৃষ্টি হবার সাথে সাথে মানুষ তার পুরনো গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনকে ভেঙে এক নতুন জীবনযাত্রা শুরু করে। কারণ নগর হল সমাজের সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। এখন প্রশ্ন হতে পারে কি কি উপকরণ হলে নগরকে আমরা সামাজিক সত্তা হিসেবে বিবেচনা করব?

নগর বা পৌরবসতির সামাজিক সত্তা বা অস্তিত্ব কয়েকটি নির্দিষ্ট সূচকের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যেমন 1) নগরের জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং তার বৈচিত্র্য নগরবাসীর পারস্পরিক সম্পর্ককে ক্রমাগত দুর্বল করে তোলে এবং তার ফলে সামাজিক শাসন (Social Control) ব্যক্তি-নিরপেক্ষ হয়ে পড়ে। 2) নগরবাসীদের মধ্যে ব্যক্তিগত পরিচয়ের সুযোগ খুব কম থাকায় পারস্পরিক সম্পর্ক সাধারণত নৈর্ব্যক্তিক, ভাসাভাসা এবং অস্থায়ী হয়ে থাকে। 3) নগরবসতিতে শ্রম বিভাজন খুবই প্রকট। এছাড়া অনেক ক্ষেত্রে পারিবারিক ব্যবসাও বড় প্রতিষ্ঠানের হাতে চলে যায়। 4) সমস্ত অধিবাসীরা এক স্থানে কেন্দ্রীভূত না থাকার ফলে পারস্পরিক যোগাযোগ পরোক্ষভাবে চলে। 5) নগরাভ্যন্তরে জমি ক্রমে বিরল হয়ে আসার জন্য বিভিন্ন জমি-ব্যবহারের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার সৃষ্টি হয়। তার ফলে জমি ব্যবহার (land use) এক বিশেষ রূপ নেয় এবং নগর জুড়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির জমি ব্যবহারাঞ্চলের

(land use zone) উদ্ভব ঘটায়। যেমন বসতি অঞ্চল, ব্যবসাঞ্চল, শিল্পাঞ্চল ইত্যাদি। এমন কি বসতি অঞ্চলও নানা শ্রেণীর হয়ে থাকে, যথা উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত ইত্যাদি। 6) নগরজীবন দ্বন্দ্বপীড়িত। আর্থিক উন্নতি বা অবনতি, অথবা নানা কারণে নগরবাসী সাধারণত একস্থানে স্থানু হয়ে না থেকে অনবরত স্থান পরিবর্তন করতে অভ্যস্ত।

সংক্ষেপে বলা যায়, নগরবাসীদের মধ্যে সরাসরি অপেক্ষা গৌণ যোগাযোগ প্রাধান্য পায়। এখানে আত্মীয়তার স্থান নেয় বিভিন্ন প্রভাবশালী গোষ্ঠী এবং নগরীর নৈর্ব্যক্তিক সত্তার ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

দ্বিতীয়ত বলা যেতে পারে যে মুখ্য এবং গৌণ অর্থনৈতিক কম শহরের আভ্যন্তরীণ এবং আঞ্চলিক অর্থনৈতিক বন্ধনকে সঠিকভাবে উপস্থাপন করতে সাহায্য করে যা অন্য কোন অর্থনৈতিক ধারণা এই বিষয়ে সঠিক চিত্র দিতে পারে না। আভ্যন্তরীণ কর্ম, আঞ্চলিক কর্ম, মৌল/অমৌল অনুপাত এবং সর্বক্ষেত্রে এর প্রয়োগ একটি ভৌগোলিক অঞ্চলের সুষ্ঠু অর্থনৈতিক শ্রেণীবিভাগ করতে যেমন সাহায্য করে, তেমনি শহরের পরিকল্পনা গ্রহণ ও রূপায়ণের-ক্ষেত্রেও এই ধারণাটি সঠিক পথে চালিত করে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। সংক্ষেপে বলা যায় "In short, the basic and non-basic ratio is a measure of the degree of interdependence existing between the people of a circumscribed area and of person in all other area."

৬.৩ নানাবিধ পৌর সমস্যা

সারণি 6.1

পৌর সমস্যা

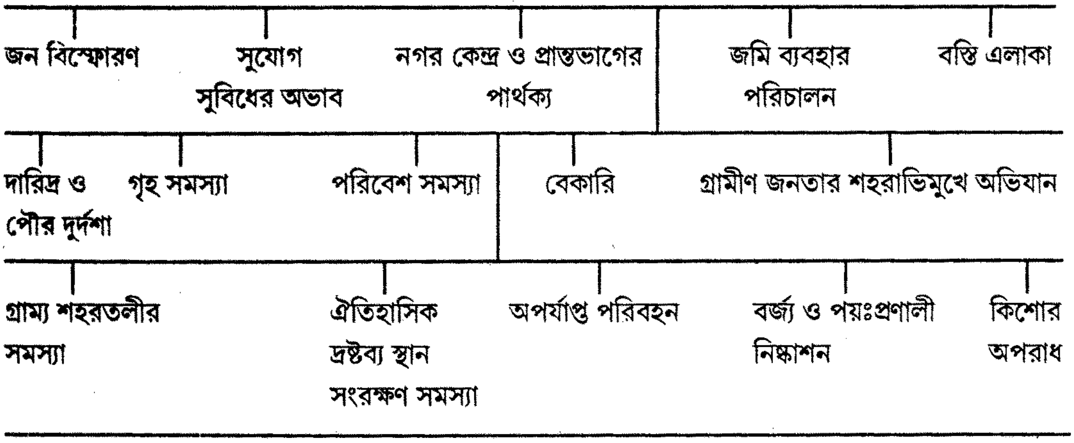

৬.৩.১ পৌর সঙ্কট (Urban Crisis)

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে নগর ও মহানগরের অভাবনীয় বৃদ্ধির ফলে পৌর সঙ্কট ঘনীভূত হয়েছে। কোন কিছুই পৌর প্রসারণকে প্রতিহত করতে পারে নি, বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে যেখানে প্রতি বছরে নগরের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার 3.6 শতাংশ। মাত্র 35 বছরে (1960 থেকে 1995 সাল) পৃথিবীর পৌর জনতার সংখ্যা 300 মিলিয়ান থেকে 3 বিলিয়ান পৌঁছেছে।

কোন কোন নগরে জনসংখ্যা বিস্ফোরণ পর্যায়ে পৌঁছেছে। উদাহরণ হিসেবে বলা চলে কেনিয়ার রাজধানী নাইরোবিতে 1960 থেকে 1995 সালের মধ্যে (35 বছরে) জনবৃদ্ধি ঘটেছে 625 শতাংশ। জনবিস্ফোরণের উদাহরণ

খুঁজতে আমাদের নাইরোবি যেতে হবে না। ঘরের কাছে পশ্চিমবঙ্গের ছোট শহর শিলিগুড়ির জনবৃদ্ধির বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাবো যে গত 60 বছরে (1931-1991) এই শহরের জনবৃদ্ধির হার হল 643 শতাংশ। এ প্রসঙ্গে বিশ্বে মেগাসিটির সংখ্যাবৃদ্ধি বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। 1950 সালে গোটা পৃথিবীতে মেগাসিটির কম করে 8 মিলিয়ন জনসংখ্যা অধ্যুষিত) সংখ্যা ছিল মাত্র দু'টো, নিউইয়র্ক ও লন্ডন। 1995-তে তা গিয়ে দাঁড়িয়েছে 23-এ (যাদের মধ্যে আবার 17-টি বিকাশশীল দেশে অবস্থিত)। 2015 সাল নাগাদ এই সংখ্যা গিয়ে দাঁড়াবে 36-এ যার মধ্যে 23-টি মেগাসিটি এশিয়া মহাদেশে থাকবে। নীচের সারণি 7.2 লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে 23-টি মেগাসিটির মধ্যে 14-টি মেগাসিটির জনসংখ্যা মিলিয়নের বেশি, আর এই 14-টি মেগাসিটির মধ্যে 11-টি বিকাশশীল দেশে অবস্থিত। আরও উল্লেখ করার মত যে 15-টি সবচেয়ে বড় নগরের মধ্যে একটিও ইউরোপ মহাদেশে অবস্থিত নয় (সারণি 6.1 দ্রষ্টব্য)।

এই সব বড় বড় নগরের দুর্বিষহ জীবন আমাদের সবার জানা আছে। বস্তির সংখ্যা বৃদ্ধি এইসব নগরে দূষণ ও অপরাধ বাড়িয়ে তোলে। যানবাহন জট এখানকার অধিবাসীদের নিত্যদিনের এক সাধারণ সমস্যা। গ্রাম থেকে শহরে মানুষের অভিবাসনের কারণ হল শহরের চাকচিক্য। তার ওপর আছে কর্মের সুযোগ। নগরে অনেক কলকারখানা রয়েছে। তাই এখানে গ্রামের চেয়ে রোজগারের পথ অনেক প্রশস্ত। লক্ষ্য করার মত যে বিকাশশীল দেশগুলোতে GNP বা (Gross National Product) মোট জাতীয় উৎপাদনের 60 থেকে 80 শতাংশ শহর এলাকা থেকে পাওয়া যায়। এখানে স্বাস্থ্য প্রশিক্ষণ ও সাংস্কৃতিক সুযোগ সুবিধে অনেক অনেক বেশি।

1991-র জনগণনায় দেখা যাচ্ছে যে ভারতের 25.7 শতাংশ মানুষ শহরে বাস করত। চীন, রাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র ও ইন্দো-চীন ছাড়া ভারতের পৌর জনতা পৃথিবীর সব দেশের চেয়ে অনেক বেশি। মূল সমস্যা হচ্ছে এই যে পাশ্চাত্য দেশের তুলনায় ভারতের পৌর এলাকায় সুযোগ সুবিধে খুব কম। তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ দেশে গ্রামের মানুষজন শহরে চলে আসেন। ক্রমবর্ধমান জনতার চাপে জল সরবরাহ, পরিবহন ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়। স্কুল, কলেজ, হাসপাতালে মানুষের ভিড় লেগে থাকে। ট্রেন, বাসে বাদুড়ঝোলা হয়ে যেতে হয়। হুগলী শহরের কথাই ধরা যাক। এই শহরের প্রতি ঘরে সাতজনেরও বেশি মানুষ বাস করেন। হুগলীতে এরকম পরিবারের সংখ্যা হল মোট পরিবারের 14 শতাংশ। জামশেদপুরে 15 শতাংশ বাড়ির একটি মাত্র ঘরে একেরও বেশি লোক বাস করেন। কানপুর, পুনে, মুম্বাই-এর অবস্থা মোটামুটি একই রকম (Mandal, 2000)।

অধিকাংশ পৌর জনতা জল সরবরাহ, স্নানঘর ও পায়খানার সুযোগ সুবিধে ভোগ করেন না। পায়খানা ও জলের কল দশ জন, বিশ জন এবং এমন কি একশ জন যৌথভাবে ভোগ করেন। 54 থেকে 87 শতাংশ বাড়িতে জলের কল নেই। হায়দ্রাবাদ ও সেকেন্দ্রাবাদ শহরে অনেক মানুষ সপ্তাহে একদিন স্নান করেন। জামশেদপুরে 49 শতাংশ মানুষ কুয়োর জল ব্যবহার করেন। কানপুরে 35 শতাংশ পরিবার পরিস্রুত জল পান না। পুনেতে 25-টিরও বেশি পরিবারের জন্য মাত্র একটি রাস্তার জলের কল আছে।

এজন্য জনৈক সমাজবিদ লিখেছেন "The existing large and small sized towns have already grown beyond their capacity and even the present rate of growth is likely to be unmanageable. Acceleration of growth means the infusion of more employment". আর এই জন্যই পৌর এলাকা বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়েছে।

কোলকাতার মত শহরে জনঘনত্ব এত বেশি (23,487 জন প্রতি বর্গ কি.মি.-তে) যে এখানে অনুভূমিক (horizontal) ব্যাপ্তির বদলে উলম্ব (vertical) ব্যাপ্তি দরকার। অর্থাৎ এখানে বহুতল বাড়ি তৈরি কাম্য। স্বভাবতই মনে হয় যে কোলকাতা মহানগরী এত ঘিঞ্জি যে তা কোন 'মানে'ই (standard) আসে না।

ঘিঞ্জি এলাকা মানুষের স্বাস্থ্যের ওপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করে? Beaujeu Garnier-কে উদ্ধৃত করে বলতে ইচ্ছে হয় যে "Overcrowding is detrimental to the physical and mental health of individuals. It comes about through the sacrifice of even the smallest open space, and through crowding families into veritable rabbitwarrens, by reducing the size of rooms and the height of ceilings, the width of passages and of staircases. It is not the density by unit of area that matters...but the density per volume of livings space". বড় বড় শহর ঘিঞ্জি হয়ে ওঠে এবং যত দিন যাবে, ততই তারা আরো ঘিঞ্জি হয়ে পড়বে। "Congestion has long been complained of in Paris but the deficiency of open space is likely to grow rather than to diminish". নীচে পৃথিবীর কয়েকটি বড় নগরের মাথা পিছু খোলা জায়গার পরিমাণ দেখানো হল (সারণি 6.2)

সারণি 6.2

বাসিন্দাদের মাথা পিছু খোলা জায়গা (বর্গ ফুটে)

প্যারী	15.0
লিওঁ	38.7
লিলি	70.0
লন্ডন	96.9
বার্লিন	140.0
ভিয়েনা	269.1
ওয়াশিংটন	538.1

(উৎস ঃ Beaujeu Garnier & Chabot : Urban Geography)

৬.৩.২ পৌর বিক্ষেপণ (Urban sprawl) ঃ

শহর বৃদ্ধির অনেক সমস্যার মধ্যে একটা সমস্যা হল শহর এলাকার অবিন্যস্ত বিস্তৃতি। পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই শহর সংলগ্ন কৃষি জমি কুক্ষিগত করে শহর এলাকা বৃদ্ধি পাচ্ছে। উন্নত দেশসমূহে, এমন কি ভারতের মত উন্নয়নশীল দেশে, বিত্তবানরা শহরের কোলাহল এড়াতে মনোরম শহরতলীর দিকে ক্রমশ সরে যাচ্ছে। কারণ সেখানকার খোলামেলা এলাকায় তারা অপেক্ষাকৃত বড় বাড়ি বানাতে পারে। অনুন্নত দেশগুলোতে শহরতলি এলাকায় বস্তির বিকাশ লক্ষণীয়, যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বস্তিবাসীরা জবরদখল করে ঐ সব এলাকায় বসবাস করতে থাকে। উভয় ক্ষেত্রেই অবশ্য শহরতলী এলাকার বিকাশ ঘটে। প্রথম প্রথম রাস্তার দু'পাশ দিয়ে শহরতলীর বিস্তার ঘটতে থাকে। তবে দুঃখের বিষয় হল পৌরবসতির এই বিস্তার ঘটে দেশের অমূল্য কৃষি জমি, জলাশয়, ভেড়ি ইত্যাদির বিনিময়ে। আজ পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ বড় শহর এবং কোলকাতা ও হাওড়া পৌর নিগম (Corporation) এলাকার দিকে তাকালে বোঝা যায় কিভাবে এখানে "প্রমোটাররাজ" কায়েম হয়েছে। প্রমোটারদের কাজই হল কৃষি জমি, পুকুর, ভেড়ি ইত্যাদি ভরাট করে কিংবা পুরোনো বাড়ি ভেঙে বা জমি কিনে ফ্ল্যাট বানানো। শহরের তীব্র বাসস্থানের কথা চিন্তা করলেও এই বহুতল বাড়ির সমর্থন করা যায় না। কারণ অনেক ক্ষেত্রেই তা আইন ও পরিকল্পনা-মাফিক তৈরি হয় না। থাকে না আগুন নেভাবার ব্যবস্থা। তা ছাড়া বহুতল বাড়ি তৈরি করতে গিয়ে পুকুর, জলাশয় ভরাট করার ফলে ঐ অঞ্চলের জলনিকাশী ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। পাশ্চাত্য দেশগুলোতেও শহরের বাসস্থান সমস্যা লাঘব করতে ও কৃষি জমিকে বাঁচাতে বহুতল বাড়ি নির্মাণ পরিকল্পনা কার্যকরী হচ্ছে। তবে

ঐ সব দেশে শহরের চারপাশ দিয়ে সবুজ বলয় (Green belt) রাখা হয়। ব্রিটেনে এই ব্যাপারে বহুদিন যাবৎ আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। বসতির কাছাকাছি সবুজের ছোঁয়া থাকায় সেখানকার বাসিন্দারা বাহ্যিক ও মানসিক দিক দিয়ে প্রফুল্লতা বোধ করে।

৬.৩.৩ বাসস্থানের সমস্যা (Problems of Housing) ঃ

জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও বাসস্থানের সমস্যা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। নগরকেন্দ্রিক সভ্যতা গ্রামের মানুষকে শহরাভিমুখী করেছে। আমরা আগেই দেখেছি যে কখনো জীবিকার সন্ধানে, কখনো শহরের বিলাসবহুল জীবনের লোভে গ্রাম থেকে মানুষ শহরে চলে আসছে। অমানুষিক পরিশ্রম করে কিংবা যে কোন জীবিকা আশ্রয় করে এরা বছরের পর বছর শহরে থেকে যায়। যেটুকু রোজগার করে, তা গ্রামাঞ্চলে থাকলে সম্ভব হত না। তাই তারা শহর আঁকড়ে পড়ে থাকে। কিন্তু শহরে মানুষের ঢল নামলেও বাসগৃহের সংখ্যা সেই অনুপাতে বাড়েনি। তাই ছিন্নমূল মানুষ আশ্রয় খোঁজে ঝুপড়িতে, বস্তিতে, রাস্তার ফুটপাতে, রেলস্টেশনের প্লাটফর্মে, গাড়ি বারান্দায়, এমন কি ফেলে রাখা বড় বড় পাইপের মধ্যে। আশ্রয়ের সন্ধানে গ্রাম থেকে শহরমুখী যে স্রোত চলে আসছে, মুম্বাই, দিল্লীর মত মহানগরী। বিখ্যাত স্থপতি চার্লস কোরিয়া কোলকাতার উন্নয়ন প্রশ্নে বলেছিলেন যে এইসব মানুষের জীবিকার সুষ্ঠু ব্যবস্থা করতে না পারলে শহরকে সুন্দর করে গড়ে তোলা যাবে না। অবশ্য এই সমস্যা বিকাশশীল দেশেরই একচেটিয়া সমস্যা, এ রকম মনে করার কারণ নেই। আন্তর্জাতিক আশ্রয় বর্ষের (International Shelter Year, 1987) এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে আধুনিক সভ্যতার অন্যতম প্রাণকেন্দ্র যুক্তরাষ্ট্রের বেশ কিছু মানুষের মাথার ওপর ছাদ নেই। কানাডাতেও কয়েক হাজার মানুষ ফুটপাতে বাস করে। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে এই সমস্যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে।

Herbert (1972)-র লেখাতে পৃথিবীর নানা দেশের বাসস্থানের সমস্যার এক সুন্দর চিত্র ফুটে উঠেছে। টোকিও সম্বন্ধে উনি লিখেছেন "Good housing is astronomically expensive, living space is characteristically small, and regular lotteries are held for the right to rent single roomed flats" এমন কি উত্তর আমেরিকাতেও "The past decade has witnessed a boom in highrise apartments, not merely in the central city, where they have some traditional place but also in suburban locations and aligned along arterial highways". কানাডাতেও এই একই রকম সমস্যা রয়েছে এবং তার মূলে রয়েছে, "Escalating land prices and financial problems".

আর এজন্যই "Suburbanisation has been the universal twentieth century reaction of the western city to the substandardness and overcrowding bequeathed from the past"

জল সরবরাহের সমস্যা (Problems of water supply) : এই সমস্যা বলতে গেলে শহরের এক স্থায়ী সমস্যা। এর কারণ হল পৃথিবীর অধিকাংশ জল সরবরাহের ভাণ্ডার হল লবণাক্ত সমুদ্র। বাকি জলের উৎস সমভাবে বণ্টিত নেই। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শহরবাসীরা দূষিত জল পান করে।

অনুন্নত দেশে পরিস্রুত জল সরবরাহের ব্যাপারটা প্রায়ই সম্ভব হয়ে ওঠে না। উদাহরণ হিসেবে বলা চলে ভারতে এক-তৃতীয়াংশের কম শহরবাসী বিশুদ্ধ জল পায়। দূষিত জল থেকে নানা রকম পেটের রোগ হয়। আর এই কারণে প্রতি বছর গ্রীষ্মের শুরুতেই কোলকাতা শহরে কলেরা, আন্ত্রিকের মত রোগ হানা দেয়। "Shanghai's cholera epidemics resulting from impure water supplies are well known, and many intestinal diseases are spread by polluted water" (Beaujeu Garnier and Chabot)। ব্রাজিলের অধিকাংশ

শহরে জলাভাব এক ভয়ঙ্কর অভিশাপ হয়ে দাঁড়ায়। এমনকি রিও-র মতো বড় শহর Serra do Mar পাহাড়ের ঢালে অবস্থিত কয়েকটি জলাশয় থেকে তার প্রয়োজনীয় জল পায়। কিন্তু সেখানেও দিনের কয়েক ঘণ্টার জন্য জল সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়। এও দেখা গেছে যে লোকে বিশুদ্ধ জলপান করলেও স্নান করা বা কাপড় কাচা নোংরা জলেই সারে। কোলকাতার রাস্তায়, বিশেষ করে বস্তিবাসীদের অপরিশোধিত গঙ্গা জলে কাপড় কাচা ও স্নান করা এক অতি পরিচিত দৃশ্য।

এও যেমন একটা সমস্যা, তেমনি অনেক বড় বড় শহরে দূর থেকে জল আনাও আর এক সমস্যা। নিউইয়র্ক, লস এঞ্জেলসের মতো শহরেও বহুদূর থেকে পানীয় জল আনতে হয়। Beaujeu Garnier ও Chabot-র মতে বাহিয়া (Bahia) বা রেসিফ (Recife)-র মতো শহরতলী এলাকায় সপ্তাহের পর সপ্তাহ বা মাসের পর মাস জল থাকে না। দেশের মধ্যেকার অবস্থা আরও করুণ, সেখানকার বাসিন্দারা নদীর জল পান করেন। কিছু সম্রান্ত ব্যক্তি ছাড়া সান ফ্রানসিসকোর বাসিন্দারা অপরিশ্রুত জল পান করেন। ভারতবর্ষে মাত্র ছয় শতাংশ শহর বাসিন্দা পানীয় জল পান, এমন কি, যারা বিশুদ্ধ জল পান করেন, তারা নোংরা জলে স্নান করেন ও কাপড় চোপড় কাচেন। এর ফলে বছরে দুই মিলিয়ান মানুষের মৃত্যু হয় ও পঞ্চাশ শতাংশ মিলিয়ান মানুষ ছোঁয়াচে রোগে ভোগেন (Beaujeu Garnier : Geography of population)। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে প্রতিটি শহরেই জলের চাহিদা বেড়ে চলেছে। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কুয়োগুলো গভীর থেকে গভীরতর করতে হচ্ছে। কলকারখানার পরিত্যক্ত রাসায়নিক পদার্থ নদীতে ফেলায় জলও দূষিত হচ্ছে। বর্তমানে আবার পরিবেশ সংরক্ষণ ব্যাপারটা গুরুত্ব পাওয়ায় প্রকৃতিপ্রেমীরা নতুন নতুন জলাধার নির্মাণে বাধা দিচ্ছে। সে যাই হোক, দূষিত জল সম্বন্ধে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে একটা সাড়া পড়েছে। ভারতেও দেখা যায় যে কেন্দ্রীয় সরকার গঙ্গার জল দূষণমুক্ত করার জন্য "Ganga Action Committee" গঠন করেছে। এই কমিটি গঙ্গার দুই পাড়ের শিল্প শহরগুলো থেকে কতটা পরিমাণ ময়লা এসে গঙ্গায় পড়ছে ও কিভাবে তা রোধ করে মানুষের ব্যবহারোপযোগী করা যায়, তা নিয়ে অনুসন্ধান চালাচ্ছে। এছাড়া, জলের অপচয় রুখতে অনেক শহর কর্তৃপক্ষ "জলের মিটার" বসিয়েছে। যারা বসায় নি তারা বসাবার কথা ভাবছে।

৬.৩.৪ কর্মস্থলে দীর্ঘ যাতায়াতের সমস্যা (Problems of Long Journey to the Working Place) ঃ

শহরের আয়তন এবং লোকসংখ্যা বৃদ্ধি ও যানবাহনের সমস্যা এক সুতোয় বাঁধা। যানজট সমস্যার আগে যেটা বলতে হয়, তা হল নিত্যযাত্রীদের কর্মস্থলে আসার দীর্ঘপথ পরিক্রমা। বড় বড় শহরের কেন্দ্রস্থলে, বিশেষ করে শহরের কেন্দ্রীয় বাণিজ্য এলাকায় (CBD), নিত্যযাত্রীরা প্রতিদিন একটা নির্দিষ্ট সময়ে আসে ও নির্দিষ্ট সময়ে ফিরে যায়। যে শহরের অর্থনৈতিক আকর্ষণ যত বেশি ও যার পরিবহন ব্যবস্থা যত ভালো, তার লোক আকর্ষণ করার ক্ষমতা তত বেশি। রাজধানী নগর হিসেবে কোলকাতার লোক আকর্ষণ করার ক্ষমতা বাণিজ্যিক শহর শিলিগুড়ির তুলনায় বহুগুণ বেশি। কোলকাতায় দ্রুতগামী যানবাহনের দৌলতে 200 কি. মি. দূর থেকেও বহু যাত্রী অফিস, কাছারী, বাণিজ্য উপলক্ষে কোলকাতায় আসে। শিলিগুড়ির ক্ষেত্রে এই সীমা হল প্রায় 50 কি. মি., আর লন্ডনের ক্ষেত্রে প্রায় 110 কি.মি.। এই দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় সময় ও অর্থ দুই-ই ব্যয়িত হয়। প্রতিদিনের যাতায়াতের সমস্যায় নিত্যযাত্রীরা মানসিক ও শারীরিক দিক দিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়ে।

একটি নির্দিষ্ট সময়ে শহরে যাতায়াতের ফলে সীমাহীন যানজটের সৃষ্টি হয় এবং অফিসযাত্রীদের অফিসে পৌঁছতে প্রচণ্ড অসুবিধের সম্মুখীন হতে হয় (চিত্র 6.6)। বেশির ভাগ পুরনো শহরে রাস্তাঘাট খুব সরু বলে সেখানকার সমস্যা আরও জটিলাকার ধারণ করে। দীর্ঘ সময় গাড়ির মধ্যে থাকতে যাত্রীদের জীবনীশক্তির অপচয় ঘটে। শহরে

যানবাহনের সংখ্যা বাড়লে যানজট সমস্যা মেটাতে রাস্তাঘাট আরও চওড়া করতে হয়। বাড়ি ঘরদোর ভাঙতেও টাকার প্রয়োজন হয়।

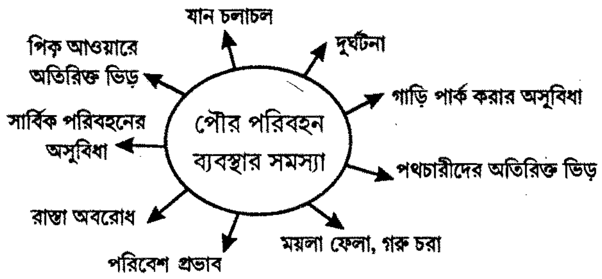

চিত্র - 6.6 পৌর পরিবহন ব্যবস্থার সমস্যা

৬.৩.৫ নগর কেন্দ্র ও চতুষ্পার্শ্বস্থ পার্থক্য

যে কোন পৌর পরিকল্পনার মুখ্য উদ্দেশ্য হল নগর কেন্দ্র ও তার সাথে সম্পর্কিত এলাকার পার্থক্যকে একটু আলাদা করে দেখা। শহরের কেন্দ্রস্থলে বহুবিধ কর্মধারা সমাবেশ দেখা যায়। আর তারই আকর্ষণে বহু দূর থেকে লোকজন আসেন। এজন্য যানবাহন জটলা দেখা যায়। এমন কি বসবাসের এলাকাতেও ছোট খাটো শিল্প গড়ে ওঠে। ফলে শহর ঘিঞ্জি হয়ে ওঠে। পক্ষান্তরে, নগরের প্রান্তভাগে ডাঁই করে আবর্জনার স্তূপ জমানো, নিম্ন আয়ের লোকদের আবাসস্থল, যোগাযোগ ব্যবস্থার অপ্রতুলতা পৌর উন্নয়নের কিছু মূল সমস্যা।

জমি সংরক্ষণ ও জমি ব্যবহার পরিচালন সমস্যা

পৌর এলাকার যথোপযুক্ত পরিকল্পনার জন্য জমি সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। কোন এলাকার পরিকল্পনা করতে অনেক সময় লাগে, কোন কোন ক্ষেত্রে 10 থেকে 25 বছর পর্যন্ত সময় লাগে। ভারতে প্রতি বছরে পৌর জনসংখ্যা বাড়ছে প্রতি চার শতাংশ হারে, এই ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপ মেটাতে শহরের মধ্যে জমি সংরক্ষণ করে রাখা প্রয়োজন। শুধুমাত্র বাড়ি করার জন্য জমি যোগাড় করলে হবে না, রাস্তা, স্কুল, হাসপাতাল, পার্ক ইত্যাদি করার জন্য জমি সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। ক্রমবর্ধমান শহরের ক্ষেত্রে এটা একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। যেহেতু শহরের মধ্যে বসতি এলাকা কম তাই শহরের বাইরে কোন স্থান নির্বাচন করতে হয়। যেহেতু শহরের মধ্যে বসতি এলাকা কম তাই শহরের বাইরে কোন স্থান নির্বাচন করতে হয়। আগে থেকে পরিকল্পনা মাফিক চিন্তাভাবনা করলে ভবিষ্যতে এ নিয়ে পৌরপিতাদের মাথাব্যথা থাকবে না। পরিকল্পনা করার সময় শহরের আশপাশের এলাকার উন্নয়নের কথাও ভাবতে হবে। বড় বড় শহরে নিক্কো পার্ক, বিজ্ঞান কেন্দ্র, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ইত্যাদি গড়ে তোলার জন্য প্রচুর জায়গার দরকার হয়। এ সবের জন্যও স্থান সংরক্ষণের কথা মাথায় রাখতে হয়। শিলিগুড়িতে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ শহর থেকে 6 কি. মি. দূরে (শালুগাড়ায়), বিজ্ঞান কেন্দ্র 5 কি. মি. দূরে (মাটিগাড়া) গড়ে উঠেছে। প্রস্তাবিত নিক্কো পার্ক শহর থেকে 4 কি. মি. দূরে গড়ে উঠবে।

৬.৩.৫.১ বস্তি এলাকা ঃ

বস্তি হল শহরের নিম্ন আয়ের ব্যক্তিদের আবাসস্থল। অত্যন্ত ঘিঞ্জি এই এলাকায় বিভিন্ন পেশা, জাতি ও ধর্মাবলম্বীদের বাস। ঘরের অভাব, অস্বাস্থ্যকর অবস্থা, কাঁচা নিকাশী ব্যবস্থা, পানীয় জলের অভাব বস্তি এলাকার

নিত্যকার সমস্যা। বস্তিবাসীদের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থা খুব করুণ। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে কোলকাতায় বস্তির শিশুদের শতকরা 90 ভাগ অপুষ্টির শিকার। 60 ভাগ শিশুর খাদ্য তালিকায় প্রোটিন বা ভিটামিনের ছিটেফোঁটা নেই। 79 ভাগ শিশু জীবনে শৌচাগার ব্যবহার করেনি। অপরিশ্রুত জল ছাড়া সাধারণত অন্য জলে স্নান করে নি। সমীক্ষায় আরও দেখা গেছে যে বস্তিবাসী পূর্ণবয়স্কদের মধ্যে 46 শতাংশ হলেন নারী। বস্তিবাসী মহিলাদের প্রায় 27 শতাংশ কাজ করেন। এঁরা ঠোঙা বানান, সেলাই-এর কাজ করেন, ঘুড়ি তৈরি করেন, ঘুঁটে দেন। এ ছাড়া বাল্ব বানানো, চামড়ার কারখানায় কাজ করার মতো বিপজ্জনক কাজও করেন (উৎস ঃ বিপন্ন পরিবেশ, 2000 নাগরিক মঞ্চ)। কোলকাতার 34 শতাংশ ও কানপুরের 20 শতাংশ মানুষ পৃথিবীর জঘন্যতম বস্তিতে দিন কাটান। শ্রমিক শ্রেণীর প্রায় 65 শতাংশ বাড়ি বসবাসের অযোগ্য (Mandal, 2000)।

এখন প্রশ্ন হল শহরে বস্তি গড়ে উঠেছে কেন, বা বস্তির সংখ্যাই বা বাড়ছে কেন? আমরা দেখেছি অভিজাত এলাকার পাশেই বস্তি গড়ে উঠে। যেমন কোলকাতার অভিজাত বালিগঞ্জ অঞ্চলের সুইনহো স্ট্রীট এলাকায় বা পার্ক সার্কাসের জামীর লেন এলাকায় বা হালে গড়ে ওঠা সল্ট লেক অঞ্চলের পাশে কেষ্টপুর এলাকায়। ঐসব বস্তির মহিলারা প্রধানত অভিজাত সম্প্রদায়ের বাড়িতে পরিচারিকার কাজ করেন। বস্তির পুরুষেরা নানা রকম কাজ করে থাকেন। যেটুকু রোজগার তারা শহরে করেন, গ্রামে থাকলে তাও সম্ভব হত না। তাই তারা আশ্রয় খোঁজেন ঝুপড়িতে, বস্তিতে, রাস্তার ফুটপাতে, রেলস্টেশনের প্ল্যাটফর্মে, গাড়ি বারান্দায়, এমন কি ফেলে রাখা জলের পাইপের মধ্যে (সারণি 6.3)।

সারণি 6.3

কোলকাতা মেট্রোপলিটন অঞ্চল ঃ কোথায় থাকেন	অস্বাস্থ্যকর স্থানে বসবাসকারীর সংখ্যা (লক্ষ)
বস্তি	30.0
ঝুপড়িবাসী	20.0
শরণার্থী শিবির	10.0
পাকা বাড়ি কিন্তু অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ	10.0
চটকলের কুলিবস্তি	0.4
ফুটপাতবাসী	0.6

(উৎস : বিপন্ন পরিবেশ, 2000)

পুরনো বস্তির ক্ষেত্রে ব্যাপক পুনর্উন্নয়ন পরিকল্পনা নেওয়া দরকার। পাশাপাশি নতুন নতুন বস্তি সৃষ্টিতে বাধা দেওয়াও সমান গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

৬.৩.৬ দারিদ্র্য ও পৌর দুর্গতি ঃ

দারিদ্র্য ও দুর্গতি পৌর এলাকার অন্যতম মূল সমস্যা। গরীব মানুষ, তফশীলি জাতি ও উপজাতিদের কথা ধরা যাক। এদের অবস্থা বর্ষাকালে করুণ হয়। কারণ তাদের কুঁড়েঘরের ছাদ দিয়ে বর্ষার জল মেঝেতে পড়ে। শতকরা ৯০ ভাগ লোকের শিক্ষার হার খুব কম। তারা মেরামতি ও নির্মাণ কাজে প্রধানত অংশ নেয়।

৬.৩.৭ স্বাস্থ্য সমস্যা ঃ

অধিকাংশ ভারতীয় শহরের অস্বাস্থ্যকর এলাকায় এখানে সেখানে হকার স্টল গজিয়ে উঠেছে। অনেক শহরেই জল সরবরাহ ব্যবস্থা অপর্যাপ্ত। দূষিত জল পান করে মানুষ কলেরা রোগের শিকার হন। কোলকাতা, মুম্বাই, পাটনা এবং প্রায় সব ভারতীয় শহরেই এটা একটা সাধারণ ব্যাপার। এছাড়া, গ্রীষ্মের শুরুতে আন্ত্রিক রোগের প্রাদুর্ভাব কোলকাতা শহরের প্রতি বছরের সমস্যা। কারণ তখন জলস্তর নেমে যায় (সারণি 6.4)। কোলকাতায় ভাগ্যবানরা মাথা পিছু প্রতিদিন প্রায় 12 গ্যালন জল পান, দিল্লী শহরবাসীরা পান এর অর্ধেকের কম।

সারণি 6.4

কোলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলের নলকূপের প্রাক্-বর্ষার জলস্তরের অবনমন (ফুটে)

অঞ্চল	সাল				
	1976	1982	1988	1994	1998
উল্টোডাঙ্গা-বেলেঘাটা	35	38	42	46	48
ডালহৌসী স্কোয়ার চৌরঙ্গী	42	43	49	53	55
হাইডরোড ট্রান্সপোর্ট	43	40	52	54	55
ডিপো রোজ	35	41	43	44	45

(উৎস : বিপন্ন পরিবেশে, 2000, নাগরিক মঞ্চ)

শহরে যে পরিমাণ পানীয় জল সরবরাহ করা হয়, তার সবটাই কিন্তু গ্রাহকদের কাছে পৌঁছোয় না। তার প্রধান কারণ হল জলের নলগুলো ফুটো। এভাবে কোলকাতাতে 10%, মুম্বাইতে 24%, এবং দিল্লীতে 30% জল গ্রাহকের কাছে পৌঁছোনোর আগেই ফুটো দিয়ে রাস্তায় পড়ে নষ্ট হয়। ফলে শহরবাসীদের পেট খারাপ লেগেই থাকে। নীচের সারণিতে (6.5) কোলকাতাবাসীদের রোগভোগের একটা চিত্র তুলে ধরা হচ্ছে যা থেকে দেখা যাচ্ছে যে শহরবাসীরা হজমের রোগে ভোগেন।

সারণি 6.5

রোগভোগের চেহারা

কী রোগ ঃ	শতকরা কতজন ভোগেন
সংবহনতন্ত্রের রোগ	5.4
হজমতন্ত্রের রোগ	26.9
নাক, কান, গলার রোগ	5.1
চোখের রোগ	6.7
ভিটামিন ও পুষ্টির অভাবজনিত রোগ	10.7
রক্ত সংক্রান্ত রোগ	5.6

(উৎস : বিপন্ন পরিবেশ, ২০০০) ভারতবর্ষে বেশির ভাগ শহরের অবৈজ্ঞানিক নর্দমা ব্যবস্থা মশাবৃদ্ধির কারণ এবং প্রতি ঘরে আমাশয় জাতীয় অসুখ চিরস্থায়ী হয়ে থাকার কারণ। পানীয় জল যদি দূষণমুক্ত না হয়, নিকাশী ব্যবস্থা যদি বিজ্ঞানভিত্তিক না হয় তবে ম্যালেরিয়া, কলেরা রোগ থাকবেই।

৬.৩.৮ অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংকট ঃ

ভারতের পৌর কেন্দ্রগুলোতে, বিশেষ করে মেট্রোপলিটন কোলকাতায়, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা অনেকের জানা আছে। ভারতবর্ষে শহরের আশপাশে পৌর জনতার চাপ খুব উদ্বেগজনক ও গুরুতর রয়ে গেছে। এখানে সেখানে বস্তি পরিষ্কার ও উদ্বাস্তু পুনর্বাসন ছাড়া বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মেট্রোপলিটন কোলকাতার অধিবাসীদের জীবনযাত্রার নিম্নমান ঠেকাতে সংশ্লিষ্ট সরকার খুব একটা বেশি কাজ করেন নি। বাসস্থান-সংক্রান্ত বিবিধ সমস্যা দূর করতে এই অঞ্চলের লৌহ ও ইস্পাত শিল্প, দামোদর, উপত্যকা করপোরেশন, কে. এম. ডি. এ., পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিভিন্ন বিভাগ, কোলকাতা পৌর নিগম ও পশ্চিমবঙ্গের পৌর প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে একটা সমন্বয় থাকা দরকার। ইদানীং জনসংখ্যা উদ্বেগজনকভাবে বেড়ে চলায় ও পরিবেশ দূষণের কারণে ভারতের শহরগুলোতে বাহ্যিক ও সামাজিক অবস্থার অবনতি ঘটেছে।

৬.৩.৯ কর্মের সমস্যা (Problems of Employment) ঃ

গ্রাম থেকে শহরাভিমুখী পরিযান যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। কিন্তু অতীতে এই সমস্যা তীব্র হয় নি। কারণ তখন জনসংখ্যা খুব কম ছিল এবং অল্প লোকই গ্রাম থেকে শহরে বসবাসের জন্য আসত। শিল্পবিপ্লবের পর থেকে অবস্থাটা বদলে গেল এবং বহু সংখ্যক লোক শহরে আসতে আরম্ভ করল। কিন্তু, বিকাশশীল দেশগুলোর পক্ষে এটা একটা বোঝা হয়ে গেল, কারণ এখানে (শহরগুলোতে) কর্মসংস্থানের সুযোগ কম। এছাড়া, শহরের নিজস্ব বাসিন্দাদের কর্মসংস্থানের ব্যাপারও আছে। উন্নত দেশগুলোতে এই সমস্যা কম। সেখানে জনসংখ্যা অনেক নিয়ন্ত্রিত বলে এই হারে পরিযান ঘটে না।

৬.৩.১০ সামাজিক সমস্যা (Social Problems) ঃ

শহরে বিভিন্ন জায়গার, এমন কি বিভিন্ন প্রদেশের লোক এসে বাস করে। ফলে বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের মধ্যে ভাষাগত দূরত্ব ও মেলামেশার সুযোগের অভাব থাকে। শহরের সামাজিক সমস্যার আর একটি দিক হল নারী-পুরুষ সমাহারের পার্থক্য। যেহেতু পুরুষরা কাজের উদ্দেশ্যে একা একা শহরে আসে তাই মহিলাদের অভাবে পুরুষদের মধ্যে নানাপ্রকার কু-অভ্যেসের জন্ম দেয়। এই সব সমস্যা নিয়ে আমরা আগেই আলোচনা করছি।

৬.৩.১১ গ্রামীণ জনতার শহরে আগমন ঃ

শুধুমাত্র ভারতেই শহরের সমস্যা বেড়ে চলেছে তাই নয়, নিউ ইয়র্কের মত মেট্রোপলিটন নগরেরও সমস্যা বাড়ছে। ভারতে পৌর সমস্যার মূলে রয়েছে গ্রামীণ মানুষের শহরে আগমন। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে এই সমস্যা প্রকট। বেশি আয়ের আশায় শহরে মানুষের ভিড় জমে।

স্থানীয় জনসাধারণের পরিষেবার জন্য পৌর প্রতিষ্ঠানগুলো গড়ে উঠেছিল। কিন্তু অর্থাভাবে তথ্য পৌরাঞ্চলে বল্গাহীন জনবৃদ্ধির কারণে এদের কাজকর্ম সন্তোষজনক নয়। প্রধানত অনিয়ন্ত্রিত জনস্রোতের দরুন নগরে পরিষেবার ভারসাম্য নষ্ট হয়, আর এজন্য শহরের বদনাম হয়। এক সময় কোলকাতার নাগরিক সমস্যা লাগাম ছাড়া হয়ে গেছিল। সি. এম. ডি. এ-র প্রচেষ্টায় ও বিশ্বব্যাঙ্কের আনুকূল্যে এই সমস্যার কিছুটা সুরাহা হয়েছে। মেট্রো ও সার্কুলার রেলের প্রবর্তন যাতায়াত সমস্যা অনেকটা সমাধান করেছে। দিল্লীও কোলকাতার পদানুসরণ করছে। অন্যান্য শহরেও যাতে কোলকাতার মত একই পরিস্থিতি না হয় তা আমাদের দেখা উচিত। এখানে উল্লেখ করতে হয় যে ভারতে ছোট শহরের সংখ্যা কমে যাচ্ছে, পক্ষান্তরে বড় শহর সংখ্যায় বাড়ছে (সারণি 6.6)। এর কারণই হল ছোট শহরে কর্ম ও পরিষেবার সুযোগ সুবিধে কম, বড় শহরে বেশি। স্বভাবতই বড় শহরে লোকজন বাড়ছে, সেই

সঙ্গে বাড়ছে তাদের সমস্যা। এর কারণই হল ছোট শহরে কর্ম ও পরিষেবার সুযোগ সুবিধে কম, বড় শহরে বেশি। স্বভাবতই বড় শহরে লোকজন বাড়ছে, সেই সঙ্গে বাড়ছে তাদের সমস্যা।

সারণি 6.6

ভারত ঃ শ্রেণীভিত্তিক পৌরজনসংখ্যা, 1981-1991

আয়তনের	পৌরজনতার অনুপাত		পৌরকেন্দ্রের সংখ্যা	
শ্রেণী	1991	1981	1991	1981
I	64.90	60.37	300	216
II	11.00	11.65	345	270
III	13.30	14.35	944	739
IV	7.90	9.52	1,170	1,048
V	2.60	3.61	740	742
VI	0.30	0.56	198	230
	100.00	100.00	3,697	3,245

৬.৩.১২ একই পৌর নীতির প্রণয়ন ঃ

আমাদের দেশে একই প্রকার পৌর নীতি থাকা উচিত। কিছুদিন আগে পর্যন্ত দিল্লী শহরের বিকাশ ছিল এলোমেলো রকমের। দেশে কিছু পৌর আইন আছে। আইন ভাঙলে শাস্তি হওয়া উচিত। তার মানে এই নয় যে কিছু জরিমানা দিলে পার পাওয়া যাবে ও আবার বে-আইনি নির্মাণ চলতে থাকবে। (Indira Gandhi, 1975).

কোন রাজ্যে রাস্তা তৈরি সম্বন্ধে বলা হয়েছিল "Well we want to do something, but there is a stay order by the court for the past four or five years". এই সব ব্যাপারগুলো একই পৌর নীতির অধীনে আসা উচিত যাতে করে বৈষম্য দূর করে সত্যিকার উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব হয়।

৬.৩.১৩ আনুষঙ্গিক সুবিধার ব্যবস্থা ঃ

পৌর উন্নয়নের জন্য প্রথম প্রয়োজন হল আনুষঙ্গিক সুবিধের ব্যবস্থা করা, যেমন পর্যাপ্ত জল সরবরাহ, নিকাশী ব্যবস্থা, রাস্তা তৈরি ইত্যাদি। বস্তি ও ফুটপাতবাসীদের সমস্যাও রয়েছে। আমাদের বস্তি অপসারণ হবে। কিন্তু বিকল্প আশ্রয়ের ব্যবস্থা না করে আমরা তাদের কোথায় সরাব? দিল্লীতে বস্তিবাসীদের সরানো হয়েছে ঠিকই, কিন্তু কর্তৃপক্ষের আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলে তাদের রুজি রোজগারের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়েছে। কর্মস্থলের যাতায়াতের জন্য পরিবহন ব্যবস্থাও করা হয়েছে।

৬.৩.১৪ শহরতলীর সমস্যা ঃ

শহরকে ঘিরে থাকা এলাকাকে শহরের আঁস্তাকুড় এলাকা হিসেবে ব্যবহার করা উচিত হবে না। শহর হল ইঁটকাঠের জঙ্গল। এখানে সবুজের খুব অভাব রয়েছে। অথচ শহরবাসীদের ফুসফুস হল একখণ্ড সবুজ বলয়, যা দিয়ে শহরকে ঘিরে রাখা উচিত। বৃটেনে বহুদিন আগেই শহরকে ঘিরে সবুজ বলয় রাখার আইন রয়েছে। শহরতলী এলাকায় আর যা যা থাকলে ভালো হয় তা হল ডেয়ারী, দুগ্ধ ও শাকসব্জি বলয়। এতে একদিকে যেমন শহরবাসীদের

রোজকার খাদ্য সমস্যার সুরাহা হবে, অন্যদিকে তেমনি গ্রামবাসীদের কাঁচা পয়সা রোজগার হবে। এ প্রসঙ্গে ভন থুনেন—এর জমি ব্যবহার মডেলের কথা স্বভাবতই এসে পড়ে। যত্রতত্র বাড়ি বানিয়ে শহরতলির জমি নষ্ট করা উচিত হবে না। পরন্তু, শহরতলির কোন এক জায়গায় আর্বজনা জমিয়ে (যেমন কোলকাতার ধাপায়) তা থেকে সার ও শক্তি উৎপাদন করা যায় কিনা, তা ভাবা যেতে পারে।

৬.৩.১৫ ঐতিহাসিক বস্তুর রক্ষণাবেক্ষণের সমস্যা ঃ

কোন দেশের ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক তার ঐতিহাসিক স্থাপত্য ও বস্তু। এই সব বস্তু সভ্যতার এক নিদর্শনও বটে। কোন সুদূর অতীতে তৈরি মিশরের পিরামিড আজও মানুষের মনে বিস্ময় সঞ্চার করে। কবে কুতবমিনার তৈরি হয়েছিল, আজও তাতে মরচে (rust) পড়েনি। কিংবা তাজমহলের কথাই ধরা যাক্। শ্বেতশুভ্র এই মর্মর স্থাপত্য আজও আমাদের মনে একই সাথে বিস্ময় ও কৌতূহল জাগায়। এ প্রসঙ্গে ভিয়েনা অপেরা হাউস-এর কথা মনে পড়ে। বিশ্বযুদ্ধের সময় এটিকে ধ্বংস করে ফেলা হয়েছিল। যুদ্ধের পর সবাই এটি নতুন করে তৈরি করার কথা ভাবলেন। শুনলে আশ্চর্য হতে হয় যে ঠিক পূর্ববৎ অপেরা হাউস তৈরি করতে যে টাকা লেগেছিল, তা জনসাধারণের টাকা দিয়েই হয়েছিল, কোন রকম সরকারি সাহায্য জনগণ নেন নি। তাই বলতে হয় যে পশ্চিমী দেশগুলো চেষ্টা করছে তাদের ঐতিহাসিক দ্রষ্টব্য বস্তুকে পুনরুদ্ধার করতে। "In many European cities, the historic nature of the inner city resists change; the zone of Preservation in Paris, for example, includes that part in which it is intended to keep and restore buildings which constitute a city's heritage" (Herbert, 1972). পরিকল্পনা রচনাকালে এগুলো আমাদের মাথায় রাখতে হবে। শুধুমাত্র প্রাচীনযুগের বা মুঘল যুগের চিত্রকলা বা স্থাপত্য নয়, ব্রিটিশ আমলে ও আমাদের দেশে অনেক সুন্দর সুন্দর স্থাপত্য তৈরি হয়েছিল। কোলকাতা শহরে নতুন নতুন অট্টালিকা তৈরি বা বহুতল বাড়ি তৈরি করতে গিয়ে এ রকম অনেক ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ স্থাপত্য ভেঙে ফেলা হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে অর্থাভাবের দরুন সরকারের পক্ষে পুরনো স্থাপত্য সংরক্ষণ করা সম্ভব হচ্ছে না।

৬.৩.১৬ পরিবেশ সমস্যা ঃ

জৈব বিবর্তনের চরম ফলশ্রুতি হল মানুষ। সৃষ্টির মুহূর্ত থেকেই মানুষ তার নিজস্ব পরিবেশ গড়ে তুলতে শিখেছে, যাকে কিনা আমরা বলি সাংস্কৃতিক পরিবেশ। বলা বাহুল্য, অনেক ক্ষেত্রে প্রকৃতিকে বিসর্জন দিয়ে মানুষ এই

চিত্র - 6.7 পৌর পরিবেশ দূষণের উৎস সমূল

পরিবেশ গড়ে তুলেছে। এত কিছুর পরেও কিন্তু পৃথিবী'তে মানুষের অস্তিত্ব নিয়ে সংকট দেখা দিচ্ছে। মানুষের লোভ ও ভোগের তীব্র বাসনা তাকে আজ চরম বিপর্যয়ের মুখো'মুখি দাঁড় করিয়েছে। এ রকম দু'একটি সমস্যার কথা এখানে তুলে ধরা হলো :

প্রথমে আসি বায়ু দূষণের কথায়। আমরা জানি বিভিন্ন গুঁড়ো দূষক বাতাসে ভেসে বেড়ানোর ফলে শ্বাস নেবার সময় আমাদের ফুসফুসের ভেতর ঢুকে যায়, যার ফলে আমাদের ফুসফুসের প্রদাহ, ঘনঘন হাঁচি ইত্যাদি রোগ হতে পারে। এছাড়া, অন্যান্য গুঁড়োগুলো ধাতব (সীসা বা অন্যান্য) হলে ক্যানসারের মতন মারাত্মক রোগ সৃষ্টি হয় (6.7)।

সারণি 6.7

শ্বাসের সঙ্গে টেনে নেওয়া যায় এমন দূষকের গড় পরিমাণ

(মাইক্রোগ্রাম প্রতি ঘন মিটারে)

ঋতু	মাস	বছর	শিল্পাঞ্চল	দপ্তর পাড়া	বসবাসের অঞ্চল
শীত	ডিসেম্বর ফেব্রুয়ারি	1991-92	286	316	308
গ্রীষ্ম	মার্চ-মে	1992	171	247	102 (এপ্রিল)
বর্ষা	জুন আগস্ট	1992	220	241 (আগস্ট)	111 (জুলাই)
শরৎ-হেমন্ত	(সেপ্টেম্বর-নভেম্বর)	1992	183	202	230

শীতকালে যে ধোঁয়া ধুলোর সমস্যায় কোলকাতাবাসীরা ব্যতিব্যস্ত হন এ তো আমাদের নিজেদের অভিজ্ঞতা। এর সঙ্গে নীচের সারণিটির (6.8) উল্লেখ করা যেতে পারে।

সারণি 6.8

কোলকাতার রাস্তায় বিভিন্ন ধরনের যানবাহন

কি ধরনের গাড়ি	সংখ্যা
দু'চাকার গাড়ি	3,13,000
হাল্কা চার চাকার গাড়ি (ট্যাক্সি ছাড়া)	2,48,000
ট্যাক্সি (যাতে মিটার লাগানো আছে)	23,000
ভারি চার চাকা বা তার বেশি চাকার গাড়ি	65,000
লজঝরি, মিনি, চার্টার্ড বাস ইত্যাদি	15,000
অটো	10,000
মোট	6,76,000

(উৎস : বিপন্ন পরিবেশ, ২০০০)

বিভিন্ন শহরের মধ্যে তুলনামূলক বিচারে দেখা যায় যে কোলকাতাতে লোকজন শ্বাস নেবার সময় সবচেয়ে বেশি পরিমাণে সালফার ডাই-অক্সাইড এবং অন্যান্য গুঁড়ো বস্তু গ্রহণে কোলকাতার স্থান দিল্লীর ঠিক পরেই। চেন্নাই-এর আয়তন কম, জনঘনত্বও কম—চেন্নাই-এর মানুষরা শ্বাসের সঙ্গে সমস্ত দূষকই অন্যান্য শহরের চেয়ে কম পরিমাণে গ্রহণ করেন।

সালফার ডাই-অক্সাইড একপ্রকার বর্ণহীন এবং অসহনীয় গন্ধবিশিষ্ট গ্যাস। শিল্পক্ষেত্রে বিভিন্ন সালফারঘটিত আকরিক থেকে লোহা, তামা ইত্যাদি ধাতু নিষ্কাষণের সময় এই গ্যাস প্রচুর পরিমাণে বাতাসে মিশে যায়। শবদেহ দাহ করার সময় বা বিভিন্ন যানবাহন থেকেও SO_2 গ্যাস বের হয়ে বায়ুমণ্ডলে মিশে হয়। প্রতি বছর প্রায় 100 কোটি মেট্রিক টন সালফার ডাই-অক্সাইড পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে সংযোজিত হচ্ছে যার মধ্যে 70% কয়লা জাতীয় ও 16% পেট্রোলিয়াম জাতীয় জ্বালানীর দহনের ফলে সৃষ্টি হয়। ভারতে 1979 সালে 69,60,000 মেট্রিক টন মাত্রায় SO_2 ছিল, 1999 সালে সেই মাত্রা বেড়ে দাঁড়িয়েছে 1 কোটি 30 লক্ষ মেট্রিক টন। ভারতের মধ্যে কোলকাতা একটি অধিক দূষণ বিশিষ্ট শহর, যেখানে মুম্বাই, দিল্লী বা কানপুরের থেকেও বেশি মাত্রায় SO_2 বায়ুমণ্ডলে সংযোজিত হয় (NEERI প্রতিবেদন)।

সালফারের অক্সাইডগুলো পরিবেশের দারুণ ক্ষতি করে, বিশেষ করে উদ্ভিদ ও প্রাণিজগৎ-এর ক্ষেত্রে। এই গ্যাস বায়ুমণ্ডলের ওজোন, অক্সিজেন, জলীয় বাষ্প, হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড-এর সাথে বিক্রিয়া করে সালফিউরিক অ্যাসিড সৃষ্টি করে বৃষ্টির মাধ্যমে মাটিতে পড়ে ও ক্ষতি করে।

বিভিন্ন কার্বন যৌগের অসম্পূর্ণ দহনের ফলে কার্বন মোনোঅক্সাইড নামে এক প্রকার বর্ণহীন ও গন্ধহীন গ্যাস সৃষ্টি হয়। মোটরচালিত বিভিন্ন যানবাহনের ইঞ্জিনে জ্বালানী-দহনের ক্ষেত্রে হাইড্রোকার্বন থেকে এই বিষাক্ত গ্যাসটি সৃষ্টি হয়ে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে। তৈল শোধনাগার, কয়লাখনি থেকে নির্গত Co পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রতিনিয়ত ছড়িয়ে পড়ছে। কোলকাতায় দিনের বেলা যখন সবচেয়ে বেশি যানবাহন চলে, তখন পেট্রোলিয়াম জ্বালানী চালিত যানবাহন থেকে যে Co নির্গত হয়, তা ঐ অঞ্চলে বায়ুমণ্ডলে Co-এর মাত্রা 40 পিপি এম পর্যন্ত বাড়িয়ে তোলে।

কার্বন মোনোক্সাইড একটি বিষাক্ত গ্যাস যার প্রভাবে রক্তের হিমোগ্লোবিনে কার্বন সংযুক্তির মাত্রা বেড়ে যায় ও কার্বক্সি হিমোগ্লোবিন সৃষ্টি হয়। কার্বক্সি-হিমোগ্লোবিন বেড়ে গেলে হাই প্রক্রিয়াজনিত শ্বাসকষ্ট বৃদ্ধি পায়। হিমোগ্লোবিনের সঙ্গে কার্বন মোনোক্সাইডের সংযুক্তি ক্ষমতা অক্সিজেনের চেয়ে প্রায় দেড়শ গুণ বেশি। পরিবেশীয় বায়ুমণ্ডলে কার্বন মোনোক্সাইডের মাত্রা 600 পিপি এম হলে হঠাৎ মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে 10-100 পিপি এম মাত্রায় কার্বন মোনোক্সাইডের উপস্থিতিতে মানসিক বিকার, তীব্র মাথার যন্ত্রণা ইত্যাদি হয়। 1996 সালের ডিসেম্বর মাসে কুমেরুতে চারজন ভারতীয় বিজ্ঞানীর মর্মান্তিক মৃত্যু এই গ্যাসের বিষক্রিয়ারই ফল। পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে 50 পিপি এম মাত্রায় এই গ্যাসের উপস্থিতিতে কোনও সুস্থ ও স্বাভাবিক ব্যক্তি মাত্র আট ঘণ্টা অবস্থান করতে পারেন।

৬.৩.১৬.১ শব্দদূষণ সমস্যা (Noise pollution problem)

ল্যাটিন শব্দ Nausea থেকে Noise কথাটি এসেছে। অপ্রয়োজনীয়, মূল্যহীন, অতিমাত্রার শব্দকে শব্দদূষণ বলে। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত সব ধরনের কাজেই আমরা নানা ধরনের শব্দ শুনি। কিন্তু মাত্রাধিক শব্দ সবাইকে বিরক্ত করে ও ক্ষতি করে। শব্দের তীব্রতা পরিমাপের একককে ডেসিবেল (db) বলে। নীচের সারণিতে (নং 6.9) আইন অনুযায়ী অনুমোদনযোগ্য আওয়াজ বা কোলাহলের মাত্রা আঞ্চলিকভাবে দেখানো হল।

সারণি 6.9

কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ কর্তৃক নির্ধারিত শব্দ দূষণের সীমা

অঞ্চল কোড	প্রকৃতি	দিনের কোলাহল মাত্রা	রাতের কোলাহল মাত্রা
ক	শিল্পক্ষেত্র	75 ডেসিবেল	65 ডেসিবেল

অঞ্চল কোড	প্রকৃতি	দিনের কোলাহল মাত্রা	রাতের কোলাহল মাত্রা
খ	বাণিজ্যক্ষেত্র	75 ডেসিবেল	55 ডেসিবেল
গ	বসবাসযোগ্য অঞ্চল	55 ,,	45 ,,
ঘ	হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, আদালত ইত্যাদি নীরব অঞ্চলের 100 মিটার দূরত্বের মধ্যে	50 ,,	40 ,,

নীচের সারণিতে (6.16) শব্দের ক্ষতিকর প্রভাব দেখানো হল :

সারণি 6.10

মানুষের ক্ষেত্রে শব্দ বা কোলাহলের ক্ষতিকর প্রভাব

কোলাহলজনিত ক্ষয়ক্ষতি
- স্থায়ী বধিরতা
- স্নায়ুজ চাপ
- সৃজনশীলতা বিনষ্ট হওয়া

কোলাহলজনিত বিরক্তিকর অবস্থা

দক্ষতা বিষয়ক
- মানসিক বিঘ্ন
- নৈরাশ্য
- কাজ করতে বাধা
- উত্তেজনা

আরাম বিষয়ক
- ঘুমে ব্যাঘাত
- গোপনীয়তা নষ্ট
- জোরে কথাবার্তা বলার অভ্যেস

বিনোদন বিষয়ক
- মনোযোগে ব্যাঘাত
- ধ্যানে ব্যাঘাত
- চিত্তবিনোদনে অস্বস্তি
- সাময়িক বধিরতা

উচ্চস্বরে কোলাহল বা আওয়াজ হৃৎ-সংবহনজনিত (Cardio-vascular) সমস্যা, হৃদ্‌রোগ, উচ্চ রক্তচাপ ইত্যাদি সৃষ্টি করে। এছাড়া, এদের মধ্যে অনেকেই হাইপারটেনশন, অনিদ্রা, দুশ্চিন্তায় ভোগেন। উচ্চস্বরের কোলাহল বা বেশী আওয়াজের প্রভাবে মাতৃগর্ভে বিকশিত ভ্রূণের (Foetus) স্নায়ুতন্ত্র ঠিকমত তৈরি হয় না।

শব্দ বা কোলাহল দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের ব্যাঘাত ঘটায়। উচ্চমাত্রার কোলাহলের শেষ কথা হল বধিরতা। নিম্নে বিভিন্ন কোলাহলের উৎস ও ফলাফল দেওয়া হল (সারণি 6.11)

সারণি 6.11

বিভিন্ন যন্ত্রপাতি বা শিল্পক্ষেত্র থেকে নির্গত শব্দ বা কোলাহলের মাত্রা (ডেসিবেল)

মেশিন/যন্ত্রপাতি	কোলাহল মাত্রা (ডেসিবেল)
সাইরেন	140
স্টিল প্লেট রিভেটিং	130
অক্সিজেন টর্চ	120

মেশিন/যন্ত্রপাতি	কোলাহল মাত্রা (ডেসিবেলে)
টেক্সটাইল পাওয়ারলুম	112
কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহৃত ট্রাক্টর অথবা টিলার	100-120
হারভেস্টার	110-130
ছাপাখানা	1000
মিলিং মেশিন	90
হাই স্পিড ড্রিল	185

সারণি 6.12

মানুষের ক্ষেত্রে শব্দ/কোলাহলের উৎস, পরিমাণ ও ফলাফল

উৎস	তীব্রতার পরিমাণ (dB)	ফলাফল
নির্জন গ্রামে পাতা ঝরার শব্দ	10-15	
মৃদু ফিসফিসানি	15-20	
বেতার সম্প্রসারক স্টুডিও/বেতারকেন্দ্র	20	
লাইব্রেরী বা গ্রন্থাগার	30-35	কোন ক্ষতিকর প্রভাব নেই
গ্রামের বসতিতে রেডিও ব্যবহার	35-40	
মানুষের মৃদু কথাবার্তা	35-50	
স্বাভাবিক কথাবার্তা	35-60	
বাসের শব্দসৃষ্টি	80	
অফিসের কোলাহল/অ্যালার্ম ঘড়ি	70-80	
বড়ো বড়ো ট্রাক	90	দীর্ঘকালীন সময় থাকলে ক্ষতিকর
মোটর সাইকেল (125 ফুট দূরত্বে থাকলে)	90	প্রভাব পড়ে
সংবাদপত্র ছাপাখানা	100	
সাইলেন্সারবিহীন মোটর সাইকেল	110	
সিংহের গর্জন (12 ফুট দূরত্বে)	105-110	
জেট বিমান উড্ডয়নকালীন শব্দ (1000 ফুট দূরত্বে)	100-110	
ট্রেনের বাঁশি (50 ফুট দূরত্বে)	110	
স্টিরিও শব্দযন্ত্র	110-117	
নিউম্যাটিক ড্রিল যন্ত্র	120	যন্ত্রণার শুরু
কমার্শিয়াল জেট বিমান (100 ফুট দূরত্বে)	120-140	গা-বমিভাব, মাথাঘোরা, স্পর্শজনিত ত্বকীয় সংবেদনশীলতা বৃদ্ধি, কানের যন্ত্রণা, শ্রবণ ক্ষমতা হ্রাস ইত্যাদি [শ্রবণযোগ্য শব্দের অন্তিম সহনসীমা 140 (dB)]

উৎস	তীব্রতার পরিমাণ (dB)	ফলাফল
সাইরেন বা উচ্চ হর্ণ	150	
জেট বিমান ওড়ার সময়	150	শ্রবণক্ষমতা বিঘ্নিত হওয়া, গা-জ্বালা;
রকেট উৎক্ষেপণ	160-180	বধিরতা ইত্যাদি।

৬.৩.১৬.২ বর্জ্য পদার্থের অপসারণ সমস্যা ঃ

Beaujeu Garnier (Urban Geography) যথার্থই মন্তব্য করেছেন "Towns absorb a great deal, but they also transform and reject a great deal, and getting rid of waste, whether it be sewage, organic matter or any other kind of debris, creates many problems". বস্তুতপক্ষে, শহরেই বেশি বর্জ্য পদার্থ জমা হয়। গ্রামে এর পরিমাণ কম। সেখানে অনেক বর্জ্য পদার্থই মানুষের পরোক্ষভাবে উপকারে আসে।

মানবসভ্যতার প্রথমদিকে জনসংখ্যা ছিল কম আর সেই জনসংখ্যার চাহিদাও ছিল সামান্য, কিন্তু সম্পদের যোগান ছিল পর্যাপ্ত। তাই সেদিনের মনুষ্যসৃষ্ট বর্জ্যপদার্থ প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মেই পুনরাবর্তিত হত, কেননা সেইসব বর্জ্য ছিল ভঙ্গুর-প্রকৃতির (Biodegradable)। আমাদের আদিবাসী মানুষজন আজও কিন্তু বর্জ্য পদার্থ সৃষ্টির সেই প্রাচীন ঐতিহ্যকে ধরে রেখেছে। কিন্তু শিল্প-বিপ্লব পরবর্তী যুগে, বিশেষত বিগত কয়েক দশকে, প্রাকৃতিক সহায়-সম্পদগুলোর অবিবেচিত ব্যবহার শুরু হয়েছে। সেই সঙ্গে তাল রেখে শুরু হয়েছে বিভিন্ন ধরনের বর্জ্যপদার্থের বিপুল পরিমাণ বৃদ্ধি। এই সমস্ত আধুনিক বর্জ্যপদার্থের একটি বিরাট অংশই হল অভঙ্গুর এবং বিপর্যয় সৃষ্টিকারী। প্রকৃতির স্বাভাবিক ক্রিয়া পদ্ধতির পক্ষে এই বিপুল পরিমাণ বর্জ্যকে সামাল দেওয়া একান্তই অসম্ভব। কাজেই বছরের পর বছর ধরে জমে উঠেছে আবর্জনার বোঝা আর তারই ফলে বিপন্ন হতে বসেছে বাস্তুতন্ত্রের স্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপ, বিঘ্নিত হচ্ছে জীবপরিমণ্ডলের স্থিতাবস্থা (Stability)। পরের পাতায় সারণিতে ভারতীয় শহরগুলোতে কঠিন বর্জ্য পদার্থের প্রকৃতি উল্লেখ করা হল।

সারণি 6.13

ভারতীয় শহরগুলোতে কঠিন বর্জ্য পদার্থের প্রকৃতি (শতাংশে)

বস্তুর উপাদান	জনসংখ্যা অনুযায়ী শহর: 2 লক্ষ পর্যন্ত	2 থেকে 5 লক্ষ	5 থেকে 20 লক্ষ	20 লক্ষের বেশি
কাগজ	3.09	4.74	3.80	7.07
প্লাস্টিক	0.57	0.59	0.81	0.86
ধাতব	0.51	0.39	0.64	1.03
কাঁচ	0.29	0.34	0.44	0.76
ছাই ও ধুলো	46.60	39.97	41.81	31.74
মিশ্র পদার্থ	33.41	39.76	40.05	41.74
কার্বন	12.36	12.51	11.95	15.92
নাইট্রোজেন	0.60	0.61	0.50	0.51
ফসফরাস, ফসফেট	0.70	0.71	0.67	0.59
পটাসিয়াম	0.70	0.73	0.72	0.67

শিলিগুড়ি শহরে প্রতিদিন 200 থেকে 250 মেট্রিক টন বর্জ্য পদার্থ (Solid waste) তৈরি হয় (বিপন্ন পরিবেশ 2000)। বড় বড় শহরে আরও বেশি। প্যারিসে প্রতিবছর 1.2 মিলিয়ন টন বর্জ্য পদার্থ তৈরি হয় (Beaujeu Garnier)। কিন্তু শিলিগুড়ি শহরে এই বর্জ্য পদার্থ এক জায়গায় জমা করা ছাড়া আর কোনো নির্দিষ্ট পরিকল্পনা নেই। কিন্তু বর্জ্যপদার্থ অনেক সময়ই স্বাস্থ্যহানির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কাজেই যত তাড়াতাড়ি তাদেরকে সরিয়ে ফেলা যায় বা অন্য কাজে সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার করা যায় ততই ভালো। বর্তমান যুগে পর্বতপ্রমাণ বর্জ্যপদার্থের উদ্বৃত্তকে প্রতিদিন শুধুমাত্র জমি ভরাট (Sanitary Land-fill) করার জন্য অপসারণ করা হয়। পরিস্থিতির সামাল দিতে ফি-বছর নিত্যনতুন নীচু ভূমি খুঁজতে হয়। কোলকাতার সংলগ্ন ধাপায় ভরাটভূমি দ্রুত গতিতে প্রসারিত হয়ে চলেছে। এমতাবস্থায় সর্বোৎকৃষ্ট পথ হল আবর্জনার পুনরাবর্তন পদ্ধতি গ্রহণ করা। ফলে একই সঙ্গে দুটি দিকে লাভবান হওয়া যায়। এদের একটি হল বর্জ্য পদার্থের বোঝার হ্রাসপ্রাপ্তি আর দ্বিতীয়টি হল প্রয়োজনীয় বস্তুসমূহের পুনর্ব্যবহারের সম্ভাবনা। প্যারিসে দুই-পঞ্চমাংশ আবর্জনা উঁচু করে জমা করা হয়। এক-তৃতীয়াংশ থেকে সার তৈরি হয়। এক-চতুর্থাংশ আবর্জনা পুড়িয়ে শক্তি উৎপাদন করা হয়।

৬.৩.১৭ কিশোর অপরাধ শহরের শান্তি নষ্ট করে ঃ

সারা দেশে কিশোর অপরাধ এক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিশোর অপরাধ শুধুমাত্র সমাজের দুর্বল শ্রেণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই সম্ভ্রান্ত ঘরের ছেলেরাও এর সাথে জড়িত।

এখানে উল্লেখ করা যায় যে সমাজে দুর্বলতর শ্রেণীর মানুষ অভাবের তাড়নায় একটু একটু করে চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, খুন ইত্যাদি অপরাধের সাথে জড়িয়ে পড়ে। আবার অত্যধিক সচ্ছলতা সম্ভ্রান্ত ঘরের ছেলেদের অপরাধের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। তবে এক্ষেত্রে একটু কিন্তু আছে, তা হল বাবা মায়ের সন্তানদের প্রতি যথাযথ নজর না দেওয়া। যদি বাবা মা সন্তানের প্রতিটি কাজকর্মের ব্যাপারে একটু নজর রাখেন, তা হলে কিশোর অপরাধের সংখ্যা কমে আসবে।

অনেক পরিবারে বাবা মা কাজে বেরিয়ে যান। সন্তানেরা একাকীত্বে ভোগে। বয়ঃসন্ধিক্ষণে তাদের মনে অনেক প্রশ্ন উঁকি দেয়, যার উত্তর তারা খুঁজে পায় না। যেমন নারী-পুরুষ সম্পর্ক। এ থেকে অনেক সময় যৌন অপরাধ জনিত সমস্যার সৃষ্টি হয়।

এছাড়া, টি. ভি, সংবাদপত্রের প্রভাব কিশোর মনে যথেষ্ট ছাপ ফেলে। টি. ভি.-র পর্দায় মারপিট, উত্তেজক যৌন দৃশ্য তাদের মনে যথেষ্ট প্রভাব ফেলে। রঙিন পর্দায় প্রিয় নায়ক-নায়িকাদের কাণ্ডকারখানা দেখে তারাও নিজেদেরকে নায়ক নায়িকা ভাবতে শেখে। এতে করে তারা অনেক সময় অপরাধে জড়িয়ে পড়ে।

৬.৪ নগর পরিকল্পনা ঃ (Town Planning)

ভূমিকা ঃ কেন্দ্রীয় নগর-পরিকল্পনা সম্পর্কিত আধুনিক ধারণাটির উৎপত্তি হয়েছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপে। ঐ সময় নাগরিকদের জল বাহিত রোগ, অগ্নিকাণ্ড প্রভৃতি থেকে নিরাপত্তা দেবার জন্য নগরোন্নয়নে যে কোনো নির্মাণ কাজের ওপর বিধি নিষেধ আরোপ করার কথা ভাবা হয়। শহরের ভূমি-ব্যবহারের একটি বিধিসম্মত ও পরিকল্পিত মানচিত্রের প্রয়োজনও এই সময় ভাবা হয়। নিকাশী ব্যবস্থার যথাযথ প্রয়োজনীয়তাও স্বীকার করা হয়। 1865 সালের একটি ইতালীয় আইনে প্রথম 'Town Planning বা 'শহর পরিকল্পনা' কথাটি ব্যবহার করা হয়। ইংল্যান্ডে 1909 সালে প্রথম নগর পরিকল্পনা বিষয়ক আইন তৈরি হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পঞ্চাশ ও ষাটের

দশকে ইংল্যান্ডে নগর পরিকল্পনা সংক্রান্ত নিয়মকানুন একটি নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছায়, অর্থাৎ এই আইনকানুন এবং পরিকল্পনাগুলো নাগরিক জীবনকে প্রভাবিত করতে শুরু করে। এই সময়েই গোটা পৃথিবীতে নগর সভ্যতার বিকাশকে একটি পরিকল্পিত দিশা দেবার চেষ্টা করা হয় এবং নগর পরিকল্পনার কিছু স্বীকৃত নিয়মকানুনও চালু হয়।

৬.৪.১ পৌর পরিকল্পনার তাৎপর্য : (Implications of Urban Planning)

আমরা আগেই জেনেছি যে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, আধুনিক পৌরায়ণ ও শিল্প সমাজের জটিলতার দরুন নানাবিধ পৌর সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। আর এই সমস্যার সমাধান করতে পারে পৌর পরিকল্পনা। এ বিষয়ে ভৌগোলিকরা নিশ্চেষ্ট থাকতে পারেন না। বাস্তবিকপক্ষে, ভৌগোলিকরা শুধুমাত্র অতীত ও বর্তমান সম্পর্কে সচেতন নন, ভবিষ্যত সম্বন্ধেও সচেতনশীল। তাই তারা শহরের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে পরিকল্পনার আশ্রয় নেন। এখন প্রশ্ন হতে পারে পরিকল্পনা কি? একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছোনোর উদ্দেশ্যে বা বিভিন্ন লক্ষ্যের মধ্যে সমতা আনার জন্য যে কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়, তাই হল পরিকল্পনা। ভৌগোলিক পরিকল্পনার লক্ষ্যই হল সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন। অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য হল কোন একটি পরিষেবা বা বিভিন্ন পরিষেবা বা কোন শিল্প অবস্থানের (Location) ক্ষেত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ অবস্থানটির অনুসন্ধান করা, আর সামাজিক পরিকল্পনার লক্ষ্য হল উন্নত পৌর পরিবেশের বা সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের আয়ের মধ্যে একটা সমতা আনা।

এই সব লক্ষ্যে পৌঁছোতে ভৌগোলিকরা দু'-রকম পথ অবলম্বন করেন। প্রথমটি হল (A) অর্থনৈতিক পরিকল্পনা যা স্থানীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সম্পদ ব্যবহারের সাথে যুক্ত। দ্বিতীয়টি হল (B) বাহ্যিক (Physical) পরিকল্পনা। পৌর পুনর্নবীকরণ, নতুন শহর সৃষ্টি বা যথোপযুক্ত জমি ব্যবহার (Land use) এই পরিকল্পনার আওতায় আসে। দু'টি পরিকল্পনাই পরস্পরের সাথে নিবিড়ভাবে যুক্ত, কিন্তু পরিকল্পনার বিভিন্ন ধাপে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের ওপর জবাব দেওয়া হয়।

৬.৪.১.১ অর্থনৈতিক পরিকল্পনা

(A) একটি অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলো থাকবে :

(i) (a) পরিকল্পনা এলাকার ভূমি ব্যবহার পদ্ধতির ওপর কঠোর ও কার্যকরী নিয়ন্ত্রণ (rigid and effective regulation)। সব ধরনের নির্মাণ কাজের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে এই নির্মাণ কাজ কোনোভাবে যেন এলাকার প্রাকৃতিক সম্পদকে ক্ষতিগ্রস্ত না করে।

(ii) (b) একটি এলাকাকে ভূমি ব্যবহার মানচিত্র (Land use map) অনুযায়ী বিভিন্ন অঞ্চলে (Zone) ভাগ করতে হবে। এই অঞ্চল-বিভাজন (Zoning) নগর পরিকল্পনার সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। একটি আদর্শ এলাকায় শিল্প (বিপজ্জনক শিল্পের জন্য আলাদা অঞ্চল), শিক্ষা, আবাসন, খোলা জায়গা (Open space), অফিস, কাছারি বা সার্বজনীন পরিষেবা (Public services) ইত্যাদির জন্য আলাদা অঞ্চল নির্দিষ্ট রাখতে হবে। একটি এলাকায় যা জায়গা পাওয়া যাচ্ছে, সেই অনুযায়ী এই অঞ্চল বিভাজন হতে পারে। কখনো কখনো একই জমিতে দুটি অঞ্চল বিভাজন হতে পারে। কখনো কখনো একই জমিতে দুটি অঞ্চল একসঙ্গেও থাকতে পারে। নিয়ন্ত্রণহীন ভূমি ব্যবহার একটি এলাকায় অঞ্চল বিভাজন অসম্ভব করে তুলতে পারে, কেননা সেক্ষেত্রে বিভিন্ন অঞ্চলের জন্য প্রয়োজনীয় জমি পাওয়া সম্ভব নয়।

(b) পরিবেশসম্মত উন্নয়নের দিকে নজর রেখে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলো অবলম্বন করতে হবে ঃ

(i) ক) এলাকার প্রাকৃতিক সম্পদগুলো সম্পর্কে সচেতন থেকে এলাকার জনসংখ্যার ঊর্ধ্বসীমা নির্ধারণ— সীমিত সম্পদ-সম্পন্ন এলাকায় জনসংখ্যার ক্রমাগত চাপ যে কোনো পরিকল্পনাকে অকার্যকরী করে দেয়। একটি এলাকার ওপর চাপ কমানোর উপায় হচ্ছে বৃহত্তর পরিকল্পনা এলাকা তৈরি করা এবং বিভিন্ন পরিকল্পনা এলাকার মধ্যবর্তী এলাকাগুলোকে উন্নত করে তোলা।

(ii) খ) প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণ— *ঘনবসতিপূর্ণ এলাকার পাশাপাশি থাকা গ্রামাঞ্চলের কৃষিজমি বাঁচিয়ে রাখা, কেন না কৃষিজমিতে বাড়ি, রাস্তা তৈরি হলে, সেই জমি তার প্রাকৃতিক চরিত্র হারায়। এইভাবে উর্বরা জমি নষ্ট হয়ে যায়।

*গ্রাম ও শহর নির্বিশেষে প্রাকৃতিক অরণ্য, ভূমি, উদ্যান ও জলাভূমি বাঁচিয়ে রাখা দরকার। পরিকল্পিত এলাকার বাতাসের গুণমান ঠিক রাখতে এবং ভূমির জল-ধারণ ক্ষমতা ঠিক রাখতে এগুলো বিশেষ ভূমিকা নেয়। এলাকার বাসিন্দাদের প্রয়োজনে (শিক্ষা ও আমোদ প্রমোদের জন্য) এগুলোর নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার করা যেতে পারে (*বিপন্ন পরিবেশ, ২০০০*)।

*প্রয়োজন এলাকার প্রাকৃতিক জলস্রোত এবং ভূগর্ভস্থ-জলভাণ্ডার বিষয়ে সঠিক ধারণা, সেগুলোর নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার এবং পানীয় জল বিষয়ে নজর দিতে হবে। দেখতে হবে যাতে প্রাকৃতিক জলস্রোত বা ভূগর্ভস্থ জলভাণ্ডার, শিল্পজাত বর্জ্য পদার্থ বা শহরের দৈনিক নিকাশী ব্যবস্থার মাধ্যমে দূষিত না হয়।

*আরো প্রয়োজন শহরের বাতাসের গুণমান ঠিক রাখার জন্য দূষণ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ—উপযুক্ত সড়ক ব্যবস্থা, যানবাহনের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, দূষণ সৃষ্টিকারী শিল্পগুলোকে নিয়ন্ত্রণ। শহরে বাতাস চলাচলের স্বাভাবিক পথগুলোকে পরিষ্কার রাখা।

গ) **বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশনের উপযুক্ত ব্যবস্থা ঃ** নিকাশী ব্যবস্থাকে কোনোভাবে বিঘ্নিত হতে না দেওয়া এবং কোনো খোলা এলাকায় কঠিন বর্জ্য পদার্থ (Solid waste) জমিয়ে না রাখা।

(B) বাহ্যিক পরিকল্পনা ঃ (Physical Planning)

(i) **পৌর বিকেন্দ্রীকরণ** (Urban decentralisation) : দ্রুত ও মাত্রাতিরিক্ত পৌর বৃদ্ধি নানা প্রকার সমস্যার সৃষ্টি করে। আর এই সব সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে নানাবিধ উপায় অবলম্বন করা হয়েছে। যেমন (a) শহরতলী এলাকায় "সবুজ বলয়" (Green belt) সৃষ্টি করা বা (b) প্রবৃদ্ধি বিন্দু (Growth pole) কেন্দ্র গড়ে তোলা। (c) 1944 সালের বৃহত্তর লন্ডন পরিকল্পনায় লন্ডন শহরের চারপাশে প্রায় 15 কি.মি. বিস্তৃত এক "সবুজ বলয়" রাখার প্রস্তাব ছিল। পরবর্তীকালে সরকার কর্তৃক এই পরিকল্পনা অনুমোদিত হয়েছিল। এর ফলস্বরূপ লন্ডনের সবুজ বলয়ের মধ্যে বাড়ি তৈরি নিয়ন্ত্রণ করা গেছে, যদিও সম্পূর্ণরূপে তা বন্ধ করা যায় নি। (d) আরও ইতিবাচক পরিকল্পনা হল বড় বড় নগর থেকে দূরে নতুন নতুন প্রবৃদ্ধি বিন্দু কেন্দ্র গড়ে তোলা। এখানে নতুন নতুন শিল্প গড়ে উঠবে। এখানে শিল্প গড়ে তোলার জন্য সরকার সস্তায় জমি ও বিদ্যুৎ সরবরাহ, কর মকুব ও শিল্প ঋণের ব্যবস্থা করবে। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পাশ্চাত্য দেশগুলোতে শহরের জনসংখ্যা বৃদ্ধির ভবিষ্যতের ভয়াবহ চিত্র কল্পনা করে প্রবৃদ্ধি বিন্দু কেন্দ্রে নতুন নতুন শহর গড়ে উঠেছিল (Hudson, 1976)।

(ii) নতুন শহর (New Towns) : নতুন শহর সৃষ্টির উদ্দেশ্য হল বড় বড় নগরের ওপর থেকে চাপ কমানো। এই উদ্দেশ্যে নতুন নতুন শিল্পকেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে। পাশ্চাত্য দেশে এই সব নতুন শহরে কিছু কিছু আর্থিক সংস্থানের ব্যবস্থাও করে। এখানে জনসংখ্যা ও অর্থনৈতিক উন্নতির মধ্যে একটা ভারসাম্য থাকে। এই সব নতুন নগরীতে শিল্প ও বসতির জন্য এক একটি নির্দিষ্ট এলাকা থাকে। মূল কথা হল এই সব নতুন নগরীতে একদিকে ভালো বাসস্থানের ব্যবস্থা রাখা, অন্যদিকে কর্মসংস্থানেরও ব্যবস্থা থাকা। নতুন শহর সম্পর্কিত ধারণা বেশ কিছুটা পুরনো। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ব্রিটেনে সলটেয়ার (Saltaire, 1852), বোর্নভিল (Bournevillc, 1879), পোর্ট সানলাইট (Port Sunlight, 1886) ও ক্রেসওয়েল (Creswell, 1895)-এর মত কয়েকটি মডেল উপনগরী সৃষ্টি হয়েছিল। এই সব শহর সৃষ্টির পেছনে দানশীল ব্যক্তি ও খনি মালিকদের অবদান ছিল বেশি। গ্রেট ব্রিটেন ছাড়া অন্যান্য শিল্পসমৃদ্ধ দেশগুলোতেও এই ধরনের উপনগরী গড়ে উঠেছিল। শিল্পে নিযুক্ত কর্মীদের বাসস্থানের জন্য ফ্রান্সে Noiselsur-Seine(1874), যুক্তরাষ্ট্রে Pullman (1881) ও নেদারল্যান্ডে Agenta Park (1883)-এ পরিকল্পিত উপনগরী গড়ে উঠেছিল (Hudson, 1976)।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ ও বিংশ শতাব্দীর শুরুতে নতুন শহর সৃষ্টির ঢেউ কিছু কিছু উদ্যান শহরগুলির (Garden suburbs) পরিকল্পনা ও রূপায়ণের মধ্যে আমরা প্রত্যক্ষ করি, যেমন Bedford Park, Action (1875) ও Hampstead Garden Suburb (1907)। আমাদের দেশে অবশ্য নতুন শহর সৃষ্টির আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট পাশ্চাত্য দেশের তুলনায় একটু ভিন্ন। আমাদের দেশে ব্রিটিশ আমলে গড়ে ওঠা রেলওয়ে শহরগুলোকে 'নতুন শহর' আখ্যা দেওয়া হত। এই সময় ভারতের দ্বৈত সত্তা ছিল। রেলপথের 50 মাইলের (80 কি. মি.) মধ্যে গড়ে ওঠা অ্যাংলোস্থান যেখানে প্রাদেশিক রাজধানীসমূহ গড়ে উঠেছিল এবং যেখানে বিনিয়োগ করা হত, আর বাকি এলাকা হল হিন্দুস্থান। এই অ্যাংলোস্থান ও 50 মাইল রেলপথ এলাকার মধ্যে গড়ে উঠেছিল রেল কলোনী। এই সব রেল আবাসনের অনেকগুলো পরবর্তীকালে পৌর কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল, যেমন পূর্ব ভারতের খড়্গপুর ও আসানসোল, উত্তর ভারতের টুণ্ডলা, পশ্চিম ভারতের মনমাদ ও ভুসাওয়াল, দক্ষিণ ভারতের ওয়ালটেয়ার, আকর্ণম ইত্যাদি।

দেশভাগের পর পূর্ববঙ্গ থেকে আগত শরণার্থীদের জন্য গড়ে উঠল অনেক নতুন নতুন শহর, যেমন পশ্চিমবাংলায় কল্যাণী, পাঞ্জাবের নীলাখেরী, দিল্লীর কাছে ফরিদাবাদ, গুজরাতের গান্ধীধাম এইরকম কয়েকটি উদ্বাস্তু পুনর্বাসনশহর। চণ্ডীগড়, ভুবনেশ্বর ও পরবর্তীকালে গান্ধীনগরের মত রাজধানী নগরগুলো স্বাধীনতার পরে গড়ে উঠেছিল। শিল্পায়নের সাথে সাথে দেশের বিভিন্ন স্থানে কয়েকটি শিল্প উপনগরীর সৃষ্টিকে পৌরায়ণের ক্ষেত্রে একটি বড় পদক্ষেপ বলা যেতে পারে। দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনার সূচনা ও সেই সাথে কয়েকটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন (চন্দ্রপুরা, পাত্রাতু) এই অঞ্চলে নতুন শিল্পকেন্দ্রের সৃষ্টিতে টনিকের কাজ করেছে। ভাকরা নাঙ্গাল, তুঙ্গভদ্রা ও হীরাকুঁদের মতো বহুমুখী নদী পরিকল্পনা এ দেশে নতুন শিল্প স্থাপনে প্রেরণা জুগিয়েছিল। বড় বড় নগর থেকে দূরে নতুন শিল্প স্থাপন করাও পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অঙ্গ ছিল, বিশেষ করে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এ দেশে নতুন শিল্প স্থাপনে প্রেরণা জুগিয়েছিল। বড় বড় নগর থেকে দূরে নতুন শিল্প স্থাপন করাও পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অঙ্গ ছিল, বিশেষ করে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায়। এই সময় অনুন্নত এলাকায় সরকারি মালিকানাধীন শিল্প স্থাপনের দিকে জোর দেওয়া হয়েছিল, যাতে সেই সব স্থানের আর্থিক বিকাশ ঘটে। এছাড়া বড় শহরের ওপর জনসংখ্যার চাপ কমানোর জন্য সল্ট লেকের মতো উপনগরীরও সৃষ্টি হয়েছে (Sivaramakrishnan, 1977)। চিত্রে পশ্চিমবঙ্গের নতুন শহরগুলো দেখানো হল। (চিত্র নং)

(iii) নগরের মধ্যেই পরিকল্পনা (Planning within the city) : শহর সৃষ্টি হবার পর জনসংখ্যার প্রচণ্ড চাপে নানা ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হয়। এতে শহরের স্বাভাবিক জীবন-যাত্রা ব্যাহত হয়। শিলিগুড়ির কথাই ধরা যাক।

আমরা আগেই জেনেছি যে এই শহরটি শিলিগুড়ি টাউন স্টেশন সংলগ্ন এলাকাকে (মহাবীরস্থান) কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। তখনকার তুলনায় বর্তমানে লোকসংখ্যা বহুগুণ বেড়েছে। অথচ রাস্তাঘাট আগের মতই অপ্রশস্ত রয়ে গেছে। বাড়িগুলো ঘিঞ্জিভাবে গড়ে উঠেছে। এই সব সমস্যা থেকে মুক্তি পাবার উপায় হল শহরকে পুনর্গঠন করা অর্থাৎ বর্তমান শহরের উন্নয়নের জন্য রাস্তার পুনর্নির্মাণ, প্রয়োজনবোধে পুরনো বাড়ি ভেঙে নতুন বাড়ি তৈরি করা, রাস্তাঘাট চওড়া করা, জলনিকাশী ব্যবস্থার সুষ্ঠু সমাধান, শহরের মধ্যে ভূমি ব্যবহারে সামঞ্জস্য আনা ইত্যাদি। তবে এই সব কাজে বৃহত্তর স্বার্থ জড়িয়ে থাকে। জমি, বাড়ির মালিকানা-জনিত আইনি জটিলতা ও আর্থিক বোঝা শহরের পুনরোন্নয়ন ও পুনর্নবীকরণের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। ফলে এই কাজটি ধীর গতিতে এগোয়। কোন কোন ক্ষেত্রে জোড়াতালি দেওয়া কাজ হয় (piecemeal work)। এদিক দিয়ে বিচার করলে পৌর পুনর্নবীকরণ নতুন শহর গড়ার চেয়ে অনেক জটিল সমস্যার সৃষ্টি করে।

আধুনিক নগর পরিকল্পনায় ভূমি-ব্যবহার বলয়ের (Land use zoning) গুরুত্বকে মর্যাদা দেওয়া হয়। ভূমি ব্যবহার বলয় হল শিল্প, আবাস, আমোদ প্রমোদ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, বাজার ইত্যাদির জন্য আলাদা আলাদা স্থান নির্দিষ্টভাবে রাখা। শহরের ভূমির যথাযথ ব্যবহার ও উন্নয়নের জন্য স্থানীয় উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (Development Authority) সৃষ্টি করা হয়। এই সব কর্তৃপক্ষের কাজ হল ভূমিকে যথাযথ ব্যবহারের দিকে লক্ষ্য রাখা ও সুষ্ঠু পরিকল্পনা রচনা করা। ক্ষেত্রবিশেষে এই প্রতিষ্ঠান নিজেই জমি অধিগ্রহণ করে ও মালিকদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেয়। বাড়ির নকশাও এই সব প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে অনুমোদন করাতে হয়। দেরিতে হলেও আমাদের দেশে এ ধরনের উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ সৃষ্টি হয়েছে, যেমন দিল্লী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (DDA), শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (SJDA), হলদিয়া উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (HDA) ইত্যাদি।

অধিকাংশ পাশ্চাত্য দেশে আবাসস্থলের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। এখানে পুরনো বাড়ি ভেঙে নতুন বহুতল বাড়ি তৈরি হয়। এতে জায়গার সমস্যাটা কিছুটা মিটলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে পাশাপাশি ফ্ল্যাটগুলো গড়ে ওঠায় তা অস্বাস্থ্যকর হয়ে পড়ে। তার চেয়ে বড় কথা হল ফ্ল্যাটের বাসিন্দাদের মধ্যে যৌথ জীবনযাত্রার মোহ থাকে না প্রত্যেকেই বিচ্ছিন্নতায় ভোগে। এছাড়া অনেক সামাজিক সমস্যারও সৃষ্টি হয়।

তবে পাশ্চাত্য দেশগুলোতে নগর পরিকল্পনা শুধু রাস্তাঘাট চওড়া বা যানবাহন চলাচলের উন্নতির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। পুরনো বাড়ির স্থানে নতুন বাড়ি তৈরি বা পুরনো বাড়িতে আধুনিক স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করা, কোন কোন ক্ষেত্রে বড় বাড়িকে ছোট ছোট আবাসনে পরিণত করা, পুরনো বাড়ির প্রয়োজনীয় সংস্কার-এ সবই পৌর পরিকল্পনার মধ্যে পড়ে।

পৌর পরিকল্পনার আর একটি দিক হল যাতায়াত সমস্যার সমাধান করা। এ ক্ষেত্রে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমস্যা ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির। পাশ্চাত্যে ব্যক্তিগত মোটর গাড়ির সংখ্যা খুব বেশি। ফলে দুর্ঘটনা ছাড়াও পরিবেশ দূষণ, শব্দ দূষণ সমস্যা কিছুটা আছে। যানজটের দরুন কর্মস্থলে পৌঁছোতেও দেরি হয়। এছাড়া পাশ্চাত্য দেশে ব্যক্তিগত গাড়ির সংখ্যা বেশি বলে সরকারি যানবাহনের সংখ্যা কম। ফলে নিত্যযাত্রীদের সরকারি বাসে উঠতে বেশি পয়সা খরচ করতে হয়। অধিকাংশ পৌর পরিকল্পনায় নগর কেন্দ্রের পুনরোন্নয়নের দিকে জোর দেওয়া হয়েছে। এদের মধ্যে প্রধান হল নগরের কেন্দ্রস্থল থেকে দূরে গাড়ি পার্কিং করার ব্যবস্থা।

অন্যদিকে, প্রাচ্যের দেশগুলোতে জনসংখ্যার তুলনায় যানবাহন কম। আবার যানবাহনের তুলনায় রাস্তার পরিসর কম। ফলে যানজট এখানকার নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। শহরগুলির রেল যোগাযোগ ব্যবস্থাও ত্রুটিমুক্ত নয়। অতএব আমরা দেখলাম দু'টি ক্ষেত্রে সমস্যা ভিন্ন ভিন্ন ধরনের। প্রথমটির ক্ষেত্রে নগরের কেন্দ্রস্থল থেকে দূরে যানবাহন নিয়ন্ত্রণ করা হয় এবং নগরের কেন্দ্রস্থলে পথচারীদের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। প্রাচ্যের দেশগুলোতে রাস্তা

চওড়া করা, ট্রাফিক সিগন্যালিং ব্যবস্থা উন্নত করা, পর্যাপ্ত সংখ্যক যানবাহনের ব্যবস্থা করা একান্ত জরুরী। বড় বড় নগরে টিউব রেল যোগাযোগ প্রয়োজন। এতে যানবাহনের সমস্যা অনেকটা মিটবে।

৬.৪.২ পরিকল্পনার সামাজিক দিক ও আইন ঃ

(i) নগর পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সামুদায়িক উন্নয়ন (Community development)-এর উদ্যোগে গ্রহণ ঃ জনস্বাস্থ্য বিষয়ে খেয়াল রেখে পানীয় জলের ব্যবস্থা, উপযুক্ত হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরি, শিক্ষাকেন্দ্র ও আমোদপ্রমোদের কেন্দ্র তৈরি। এধরনের সামুদায়িক উদ্যোগের মধ্যে পরিকল্পনা এলাকায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কর্মসংস্থানের বিষয়টিও আছে।

(ii) নগর পরিকল্পনায় নাগরিকদের মতামত গ্রহণ এবং নিয়ন্ত্রণবিধি কার্যকর করার ক্ষেত্রে নাগরিকদের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করা ঃ নগর পরিকল্পনাকে কার্যকরী করার জন্য উপযুক্ত আইন কানুনের প্রয়োজন। বাসিন্দাদের ব্যক্তিগত প্রয়োজনের সঙ্গে সামুদায়িক প্রয়োজনগুলো সমন্বিত না হলে, প্রাকৃতিক সম্পদের নিয়ন্ত্রিত ও যথাযথ ব্যবহার সুনিশ্চিত করা না গেলে, 'পরিকল্পিত উন্নয়ন' কাগজপত্রের বাইরে যায় না। উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থার সাহায্যে ভূমি ব্যবহার ও অঞ্চল বিভাজনকে নিয়ন্ত্রণাধীন রাখা যায়, যথেচ্ছ নির্মাণ কাজকে বন্ধ করা যায়। আইনি সংস্থান বা উপযুক্ত (Legislation) নগর পরিকল্পনার একটি অবশ্য প্রয়োজনীয় অঙ্গ (বিপন্ন পরিবেশ, 2000)।

এই রাজ্যেও নানাবিধ আইন তৈরি করে নগর পরিকল্পনাকে কার্যকরী রূপ দেবার চেষ্টা হয়েছে। বিভিন্ন পুর আইন ছাড়াও পরিকল্পনা এলাকাগুলোকে বাস্তবায়িত করার জন্য Calcutta Metropolitan Planning Area Control Act (1956), The W. B. Govt. Township Act(1976) এবং West Bengal Town and Country Planning and Development Act (1979) জাতীয় আইন হয়েছে।

৬.৫ সারাংশ

- শহর ও নগর সমাজের সংস্কৃতি, অর্থনীতি, কারিগরী ও আবরণের প্রতিফলক হিসেবে কাজ করে।
- 'লোকসমাজ' কথাটার একটা বিশেষ তাৎপর্য আছে। লোকসমাজ কথাটির ব্যাখ্যা বিভিন্ন জন বিভিন্ন ভাবে দিয়েছেন। তবে এ-ও ঠিক যে নগরের বা শহরের সামাজিক সম্পর্ক উপলব্ধির জন্য 'লোকসমাজ' অভিধা অপরিহার্য নয়। সমাজবিজ্ঞানীদের বিশ্লেষণে 'মানবিক পরিবেশবিদ্যা' বলে একটি নতুন অভিধা ব্যবহৃত হয়েছে। এর মধ্যে শহর নগরের অনেক বিষয়ই অঙ্গীভূত।
- নগর ও পৌরবসতির সামাজিক সত্তা যে কটি নির্দিষ্ট সূচকের মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয়, সেগুলি হল ঃ ১) জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও বৈচিত্র, ২) ব্যক্তিগত পরিচয়ের অভাব ৩) শ্রমবিভাজন ৪) পরস্পরের প্রত্যক্ষ যোগাযোগের অভাব ৫) জমির অভাব।
- পৌর সংকটগুলি এভাবে তালিকাবদ্ধ করা যায় ঃ জনসংখ্যার বিস্ফোরণ, পৌর বিক্ষেপণ, বাসস্থানের সমস্যা, জল সরবরাহের সমস্যা, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংকট, বিভিন্ন ধরনের দূষণ ও অপরাধ প্রবণতার সমস্যা।
- এ সব সমস্যা সমাধানের জন্য আদর্শ ও আইনানুগ পরিকল্পনা প্রয়োজন। দরকার হলে আইন সংশোধন ও নতুন আইন প্রণয়নও দরকার।

৬.৬ সর্বশেষ প্রশ্নাবলি

1. 'নগরী সমাজের সংস্কৃতি, অর্থনীতি, কারিগরী ও আচরণের প্রতিফলন' ব্যাখ্যা করুন।
2. বাসস্থানের মধ্য দিয়ে শহর কী ভাবে সমাজকে প্রতিফলিত করে?
3. কলকাতার বিভিন্ন ভাষাভাষী অঞ্চলের একটা রূপরেখা ছিল।
4. 'লোক সমাজ' অভিধাটির বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করুন। 'মানবিক পরিবেশবিদ্যা' বলতে কী বোঝেন?
5. সামাজিক সত্তা হিসেবে নগরের সূচক সমূহের কার্যকারিতা ব্যাখ্যা করুন।
6. বিভিন্ন প্রকার পৌর সমস্যাগুলি বিবৃত করুন, তাদের সমাধানের সম্ভাব্য পথ নির্দেশ করুন।
7. নগর পরিকল্পনার বিভিন্ন দিকগুলি পর্যালোচনা করুন।
8. পরিকল্পনার সামাজিক দিক ও আইন সম্বন্ধে আলোচনা করুন।

৬.৭ উত্তরমালা

১. ৬.২ অংশ দেখুন
২. ৬.২.৪ অংশ দেখুন
৩. ৬.২.৪ অংশ দেখুন
৪. ৬.২.৫ অংশ দেখুন
৫. ৬.২.৬ অংশ দেখুন
৬. ৬.৩ অংশ দেখুন
৭. ৬.৪ অংশ দেখুন
৮. ৬.৪.২ অংশ দেখুন

৬.৮ গ্রন্থ নির্দেশিকা

ইলাহী, মউদুদ ও আকমল হোসেন, ১৯৮৭ : *ভৌগোলিক শব্দপঞ্জী ও বাংলা পরিভাষা,* ঢাকা, বাংলাদেশ

দাশগুপ্ত, সমীর, ১৯৮৩ : *অর্থনৈতিক সমাজতত্ত্ব* পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কোলকাতা

নাগরিক মঞ্চ, ২০০০ : *বিপন্ন পরিবেশ,* ২০০০, নাগরিক মঞ্চ, কোলকাতা-৭০০০৮৫

বারী, আবদুল মোঃ, ১৯৯৪ : *গ্রামীণ বসতি,* ভৌগোলিক পরিচয়, শাপলা, ঢাকা।

ভট্টাচার্য, অণিমা ও বিমলেন্দু ভট্টাচার্য, ১৯৭৭ : *সমাজ বিজ্ঞানীয় ভূগোল,* পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কোলকাতা।

ভূগোল পরিভাষা উপসমিতি, ১৯৯৬ : *ভূগোল পরিভাষা,* পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কোলকাতা।

সেন, জ্যোতির্ময়, ১৯৯৮ : *জনবসতি ভূগোল*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কোলকাতা।

Alam, S. M., 1965 : *Hyderabad Secunderabad (Twin Cities), A Study in Urban Geography*, Allied Publishers, Bombay.

Alexander, J. W., 1952 : *The Economic Life of Oshkosh*, Madison (Wisconsin).

Alexandersson, Gunnar, 1956 : *The Industrial Structure of American Cities*, London and Stockholm.

Aurousseau, M., 1924 : "Recent Contributions in Urban Geography". *Geographical Review*, Vol. XIV, pp 444-45.

Bachi, R., 1962 : "Standard Distance Measures and Related Methods for Spatial Analysis. *Papers, Regional Science Association*, Vol. 10. pp. 83-102.

Baskin, C. W., 1966 : *Central Places in Southern Germany*, Prentice Hall Inc., Englewood Cliff, New Jersey.

Beaujeu, Garnier, 1978 : *Geography of Population*, 2nd edn, Longman, New York.

Beaujeu, Garnier, & G. Chabot, 1967 : *Urban Geography* ; Longman, London.

Bergel, E. E., 1955 : *Urban Sociology*, McGraw Hill, New York.

Berry, Brian, J. L., et. al., 1986 : The Factoral of Calcutta in Indian Cities, *Ecological Perspectives*, ed, by V. K. Tiwari et. al., Concept, New Delhi.

Bhattacharya, B., 1972 : Factors Determining the Central Functions and Urban Hierarchy in North Bengal, *Geographical Review of India*, Vol. 39, No. 4.

Biswas, A., P. Chatterjee & S. K. Chaube, 1976 : The Ethnic Composition of Calcutta and the Residential Patterns of Minorities, *Geog. Review of India*, Calcutta, Vol. 38, No. 2 & 3.

Bose, N. K., 1965 : 'Calcutta : A Premature Metropolis' in Knoff, A. A. (1965) ed. *Cities*, Penguin Books Ltd. Harmonsworth, England.

Bracy, H. E., 1953 : "Towns as Rural Service Centres," Transactions and *Papers, Institute of British Geographers*, Vol. 49, pp. 95-105.

Burgess, E. M., 1925 : 'The Growth of the City : An Introduction to a Research Project' in Park, R. E. and E. W. Burgess, ed. (1925), The City, Chicago University Press, Chicago.

Brunhes, J., 1947 : *Human Geography*, Rand McNally & Co., London.

Brush, J. E., 1953 : 'The Hierarchy of Central Places in South Western Wisconsin', *Geographical Review*, Vol. XI.

Carter, Harold, 1975 : *The Study of Urban Geography*, Edward arnold Ltd.

Charles, T & J. Stewart, 1969 : "The Size and Spacing of Cities", *Readings in Urban Geography* (Ed. Mayer and Kohn), Central Book Dept. Allahabad, pp. 245-50.

Chatterjee, A. B., 1967 : Howrah : A Study in Social Geography, Calcutta.

Childe, V. Gordon, 1950 : 'The Urban Revolution' in *Town Planning Review*, Vol. 21.

Christaller, W., (1933) : *Die Zentraler Qute in Suddentschland*, Trans., by Baskin, C. W. (1966). *Central Places in Southern Germany*, Prentice-Hall, Englewood Cliff, New Jersey.

Clark, P. J., and Evans, F. C., 1964 : 'Distance to Nearest Neighbour as a Measure of Relationship in Population in *Ecology*, Vol.31.

Cleef, Eugene Van, 1941 : Hinterland Umland, *Geog. Review*, Vol. 31.

Colby, C. C., 1933 : "Centrifugal and Centripetal Forces in Urban Geography" *Annals of the Association of Urban Geography*, Vol XXII, pp. 1-20

Dacey M. F., 1962 : "Analysis of Central Place and Point Patterns by a Nearest Neighbour Method." *Lund Studies in Geography*, Series B. Human Geography, Vol. 24, pp. 55-75.

Deshpande, C. D., and B. Arunachalam, 1981 : 'Bombay' in Pacique, Michael (1981) ed. *Problems and Planning in Third* World Cities, Helm, London.

Dickinson, R. E. 1947 : *City Region and Regionalism*, Routledge and Kegan Paul Ltd., London.

———— 1948 "The Sope and Status of Urban Geography," *Land Economics* pp. 221-38.

———— 1968 : City & Region *A Geographical Interpretation*, Routledge and Kegan Paul Ltd. London.

Dikshit, K. R. and S. B. Sawant, 1968 : "Hinterland as a Region : Its Type, Hierarchy, Demarcation, and Characteristics-Illustrated in Case Study of the Hinterland of Poona', *The National Geographical Journal of India*, Vol, 14, pp. 1-22.

Dwivedi, R. L., 1964 : 'Delimiting the Umland of Allahabad', *The Indian Geographical Journal*, Vol, 39, pp.123-39.

Dutt, A.. K. 1963 : 'Umland of Jamshedpur ; A Study in Urban Geography' in *Geographical Review of India.*, Vol. XXV, No. 2.

Ellefsen, Richard A., 1962 : 'City-Hinterland Relationships in India', in Roy Turner (ed) : *India's Urban Future*, Oxford University Press, Bombay, 1962, pp.94-116.

Fawcett, C. W., 1942 : British Conurbation in 1921, *Sociological Review*, Vol.42.

Geddess, Patrick, 1915 : *Cities in Evolution*, Williams & Norgate Ltd. London.

Ghosh, Sumita, 1998 : *Introduction to Settlement* Geography, Sangam Books, Kolkata.

Gras, N. S. B., 1922 : *An Introduction to Economic History,* Harper, New York.

Green, F. H. W., 1950 : Urban Hinterlands in England and Wales ; An Analysis of Bus Services, Geographical Journal, Vol. 116.

Godlund, S., 1956 : "The Functions and Growth of Bus Traffic within the Sphere of Urban Influence," *Lund Studies in Geography,* Series B., Human Geography, No. 18, p. 12.

Gopi, K. N., 1978 : *The Process of Urban Fringe Development ; A Model.* Concept, Delhi.

Gosal G. S., 1959 : "The Occupation Structure of India's Rural Population : A Regional Analysis. *The National Geographical Journal of India,* Vol. 5, pp 137.

Gottmann, J., 1961 : *Megalopolis,* Twentieth Century Fund, New York.

Hagget, Peter, 1965 : *Locational Analysis in Human Geography,* Edward Arnold Ltd. London.

Harris, C. D., 1943 : A Functional Classification of Cities in the United States, *Geographical Review,* Vol. 33.

&

E. L. Ullman, 1945 : The Nature of Cities, *Annals of the American Academy of Political and Social Sciences,* Vol. 242.

Harvey, David, 1973 : *Social Justice and the City.* Edward Arnold Publishers, London.

Hauser, Philip M., & Otis Dudley Duncan (eds), 1954 : *The Study of Population, An Inventory and Appraisal,* The University of Chicago Press.

Hausen, N. M., 1971 : *Intermediate Size Cities As Growth Centres,* Praeger Publishers, New York, p. 30.

Herbert, David, 1972 : *Urban Geography, A Social Perspective,* David & Charles, North Vancouver B. C. Canada.

Hope Tisdale Eldridge, 1956 : "The Process of Urbanization," in J. J. Spengler and O. D. Duncan (eds.) *Demographic Analysis,* Glence, III : Free Press.

Hoyt, H., 1939 : The Structure and Growth of Residential Neighbourhoods in American Cities, Federal Housing Administration, Washington.

Hudson, F. S., 1976 : *A Geography of Settlements,* 2nd edn., Macdonald & Evans Ltd., Plymouth.

Hussain, Majid, 1999 : *Human Geography,* 2nd edn., Rawat, Jaipur.

Janaki, V. A and H. M. Ajwani, 1961 : Urban Influence and the Changing Face of a Gujarat Village, *Journal of the Maharaja Sayaji Rao University,* Baroda, Vol, 10, November, 1961, pp. 59-87.

Jefferson, Mark, 1939 : The Law of the Primate City, *Geog. Review*, Vol. XXIX.

Jones, Emrys, 1965 : *Human Geography*, Chatto & Windus, London.

——, 1969——— : Towns and Cities, Oxford University Press, Oxford.

Kar, N. R., 1960 : 'Urban Hierarchy and Central Functions around Calcutta in Lower West Bengal, India and their significance' in Norborg, Knut (1960), Ed. in *Proceedings of the IGU Symposium in Urban Geography*, C. W. K. Gleesup Publishers, Lund.

Knowles, R. & J. Wareing, 1976 : *Economic and Social Geography*, W. H. Allen, London.

Kohn, Clyde F., 1954 : Settlement Geography in *American Geography* : Inventory and Prospect, Syracuse Univ. Press.

Krishan, Gopal, 1963 : 'Spatial Analysis of Vegetable Supply of a Planned City : Chandigarh', *The Indian Geographical Journal*, Vol, 38, 1963. pp. 1-15.

Lal, A, 1959 : Some Aspects of Functional classification of cities and a Proposed Scheme for Classifying Indian cities, The *Nat. Geog. Jour. of India*, Vol. 5, Part 2.

Blache, P. Vidal de., 1959 : *Principles of Human Geography*, Constable, London.

Leong, Goh Cheng & G. C. Mongan, 1982 : *Economic and Human Geography*, Oxford University Press, Oxford.

Losch, A, 1954 : *The Economics of Location*, Yale University Press, New Haven.

Mandal R. B., and G. L. Peters, 1981 : The Development of Conurbation in India. A Conceptual Framework in *Urbanization and Regional Development*, Concept, New Delhi.

Mayer, H. M., 1954 : Urban Geography in *American Geography Inventory and Prospect*, Syracuse University Press.

Mayer, H. M., 1967 : *Readings in Urban Geography*, Central Book Depot, Allahabad.

Mckenzie, R. D., 1933 : *The Metropolitan Community* "Mcgraw-Hill" New York.

Mitra, Asok, 1973 : *Functional Classification of India's Towns*, Institute of Economic Growth, Delhi.

Mukherjee, K. N., 1996 : *Agricultural Land Capability of West Bengal*, Calcutta.

Mukherjee, M. M. 1968 : "Functional Association of Towns in Bihar, India", *21st International Geographical Congress*, 1968.

Mumford, Lewis, 1963 : *The City in History, Its Origin, Its Transformation and its Prospects*, Secker & Warburg, London.

Murphy R. E., 1966 : *The American City : An Urban Geography*, McGraw Hill, New York.

Murphy, R. E., and J. E. Vance, 1954 : Delimiting the C.B.D., *Economic Geography*, Vol. XXX.

R. E. Murphy and J. E. Vance, 1955" : Internal Structure of C.B.D. "*Economic Geography*, Vol. 31, p.42.

Nangia, Sudesh, 1976 : Delhi Metropolitan Area : A Study in Settlement Geography, K. B. Publication, New Delhi, 1976.

Nath, V, 1962 : 'The Concept of Umland and Its Delimitation', Decan Geographer, Vol. 1.

Nelson, H. J., 1955 : A Service Classification of American Cities, *Economic Geography*, Vol.31.

Northam, R. M., 1979 : *Urban Geography* (Second Edition), John Wiley & Sons., New York.

Pal, M., & J. Sen, 1984 : A Comparative Study of Two Towns in North Bengal, *Geographical Review of India*, Vol. 46, No.4

Park, R. E. and E. W., Burgess, ed. (1925): The City, Chicago University Press., Chicago

Pownell, L., 1953 : "Functions of New Zealand Towns," *Annals of the Association of American Geographers*, Vol. 43, pp. 332-50

Raffiullah, S. M, 1965 : "A New approach to Functional Classification of Towns." *The Geographer*, Vo., XII, pp. 40-48.

Ramachandran, R., 1989 : *Urbanisation and Urban Systems in India*, Oxford University Presss, Delhi.

Ramesh, A., 1965 : Functions and Functional Classification of Towns of Tamilnadu, : A Study in Urban Settlement, Unpublished Ph. D. Thesis, Banaras Hindu University, Varanasi.

Rao, V. L. S. Prakasa, 1964 : *Towns of Mysore State*, Indian Statistical Insitute, Calcutta.

Rao, Prakasa V. L. S., 1983 : *Urbanisation in India* : Spatial Dimensions, Concept, New Delhi, 1983.

Prakasa Rao, V.L.S. and V.K. Tiwari, 1979 : *The Structure of an Indian Metropolis : A Study of Bangalore*, Allied Publishers, Delhi.

Ratcliffe, Richard U., 1949 : *Urban Land Economics*, McGraw-Hill Inc., New York.

Ray, Ranjit, 1985 : *Economic Change in Siliguri and Problems of its Urban Development*, Unpublished Ph. D. Thesis, North Bengal University.

Saxena, N. P. and R. C., Tyagi, 1975 : "Criteria for Determining Centrality in a Macro-Region," *The Geographical Observer*, Vol. II, March, 1975, pp. 53-64.

Sholar, Pater, 1948 : "The Scope and Status of Urban Geography", *Land Economics*, pp. 221-38.

Singh, Harihar, 1972 : *Kanpur : A Study in Urban Geography*, Indrani Devi, Varanasi,

Singh, L., 1956 : The Umland of Agra Based on Bus Services', *The National Geographical Journal of India*. Vol. 2 pp. 149-53.

Singh, R. L., 1955 : *Banaras : A Study in Urban Geography*, Nand Kishore & Bros., Banaras.

———, 1972——— : 'The Concept of Umland', in ICSSR : *A Survey of Research in Geography*, Popular Prakashan, Bombay, Chapter 15, pp. 226-33.

Singh, U., 1961 : 'Umland of Allahabad', *The National Geographical Journal of India*, Vol. 7 pp. 37-51.

Singh, V.N.P., 1976 : *Chotanagpur Plateau : A Study in Settlement Geography*, K. B. Publications, New Delhi, 1976.

Sivaramkrishnan, K. C., 1977 : *New Towns in India* (Cyclostyled), Indian Institute of Management, Calcutta.

Sjoberg, Gideon, 1960 : *The Pre-Industrial City : Past and Present*. The Free Press of Glencoe, Illinois.

Smailes, A. E., 1944 : "The Urban Hierarchy in England and Wales", *Geography*, Vol. 29, Part I, p. 41-51.

Smith, R.H.T., 1965 : Methods and Purpose in Functional Town Classification, *Annals of the Association of American Geographers*, Vol. 55, p.454.

Stamp L.D., 1960 : *Applied Geography*, Middlesex.

Taylor, G., 1945 : Towns and Townships in Southern Ontario, *Economic Geography*. XXI, pp. 86-96.

———, 1949——— : *Urban Geography*, Methuen London

Thomas, L.L., 1927 : Localization of Business Activities in Metropolitan St. Louis, St. Louis.

Thompson, D' Arcy, 1917 : *On Growth and Form*, Cambridge University Press, Cambridge.

Thompson, W.S., 1935 : *Urbanization in Encyclopaedia of Social Sciences*, Vol. XV, Macmillan, p. 189.

Turner, Roy (ed.) 1962 : *India's Urban Future*, Oxford University Press, Mumbai.

Whittlesey, Derwent, 1937 : Kano : A Sudanese Metropolis, *Geographical Review*, Vo. 27.

Wirth, Louis, 1938 : 'Urbanism as a Way of Life' in *The American Journal of Sociology*, Vol. 44, No. 1.